ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা

Islamic State System

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম একজন গবেষক, লেখক এবং ব্যাংকার। তিনি ১৯৫৯ সালে ঐতিহ্যবাহী লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীগঞ্জ হাইস্কুল ও লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ থেকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সাথে বিএসএস (অনার্স) ও এমএসএস ডিগ্রি লাভের পর ব্যাংকিং ও অধ্যাপনা পেশার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। পেশাগত জীবনে ব্যস্ততার মাঝেও তিনি একজন গবেষক, লেখক ও বিশ্লেষক হিসেবে বিশ্ব পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, বাংলাদেশের অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং এবং ইসলামী দুনিয়া বিষয়ে নিয়মিত লিখছেন। অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মাসিক পৃথিবী, ছাত্র সংবাদ, কিশোর কণ্ঠে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি পাঠ্যবই লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা, ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা, ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও

ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

বিএসএস (অনার্স), এমএসএস

পি.এইচ.ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহসান পাবলিকেশন

বাংলাবাজার ❑ কাঁটাবন ❑ মগবাজার

ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

ISBN : 984-70012-0004-3

প্রকাশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
❑ ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৯৩৭৪৮০
❑ ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা, ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৭১৪২০৭৮৩৯
❑ কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬, ০১৮১৫৪২২৪১৯

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে, ২০১৪

প্রচ্ছদ
মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন

কম্পোজ
র‍্যাক্স কম্পিউটার
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মুদ্রণ
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISLAMER RASTRO BABOSTHA (Islamic State System) by **Muhammad Nurul Islam**, Published by Ahsan Publication, 38/3 Banglabazar. Dhaka-1100, First Edition April 2009, 2nd Edition May 2014, Price : Tk. 450.00 only.

AP-60

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী রচিত।

লেখকের কথা

ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ে গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে 'ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা' প্রকাশ হলো। এ জন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি সব সময়ই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম, এ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে জানা, বুঝা এবং অন্যদের কাছে তুলে ধরার তীব্র প্রেরণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নরত থাকাকালীন সময় থেকেই অনুভব করি। আমার লিখিত প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা (২০০৩), ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা (২০০৮) পাঠ্যবই হিসেবে প্রকাশিত হয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হওয়ায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ে পৃথক একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনার দাবি বিভিন্ন মহল থেকে বারবার জোরের সাথে উত্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী রচিত হয়ে এটি এখানে প্রকাশ পেলো।

গ্রন্থটি ইসলামী রাষ্ট্রনীতি-সাহিত্যে ব্যাপক অধ্যয়ন ও বহু বছর ধরে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা ও পাঠদানের অভিজ্ঞতার ফসল। এই গ্রন্থ রচনায় কোন মৌলিক অবদানের দাবি করা হচ্ছে না। যা দাবি করা হচ্ছে তা হলো ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা, বিভিন্ন গ্রন্থাবলী, পুস্তিকা, প্রবন্ধ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে হজম করা, সংগৃহীত মাল-মসলা সংক্ষিপ্তকরণ, সম্প্রসারণ, সদৃশকরণ, পুনরীক্ষণ, সংযোজন ও মূল্যায়ন। যাদের লেখার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি মূলত বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে রচিত। যাঁরা ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী, তাঁরা এ থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। যাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্রব্যবস্থা পৃথক একটি বিষয় বা শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করা যায় না বলে মনে করেন, তাঁরা আমার দৃঢ়বিশ্বাস গ্রন্থটি পড়ে শুধু আনন্দই পাবেন না, সমালোচনা, পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনার জন্যেও প্রচুর মাল-মস্‌লা পাবেন। গ্রন্থটি যেকোন সচেতন নাগরিক, রাজনীতিবিদসহ সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য একটি উপযোগী গ্রন্থ হবে বলে মনে করি।

রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্থাপন, শিক্ষা ও সভ্যতার সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় মুসলিমগণ অতীব বিস্ময়কর প্রতিভার স্পষ্ট ও স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে মানব সভ্যতার ইতিহাসে অবদানের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন, তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। শূন্য বিন্দু থেকে আরম্ভ করে মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনায় যে কল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন করেন, তাঁর সেই নব্য প্রতিষ্ঠিত

রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মুখে রেখে তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিশাল রাষ্ট্রে আরব, পারসিক, গ্রীক, সিরীয়, ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক, হিন্দু প্রভৃতি নানা ধর্ম ও বর্ণের অনুসারীরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দিতে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত মুসলিম জাহান দখল করে নেয়ার পর রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপরীত ধারা সূচিত হয়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রে (Nation State) খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর এসব মুসলিম দেশের শাসনভার পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্রশাসক, আমলাব্যবস্থা ও সামরিক চক্রের হাতে পড়ে। মুসলিমগণ দীর্ঘদিন যাবত এ দুঃসহ অবস্থাটি ভাঙ্গার চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামষ্টিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ইসলামের স্বর্ণযুগের হারানো অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করতে পারেন।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের পটভূমিতে এ গ্রন্থটি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাংঘর্ষিক সম্পর্ক, বর্তমান মুসলিম বিশ্বব্যবস্থা এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মূল চেতনা ও পদ্ধতি অনুধাবনে সহায়ক হবে বলে আশা করি।

সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীগণ এ গ্রন্থটি গ্রহণ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। একই সাথে তাদের মূল্যবান পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির আরো উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। পাঠক-পাঠিকাগণ যদি এ গ্রন্থ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করেন তাহলে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবিধ প্রসঙ্গ বুঝতে ও জানতে গ্রন্থটি কাজে আসলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। গ্রন্থখানি রচনায় অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখকের গ্রন্থ ও দেশী বিদেশী অসংখ্য প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের অকৃত্রিম কার্যকর উপদেশ লাভ করেছি।

আহসান পাবলিকেশনের জনাব মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এ কামনা করছি, তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং আমাদের জাতির জন্য এটিকে কল্যাণকর করে দেন।

ঢাকা
২৬ মার্চ, ২০০৯

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

তোহফা

শৈশবকালে আমাকে যিনি বিদ্যাশিক্ষায় নিরন্তর উৎসাহিত করতেন এ গ্রন্থ প্রকাশের কাজ চলাকালীন যিনি গত ২১ মার্চ, ২০০৯ এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন সেই পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান মরহুমা ছকিনা খাতুনের মাগফিরাত কামনায় এবং তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে–

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য, যাঁর অশেষ মেহেরবানীতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রকাশের তাওফীক পেলাম। লেখক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম এ বিষয়ের ছাত্র ছিলেন এবং এখন এ বিষয়ের শিক্ষকও। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ এই রচনা খুবই সমৃদ্ধ হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক সকলের জন্যই গ্রন্থখানি খুবই কাজে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ বিষয়ে ছোট বড় কিছু গ্রন্থ বাংলাভাষায় ইতোপূর্বে প্রকাশিত হলেও এতো বিস্তারিত আলোচনা কোনোটিতেই নেই। তিনি ষোলটি অধ্যায়ে ভাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং অধ্যায়ের শেষে প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

একটি বইকে নির্ভুল করে প্রকাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ, তবে অসম্ভব নয়। আমরা সাধ্যমত নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। পাঠকবৃন্দের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, তাঁরা যদি কোনো বিষয়ে কোনো অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন, মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। আল্লাহ্ আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমিন।

সূচিপত্র

১

রাজনীতি ও ইসলাম

Politics and Islam

১.১ ভূমিকা ॥ ১৭
১.২ রাজনীতির প্রত্যয়গত ধারণা ॥ ১৯
১.৩ রাজনীতি কি নয় ॥ ২১
১.৪ রাজনীতি হচ্ছে বিজ্ঞান ॥ ২২
১.৫ প্রচলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ॥ ২৮
১.৬ ইসলামে রাজনীতি বা ইসলামী রাজনীতি ॥ ৩৩
১.৭ ইসলামী রাজনীতির উৎস ॥ ৩৬
১.৮ ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব ॥ ৩৮
১.৯ ইসলামী রাজনীতি ফরয ॥ ৪২
১.১০ ইসলামী রাষ্ট্রনীতি রাজনীতি অরিয়েনটেড ॥ ৪৮
১.১১ ইসলামকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা বা ইসলামকে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা ॥ ৫০
১.১২ ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ॥ ৫১
১.১৩ প্রচলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য : তুলনামূলক আলোচনা ॥ ৫৯
১.১৪ বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি/ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে আপত্তি ও তার জবাব ॥ ৬০
১.১৫ বাংলাদেশে রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা ॥ ৬৩
১.১৬ মহানবী (সা)-এর রাজনীতি ॥ ৬৫
১.১৭ মহানবীর (সা) রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ॥ ৭০
১.১৮ ইসলামী রাজনীতির বিরোধিতা কারা করেন ॥ ৭১
১.১৯ আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণ ॥ ৭২
১.২০ রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ইসলাম ॥ ৭৩
১.২১ রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ॥ ৭৩
১.২২ রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণ ॥ ৭৪

২

ইসলামী রাষ্ট্র

The Islamic State

২.১ ভূমিকা ‖ ৮০

২.২ ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ‖ ৮০

২.৩ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ‖ ৮১

২.৪ রাষ্ট্রের কতিপয় প্রামাণ্য সংজ্ঞা ‖ ৮৩

২.৫ রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মত/কার্ল মার্কসের মত ‖ ৮৬

২.৬ রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েভার ‖ ৮৭

২.৭ রাষ্ট্রের আরো কতিপয় সংজ্ঞা ‖ ৮৯

২.৮ এক নজরে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার আবশ্যকীয় নীতিমালা ‖ ৯০

২.৯ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌল নীতিমালা ‖ ৯১

২.১০ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ‖ ৯৮

২.১১ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ‖ ৯৯

২.১২ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিভাষা ‖ ১০৩

২.১৩ ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্র ‖ ১০৩

২.১৪ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ‖ ১০৪

২.১৫ ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ‖ ১১৯

২.১৬ ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যাবলী ‖ ১২৬

২.১৭ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ‖ ১৩০

২.১৮ আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র ‖ ১৩০

২.১৯ কল্যাণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ‖ ১৩০

২.২০ কল্যাণ রাষ্ট্রের কার্যাবলী ‖ ১৩১

২.২১ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ‖ ১৩১

২.২২ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর ফারুক (রা) ‖ ১৩৪

২.২৩ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অপরিহার্যতা ‖ ১৪০

৩

ইসলামী রাষ্ট্র ও আধুনিক রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা

Islamic State Vs. Modern State : A Comparative Analysis

৩.১ ইসলামী রাষ্ট্র বনাম আধুনিক রাষ্ট্র ॥ ১৭৭

৩.২ ইসলামী রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনা ॥ ১৮১

৩.৩ ইসলামী রাষ্ট্র বনাম ধর্মীয় রাষ্ট্র ॥ ১৮৬

৩.৪ ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ও ইসলাম ॥ ১৯০

৩.৫ রাজতন্ত্র ও ইসলাম ॥ ১৯২

৩.৬ একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম ॥ ১৯৪

৩.৭ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম ॥ ১৯৭

৩.৮ মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্র ॥ ২২৮

৩.৯ দারুল ইসলাম, দারুল আহাদ, দারুল হারব, আল আমান ও আল জিম্মাহ ॥ ২২৯

৪

ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান

Elements of Islamic State

৪.১ ভূমিকা ॥ ২৩৩

৪.২ ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ ॥ ২৩৩

৪.৩ সার্বভৌমত্ব ॥ ২৩৬

৪.৪ কুরআন মজীদে ব্যবহৃত সার্বভৌমত্ব বিষয়ক পরিভাষা ॥ ২৩৯

৪.৫ ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব ॥ ২৪১

৪.৬ সার্বভৌমত্বের ইতিহাস ॥ ২৪১

৪.৭ সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা ॥ ২৪২

৪.৮ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ॥ ২৪৪

৪.৯ সার্বভৌমত্বের অবস্থান নির্ণয় ॥ ২৪৭

৪.১০ সার্বভৌমত্বের ইসলামী সংজ্ঞা ॥ ২৪৭

৪.১১ ইসলামী সার্বভৌমত্ব ॥ ২৪৯

৪.১২ ইসলামী সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ॥ ২৫১

৫
ইসলামী রাষ্ট্রের সংগঠন ও বিভাগ
Organisation and Departments of Islamic State

৫.১ ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী ॥ ২৫৬

৫.২ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ ॥ ২৫৬

৫.৩ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ॥ ২৫৭

৫.৪ ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাহীদের গুণাবলী ॥ ২৬৯

৬
মহানবী (সা)-এর সচিবালয়
Secretariat of Prophet (Sm)

৬.১ ভূমিকা ॥ ২৮৭

৬.২ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সচিবালয়ের বৈশিষ্ট্য ॥ ২৮৮

৬.৩ সচিবালয়ের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগসমূহ ॥ ২৯১

৭
মহানবী (সা)-এর অর্থ-প্রশাসন
Financial Administration of Prophet (Sm)

৭.১ প্রসঙ্গের উত্থাপন ॥ ৩১৮

৭.২ মহানবীর অর্থ-প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ॥ ৩১৯

৮
আইন বিভাগ (The Legislature)
মজলিসে শূরা (Majlis-E Shura)

৮.১ ভূমিকা ॥ ৩৪৭

৮.২ মজলিসে শূরার সংজ্ঞা ॥ ৩৫০

৮.৩ মজলিসে শূরা : প্রাক ইসলামী পটভূমি ॥ ৩৫১

৮.৪ মহানবী (সা)-এর সময়ে মজলিসে শূরা ॥ ৩৫১

৮.৫ মজলিসে শূরার ক্রমোন্নতি ॥ ৩৫৩

৮.৬ শূরার সদস্যগণ মনোনীত না নির্বাচিত ছিলেন ॥ ৩৫৯

৮.৭ ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে শূরার ভূমিকা ॥ ৩৬১

৮.৮ মজলিসে শূরার সদস্যদের যোগ্যতা ও গুণাবলী ॥ ৩৬৩
৮.৯ মজলিসে আমের সদস্যদের গুণাবলী ॥ ৩৬৫
৮.১০ উপসংহার ॥ ৩৬৫
৮.১১ ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎস ॥ ৩৬৬

৯
বিচার বিভাগ
The Judiciary

৯.১ ভূমিকা ॥ ৩৮০
৯.২. ইসলামে বিচার ব্যবস্থার অবস্থান ॥ ৩৮২
৯.৩ স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা/বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ॥ ৩৮৪
৯.৪ বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ॥ ৩৮৫
৯.৫ বিচার বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থা ॥ ৩৯০
৯.৬ ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কার্যাবলী ॥ ৪০০

১০
ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য
Rights and Duties of Citizens in Islamic State

১০.১ ভূমিকা ॥ ৪০৫
১০.২ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ॥ ৪০৫
১০. ৩ ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের গুণাবলী ॥ ৪০৯
১০.৪ নাগরিকদের নিকট ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকার ॥ ৪১০
১০.৫ মুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য ॥ ৪১১
১০.৬ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য ॥ ৪১৭

১১
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব
The Status, Rights and Duties of Woman in Islamic Society and State

১১.১ ভূমিকা ॥ ৪২০
১১.২ ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ॥ ৪২১

১১.৩ বিভিন্ন সভ্যতায় ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা ॥ ৪২৬
১১.৪ ইসলামে নারীর অধিকার ॥ ৪৩৫
১১.৫ ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ॥ ৪৩৫
১১.৬ ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ॥ ৪৪২
১১.৭ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসির) মানবাধিকার ঘোষণার আলোকে নারীর অধিকার ॥ ৪৪৭
১১.৮ নারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের শিক্ষা ॥ ৪৫৩

১২

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা

Rights and Status of Non-Muslim's in Islamic State

১২.১ ভূমিকা ॥ ৪৫৭
১২.২ মদীনা রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা ॥ ৪৫৭
১২.৩ অমুসলিমদের সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ার ভাষ্য ॥ ৪৬০
১২.৪ অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকার ॥ ৪৬১

১৩

ইসলামী রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র

Islamic State and Democracy

১৩.১ ভূমিকা ॥ ৪৭১
১৩.২ গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ॥ ৪৭১
১৩.৩ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ॥ ৪৭৫
১৩.৪ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ॥ ৪৭৭
১৩.৫ গণতন্ত্রের মূলনীতি ॥ ৪৭৮
১৩.৬ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত ॥ ৪৭৯
১৩.৭ গণতন্ত্রের ইসলামী বিশ্লেষণ ॥ ৪৮০
১৩.৮ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বনাম ইসলামী গণতন্ত্র ॥ ৪৮৬
১৩.৯ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ॥ ৪৮৭
১৩.১০ উপসংহার ॥ ৪৯৬

১৪
নির্বাচন ও ইসলামী রাষ্ট্র
Election and Islamic State
১৪.১ ইসলাম ও নির্বাচন ॥ ৪৯৮
১৪.২ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র ও নির্বাচন ॥ ৫০০
১৪.৩ ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচনে ভোট প্রদান প্রসঙ্গে ॥ ৫০৬
১৪.৪ ইসলামে ভোটাধিকারের তাৎপর্য ॥ ৫১১
১৪.৫ ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট, ভোটার ও প্রার্থী ॥ ৫১২
১৪.৬ ভোটারের কর্তব্য ॥ ৫১৪
১৪.৭ ঈমানের দৃষ্টিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করার ক্ষতি ॥ ৫১৬
১৪.৮ ভোটাধিকার প্রয়োগ ও সংরক্ষণের মহান কাজে অংশগ্রহণ ॥ ৫১৮

১৫
ইসলামী শাসনতন্ত্র বা সংবিধান
Islamic Constitution
১৫.১ ভূমিকা ॥ ৫২২
১৫.২ শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা ॥ ৫২৩
১৫.৩ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ॥ ৫২৪
১৫.৪ ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ॥ ৫২৫
১৫.৫ মানব ইতিহাসের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র : মদীনা সনদ ॥ ৫২৮
১৫.৬ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসনতন্ত্র ॥ ৫৩৬

১৬
ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি
(Foreign Policy of Islamic State)
১৬.১ ভূমিকা ॥ ৫৬৫
১৬.২ বৈদেশিক নীতি কী ॥ ৫৬৬
১৬.৩ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলনীতি ॥ ৫৬৬
১৬.৪ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য ॥ ৫৬৭
১৬.৫ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ॥ ৫৬৮

১৭
টীকা

১৭. ১ তাগুত ॥ ৫৭৩
১৭.২ জাহিলিয়াত ॥ ৫৮২
১৭. ৩ সিয়াসত ॥ ৫৮৪
১৭. ৪ খিলাফত ॥ ৫৮৬
১৭. ৫ আদালাহ্ ॥ ৫৮৯
১৭. ৬ ইসলামী রাষ্ট্রে জবাবদিহিতা ॥ ৫৯০
১৭. ৭ জরুরিয়াত ॥ ৫৯৩
১৭. ৮ বায়তুলমাল ॥ ৫৯৫
১৭.৯ আল আমানাহ্ ॥ ৫৯৭
১৭.১০ মজলিসে শূরা ॥ ৫৯৮
১৭.১১ নাহ্দাহ্ ॥ ৬০০
১৭.১২ ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার ॥ ৬০২
১৭.১৩ আল হিসবাহ্ ও মুহতাসিব ॥ ৬০৬
১৭.১৪ দিওয়ান-ই-মাযালিম ॥ ৬০৯
১৭.১৫ অমবুডসম্যান / ন্যায়পাল ॥ ৬১২
১৭.১৬ মৌলবাদ ॥ ৬১৬
১৭.১৭ ফতোয়া ॥ ৬২০
১৭.১৮ উম্মাহ্ ॥ ৬২৪
১৭.১৯ মিল্লাত ॥ ৬২৬
১৭.২০ কাওমিয়াত – জাতীয়তাবাদ ॥ ৬২৮
১৭.২১ হুররীয়াত – স্বাধীনতা ৬৩০
১৭.২২ মুলুকিয়াত – রাজতন্ত্র ॥ ৬৩২
১৭.২৩ জিহাদ ॥ ৬৩৪
১৭.২৪ সন্ত্রাস – সন্ত্রাসবাদ ৬৩৬
১৭.২৫ মহাসনদ বা ম্যাগনা কার্টা ॥ ৬৪০
১৭.২৬ ফিতনা ॥ ৬৪২
১৭.২৭ ফাসাদ ॥ ৬৪৮

১

রাজনীতি ও ইসলাম
Politics and Islam

১.১ ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান যুগে রাজনীতি গণমানুষের অন্তর আকর্ষণ করেছে। দেশ-দেশান্তরে, মরু-কান্তারে, ঝাড়ে-জঙ্গলে রাজনীতি এখন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়গ্রাহী প্রিয়বস্তু। অতএব, সহজ সরল ভাষায় রাজনীতি হৃদয়ঙ্গম করা সকল মানুষের জন্য বর্তমানে অপরিহার্য। কেউ রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। টমাস সান এজন্যই বলেছেন, 'রাজনীতি এ যুগের মানুষের অচ্ছেদ্য বিধিলিপি'।

রাজনীতির ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়। রাজনীতি শুধু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে না বরং রাষ্ট্রের মানুষের গোটা জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের তাহযীব তামাদ্দুন, ধর্মীয় চিন্তাধারা, নৈতিকতা, আচার-আচরণ রাষ্ট্র ও সরকারের উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল। রাষ্ট্র পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মর্জি মোতাবেক রাষ্ট্রের জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, সামাজিক কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় এবং তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিচালিত হয়।

রাজনীতি রাজত্বের খেলা। এককালে রাজনীতিতে রাজা-বাদশাহদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। রাজার নীতিকেই এক সময় রাজনীতি বলা হত। বুদ্ধিমত্তা, ভাগ্য ও অস্ত্র বলে রাজারা দেশে দেশে রাজত্ব করত। তাই জনগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখার জন্য রাজাদের শাসন নীতিকে 'রাজনীতি' বলা হত। এ অর্থে রাজনীতি মানে শাসন নীতি।

আসলে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিই রাজনীতি বলে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এর নাম হওয়া উচিত রাষ্ট্রনীতি। রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি পরিভাষা হিসেবে বর্তমানে এক কথা নয়। রাষ্ট্র ও সরকারে যেরূপ পার্থক্য, রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতিতেও তেমন তফাৎ। অর্থাৎ রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়াদি হলো রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত আর সরকার সম্বন্ধীয় কার্যাবলিকেই বলা হয় রাজনীতি।

প্রাচীন যুগের রাজা-বাদশাহদের সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। কেউ ভাবত রাজা স্বয়ং ভগবান। এ ভেবে মিসরের অধিবাসীরা তাদের রাজা ফেরাউনের পূজা করত। চীন দেশের সম্রাট দেবতাজ্ঞানে প্রজাদের পূজা পেতেন। পারস্যের

সম্রাটকে আসমানী ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাহেনশাহ বলে মান্য করা হত। ইংল্যান্ডের রাজা-রাণীকে এখনও ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ধারণা করা হয় এবং বলা হয় যে The king can do no wrong. অর্থাৎ রাজা কোন ভুল করতে পারেন না। জাপানের সম্রাটকে দেবতা মানা হত এবং এখনও দেবতা বলেই জ্ঞান করা হয়, যদিও আজকালকের গণতন্ত্রের যুগে ঐসব দৈবতত্ত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে অকার্যকর।

আবার প্রাচীন ও মধ্যযুগে নানা দেশে এরিস্টোক্রেসি বা সম্ভ্রান্ততন্ত্রের রাজত্ব চালু হয়েছিল। সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা বুদ্ধিমত্তা ও অস্ত্র বলে রাজত্বকে কুক্ষিগত করত। ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী কুলিনপ্রথা ও ক্ষত্রিয়তন্ত্র, পাশ্চাত্যে গ্রীক-রোমান এরিস্টোক্রেসি বা আধুনিক বুর্জোয়াজীও এক প্রকার সম্ভ্রান্ততন্ত্রেরই নামান্তর। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের উচ্চতর পরিষদকে 'হাউস অব লর্ডস' অর্থাৎ 'লাট সাহেব পরিষদ' বলার এটাই আসল কারণ।

ভারতের আর্যরা সম্ভ্রান্ততন্ত্রের নামে নিজেদের প্রতি দেবত্ব আরোপ করত। ভারতে এখনও উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা বৈশ্য, শূদ্র, হরিজন, অচ্ছুত, তফশিলী, আদিবাসী, উপজাতি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকদের উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রচিন্তাবিদ প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) এদেরকে সোনা ও রূপার তৈরি বলে আখ্যায়িত করেন এবং বাদ বাকী সাধারণ মানুষকে নিম্ন ধাতুর তৈরি বলে আখ্যায়িত করেন।[১] প্লেটোর ছাত্র এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) এরিস্টোক্রেটিক সরকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।[২] তাই এদের শাসন নীতিকে রাজনীতি বললে, রাজনীতির অর্থ দাঁড়ায় 'রাজনীতি' তথা রাজত্বের নীতি অর্থাৎ যাকে প্রশাসন নীতি বলা হয়ে থাকে। অতএব, রাজাবিহীন রাজনীতি বলতে প্রশস্তভাবে শাসন-প্রশাসন নীতিই বুঝায়।

পূর্বকালে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে শাসন ও প্রশাসন নীতি আলাদা ছিল। তাতে শাসন নীতিকেই রাজনীতি বলা হত। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে এ দেশগুলোতে শাসন ও প্রশাসন সংমিশ্রিত হয়ে গিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।[৩]

---

১. Plato : Republic, Book (iii) Plato (in Five Dialuges) translated by B. Jowett. edited by Louise Ropes Loomis. Walter J. Black, New York. 1949. P. 303.

২ Ernest Barker : The Politics of Aristotle. Oxford. 1961, P-155 and 354-55.

৩. যেমন মুঘল আমলে সম্রাট এবং উজিররা ছিলেন শাসক এবং মসনবদারেরা (mansabdar) ছিলেন প্রশাসক, মনসব মানে দপ্তর, দার মানে অধিকারী, ইংরেজিতে

কিন্তু বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের প্রবল হাওয়া ও ভোটাভুটির কোলাহল রাজনীতিকে মাঠে ঘাটে যত্রতত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই রাজনীতি এখন ঘরে ঘরে। রাজনীতি সবার মুখে মুখে। রাজনীতির সাথে সবাই জড়িত। সবাই রাজনীতির চিন্তায় বিভোর এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সুযোগ সন্ধানী।

আদতে রাজনীতি ছিল জীবন নীতি। হিজরী চতুর্থ ও খ্রিস্টিয় দশম শতকের মহান তুর্কি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ আবু নছর আল ফারাবীর (৮৭০-৯৫০) মতে, জীবন রক্ষা ও জীবনোন্নয়নের জন্য পরস্পর সহযোগিতামূলক জীবন নীতি বা সিয়াসত (রাজনীতি) মানুষের জন্য অপরিহার্য। কেননা একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবনের নাগরিকত্বেই মানুষ যথার্থ মানবিকতা খুঁজে পায় এবং নিজের মানবত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।[৪]

কিন্তু বর্তমানে রাজনীতি আনাড়ি হাতে পড়ায় রাজনীতিতে ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছে। তাই অনেকে রাজনীতিকে ধোকাবাজি বলেও আখ্যায়িত করেন। তবে যে যাই বলুক না কেন, রাজনীতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্র চলে না, সমাজ চলে না, পরিবার চলে না। অতএব, রাজনীতি ছাড়া মানুষের জীবন চলে না।

১.২ রাজনীতির প্রত্যয়গত ধারণা (Politics Defined)

বাংলায় রাজনীতি এবং ইংরেজিতে Politics শব্দ দু'টি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাজনীতির ব্যাসবাক্য হচ্ছে রাজার নীতি অর্থাৎ বড় নীতি। যেমন- রাজবাড়ি বলতে বুঝায় বড় বাড়ি, রাজার বাড়িকে; রাজপথ বলতে বুঝায় বড় পথ, মেইন পথ, প্রশস্ত পথকে। বাংলায় রাজনীতি শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজকার্য সম্পর্কিত বিষয়াদি, রাজার নীতি ও কার্যাদি সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা। বাংলাদেশে রাজার শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল বলে কিংবা গণতন্ত্রের বা রাষ্ট্রের ধারণা সুস্পষ্ট না হওয়ায় রাজনীতি শব্দটির ব্যঞ্জনা রাজাকে বা রাজকার্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

Office bearer... অর্থাৎ কর্মকর্তা নিছক চাকর ছিলেন না; বরং দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসনকর্তা ছিলেন। সম্রাট আকবর মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করে মুঘলদের সামরিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছেন।

৪. E.I.J. Rosenthal : Political Thought in Medieval Islam. London. 1958. Hyderabad. Deccan, P. 125 and H.R.K Sherwani; Studies in Muslim Political Thought and Administration, 1945, P. 68.

অভিধানে ইংরেজি Politics শব্দের অর্থ অনেক বিস্তৃত ও বিস্তারিত। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে, Politics means the science and art of Government, the science dealing with the form, organisation and administration of a state. অর্থাৎ রাজনীতি হচ্ছে সরকার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও আর্ট, একটি রাষ্ট্রের কাঠামো, রূপ, সংগঠন ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞান। বলা বাহুল্য, ইংরেজি পলিটিক্স শব্দের আভিধানিক অর্থ অনেক ব্যাপক এবং চলমান জীবন ও ঘটনাপ্রবাহের সাথে অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

উক্ত ডিকশনারিতে পলিটিক্সের সংজ্ঞায় আরো বলা হয়েছে– Politics is the branch of Moral Philosophy dealing within the state of social organisation as a whole. অর্থাৎ রাজনীতি হল নৈতিক দর্শনের শাখা যা সামাজিক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের সার্বিক বিষয় দেখাশুনা করে। রাজনীতির সাথে নৈতিক দর্শনের বিষয়টিও জড়িত।

রাজনীতি ও নৈতিকতাকে যে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয় বরং রাজনীতির সাথে যে নৈতিকতা ও সুনীতির প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিংশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের যৌন কেলেঙ্কারীর ঘটনা নিয়ে বিশ্বজোড়া তোলপাড় সে কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে।

ড. মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান লিখেছেন, রাজনীতি হচ্ছে সর্বাগ্রে নীতি সম্পর্কে– নীতি হচ্ছে কোন কিছু পরিবর্তন করার বাসনা, না হয় পরিবর্তনের হাত থেকে কোন কিছুকে হিফাযত করার বাসনা।[৫]

রাজনীতির সাথে জড়িত ক্ষমতা এবং ক্ষমতার সাথে জড়িত দুর্নীতির বিষয়। Power corrupts, absolute power corrupts absolutely। জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, রাজনীতিকে যদি দুর্নীতির কলুষমুক্ত করা যেত, তাহলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণ-বঞ্চনার ৬০ শতাংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দূরীভূত হয়ে যেত। দুর্নীতির উচ্ছেদ ঘটানো রাজনীতির অন্যতম প্রধান ইস্যু। এ ব্যাপারে সম্ভবত ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান নেই।

---

৫. ড. মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৭৮।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফক্স (Fox) বলেছেন, নৈতিকতার দিক দিয়ে যা ভুল রাজনীতির দৃষ্টিতে তা কখনোই সমীচীন হতে পারে না। (What is morally wrong can never be politically right, we may say that politics is conditioned by ethics.) তাই বলা যায়, রাজনীতি ও নৈতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যকথায় রাজনীতি নৈতিকতার শর্তে আবদ্ধ।

১.৩ রাজনীতি কি নয় (What Politics is Not)

১. রাজনীতি নিছক ক্ষমতা দখলের ব্যাপার নয়

Politics is not the process of capturing the power

রাজনীতি কোন ব্যক্তি বা কোন দলের নিছক ক্ষমতা দখলের ব্যাপার নয়। মূর্খ ও নির্বোধ লোকেরা রাজনীতিকে তাদের ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করার মাধ্যম মনে করে, সম্পদ উপার্জন করার এক ধরনের ব্যবসা জ্ঞান করে। পারমিট, লাইসেন্স ও বড় ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য আয়ত্তে আনার জন্য, মন্ত্রীত্ব লাভের জন্য রাজনীতিকে কেঁউ কেউ অপরিহার্য মনে করে। এ ধরনের লোক নিজেদেরকে যত চতুর জ্ঞান করুক না কেন এরা নির্বোধ এবং দেশ ও জনগণের শত্রু। তাদের অন্ধ অনুসারীরা তাদেরকে যতই সুযোগ্য রাজনীতিবিদ মনে করুক না কেন তারা সমাজ, দেশ ও জাতির হিতৈষী বন্ধু নয় বরং তারা রাজনীতির গুটিতে চাল দিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে চায়।

২. রাজনীতির ফলশ্রুতি সীমাবদ্ধ নয়

The effects of Politics is not confined

রাজনীতির ফলশ্রুতি সীমাবদ্ধ নয়। এক ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তির ক্ষমতা দখলের লড়াই অথবা এক দল বা বহু দলের সংঘর্ষ ও কোন্দলের দায়দায়িত্ব এবং ফলাফল ব্যক্তি বা দল পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক ব্যক্তি বা এক দলের হঠকারিতা, উগ্রতা, একগুয়েমি, বাড়াবাড়ি, নির্বুদ্ধিতা এবং স্বার্থান্ধতার মাশুল সমগ্র জাতিকে দিতে হয়। মীরজাফর এবং তার ষড়যন্ত্রের দোসর জগতশেঠ, উঁমিচাঁদ, রাজভল্লব, কৃষ্ণভল্লব, রায়দুর্লভ, মহারাজ নন্দকুমার, ঘষেটি বেগমদের দুষ্কর্মের মাশুল এ দেশের জনগণ এবং বিশেষত মুসলমানদেরকে একশ' নব্বই বছর দিতে হয়েছে।

যে রাজনীতির পরম কাম্য ও প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করা, তা দ্বারা স্বার্থপর রাজনীতিকদের কিছু খেদমত হলেও জনসেবার কোন সম্ভাবনাই সেখানে নেই।[৬]

---

৬. প্রফেসর গোলাম আযম, বাংলাদেশের রাজনীতি, পৃঃ ৬৩।

যেসব রাজনৈতিক দল নিজস্ব জনশক্তিকে জনগণের সেবক হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেনি, সেসব দল ক্ষমতা দখল করলে নিজেদের সেবা ব্যতীত আর সকলের উপরই যুলুম করবে। যে দল রাজনৈতিক কর্মী বাহিনীকে জনগণের সেবক হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে, সে দল ক্ষমতায় গেলে জনগণ অবশ্যই তাদের নিকট সত্যিকার সেবা পাবে।[৭]

৩. রাজনীতি ব্যবসা নয়
Politics is not business

রাজনীতি ব্যবসা নয়, রাজনীতি দেশ ও জনগণের সেবার মাধ্যম। রাজনীতি দেশ সেবার একটি উত্তম মাধ্যম। রাজনীতি যদি ব্যবসায়িক স্বার্থে হয়, রাজনীতি যদি ক্ষমতাকেন্দ্রিক হয়, ক্ষমতায় থাকার জন্য রাজনীতি, ক্ষমতায় যাবার জন্য রাজনীতি এবং এই রাজনীতির জন্য যদি দেশের মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়, দেশের মানুষকে জিম্মি করে ফেলা হয়– তাহলে সে রাজনীতি দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

৪. ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়
Religion and Politics is not Separated

ধর্ম আর রাজনীতিকে আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কেউ যদি সত্যি সত্যি স্বীয় ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রাজনীতি করে আর সে ধর্মটি যদি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হয় তাহলে তা দোষের হবে না। রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা আদিকাল থেকেই ছিল এবং অদ্যাবধি তা আছে। ধর্মের রাজনৈতিক ভূমিকা কোন দেশেই অস্বীকার করা হয় না। সারা পৃথিবীতেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ছড়াছড়ি। পৃথিবীব্যাপী খ্রিস্টান অধ্যুষিত প্রায় সকল দেশেই আছে ক্রিশ্চিয়ান পার্টি বা ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি।

১.৪ রাজনীতি হচ্ছে বিজ্ঞান (Politics is Science)

রাজনীতি সবাই করে বটে, কিন্তু রাজনীতির কর্তৃত্ব থাকে নেতৃত্বের হাতে। রাজনীতির কথা মধুর। রাজনীতি মানুষের জীবন রক্ষা ও জীবনোন্নয়নের মৌল উপাদান। রাজনীতি শক্তি, ক্ষমতার আকর। রাজনীতি সবাইকে আকৃষ্ট করে। রাজনীতি প্রতিটি মানুষের জীবনে অপরিহার্য।

পলিটিক্স বা রাজনীতি শব্দটি গ্রীক শব্দ 'পলিস' হতে এসেছে, যার অর্থ নগর।

---

৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪।

রাজনীতির আলোচনায় রাষ্ট্র প্রসঙ্গ এসে পড়ে বিধায় এর বহুবিধ অর্থ, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সৃষ্টি হয়েছে। বার্নার্ড ক্রীকস (Bernard Cricks) এজন্যই চমৎকারভাবে বলেছেন, 'রাজনীতি হচ্ছে রাজনীতি' (Politics is politics)।[৮] অনেকে রাজনীতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের উপযোগিতার বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, কেননা রাজনীতির সংজ্ঞা এর প্রাসংগিকতার মধ্যেই নিহিত আছে। তাদের মতে রাজনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যা বলেন তাই হচ্ছে রাজনীতি।

রবার্ট ডল রাজনীতির একটি সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'রাজনীতি হচ্ছে এক ধরনের অনড় মানবিক সম্পর্কের প্রকৃতি যা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষমতা, শাসন বা কর্তৃত্বের সাথে সংযুক্ত থাকে।' (Politics means any persistent pattern of human relationships that involves to a significant extent, power, rule or authority.)[৯]

হ্যারল্ড ল্যাসওয়েলের মতে, রাষ্ট্র হতে কে কি পাচ্ছে, কখন পাচ্ছে এবং কিভাবে পাচ্ছে তাই হচ্ছে রাজনীতি, (Politics as being concerned with who gets what when and how.)[১০] বন্টন পদ্ধতি এবং এতদসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের উপর এ সংজ্ঞায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সংজ্ঞাটি পরিধির দিক দিয়ে ব্যাপক যা একজন মানুষকে রাষ্ট্রযন্ত্রসহ সমাজ বিন্যাসের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে রাজনীতিকে অবলোকন করার সুযোগ প্রদান করে। এ সংজ্ঞা যুগপৎ কর্তৃত্বশীলতার সম্পর্ক এবং বন্টন পদ্ধতিতে ক্ষমতা ও দ্বন্দ্বের প্রভাবকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ল্যাসওয়েল ক্ষমতার সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন।

রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রথম উদ্গাতা ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) বলেন, রাজনীতির জন্য মানুষের একটি 'বাতিক' আছে। অর্থাৎ মানুষ রাজনীতির বাতিকগ্রস্ত। কেউ রাজনীতিতে গদিনসীন হলে সে যতই বিপত্তির সম্মুখীন হোক না কেন সহজে বা স্বইচ্ছায় রাজনীতি ছাড়তে চায় না। এমনকি জোরপূর্বক গদিচ্যুত না করা হলে, সে গদি ছাড়ে না। অনেকে জীবনপণ করে গদি আঁকড়ে ধরে এবং গদি ছাড়ার চেয়ে প্রাণপাত করা শ্রেয় মনে করে। এতে রাজনীতিতে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। রেষারেষি, মারামারি, কলহ, কোন্দল, প্রতিহিংসামূলক রীতিনীতি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

---

৮. বার্নার্ড ক্রীক, In Defence of Politics, লন্ডন, পেলিকান বুকস, ১৯৬৪, পৃঃ ১৬।

৯. রবার্ট ডল, Modern Political Analysis, ঈগল উড ক্লীফস, এন জে, প্রেনটিস হল, ১৯৭০, পৃঃ ৬।

১০. হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, Politics : Who gets What, When, How, কীভল্যান্ড, ওয়ার্ল্ড পাবলিসিং কোম্পানী, ১৯৫৮।

এ জন্যই যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ এবং উত্তরসূরির নিকট শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পন্থা উদ্ভাবন করার প্রয়াস পান। বিশেষত আদি যুগ থেকে যথাক্রমে এথেন্স, মদীনা, বাগদাদ, প্যারিস, লন্ডন ও ওয়াশিংটনের অনন্য গণতন্ত্রকামী ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে মানুষের মনকে মানবিক মূল্যবোধের দিকে আকৃষ্ট করেছে। মানবতার ঐতিহ্যবাহী মহানগরীগুলোর গণতান্ত্রিক মহান প্রত্যাশা ও সম্মিলিত অনুপ্রেরণার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে গণতন্ত্রের হাওয়া বিশ্বব্যাপী মানব সমাজকে আন্দোলিত করছে। শান্তিকামী সবার প্রত্যাশা, এ হাওয়া প্রবল আকার ধারণ করে বিশ্ব মানব সমাজে একটি শান্তিপূর্ণ নয়া গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হবে।

রাজনীতি মূলত একটি কর্মকাণ্ড। গ্রীক দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) রাজনীতিকে একটি 'প্র্যাকটিক্যাল আর্ট' তথা 'কার্যকরী কলাকৌশল' (Politics is a practical art of doing) বলে অভিহিত করেন।[১১]

কলা (আর্ট) বলার কারণ হলো, রাজনীতির কর্মকাণ্ড চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং চিন্তা যতই গভীর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, রাজনীতি ততই যুৎসই ও কার্যকরী হয়। এ জন্য পূর্বকালে রাজনীতিকে একটি আর্ট বা কলা বলা হত। গ্রীকদের মতে কলা দুই প্রকার, যথা : 'আর্ট অব ডুইং' এবং 'আর্ট অব মেকিং'[১২] অর্থাৎ কর্মসাধনের কলা ও উৎপাদনের কলা। এরিস্টটল রাজনীতিকে কর্মসাধনের কলা বলে চিহ্নিত করেন।

পরবর্তীতে রাজনীতিকে একটি বিদ্যায় উন্নীত করা হয়। কারণ রাজনীতি কার্যত একটি নেতৃত্বের বিদ্যা। একা একা কেউ রাজনীতি করতে পারে না। ব্যক্তি জীবনে বা প্রাইভেট লাইফে রাজনীতি নেই। কেবল একান্ত জীবন নীতি আছে। একমাত্র সংঘবদ্ধ জীবনেই রাজনীতির উন্মেষ ঘটে। বিশ্ব বিখ্যাত তুর্কি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ আল ফারাবী (৮৭৫-৯৫০) বলেন, মানুষ জীবন রক্ষা ও জীবনোন্নয়নের জন্য পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়।[১৩] আল ফারাবীর মতে, অপরিহার্য প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হওয়া মানুষের প্রকৃতিগত বাস্তবতা। কিন্তু সংঘবদ্ধতা টিকিয়ে রাখার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন।

---

১১. আর্নেস্ট বার্কার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫।

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫।

১৩. এইচ. আর. কে. শেরওয়ানী, স্টাডিজ ইন মুসলিম পলিটিক্যাল থট এণ্ড এডমিনিস্ট্রেশন, হায়দারাবাদ ১৯৪৫, পৃঃ ৮৮।

কেননা জোটবদ্ধ জীবনে পরস্পরের স্বাধীনতার দ্বারা পরস্পরের স্বাধীনতা খর্ব হয়। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মার্জিত ও সংযত করে সার্বিক ও সামাজিক স্বাধীনতার উদ্ভাবন করতে হয়। এর জন্য নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। অতএব, নেতৃত্বের জন্মলগ্নে কৌশল নীতির অঙ্কুর বিদ্যমান থাকে। তাই সমাজের নেতৃত্বকে 'সরদারী' বলে। আর সরদারীর স্থায়িত্ব সরদারের বিচক্ষণতার উপর নির্ভরশীল। তাই নেতৃত্ব যখন রাজার হাতে তখন নেতৃত্বকে রাজনীতি বলে, যখন শাসনকর্তার হাতে পড়ে, তখন 'প্রশাসন' বলে। এগুলোর স্থায়িত্ব যথাক্রমে রাজা ও প্রশাসকের বিচক্ষণতার উপর নির্ভরশীল।

রাজনীতিতে নিহিত বিচক্ষণতাকে প্রাচীন ভারতের কৌটিল্য[১৪] কূটনীতি বা কূটকৌশল নামে অভিহিত করেন, ইউরোপীয়রা ডিপ্লোমেসি নামে অভিহিত করেন এবং মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ সাধারণভাবে হিকমত বা কৌশল নীতি বলে চিহ্নিত করেন।

বাংলায় রাজনীতি, এর ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য প্রতিশব্দ পলিটিক্স এবং আরব, ইরানি, তুর্কি ও সাধারণভাবে ইসলামী পরিভাষা সিয়াসত। অতএব, রাজনীতি একটি বিদ্যা। জোটবদ্ধ মানব জীবনকে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতার সমন্বয়ে রাজনীতি বিদ্যার উন্মেষ ঘটে। এ বিদ্যায় রাজনীতি ব্যক্ত থাকে এবং বিচক্ষণতার কৌশল নীতি অব্যক্ত থাকে। কেননা, কৌশলকে ব্যক্ত করলে তা আর কৌশল থাকে না বরং রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়। কার্যত সেরূপ রাজনীতি কৌশলবিহীন নিছক কর্মকাণ্ডের স্তরে নেমে আসে, বিদ্যা থাকে না। কৌশলবিহীন এরূপ রাজনীতিকে রাজনীতির ভূমিকা পালন বা Political Role Play বলা যায়।

রাজনীতি বিদ্যাকে একটি শাস্ত্র বলা যায়। শাস্ত্র বলতে একটি সূত্রগত বিদ্যাকে বুঝায়। 'শাস' মানে সারাংশ, 'ত্রি' মানে তিন। আর রাজনীতি হলো প্রথমত, একটি কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয়ত, একটি নেতৃত্বের কলা এবং তৃতীয়ত, একটি কৌশল নীতি। তাই রাজনীতিকে একটি ত্রি-ধারার নির্যাস বিশিষ্ট শাস্ত্র বলা যায়। চিন্তা বা কর্মের ত্রি-ধারার সারাংশ বিশিষ্ট বিদ্যাকে শাস্ত্র বলা হয়। তাই সাধারণ অর্থে শাস্ত্র মানে বিদ্যা, বিজ্ঞান নয়।

প্রখ্যাত ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) সর্বপ্রথম রাজনীতি

---

১৪. ড. রাধা গোবিন্দ বসাক, কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮০, মূল সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাকে একটি 'বিজ্ঞানে' উন্নীত করেন এবং এটাকে একটি সমাজ বিজ্ঞান[১৫] নামকরণ করেন। তিনি রাজনীতির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে তিনটি স্তর নির্ণয় করেন। যেমন : প্রথমত, দলীয় সংহতি বা আছবিয়া; দ্বিতীয়ত, একটি ধর্ম বা ইডিওলজীর বা আদর্শের প্রতি আনুগত্য; তৃতীয়ত, ছলে-বলে-কৌশলে অন্যান্য দলগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার।

ইবনে খালদুন ছলে-বলে-কৌশলে এই নীতিটি রাজনীতি 'আন্তঃজাতীয়' স্তরে অর্থাৎ জাতীয় রাজনীতির শীর্ষস্থানে নির্ণয় করেন। তাঁর রাজনীতি চিন্তা জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে নিমগ্ন ছিল। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করেননি। তিনি আন্তর্জাতিক সভ্যতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন।

পরবর্তীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁ উত্তর পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলীর (১৪৬৯-১৫২৭) ডিপ্লোমেসি[১৬] অবলম্বন করে উদীয়মান পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ ছলে-বলে-কৌশলের নীতিটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে।[১৭] এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এতে ডিপ্লোমেসি বা কৌশল নীতি আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করে। ফলে রাজনীতির ত্রি-ধারা প্রথমত, দলীয় সংহতি, দ্বিতীয়ত, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমেসি বা কৌশল নীতির তিন প্রস্থে চলমান হয়।

সর্বশেষে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাশক্তিরূপে অভ্যুদয়, উভয়ের মরণপণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হানাহানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাপট, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও শক্তির প্রদর্শনী আন্তর্জাতিক কৌশল নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে।

প্রথমত. বিশ্বব্যাপী স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় সমতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

১৫. ড. মুহসিন মাহদী, ইবনে খালদুনস ফিলসফি অব হিস্ট্রি, শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৫৭।

১৬. নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী, দি প্রিন্স, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫১৫ সালে, দেখুন থিলি, এ হিস্ট্রি অব ফিলসফি, এলাহাবাদ, ১৯৪৯, পৃঃ ২১৮-২০।

১৭. ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, হিস্ট্রি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল, ভলিউম ১ (ঐ, মুসলিম রুল ইন বেঙ্গল ১১৭০-১৭৫৭, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৯৫।

দ্বিতীয়ত. আবার উনিশ বিশ শতকের পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে পড়ে।

তৃতীয়ত. আন্তর্জাতিক কৌশল নীতির পরিসীমায় পরাশক্তিদ্বয়ের গ্লোবাল স্ট্রেটেজি বা বিশ্বনৈতিক কৌশল নীতির উদ্ভব ঘটে।

চতুর্থত. সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার দাপট ও বিশ্ববাসীর মতামতকে তোয়াক্কা না করার যে কৌশল অবলম্বিত হয় তা রাজনীতির তিন প্রস্থের সাথে আরো একটি মাত্রা যুক্ত করে। অতএব, বর্তমানে রাজনীতি চার প্রস্থ বিশিষ্ট দলীয় সংহতি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, আন্তর্জাতিক কৌশল নীতি ও বিশ্বনৈতিক পরাকৌশল নীতির সমন্বয়ে এক প্রকার পরা রাজনীতির আকার পরিগ্রহ করেছে।

মানব জীবনের গতি-প্রকৃতির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় জীবন নীতি এবং মানব জীবনের সংঘবদ্ধতা ও সামাজিক সংগঠনের পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে উন্মেষ ঘটে রাজনীতির। তাই রাজনীতির গতি জীবনের গতির সাথে সমান্তরাল। রাজনীতিতে মানুষ দলীয় নীতি, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক কৌশল নীতির সমন্বয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়। এ ত্রি-নীতিকে রাজনীতির পরিভাষায় রণনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও কৌশল নীতি বলাই যথার্থ।

রাজনীতি কথাটি সংস্কৃতি থেকে ব্যুৎপন্ন বাংলা শব্দ। পশ্চাত্যের রাজনৈতিক ঐতিহ্যগত এর প্রতিশব্দ পলিটিক্স বা পলিস বা নাগরিক জীবন থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ পলিটিক্স বলতে শান্তিপূর্ণভাবে নাগরিক জীবন যাপন করার নীতি বুঝায়। পলিটিক্স বা রাজনীতি শব্দটি গ্রীক শব্দ পলিটি হতে এসেছে যার অর্থ নগর। রাজনীতির উপর আলোচনা নগর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের উপর বিধায় এর নানা অর্থ ও তাৎপর্য সৃষ্টি হয়েছে। এর আরবি ইসলামী প্রতিশব্দ 'সিয়াসত' যা মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের আদলে সুষ্ঠু নেতৃত্ব প্রদানের দিক নির্দেশ করে। রাজনীতি ও সিয়াসতের ভাবার্থ একই, অর্থাৎ সংঘবদ্ধ মানবজীবন যাপনের সামঞ্জস্যপূর্ণ নেতৃত্ব।

রাজনীতি মানুষের জীবনের সাথে এত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত যে, আজ রাজনীতির সঠিকতার উপর নির্ভর করছে মানব জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের বিশ্বের মৌলিক সমস্যাগুলোর পেছনেও ক্রিয়াশীল রয়েছে এই রাজনীতিরই ভূমিকা। মানুষের মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তাহীনতার পেছনেও সক্রিয় রয়েছে রাজনৈতিক হাত। অর্থনীতির দ্বারা রাজনীতি বহুলাংশে প্রভাবিত হলেও আজকের বাস্তব সত্য হলো এই যে অর্থনৈতিক যাবতীয় কার্যক্রম নির্ভর করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর। দেশে সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী অথবা ইসলামী অর্থনীতির

বাস্তবায়ন হবে– এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অথবা শাসকগোষ্ঠী। এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাষ্ট্রের কর নীতি, উন্নয়ন ও বার্ষিক বাজেট হয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আলোকে। মানুষের সার্বিক অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে এক ধরনের রাজনীতিরই কারণে। কোথাও কোথাও জনগণের কথা বলার অধিকার নেই, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার কিংবা বিরোধী দল গঠন করার অধিকার নেই ঐ রাজনীতিরই কারণে। আজকের বিশ্বে আণবিক শক্তির পারস্পরিক হুমকির সম্মুখীন হয়ে মানব সভ্যতা যে ধ্বংসের প্রহর গুনছে তার পেছনেও রয়েছে রাজনৈতিক কারণ। আজকের পৃথিবীতে অন্যায়, নিপীড়ন, শোষণ এসবই প্রচলিত রাজনীতিরই অবদান।

১.৫ প্রচলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Traditional Politics)

পশ্চিমা ধাঁচের প্রচলিত রাজনীতি মূলত ইতালীর সেক্যুলার রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলীর রাজনীতি। প্রচলিত রাজনীতিতে ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা, দুর্নীতি, ওয়াদা ভঙ্গ করা ইত্যাদি কোন মারাত্মক অপরাধই নয়। প্রচলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. রাজনীতি ও নৈতিকতার বিচ্ছিন্নতা (Seperation between Politics and Morality) : প্রচলিত রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল নৈতিকতাকে নির্বাসিত করা। এ রাজনীতিতে নৈতিকতার কোন স্থান নেই। প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শে রাজনীতি ও নৈতিকতার কোন সংস্রব নেই। তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতার কোন মানদণ্ডও নেই। নৈতিকতার যতটুকু কার্যকর নিয়ন্ত্রণ মানুষের সার্বিক জীবনের উপর ছিল, ম্যাকিয়াভেলীর অবদানে তাও আজ অপসারিত হয়েছে। তাই আজ রাজনীতির কোন বাঁধন নেই, নেই কোন উচ্চতর লক্ষ্য। বল্গাহারা রাজনীতিই এ যুগের বৈশিষ্ট্য। কতিপয় বিশেষ রাষ্ট্রের কথা বাদ দিলে একথা সুস্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই অসুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজমান। নৈতিকতার সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে 'স্বার্থ'কেই রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শাসনের মাধ্যমে জনগণের সেবা করার, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা। ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য চলে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা, প্রশাসন যন্ত্র ও প্রচার মাধ্যমের অপব্যবহার, জনগণের পয়সার নিদারুণ অপচয় আর ধোঁকাবাজি, বছরের পর বছর স্বপ্নীল আশ্বাসমালা। যারা ক্ষমতায় নেই, তারাও যে কোন মূল্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত

করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তারা খাদ্যশস্য মজুদ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চান, শিল্প কারখানায় লাগান আগুন, কথায় কথায় ডাকেন ধর্মঘট, সাধারণ মানুষদের ঠেলে দেন বন্দুকের নলের মোকাবিলার জন্য। এর ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা পৃথিবীতে বিরল।

২. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতা (Political Anarchy) : প্রচলিত রাজনীতিতে শাসকের প্রতি আনুগত্য ও তার দায়িত্বশীলতা উভয়ই অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসকের প্রতি সঠিক আনুগত্যের বাঁধন যেমন শিথিল, তেমনি শাসকের সক্রিয় ও বাস্তব দায়িত্বশীলতাও বহুলাংশে অনুপস্থিত। আর তাই আমরা লক্ষ্য করছি বহু রাষ্ট্রেই জনগণের রাজনৈতিক অধিকার যথেচ্ছ হরণ করা হচ্ছে এবং অন্যদিকে জনগণও প্রচলিত রাজনীতির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এমনি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। সরকার যেমনই হোক নির্বাচিত হবার পর জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও সহযোগিতা করা। কেননা নির্বাচিত সরকার যদি জনগণের আনুগত্য ও সহযোগিতা প্রাপ্তির অধিকারী না হয়ে থাকে, তাহলে অধিকার আর কারো প্রতিই প্রযোজ্য হতে পারে না। আর ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য, জনগণের প্রতি জবাবদিহির দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা শাসকের স্থায়িত্বকে কমিয়ে আনে মাত্র। প্রচলিত রাজনীতিতে এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির কারণেই চলছে করুণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা।

৩. ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতি (Poor and Faulty Election System) : অন্যান্য রাজনৈতিক আদর্শের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো পদ্ধতিগত। যেখানে ব্যক্তি বা দল বিশেষ নেতৃত্বের জন্য তাদের দলীয় মেনিফেস্টো পেশ করে এবং জনগণের রায়ের জন্য নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আর এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হলো এই যে, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য যারা নিজেদের উপস্থাপন করে, তারা যে কোন মূল্যে, যে কোন উপায়ে এ নির্বাচনী যুদ্ধে বিজয়ের জন্য প্রয়াস চালায়। এ রকম নির্বাচনী যুদ্ধে প্রচার প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে জনগণকে যে যতটুকু প্রভাবিত করতে পারে কিংবা যারা পয়সা দিয়ে রায় কিনে নিতে পারেন, তাদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে বিজয়ের মালা। আর এ পদ্ধতির তিক্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হলো এই যে, জনগণের রায় ভিক্ষে করে, বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়ে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, অতঃপর স্বার্থের বেদীমূলে উৎসর্গিত হয়ে নিজের ক্ষমতার আসনকে সংহত, নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে কাজ করাই হলো তাদের একমাত্র অভিলাষ। নির্বাচনে নির্বাচকরাও স্বাধীন ও সঠিক রায় প্রকাশ করতে পারেন না। কারণ

উন্নয়নশীল দেশসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত মানুষ জাতীয় জীবনে নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ। নেতৃত্ব নির্বাচন যে একটি পবিত্র দায়িত্ব এবং ভুল নির্বাচন যে জাতির পূর্ণ সত্তাকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে, এ চেতনা ও উপলব্ধি তাদের নেই।

উপরন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে সৎ মানুষের বিচরণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। রাজনীতির কলুষিত অঙ্গন থেকে সমাজের সৎ অংশ নিজেদের দূরেই সরিয়ে রাখতে চান। রাজনীতি ধূর্ত, চতুর এবং শঠ মানুষদের জন্যই, এটা একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর ইসলামী জীবন বিধান যা সমাজকে সৎ মানুষ উপহার দেয়, এ সুযোগকে রোধ করার জন্য সুচতুর পেশাদার রাজনীতিবাজরা তার স্বরে চেচাচ্ছে যে, ধর্মে তথা ইসলামে রাজনীতি নেই। অন্যদিকে বিনা পয়সায় রাজনীতি চলে না। সৎ মানুষদের সততার বদৌলতে আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তাঁরা রাজনীতির মতো হাতীকে পুষতে সম্মত হতে পারেন না। বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনের বাজারী অথবা পেশাদার রাজনীতিবাজদের এতে পোয়াবারো। কেননা সমাজতন্ত্রের লেজ ধরতে পারলে আছে সমাজতন্ত্রী মোড়ল, সুবিধাবাদের ধ্বজাধারী হতে পারলে আছে পশ্চিম গোলার্ধের মুরুব্বী অথবা আরো নিকটের আধিপত্যবাদী প্রতিবেশী। দেশের চতুর ব্যবসায়ী মহলও আছে রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। আসলে এজেন্সী নিতে রাজি থাকলে বর্তমান রাজনীতিতে ডিস্ট্রিবিউটর কিংবা হোল-সেলার-এর অভাব নেই। সুতরাং এ বিকৃত প্রতিযোগিতাপূর্ণ পুঁতি গন্ধময় পরিবেশের মানুষদেরকেই নেতা হিসেবে নির্বাচন করতে হয়। এছাড়া সঠিক ধারণার অভাবের স্থান পূরণ করেছে হুজুগ আর প্রভাবশালী প্রচার। অন্যদিকে নির্বাচনোত্তর আশ্বাসের সাথে আছে সাময়িক নগদ দানাপানি। এ হলো প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির ভেতরের কথা।

৪. হিংসা-বিদ্বেষ, অসহনশীলতা (Jealousy and envy) : বর্তমানে দলে দলে, আদর্শে আদর্শে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে হিংসা-বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়ানো হচ্ছে ভয়ানকভাবে, তার ফলে জাতীয় জীবনে আসছে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, দুর্দশা আর আন্তর্জাতিক জীবনে সূচিত হচ্ছে ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মহাসমারোহ যা মানবতার অস্তিত্বের প্রতি হয়ে দাঁড়ায় হুমকিস্বরূপ। বস্তুত এসব কিছুর পেছনে কাজ করে কিছু রাজনৈতিক চিন্তাধারা, যেমন- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, একনায়কত্ব, আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, ফ্যাসিবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ ইত্যাকার

নানাবিধ তত্ত্ব। অগণতান্ত্রিক-অরাজনৈতিক আচরণ, হিংসা-বিদ্বেষ প্রচলিত রাজনীতিকে কলুষিত করেছে।

৫. রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন (Criminalization of Politics) : একথা বলার অপেক্ষা রাখে না প্রচলিত রাজনীতি দুর্বৃত্তায়নের কবলে পড়েছে। সন্ত্রাস-দুর্নীতি রাজনীতিকে কলুষিত করে তার প্রকৃত চেহারাকে বদলে দিয়েছে। সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিকরা কার্যত প্রচলিত রাজনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রচলিত রাজনীতি এখন মেধাহীন অযোগ্য লোকদের উপার্জনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

৬. জবাবদিহিতার অভাব (Absence of Accountability) : প্রচলিত রাজনীতিতে বাহ্যিকভাবে মনে হয় রাজনীতিবিদরা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে বসেন। তারা জনগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন অনেক সময়। জবাবদিহিতার সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা না থাকায় গতানুগতিক রাজনীতির কর্ণধাররা খেয়াল খুশিমত দেশ শাসন করেন, যা দেশ ও জাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর।

৭. প্রতারণা ও ধূর্তামির রাজনীতি (Cheating and Tricking in Politics) : প্রচলিত রাজনীতি প্রতারণা ও ধূর্তামির রাজনীতি। একে শিয়াল রাজনীতিও বলা হয়। ম্যাকিয়াভেলীর মতে, একজন সেক্যুলার শাসককে শৃগাল ও সিংহের মতো গুণবিশিষ্ট হতে হবে। প্রচলিত রাজনীতিতে সবই বৈধ। এ রাজনীতিতে যে কোন উপায়ে তা অবৈধ উপায় হলেও ক্ষমতা লাভ করাটাই বড় সফলতা।

৮. পারস্পরিক দোষারোপ, প্রতিহিংসা, সংঘাত-সংঘর্ষ, বিভাজনের রাজনীতি (Politics of fault findings, envy, conflict-clash and fragmentation) : প্রচলিত রাজনীতিতে পারস্পরিক দোষারোপ, প্রতিহিংসা, সংঘাত-সংঘর্ষ ও বিভাজনের রাজনীতি সক্রিয় থাকে। নীতি জ্ঞান বর্জিত রাজনীতির ফলে দুষ্ট লোকদের সকল প্রকার অপকর্ম বৃদ্ধি পায়।

৯. ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি (Personality Oriented Politics) : প্রচলিত রাজনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তির প্রভাবেই জনগণ প্রভাবিত হয়, জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলের চাইতে ব্যক্তিই অনেক সময় মুখ্য হয়ে উঠেন। ফলে একপর্যায়ে তারা আর জনমতের প্রতি তোয়াক্কা করেন না। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাই এ রাজনীতির কাম্য বিষয়।

১০. নেতিবাচক রাজনীতি (Negative Politics) : প্রচলিত রাজনীতি প্রধানত নেতিবাচক রাজনীতি। এ রাজনীতির কর্ণধাররা সবক্ষেত্রেই নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেন। শঠতা, প্রতারণা যেখানে সকল প্রেরণার মূল, সেখানে এ নেতিবাচক রাজনীতি জনগণের কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে না। প্রচলিত রাজনীতি এজন্যই রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

১১. সংঘাত ও নীতিহীনতার রাজনীতি (Conflict and absence of Morality in Politics) : সংঘাতই প্রচলিত রাজনীতির বড় অনুসঙ্গ। আর যেখানে সংঘাত-সংঘর্ষ, লগি, লাঠি, বৈঠার তাণ্ডব সেখানে সহযোগিতা-প্রীতির কোন স্থান নেই। এই রাজনীতিতে নীতিবানদের চেয়ে দুর্নীতিবাজদের প্রাধান্যই বেশি। নীতিহীন, দুর্নীতিবাজরাই এ রাজনীতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পন্থা অবলম্বন করেই এক্ষেত্রে রাজনীতি করা হয়।

১২. তোষামোদকারী, মতলববাজ, ফন্দিফিকির আঁটায় অভ্যস্তদের ভিড় (Gathering of the flatterers, trickers and schemers) : প্রচলিত রাজনীতিতে তোষামোদকারী, চাটুকার, মতলববাজ, ধান্দাবাজদের কদর বেশি। এ রাজনীতিতে সৎ লোকদের কোন স্থান নেই। তোষামোদকারী, মতলববাজদের ভিড়ে প্রচলিত রাজনীতি সবসময় সরগরম থাকে।

১৩. ক্ষমতা, ধন ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ (Attraction to power wealth and Honour) : প্রচলিত রাজনৈতিক দলের নেতারা ক্ষমতা লোলুপ থাকে। যে কোন মূল্যে তারা ক্ষমতায় যেতে চায় আর ক্ষমতায় একবার যেতে পারলে তা আর হাতছাড়া করতে চায় না। প্রচলিত রাজনীতিতে কর্মরত নেতারা তাদের ক্ষমতা ও বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে প্রক্রিয়া ও পন্থা অবলম্বন করে তা আইন ও নীতি-নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। নৈতিকতা ব্যতীত ক্ষমতার ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার সম্ভব নয়। ক্ষমতার অপব্যবহার হলে জাতি সেবার পরিবর্তে জুলুমই ভোগ করে।

১৪. দলীয় গণতন্ত্রের অভাব (Laek of Democracy within the party) : প্রচলিত রাজনীতিতে দলে গণতন্ত্রের চর্চা খুব কমই হয়। প্রচলিত রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্রের কোন স্থান নেই। দলের সকলে নেতার সাথে তোষামোদকারীর ভূমিকা পালন করে। তারা নেতাকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। ফলে দেশ ও জাতির স্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হয়।

১৫. কলহ-কোন্দলের রাজনীতি (Politics of Chaos and conflict) : প্রচলিত রাজনীতি কলহ ও কোন্দলের রাজনীতি। প্রচলিত রাজনীতির পরিমণ্ডলে কর্মরত নেতারা মুখে নীতিবাক্য আওড়ান আর বাস্তবে কর্মীদেরকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ শেখান, পরবর্তীতে এ নেতারাই কর্মীদের হাতে অপদস্ত হন। কর্মীরা এ ধরনের দলে বিরোধ সৃষ্টি করে পাল্টা দল বা উপদল গঠন করেন। এভাবে প্রচলিত রাজনীতিতে দল স্বার্থের জন্য ও নেতৃত্বের কোন্দলে বহুদলে বিভক্ত হয়। একই নামে বহুদল এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

মূলত প্রচলিত রাজনীতি হলো ইতালির রাষ্ট্র দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলীর রাজনীতি। তিনি বলেন, Everything fair in politics. অর্থাৎ রাজনীতিতে সবকিছুই জায়েয। এ রাজনীতির ময়দানে Ends justify the means. অর্থাৎ যে কোন উপায়েই হোক ক্ষমতা লাভ করাটাই হচ্ছে সফলতা। রাজনীতির অঙ্গনে ম্যাকিয়াভেলীর মতে, একজন শাসককে শৃগাল ও সিংহের মত গুণবিশিষ্ট হতে হবে। মোটকথা, প্রচলিত রাজনীতিতে মিথ্যা, চুরি, ওয়াদা ভঙ্গ ইত্যাদি কোন মারাত্মক অপরাধই নয়, কোন অন্যায়ই অন্যায় নয়। রাশিয়ার লেনিন তার 'Left Wing Communism' বইতে বলেছেন, পার্টির মঙ্গলের জন্য চুরি, মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, খুন, রক্তপাত ইত্যাদি অপরিহার্য। যে রাজনীতিতে চুরি করা, মিথ্যা বলা, খুন করা, ঠকানো ইত্যাদি অন্যায় তো নয়ই বরং অপরিহার্য সে রাজনীতির প্রতি মানুষ অনীহা প্রকাশ করবে তা একান্তই স্বাভাবিক। আইজ্যাক ডি. ইসরাইলীর ভাষায় প্রচলিত রাজনীতি তাই 'প্রতারণার মাধ্যমে মানব জাতিকে শাসন করার কৌশল' (The art of governing mankind by deceiving them) এ পরিণত হয়েছে।[১৮]

১.৬ ইসলামে রাজনীতি বা ইসলামী রাজনীতি (Politics in Islam/ Islamic Politics)

পাশ্চাত্য ধাচের রাজনীতির সাথে ইসলামী রাজনীতির কোন সামঞ্জস্য বা মিল নেই। তবে রাজনীতির অর্থ যদি হয় কল্যাণময় জীবন যাপন এবং মহান প্রভু আল্লাহকে এক ও একক মনে করে তাঁর ইবাদত এবং তাঁরই সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য জীবন চর্চা, তবে সে রাজনীতি ইসলামের কেন্দ্রীয় বিষয়। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে চারটি স্তম্ভ যেমন– নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ তার অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে।[১৯] ইসলামের মৌলিক

১৮. বার্নার্ড ক্রীক, In Defence of Politics, পৃঃ ৬।

১৯. হামিদ এনায়েত, আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা, লন্ডন, ম্যাকমিলান, ১৯৮২, পৃঃ ২।

স্তম্ভসমূহের লক্ষ্য শুধু ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধন নয় বরং এর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। এসব স্তম্ভসমূহ মানুষের সামগ্রিক আচরণ এবং কার্যকলাপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

ইসলামী রাজনীতি বলতে বুঝায় ঐ রাজনীতি, যার লক্ষ্য কুরআন-সুন্নাহর আদর্শের ভিত্তিতে দেশের শাসনব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনা। এ রাজনীতির যারা ধারক-বাহক তারা এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

যেসব রাজনৈতিক দল কুরআন-সুন্নাহকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামী আইন-কানুন, বিধি-বিধান, শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, নিজেদের জীবনে ও দলের অভ্যন্তরে ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করে, কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একটি আধুনিক প্রগতিশীল কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মাঠে ময়দানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, তাদের রাজনীতিই মূলত ইসলামভিত্তিক রাজনীতি বা ইসলামী রাজনীতি। এটা কখনও এবং কোন অবস্থাতেই ধর্মকে অর্থাৎ ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার বলে পরিগণিত হতে পারে না।

রাজনীতিকে যদি সরকার পরিচালনার সীমিত অর্থে বিবেচনায় আনা হয় তাহলে রাজনীতি ইসলামের অন্যতম প্রধান বিষয়। 'সৎ কাজের আদেশ করো এবং মন্দ কাজে নিষেধ করো' আল-কুরআনের এ মহান আহ্বান, ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলী ও নির্দেশনা সমুন্নত রাখার জন্য রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। আল-কুরআন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকে নিন্দা করেছে।[২০] মহানবী (সা) সমাজ ও রাষ্ট্রে সংগঠন ও কর্তৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একইভাবে ইসলামের মহান খলীফা হযরত উমর (রা) একজন নেতা ব্যতিরেকে সংগঠিত সমাজ গঠন সম্ভব নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং আরো বলেছেন যে, আনুগত্য ছাড়া নেতা নির্বাচিত হওয়া যায় না।[২১]

খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীগণ এই মর্মে অভিমত পেশ করেছেন

---

২০. ২ : সূরা আল বাকারা : ২০৫।

২১. ইউসুফ ইবনে আবদুল বার আল কুরতুবী, জামি বায়ান আল ইলম ওয়া ফাদলুহ, মদীনা, আল মাকতাবাহ আল ইসলামিয়াহ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬২।

যে, আল্লাহ্ পাকের অহীর নির্দেশ বাস্তবায়নের যে মহান দায়িত্ব বান্দাদের উপর অর্পিত হয়েছে তার দায়ভার যুগপৎ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদন করতে হবে। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এমন ধর্মীয় শুভবোধ দ্বারা সিক্ত ছিল যে, তাঁরা রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আইনকে ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হিসেবে দেখতেন। এ বিষয়টি হযরত কা'ব (রা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, ইসলাম, সরকার ও জনগণ হচ্ছে তাঁবু, দণ্ড, রজ্জু ও পেরেকের মতো। ইসলাম হচ্ছে তাঁবু; সরকার হচ্ছে তাঁবু ধারণকারী দণ্ড; আর জনগণ হচ্ছে রজ্জু ও পেরেক। একটি ছাড়া অন্যটির কোন কার্যকারিতা নেই। (Islam, the government, the people are like the tent, the pole, the ropes and the pegs. The tent is Islam; the pole is the government; the ropes and pegs are the people. None will do without the others.)[২২]

ক্ষমতা লাভের প্রেক্ষিতে দেখলে রাজনীতি ইসলামের আরো মৌলিক বিষয়। কেননা আল্লাহ্ পাকের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তাওহীদ ও রবুবিয়াতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সমস্ত তাগুতী শক্তিকে মূলোৎপাটন করে দেয়া, অন্যকথায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে যাতে তা প্রয়োগ করে পৃথিবীর বুক থেকে যাবতীয় শোষণ, যুলুম, অন্যায়, অবিচার দূরীভূত করা যায়। ইসলামের কাঙ্ক্ষিত তাওহিদী সমাজে আপোষকামিতার কোন অবকাশ নেই। সকল মিথ্যা দেবতাদের মিথ্যা পূজা অর্চনাকে বিতাড়িত করে দেয়ার জন্য ইসলাম উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। খোদাদ্রোহী এবং মানব রচিত মতবাদের ধারক-বাহকদের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ন্যায়পরায়ণ নেক মানুষদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিস্থাপন করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশেই মহানবী (সা) রিসালাত অস্বীকারকারীদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খর্ব করেছিলেন। তাঁর মদীনায় হিজরতের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। একইভাবে পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলগণ ইসলামের মহান বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন এবং তাগুতী শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন।[২৩] ইসলাম তাই ক্ষমতার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত, যে ক্ষমতা

---

২২. ইবনে কুতায়বাহ, উইয়ূন আল আখবার, ভলিউম ১; বার্নাড লুইস সম্পাদিত Islam : From the Prophet Muhammad to the capture of Constantinople, লন্ডন, ম্যাকমিলান প্রেস লিঃ, ১৯৭৬, ভলিউম ১, পৃঃ ১৮৪।

২৩. ১৬ : সূরা আন নাহল : ৩৬ নং আয়াত।

প্রয়োগের মাধ্যমে সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধনের মধ্য দিয়ে ইসলামী আদর্শকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ব্যক্তিগত স্বার্থ বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষমতা দখল ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম ক্ষমতাকে একটি নৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেছে। ইসলামে ক্ষমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান ইচ্ছা পূরণের মাধ্যম মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতা মানুষের কল্যাণের জন্যই ব্যবহৃত হতে হবে।

রাজনীতি হচ্ছে ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা এবং একে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। স্রষ্টা ও সীজারের মধ্যে একজনকে বেছে নেয়ার অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলামে সীজারের কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলামী শরীয়াহ নৈতিক ও বস্তুগত জীবনের ঐক্য স্থাপন করেছে। ইসলাম মানব জাতিকে নৈতিক ও বস্তুগত উভয়দিক দিয়েই অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ রাজনীতির নির্দেশনা ও গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। রাজনৈতিক আচরণ বিধি ইসলামের আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হতে উৎসারিত। তাই রাজনীতির প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ তথা রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা, নেক মানুষদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ, দুষ্কৃতির শিকড় উৎপাটন করে কল্যাণকর জীবন প্রতিষ্ঠা– এসব কিছুই ইসলামে প্রাসঙ্গিক এবং ইসলাম এসব কিছুকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ইসলাম কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রদান করে, তবে পার্থক্য এটুকু যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলামের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ও বিস্তৃত কাঠামোর ভেতরে সংঘটিত হতে হবে। ধর্ম ও রাজনীতি তাই একই ইসলামী মুদ্রার দু'পিঠ নয় (No two sides of a single coin in Islam)।[২৪] ধর্ম ও রাজনীতিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যায় না যে এরা এক একটি স্বাধীন পৃথক সত্তা বরং একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের ভাষায় 'প্রকৃত সত্য এই যে, 'ইসলাম হচ্ছে দ্ব্যর্থহীনভাবে একক বাস্তবতা, যা সুস্পষ্টভাবে এক ও অভিন্ন, তা যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন।[২৫]

১.৭ ইসলামী রাজনীতির উৎস (Sources of Islamic Politics)

ইসলামের ভিত্তির মূলেই রয়েছে রাজনীতি। ইসলামের মূল ভিত্তি কালেমা

২৪. জি এইচ জ্যানসেন, মিলিটেন্ট ইসলাম, লন্ডন, প্যানবুকস, ১৯৭৯, পৃঃ ১৭।

২৫. ড. স্যার মুহাম্মদ ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, লাহোর, শেখ মোহাম্মদ আশরাফ, ১৯৭১, পৃঃ ১৫৪।

তাইয়্যেবাই ইসলামী রাজনীতির উৎস। কালেমা তাইয়্যেবার মূল ঘোষণা ও অন্তর্নিহিত বাণী হলো এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া। এক আল্লাহ ছাড়া আর সকলের সবকিছুর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা। গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব পরিহার করে বা বর্জন করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-কে অনুসরণের অঙ্গীকারই কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক। তাই এটাকে কোন অবস্থাতেই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই।

মহানবী (সা)-এর একটি হাদীসের আলোকে ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি, যার প্রথমটি হলো এ কালেমার ঘোষণা। এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন সত্তা নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করার অর্থ ও তাৎপর্য হলো, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আকারে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তা বর্জন করা।

কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা মূলত মানুষের গোটা যিন্দেগীকে খোদাহীন মতাদর্শ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান পরিহার করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত নীতি আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনার একটি শর্তহীন অঙ্গীকার। এ কালেমার ঘোষণা দিয়ে যারা ইসলামে প্রবেশ করে ইসলামী উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হয় তারা ইসলামহীন রাজনীতি বা রাজনীতিবিহীন ইসলামের কথা ভাবতেও পারে না। হাদীসের আলোকে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুনিয়াদ নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা। এ দু'টো কাজকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন তাঁর কিতাব আল-কুরআনে। সূরা আল হাজ্জে আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

(আল্লাযীনা ইম-মাক্কান্না হুম্ ফিল আরদি আকামুছ ছালাতা ওয়া আতাউয যাকাতা ওয়া আমারু বিল মা'রূফি ওয়া নাহাও আ'নিল মুনকারি; ওয়া লিল্লাহি আ'ক্বিবাতুল উমূর।)

অর্থ : "আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা (রাষ্ট্র ক্ষমতা) দান করলে তারা নামায

কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।” (২২ : সূরা আল হাজ্জ : ৪১)

তাছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন-বিধান, হুকুম-আহকাম এবং রাসূলের আদর্শ অনুসরণের জন্য শাসক নিয়োগ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্যের যে নির্দেশ আল-কুরআনে দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম কায়েম ও ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

(ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।)

অর্থ : “হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল (ক্ষমতার অধিকারী) তাদের আনুগত্য করো।” (৪ : সূরা আন-নিসা : ৫৯)

মুসলমানদের অবশ্যই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার ইসলামী তত্ত্বানুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। মহানবী (সা) নিজে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর চারজন খলীফা ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার উজ্জ্বল উদাহরণ রেখে গেছেন। বিশেষ করে হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর শাসনকাল পর্যন্ত যে রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু ছিল তা সর্বদিক দিয়ে মানব জাতির জন্য অতি উন্নত মানের নমুনা বলে অমুসলিম চিন্তাবিদগণ পর্যন্ত অকপটে স্বীকার করেছেন।

১.৮ ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব (Importance of Politics in Islam)

ইসলামের বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিও এর অন্যতম শাখা। এটি দীনের প্রধানতম শাখা না হলেও দীনের বিশেষ অঙ্গ তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

হযরত মূসা (আ)-এর সময়ে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানকে শরীয়াতের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ)-কে অধিকাংশ সময়

তৎকালীন রাজা বাদশাহদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. وَلاَ تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً. وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

(ইন্না আনযালনাত তাওরাতা ফীহা হুদাও ওয়া নূরা ইয়াহকুমু বিহান নাবিয়্যুনাল লাযীনা আসলামূ লিল্লাযীনা হাদূ ওয়া রাব্বানিয়্যুনা ওয়াল আহবারু বিমাসতুহফিযূ মিন কিতাবিল্লাহি ওয়া কানূ আলাইহি শুহাদাআ, ফালা তাখশাউন্নাসা ওয়াখশাওনি, ওয়া লা তাশতারূ বিআইয়াতী ছামানান কালীলা, ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনযালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুল কাফিরূন।)

অর্থ : "আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো, নবীগণ যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ; কারণ তাঁদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রী করবে না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।" (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَنْفَ بِالاَنْفِ وَالاُذُنَ بِالاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

(ওয়া কাতাবনা আলাইহিম ফীহা আন্নান নাফসা বিন নাফসি ওয়াল 'আইনা বিন 'আইনি ওয়াল আনফা বিল আনফি ওয়াল উযুনা বিল উযুনি ওয়াসসিন্না বিসসিন্নি

ওয়াল জুরূহা কিছাছুন ফামান তাছাদ্দাকা বিহী ফাহুওয়া কাফ্ফারাতুল্লাহূ; ওয়া মাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনযালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুয্যালিমূন।)

অর্থ : "আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম।" (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ـ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

(ওয়াল ইয়াহকুম আহলুল ইনজীলি বিমা আনযালাল্লাহু ফীহি, ওয়া মাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনযালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুল ফাসিকূন।)

অর্থ : "ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা ফাসিক।" (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৭)

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

(ওয়া আনযালনা ইলাইকাল কিতাবা বিলহাক্কি মুছাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল কিতাবি ওয়ামুহাইমিনান 'আলাইহি ফাহকুম বাইনাহুম বিমা আনযাল্লাহু ওয়ালা তাত্তাবি' আহওয়া আহুম 'আম্মা জাআকা মিনাল হাক্কি।)

অর্থ : "আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবে এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে না।" (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৮)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَتَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ـ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ـ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ـ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

(ওয়া আনিহকুম বাইনাহুম বিমা আনযাল্লাহু ওয়া লা তাত্তাবি আহওয়াআহুম ওয়াহযারহুম আই ইয়াফতিনূকা আম বা'য়া দিমা আনযালাল্লাহু ইলাইকা, ফাইন তাওয়াল্লাও ফা'লাম আন্নামা ইউরীদুল্লাহু আই ইউছীবাহুম বিবা'দি যুনূবিহিম, ওয়া ইন্না কাছীরাম মিনান নাসি লাফাসিকূন। আফাহুকমুল জাহিলিয়্যাতি ইয়াবগুনা ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি হুকমাল লিকাওমি ইয়্যুকিনূন।)

অর্থ : "আমি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো, তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ না করো এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো ফাসিক। তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠতর?" (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৯-৫০)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে তিনটি শরীয়াতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ)-এর শরীয়াত, হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়াত এবং আমাদের শেষ নবী সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়াত। তিনটি শরীয়াতেরই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এই যে, সকল বিষয়ে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মতে ফয়সালা করতে হবে। বিশেষভাবে রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে। অতএব, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোন ফয়সালা দেয়ার পূর্বে সে সম্বন্ধে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসন্ধান করা শাসকের জন্য অপরিহার্য। কেননা এগুলো জানা ব্যতিরেকে জনগণের মাঝে ন্যায়ের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, যারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের অনুসরণ করে না, তাদেরকে কাফির, যালিম এবং ফাসিক বলে

আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও উলামায়ে কেরামের মতে এ কুফরী প্রকৃত কুফরীর সমপর্যায়ের নয় এবং এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইসলামের সীমানা থেকে খারিজ হয়ে যাবে না।[২৬]

এমারত, খিলাফত ও রাজনীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেন,

لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِالطَّاعَةِ.

(লা ইসলামা ইল্লা বিজামায়াতিন ওলা জামায়াতা ইল্লা বি ইমারাতুন ওলা ইমারাতা ইল্লা বি ত্বয়াতিন।)

অর্থ : "ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হবে না জামায়াত ছাড়া। জামায়াত হবে না এমারত তথা খিলাফত ছাড়া। আর এমারত হবে না আনুগত্য ছাড়া।"[২৭]

অধিকন্তু কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ-এর গ্রন্থসমূহে এমন বহু বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন সিয়াসী নিযাম তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ব্যতীত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। যেমন : চোরের হাত কাটা, ব্যভিচার বা যিনার শাস্তি বিধান করা, নামায বর্জনকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করা বা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা, কোথাও সেনা অভিযান প্রেরণ করা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, সুদ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি। কাজেই সিয়াসত ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্যতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

১.৯ ইসলামী রাজনীতি ফরয [Islamic Politics is farz (Obligatory)]

ইসলামী রাজনীতি ফরযে আইন। ইসলামী রাজনীতিতে অংশ না নিলে মুসলমান থাকা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ.

(আন্নাল আরদা ইয়ারিছুহা ইবাদিয়াছ ছালিহূন।)

অর্থ : "নিঃসন্দেহে, আমার সৎ কর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে।" (২১ : সূরা আল আম্বিয়া : ১০৫)

প্রশ্ন হচ্ছে, শাসন কর্তৃত্ব যদি কোন খারাপ জিনিসই হবে তবে আল্লাহ কি সৎ কর্মশীল বান্দাদের জন্য তা ঘোষণা করতেন?

---

২৬. ফতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যাল আমীন, পৃঃ ৩-৪।

২৭. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

আল্লাহ তা'আলা আরো ওয়াদা করছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ.

(ওয়া'আদাল্লাহুল্লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আমিলুছ ছালিহাতি লাইয়াসতাখলিফান্নাহুম ফিল আরদ।)

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন।" (২৪ : সূরা আন নূর : ৫৪)

শাসন কর্তৃত্ব কোন নাপাক জিনিস হলে আল্লাহ সৎ ঈমানদারদের জন্য তা ওয়াদা করতেন না। হিজরতের আগে আল্লাহই তাঁর রাসূল (সা)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নিকট একটি সালতানাতের (রাষ্ট্রীয় শক্তির) সাহায্য চাইতে।

আল্লাহর নবী (সা) তের বছর পর্যন্ত লোক তৈরি করার পর মদীনায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছিলেন। মসজিদে নববীর সামনে বসে তিনি কুরআনের আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেছেন। বিদেশী সম্রাটদের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনাইনের প্রান্তরে তিনি যুদ্ধ করেছেন। যাকাত আদায় করেছেন, বণ্টন করেছেন, আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী লেন-দেন ও অর্থ প্রশাসন পরিচালনা করেছেন। এসব কি রাজনীতি নয়? আল্লাহ স্বয়ং যে জিনিসের ওয়াদা করলেন, তার পেয়ারে হাবীবকে যে জিনিসের সাহায্য চাইতে শিখিয়ে দিলেন, আল্লাহর নবী নিজের জীবনে যে কাজ করে দেখিয়ে দিলেন, তাকে যারা খারাপ মনে করে নিজেদের জন্য হারাম করে নেয় তারা কি কখনও ঈমানের দাবি করতে পারে?

আল্লাহর নবীর চাইতে তো কেউ বেশি পরহেযগার নন। আল্লাহর নবীর চাইতে কেউ বড় দরবেশও নন। যে কাজ আল্লাহর নবীকে করতে হলো তা না করে একজন লোক নিজেকে নবীর উম্মত বলে দাবি করে কিভাবে?

আল্লাহ তো বলে দিয়েছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

(লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাতুন।)

অর্থ : "তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের (জীবনের) মাঝে (অনুকরণ) যোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (৩৩ : সূরা আল আহ্যাব : ২১)

নবী ছাড়া অন্য কাউকেই আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। আল্লাহর নবী যে কাজ করেছেন তা না করাটা যদি আমরা পরহেযগারী ও বুযুর্গী বলে মনে করি তবে আল্লাহ্ নবীকে কি কম পরহেযগার বলে ধারণা করা হয় না? অথচ আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসতেন। সুতরাং বেহেশতে যাবার যদি কোন সহজ ও সরল রাস্তা থাকে তবে আল্লাহ্ তাঁকে অবশ্যই তা দেখিয়ে দিতেন। আল্লাহর নবীকে (সা) নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং যিকির আযকার করা সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হলো, রাজনীতি করতে হলো, আর আমরা নবীর দেখানো রাজনীতি না করেই তাঁর চাইতে সংক্ষেপে পরহেযগার বনে যাব– এটা কি সম্ভব?

কুরআনের একটি আয়াতকে অস্বীকার করেও আমরা ঈমানের দাবি করতে পারি না। অথচ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত আয়াত আছে তা সব একত্রিত করলে এক পারার বেশি হবে না। বাকি উনত্রিশ পারায় যে অসংখ্য হুকুম আছে সেগুলো কি তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তিলাওয়াত করার জন্যই দিয়েছেন?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ -

(ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ।)

অর্থ : "আইন দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নেই।" (১২ : সূরা ইউসুফ : ৪০, ৬ : সূরা আল আন'আম : ৫৭)

যে ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নেই সে ক্ষমতা অন্যের উপর আরোপ করা শিরক। তাহলে প্রশ্ন হলো, আমাদের দেশের কোর্ট-কাচারিতে কি কুরআনের আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা হয়? নিশ্চয়ই এর জবাব হবে না, হয় না। এখানে ইংল্যান্ড ও রোমের আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা হয়। যে ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নেই বলে আল্লাহ্ দাবি করেছেন সে ক্ষমতা এ দেশে তুলে দেয়া হলো, রোমের এবং ইংল্যান্ডের আইন ও আইনবিদদের হাতে। আল্লাহ বলেন,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ.

(ওয়া আনিহ্কুম বাইনাকুম বিমা আনযালাল্লাহু।)

অর্থ : "কোন বিষয়ে বিচার ফয়সালা করতে হলে তা আল্লাহর দেয়া আইনের দ্বারাই করবে।" (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৯)

কুরআন ঘোষণা করছে :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ... الظَّالِمُوْنَ... الْفَاسِقُوْنَ.

(ওয়া মাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনযালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল কাফিরূন... আজ্জালিমূনা... আলফাসিকূন।)

অর্থ : "আল্লাহর আইনানুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফির... যালিম... ফাসিক।" (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৪-৪৫-৪৭)

আমরা তো আল্লাহর আইনমত বিচার ফয়সালা করি না, তাহলে আল্লাহর কুরআন মুতাবেক আমাদের যথার্থ পরিচয় কি হওয়া উচিত?

ঈমানের দাবির জন্য মানুষের তৈরি আইন বদলিয়ে আল্লাহর আইন জারি করা তাই একান্ত কর্তব্য (ফরয)– একথা সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতা অর্জন করা ছাড়া আইন বদলানো কি সম্ভব?

ঈমানের জন্য আইন বদলানো ফরয, আইন বদলানোর জন্য ক্ষমতা পরিবর্তন অপরিহার্য। আর ক্ষমতা বদলানোর জন্য যে রাজনীতি তাও ফরয। আপনি কি বলতে চান, শাসন আপনার হাতে নেই, সুতরাং খোদায়ী আইন কায়েম করা আপনার জন্য ফরয নয়। কোন একটা ফরয আদায়ের জন্য যে যে জিনিস হাসিল করা জরুরি, সে জিনিস হাসিলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাও ফরয। মানুষের মনিব মহান আল্লাহ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকির-আযকার এসব হুকুমের সাথে এ হুকুমটিও করেছেন :

لَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

(লা তুতি' মান আগফালনা কালবাহু আন যিকরিনা ওয়াত্তাবায়া হাওয়াহু ওয়া কানা আমরুহু ফুরুতা।)

অর্থ : "তোমরা এমন লোককে মোটেই নেতা মেনো না, এমন লোকের কথা মোটেই শুনো না, যার দিলের মধ্যে আমার যিকির নেই এবং যে ব্যক্তি তার নফসের খাহেশ অনুযায়ী চলে।" (১৮ সূরা আল কাহাফ : ২৮)

আল্লাহ আরও বলেছেন, لَاتُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ.

(লা তুতীউ' আমরাল মুসরিফীনা।)

অর্থ : "এমন লোককে নেতা মেনো না যারা যমীনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।" (২২ : সূরা আশ শোয়ারা : ১৫২)

আল্লাহর হুকুম যারা মানে না তারা নফসের হুকুম মানে। আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের আনুগত্য কুরআন মজীদে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে কাকে নেতা মানতে হবে সেদিকেও আল্লাহ্ তা'আলা আলোকপাত করেছেন। বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

(আল্লাযীনা ইমমাক্কান্নাহুম ফিল আরদি আকামুছ ছালাতা ওয়া আতাউয যাকাতা ওয়া আমারু বিল মা'রূফি ওয়া নাহাও আনিল মুনকারি।)

অর্থ : "মুমিন ব্যক্তিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, ভালো কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।" (২২ : সূরা আল হাজ্জ : ৪১)

আল্লাহ বলছেন,

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

(আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।)

অর্থ : "আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা কর্তৃত্বশীল তাদেরও।" (৪ : সূরা আন নিসা : ৫৯)

উপরিউক্ত আয়াতে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা ঈমানদারদের মধ্য থেকেই একজনকে নেতা বা আমীর বানানোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী কাউকে নেতা মানা যেত তবে এখানে তোমাদের মধ্য থেকে একথা বলার কোনই প্রয়োজন হত না।

কিরূপ লোককে নেতা বানাতে হবে তা তো কুরআন মজীদই বলে দিয়েছে। কুরআনের এ সুস্পষ্ট আয়াতগুলো কি আমল করার জন্য নয়? আল্লাহর হুকুম মানা যদি ফরয হয় তবে উপরে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী লোকদের নেতৃত্ব কায়েমের

রাজনীতি কি ফরয নয়? আল্লাহর দীনকে আল্লাহর যমীনে কায়েম করার চেষ্টা যে ফরয এ ব্যাপারে আমাদের কারোই সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও আমরা দীন প্রতিষ্ঠার এ পথ থেকে পলায়নের চেষ্টা করি, আমাদের কাছে এ পথ দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ মনে হয়। অথচ কুরআন বলে, "আমিই তোমার জীবনের আইন। আমিই তোমার পথ প্রদর্শক, আমি কখনও মিথ্যা বলি না, ভুল জিনিষ পেশ করি না। সত্য জ্ঞান কেবল আমার কাছেই রয়েছে। আমি সকল কালের জন্য সত্য। আমার পথেই সমগ্র মানবতার মুক্তি নিহিত আছে। আমি ছাড়া সবকিছুই বাতিল, আমার বিরোধী সবকিছুই নিরেট জাহিলিয়াত।"

কুরআনের এ দাবিই তো আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যখনই কুরআন বলে, "আমার দেয়া ব্যবস্থা যমীনে কায়েম করো! তোমার জীবনের সকল কাজ আমার নির্দেশ অনুযায়ী করো।" তখনি আমরা পলায়নের পথ খুঁজি। শুধু তাই নয়, এ পলায়নকে আবার কুরআনসম্মত প্রমাণ করার জন্যও উঠে পড়ে লেগে যাই। আমরা মনে করি যে আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই– সুতরাং আল্লাহর আইন কায়েমের দায়িত্বও আমাদের নয়। কিন্তু আল্লাহর আইন কায়েমের প্রতি যদি আমাদের সামান্যতম আগ্রহও থাকত তবে কি আমরা এ কাজের জন্য যে শাসন ক্ষমতা একান্ত জরুরি– তা না পেয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারতাম?

স্বার্থপর ও গদিভিত্তিক রাজনীতি যেমন ইসলাম বিরোধী, নবীর অবলম্বিত রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াও তেমনি অনৈসলামিক। বরং রাসূলগণ যে ধরনের রাজনীতি করেছেন তা মুসলমানদের জন্য অন্যতম ফরয। ফরযটির নাম হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই ইসলামী আন্দোলন এবং রাজনীতিই এ আন্দোলনের প্রধানতম অবলম্বন। সুতরাং কতক লোক পরহেযগারীর দোহাই দিয়ে রাজনীতি করা অপছন্দ করলেও রাসূল (সা)-এর খাঁটি অনুসারীদের পক্ষে তা পছন্দ না করে কোন উপায় নেই।[২৮] নবী করীম (সা) যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তাতে প্রকৃতপক্ষে চরম রাজনৈতিক কার্যকলাপ অপরিহার্য ছিল। দেশের নেতৃত্ব যদি অনৈসলামী লোকদের হাতে থাকে, তাহলে ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেতে পারে না। তাই ইসলামী আদর্শের বিজয় মানেই নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই চরম রাজনীতি।[২৯]

---

২৮. প্রফেসর গোলাম আযম, বাংলাদেশের রাজনীতি, পৃঃ ৩৫।

২৯. প্রফেসর গোলাম আযম, সিরাতুন্নবী সংকলন, পৃঃ ৮২-৮৩।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার চালাবার যে নিয়ম ও নীতি মহানবী (সা) চালু করে দেখিয়ে দিয়েছেন তারই নাম ইসলামী রাজনীতি।[৩০]

১.১০ ইসলামী রাষ্ট্রনীতি রাজনীতি অরিয়েনটেড (Islamic State Policy is Politics Oriented)

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মতে, ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ। ধর্মের সাথে রাষ্ট্রনীতির এবং রাষ্ট্রনীতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম অজানা জগৎ তথা পরকাল নিয়ে কথা বলে; অতএব পার্থিব কর্মকাণ্ডে বা ইহজাগতিক বিষয়ে ধর্মের স্থান নেই যেমন পরজগতের বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন বক্তব্য নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এ দৃষ্টিভঙ্গীকে সেকুলারিজম বা ইলমানিয়্যা বলা হয়। ইসলাম দুটি কালের (ইহকাল বা দুনিয়া এবং পরকাল বা আখেরাত) অস্তিত্ব স্বীকার করে; তবে ইহকাল ও পরকালকে বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্কহীন মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহকাল ক্ষণস্থায়ী, পরকাল চিরস্থায়ী। আল কুরআনে সমাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, রাজনীতি ও শাসননীতিসহ ইহকাল সম্পর্কিত নানা বিষয়ে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। কোন মুসলমানই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না। কারণ এটা ঈমানেরই পরিপন্থী। খ্রিস্টান ও নাস্তিক সম্প্রদায়ের মিথ্যা প্রচারণার ফলে মুসলমানদের কেউ কেউ বর্তমানে একথা বলতে আরম্ভ করেছে যে, ইসলামের সাথে রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক নেই। যারা এ জাতীয় চিন্তাভাবনা পোষণ করে তাদের মধ্যে কয়েকটি দল রয়েছে। তাদের চিন্তা দর্শন সম্পূর্ণরূপে আলাদা ও পৃথক ধরনের। নিচে তা তুলে ধরা হলো :

১। প্রথম দলের মতে, ইসলামে রাজনীতি আছে বটে তবে বর্তমানে তা কার্যকরী করার মত নয়। কেননা বর্তমান যুগ, নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে ইসলামী রাজনীতির তুলনায় অনেকটা এগিয়ে গেছে। এ দলটি নিঃসন্দেহে মুলাহিদ ও যিন্দীক। ইসলামে তাদের কোন স্থান নেই। তাদের ক্ষতিকর প্রভাব ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য কাফিরের তুলনায়ও অধিক মারাত্মক। যারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালতে বিশ্বাসী তাদের উচিত এ জাতীয় মুলাহিদ ও যিন্দীকদেরকে প্রত্যাখ্যান করা।

২। দ্বিতীয় দলের মতে, ইসলাম নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ সর্বস্ব এটি ধর্মমাত্র। এতে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির কোন স্থান নেই। তারাও মূলত পথভ্রষ্টকারী জাহিল অজ্ঞ অথবা স্পষ্ট কাফির। তাদের ক্ষতিকর প্রভাবও প্রকৃত কাফিরের

---

৩০. প্রফেসর গোলাম আযম, বাংলাদেশের আদর্শের লড়াই, পৃঃ ৩২।

তুলনায় অধিক ক্ষতিকর ও বিপদজনক। এক্ষেত্রে স্পষ্ট বক্তব্য এটাই যে, যদি তারা আন্তরিকভাবেই এ মতবাদে বিশ্বাসী হয় তবে তারা পরিষ্কার কাফির। কেননা দীনের কোন অংশ বিশেষের উপর ঈমান এনে অপর কোন অংশকে প্রত্যাখ্যান করাও কুফুরী। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ.

(আফাতু'মিনূনা বিবা'দিল কিতাবি, ওয়া তাকফুরূনা বিবা'দি।)

অর্থ : "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করো।" (২ : সূরা আল বাকারা : ৮৫)

মুসায়িরা গ্রন্থে আল্লামা ইবনে হুমাম এবং আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮) ও আল্লামা হাফিয ইবনে কায়্যিম তৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহে একথা উল্লেখ করেছেন যে,

مَنْ كَفَرَ بِشَيْءٍ مِّنْ ضُرُوْرِيَاتِ الدِّيْنِ اَوْ اسْتَخَفَّ بِشَيْءٍ مِّنَ الشَّرَائِعِ وَلَوْ سُنَّةً فَهُوَ كَافِرٌ لِاَنَّ الاِيْمَانَ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَرِضَا الْقَلْبِ بِهٖ وَتَسْلِيْمَ الْقَلْبِ لَهٗ مَعَ غَايَةِ الْاَجْلَالِ وَنَهَايَةُ التَّعْظِيْمِ.

(মান কাফারা বিসাইয়িন মিনা জরুরিয়্যাতীদ দীন আও ইসতাখাফফা বিসাইয়িন মিনাশ শারায়িয়ে ওয়া লাও সুন্নাতুন ফাহুয়া কাফিরুন লি আন্নাল ইমানা হুয়া তাছদিকুন্নবী (সা) বিজামিয়ি' মা জায়া বিহী মিন ইনদিল্লাহি অরিদাল কালবি বিহী ওয়া তাসলীমাল কালবি লাহূ মায়াল গায়াতিল আজলালি ওয়া নাহাইয়াতুত তা'যীম।)

অর্থ : "কেউ যদি জরুরিয়্যাতে দীন তথা দীনের অপরিহার্য কোন অঙ্গকে অস্বীকার করে অথবা শরীয়াতের কোন অংশ বিশেষের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করে এমনকি তা যদি সুন্নাতও হয় তবে সে কাফির। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর তরফ থেকে যা কিছু এনেছেন এর সবকিছু পরিপূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে, সন্তুষ্টচিত্তে ও অবনত মস্তকে মেনে নেয়া ও গ্রহণ করার নামই হচ্ছে ঈমান।"

৩। তৃতীয় দলের মতে, ইসলামে রাষ্ট্রনীতি আছে কিন্তু তা এক বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয়। এ দলটিও কাফির। তাদের ধারণা মতে, ইসলাম যেন পূর্ণাঙ্গ দীন নয়। অথচ কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

(আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু 'আলাইকুম নি'মাতী ওয়া রাদীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা।)

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের উপর আমার দেয়া নি'আমতকেও পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৩)

ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য রাখে না এবং গোটা মানব জীবনকে আল্লাহর বিধানের অধীন করে দিতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম রাজনীতিকেও ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায় এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে কাজে লাগাতে চায়।

১.১১ ইসলামকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা বা ইসলামকে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা (Uses of Islam in Politics or abuses of Islam in Politics)

রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার অবশ্যই নিন্দনীয়। এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়, ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের নিন্দায় যারা যতবেশি সোচ্চার, তারাই ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ততবেশি অগ্রগামী। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের যারা নিন্দা করেন অথবা প্রশ্ন তোলেন, তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু অবশ্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ আক্রমণের টার্গেট মূলত ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো। শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই নয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও এ আক্রমণ, সমালোচনা, নিন্দাবাদের একমাত্র টার্গেট বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলন।

যাদের দলীয় ইশতেহারে আদর্শের ভিত্তি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা হয় না, যাদের দলীয় কর্মসূচিতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থাসহ ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ থাকে না, যাদের বাস্তব জীবন কুরআন-সুন্নাহর আদর্শের সাথে সম্পর্কহীন তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সময় জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য ইসলামের নাম ব্যবহার করে নিজেদের ধার্মিক বলে পরিচয় দেয়ার অভিনয় করাকেই বলা হয় ধর্ম ব্যবসা।

রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার বা ইসলামের ব্যবহার, এটা সরলপ্রাণ দীনদার মানুষের সাথে একটি প্রতারণা। এটি সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। কিন্তু যারা পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামের চর্চা করেন, অনুসরণ করেন এবং এর বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাদের কার্যক্রমকে কিছুতেই ধর্ম বা ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার হিসেবে অভিহিত করা যায় না। ইসলামী রাজনীতির সমালোচকদের কাছে এ পার্থক্যটুকু পরিষ্কার থাকা দরকার।

যারা আধুনিক প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল ইসলামী কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের রূপরেখা সামনে নিয়ে ইসলামী আদর্শের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি গঠন, জাতি গঠন, জনমত গঠন, রাষ্ট্র গঠনের বাস্তবসম্মত কাজে সক্রিয় এবং নিজেরাও এ আদর্শের অনুসারী, যারা নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস করেন বর্তমান বিশ্বের লাঞ্ছিত মানবতা মনুষ্যত্বের পুনর্জীবিত হওয়া এরই উপর নির্ভরশীল, যারা বিশ্বাস করেন বর্তমান বিশ্বে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের দুর্দশা দুর্ভোগের অবসান একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই হতে পারে, নিশ্চিত হতে পারে মানব জাতির শান্তি ও নিরাপত্তা, তাদের কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার নামে অভিহিত করা শুধু অসামঞ্জস্যশীলই নয় বরং বিবেকবর্জিত এবং সকল ন্যায়নীতি পরিপন্থী। সেই সাথে এটি ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতারও পরিচয় বহন করে। ইসলামের ন্যূনতম মৌলিক জ্ঞান যাদের আছে তারা কোন অবস্থাতেই এ মন্তব্য করতে পারেন না।

১.১২ ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic Politics)

ইসলামী রাজনীতি তথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি একটি পবিত্র সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজ গঠনে বিশ্ব ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে আসছে এবং ভবিষ্যতেও রাখতে পারে। ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ অনন্য বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট এবং প্রচলিত গতানুগতিক রাজনীতির যাবতীয় দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণমুক্ত।

ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো এত ভারসাম্যপূর্ণ যে তা ব্যক্তি, জাতি, আন্তর্জাতিকতা সর্বপর্যায়ে সুষ্ঠু পরিবেশ পরিস্থিতি সংরক্ষণে সক্ষম।

ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১। **নৈতিকতার প্রাধান্য (Dominance of Morality) :** যে লক্ষ্য

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সমগ্র মানব জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে, সেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ইসলামী রাজনীতিতে নৈতিকতাপূর্ণ আদর্শ স্থাপনে মানুষকে বাধ্য করে। রাষ্ট্র ও সরকার, ব্যক্তি ও দল সবার ক্ষেত্রেই এ একই লক্ষ্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। এজন্যই ইসলামের রাজনৈতিক কাঠামোতে স্বার্থ নামক জিনিসটির কোন প্রভাব নেই। জনগণ ও শাসকেরা মূল্যবোধের ভিত্তিতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ফলে শাসকেরা এখানে জনগণকে শোষণ তো দূরের কথা শাসনও করেন না। বরং জনগণের (সত্যিকার অর্থে) খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, গদিকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য (মজবুত করার জন্য) সেখানে শাসকবর্গ বিন্দুমাত্রও প্রয়াসী হয় না। যদি কখনো এর ব্যতিক্রমী ভূমিকা দেখা দেয় তাহলে জনগণের সচেতন তৎপরতা তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বনে বাধ্য করে।

এ ব্যাপারে শাসক হিসেবে চতুর্থ খলীফার জীবনের দিকে ইঙ্গিত দেয়াই যথেষ্ট। তারপরও (রাজতন্ত্র ইসলামে অননুমোদিত হলেও এবং রাজা-বাদশাহদের স্বীকৃতি ইসলামে না থাকলেও) সেসব মুসলিম বাদশাহ-সুলতান, সম্রাটদের অধিকাংশের জীবনেই ইসলামের বাস্তব প্রভাবে যে গুণ বৈশিষ্ট্য, ন্যায়নীতি সচেতনতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তার নিম্নপর্যায়ের মান প্রদর্শনেও অন্য আদর্শের অতীত-বর্তমান শাসকরা ব্যর্থ হয়েছেন। খলীফা হারুনুর রশীদ, গাযী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (১১৭৪-১১৯৩), সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭), বাদশাহ নাসিরুদ্দিন (১৪৪২-১৪৫৯) তাঁদের মতো শাসকের দুর্লভ গৌরবের অধিকারী খুব কম জাতিরই আছে। হযরত উসমান (রা)-এর সময়ে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু যর গিফারীর আন্দোলনমুখী ভূমিকা, খলীফা আবু জাফর আল মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রী:) বিরুদ্ধে সুফিয়ান ছওরীর উক্তি শ্রবণ করুন, জাহির যেবরিসের আমলে শেখ মহিউদ্দিন নদভীর ভূমিকা লক্ষ্য করুন– এগুলো জনগণের নির্ভীকতার, সচেতনতার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখরতার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁরা কখনো শাসকের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করেননি। আপন অধিকার আদায়ের প্রশ্নে, অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাঁরা আন্দোলন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন ন্যায়নীতির সাথে এবং মনের মধ্যে কারো প্রতি প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করেই।

২। জনগণের আনুগত্য ও সরকারের দায়িত্বশীলতা (Obedience of citizen and responsibility of Government) : ইসলামের রাজনৈতিক কাঠামোয় আনুগত্য ও সরকারের দায়িত্বশীলতার বাঁধন এতই মজবুত

যে, এ নজির অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আনুগত্যকে এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, শাসক কমপক্ষে নামায পড়ে– এত দূর পর্যন্ত অবস্থায়ও আনুগত্য প্রত্যাহারকে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তদুপরি ইসলামের আনুগত্যের ব্যবস্থা এতই তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় যে তা অন্য যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য আদর্শ স্থানীয়। ইসলামে যে মজবুত ও কঠোর আনুগত্য ব্যবস্থা, এটি শর্তহীন এবং অন্ধ নয়, আনুগত্য দায়িত্বপূর্ণও বটে। আনুগত্যের শর্ত হলো শাসক কর্তৃক ইসলামের সীমার মধ্যে থাকা। যদি তিনি ইসলামের সীমালঙ্ঘন করেন, তাহলে তিনি আর জনগণের আনুগত্য দাবি করতে পারেন না এবং মুসলিমরাও আর তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য নয়। যদি শাসক ইসলামের সীমালঙ্ঘন করেন তাহলে তার সংশোধনের জন্য নসিহত থেকে শুরু করে বল প্রয়োগও করা যেতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে অপসারণ করা মুসলিম জনগণের ঈমানী দায়িত্ব।

এ ব্যবস্থার মূলনীতিটাকে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, "কেবলমাত্র মারূফ (ভাল) কাজেই সরকারের (প্রশাসনের) আনুগত্য অপরিহার্য। পাপাচার (মন্দ কাজে) আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারোও নেই।"

ইসলামের স্বর্ণযুগের যে দৃষ্টান্ত ও ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে তা এ ধরনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এটাও সত্য যে, এগুলো নিয়মতান্ত্রিক বাঁধন মাত্র, অন্যথায় ইসলামের স্বর্ণযুগে সরকারও যেমন দায়িত্বশীল ছিলেন, জনগণও ছিলেন অনুরূপ আনুগত্যপরায়ণ। শাসন সম্পর্কে ইসলামের আদর্শ বিশ্লেষণ ও অন্য আদর্শের সাথে তুলনা করে দেখা উচিত, "তোমাদের উত্তম নেতা হচ্ছে তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাস ও তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের কল্যাণকামী এবং তোমরাও তাদের কল্যাণকামী।[৩১] এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই আদর্শ একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা মুসলিমদের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল এবং আগামীতে মুসলিম জাতি নিজে যদি শাসকদের কল্যাণকামিতার গুণে নিজেদের অভিষিক্ত করতে পারে এবং তাদের নেতৃত্বকেও নিজেদের প্রতি কল্যাণকামীরূপে গড়ে তুলতে পারে তাহলে আবারও মুসলিমরা ইসলামের আর একটি স্বর্ণযুগ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে সক্ষম হবে।

৩। অনন্য একটি নির্বাচন নীতি ও পদ্ধতি (**Unique election code and method)** : ইসলামী রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর

---

৩১. মুসলিম শরীফ।

অনন্য নির্বাচন নীতি ও পদ্ধতি। ইসলামে ক্ষমতালিপ্সুর কোন স্থান নেই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির জন্য ক্ষমতা হারাম করা হয়েছে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সে ব্যক্তি বেশি অযোগ্য অনুপযুক্ত, যে নিজে পদমর্যাদা লাভ করার আকাঙ্ক্ষী, সেজন্য সচেষ্ট। তাই নিজেকে নেতৃত্বের জন্য পেশ করা ইসলামী নীতি বহির্ভূত। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এ বিধান ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য। অনৈসলামী সমাজে কিংবা ইসলামী আন্দোলনকারীদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও স্বার্থের জন্য কিংবা ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিহার করে চলতে হবে, তাই ইসলামে কোন ব্যক্তি নিজেকে নেতৃত্বের জন্য পেশ করেন না বলে সেখানে নির্বাচন পদ্ধতিই ভিন্নতর।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে স্ব-ইচ্ছায় কোন প্রার্থী থাকবে না। প্রত্যেক মুসলিম তার নেতৃত্বের জন্য ইসলামের নির্ধারিত সর্বাধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের জন্য নির্বাচন করবে। ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য ও নিরাপত্তার জন্য ইসলামের এ ব্যবস্থাই একমাত্র গ্যারান্টি। এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে কোন মুসলিম যখন ক্ষমতায় যাবেন বা নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন, তখন কোনভাবেই তিনি অন্যান্য রাজনীতিতে যে ধরনের ভূমিকা অবলম্বিত হয়ে থাকে সে ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করবেন না। ইসলাম মানুষের মনে আখিরাতে জবাবদিহির যে কঠিন ও বাস্তব অনুভূতি সৃষ্টি করে তার ফলে দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য মুসলিম বিন্দুমাত্র মোহগ্রস্ত হয় না। বরং সঠিকভাবে কম দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যতটুকু জবাবদিহি সে করতে পারে, ততটুকু পরিসরেই সে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। তাই সে পদের প্রতি লোভহীন অবস্থায় যদি ক্ষমতায় যায় তখন জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে সর্বাধিক দায়িত্বশীলতা সহকারে সে দায়িত্ব পালন করে।

এ বৈশিষ্ট্যেরই অপরদিক হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তিকে কোন পদের জন্য নির্বাচিত করা হয় তাহলে সে ব্যক্তির উচিত সে পদ প্রত্যাখ্যান না করে দায়িত্ব গ্রহণ করা। কারণ একজন মুসলিম সহজে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বের ঝুঁকি নিজে তার মাথায় তুলে নিতে সম্মত হবে না, যতক্ষণ তার জীবন বিধান আল ইসলামের কাছ থেকেই তার সর্বশেষ পরিণামের ব্যাপারে কিছু আশ্বাস না পায়। তাকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, তার দায়িত্বের প্রতি সামান্য অবহেলার জন্য তাকে শেষ বিচারের দিনে জবাবদিহি করতে হবে। ক্ষমতার যে রোগ মানব সভ্যতা ও সমাজকে বিপর্যস্ত করেছে, ইসলাম এমনিভাবেই তা নিরাময় ও প্রতিরোধ করে।

৪। সহনশীলতা-পারস্পরিক সহযোগিতা (Tolerence and mutual co-operation) : ইসলামী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীলতা। ইসলাম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তাই পক্ষীয় বিপক্ষীয় সকল আদর্শ ও দলের প্রচার কিংবা প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার স্বাধীনতায় ইসলাম বিশ্বাস করে। ইসলাম কোন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়। বর্তমান রাজনীতিতে একদল আর একদলের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে কিংবা এক আদর্শের অনুসারী অন্য আদর্শের অনুসারীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করে থাকে, ইসলামী রাজনীতি কোনভাবেই সে ধরনের আচরণ কিংবা ভূমিকা সমর্থন করে না। ইসলাম একটি অনৈসলামী সমাজে নিজের আদর্শ প্রচারের সর্বাধিক অধিকার রয়েছে বলে যেমন মনে করে, তেমনি ইসলামী সমাজেও অন্য আদর্শের প্রশ্নে সে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কারণ অনৈসলামী সমাজে অন্য আদর্শের জন্য ইসলাম আতংকের কারণ, কিন্তু ইসলামী সমাজে অন্য আদর্শ ইসলামের জন্য আতংকের কারণ হতে পারে না। ইসলামের সুমহান আদর্শ এবং সে আদর্শিক সমাজের জনগণ অন্য কোন আদর্শের প্রতি মোহগ্রস্ত হতে পারে এ আশঙ্কা নেই বললেই চলে– ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বই এর গ্যারান্টি। ইসলাম নিঃসন্দেহে যে কোন আদর্শিক রাষ্ট্রের চেয়ে এ ব্যাপারে অধিক উদার। তবে আদর্শ প্রচারের জন্য অপসংস্কৃতি, অপসাহিত্য, সন্ত্রাস, গুপ্ত কার্যধারা, অন্য রাষ্ট্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করাকে ইসলাম কোনভাবেই অনুমোদন করে না।

৫। দুর্বৃত্তায়নের মূলোৎপাটন (Abolition of Criminalization) : ইসলামী রাজনীতি সৎ ও নেক লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ রাজনীতিতে সৎ ও যোগ্য লোকদের কদর বেশী। যারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে এবং সৎ জীবন যাপন করে এ রাজনীতিতে তাদের মূল্য বেশী বলে দুর্বৃত্তায়নের মূলোৎপাটন সাধিত হয়। ইসলামী রাজনীতি বিজয়ী হওয়া মানে মিথ্যে জুলমাতের তখতে তাউস আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। ইসলামী রাজনীতি সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

৬। সুশৃঙ্খল রাজনীতি (Systematic/methodical Politics) : ইসলামী রাজনীতি ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ইসলামী নীতি ও আদর্শ আগাগোড়াই সুশৃঙ্খল। তাই ইসলামী রাজনীতি সুশৃঙ্খল রাজনীতি। ইসলামী রাজনীতি সংস্কার সাধন ও পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে নিবেদিত। ভাঙ্গা নয় নির্মাণ এবং উন্নতিই কাম্য।

৭। নিয়মতান্ত্রিক, আইনানুগ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী (Believe in Systematic, Constitutional, Lawful and democratic Values) : ইসলামী রাজনীতি নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সবার মতামতকে উদারচিত্তে গ্রহণ করার সক্ষমতা রয়েছে। মানুষকে জোর করে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে সত্যের সপক্ষে মতামত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করা ইসলামী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী রাজনীতি নিয়মতান্ত্রিক ও আইনানুগ পন্থায় পরিচালিত হয়। এ রাজনীতি কখনই অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালিত হয় না, আইন লঙ্ঘন করে না বা আইন হাতে তুলে নেয় না। শুধু তাই নয়, আইন লঙ্ঘনকে প্রশ্রয় দেয় না বা আইন লঙ্ঘনের জন্য উস্কানিও দেয় না। কখনও কোন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় না।

৮। ভণ্ডামী নীতি সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য (Hypocritical policy to be left in exery aspects) : ইসলামী রাজনীতিতে অসৎ, ভণ্ড লোকদের ও ভণ্ডামী নীতির কোন স্থান নেই। প্রচলিত রাজনীতিতে নীতিহীন দল ও ভণ্ড নেতৃত্ব ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এমন সব অবাস্তব ওয়াদা করে ক্ষমতায় গিয়ে যা তারা পূরণ করতে পারে না। ফলে তারা ভণ্ডামীর আশ্রয় নেয়। ইসলামী রাজনীতিতে এ ধরনের বৈপরীত্য, মুনাফেকী, ভণ্ডামী ও মিথ্যাচারের কোন স্থান নেই।

৯। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আদর্শ, কর্মসূচি, গণতন্ত্র চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতি (Transferency, Accountability, Ideology Demoertic Prectice and Intellectual Politics) : স্বচ্ছতা ইসলামী রাজনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, আখিরাতের চিন্তা ও জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি যে রাজনীতিতে সর্বদা সক্রিয় থাকে। আল্লাহই সর্বশক্তিমান এবং তাঁর নিকট সবাইকে স্বীয় কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী রাজনীতি মানুষকে এ উপলব্ধি দান করে যে, আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। সবকিছুই তাঁর জ্ঞাত। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড, তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিটি মানুষকে এ দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী রাজনীতি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কর্মসূচি ইসলামী রাজনীতিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসই হচ্ছে গণতান্ত্রিক। এজন্য ইসলামী দল কখনও অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারকে মেনে নিতে পারে না। তাদের সাথে আপোষ করতে পারে না। এ

কারণেই সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ইসলামী দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। নামাযে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির জন্য লুকমা দেয়া (ভুল ধরিয়ে দেয়া) ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হলো রাসূলের প্রতিনিধি। নামাযের ইমাম যেমন রাসূলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাদিদেরকে পালন করতে হয়, তেমনি রাসূল (সা) যে পদ্ধতিতে, যে নিয়মে রাষ্ট্র শাসন করেছেন, এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। ইসলামী রাজনীতি বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual) রাজনীতি।

১০। ইসলামী রাজনীতি আদর্শকেন্দ্রিক, সংগঠনকেন্দ্রিক (Islamic Politics is Ideology oriented, Organisation oriented) : ইসলামী রাজনীতি ইসলামী আদর্শকেন্দ্রিক ও সংগঠনকেন্দ্রিক। ইসলামী আদর্শের উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদত, ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কুরআনের শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুই হলো মানুষের সমাজে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। এজন্যই ইসলাম ও রাজনীতি একই সূত্রে গ্রথিত। ইসলামী সংগঠন বা দলই ইসলামী রাজনীতিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কর্মরত থাকে।

১১। ইতিবাচক রাজনীতি (Positive Politics) : ইসলামী রাজনীতি ইতিবাচক রাজনীতি। এ রাজনীতি ইতিবাচক পন্থায় পরিচালিত হয়। এ রাজনীতি মানব জীবনকে সার্থক করার রাজনীতি। এ রাজনীতি চরিত্র গঠনের রাজনীতি, মানুষ গড়ার রাজনীতি। ইসলামী রাজনীতি প্রকৃত অর্থেই দেশ গড়ার রাজনীতি। দেশকে এগিয়ে নেয়ার ইতিবাচক রাজনীতি। এ রাজনীতি একজন ঈমানদার মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয়। এ থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই। যার ফলে ইসলামী রাজনীতি এর সাথে সংশ্লিষ্টদের নীতিবান করে গড়ে তোলে। মানুষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করে, বিকশিত করে। ইসলামী রাজনীতি উপার্জনের অবৈধ পন্থাকে পাপ মনে করে। ইসলামী রাজনীতি শেখায় যে, দুর্নীতি মহাপাপ। দুর্নীতি মানুষের আত্মাকে বিনষ্ট করে। মানব সমাজকে লোভী বানায়। ইসলামী রাজনীতির অনুসারীরা এজন্য স্বীয় আদর্শিক উপলব্ধি এবং পরিবেশগত কারণে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকে। তারা পুলিশ ও মামলার চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা দুর্নীতিমুক্ত থাকেন। ইসলামী রাজনীতি মানুষকে দুর্নীতিমুক্ত রাখে, সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করে। সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হলে,

দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে হলে ইতিবাচক ইসলামী রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে হবে।

১২। নীতি, নৈতিকতা ও সমন্বয়ের রাজনীতি (Politics of Ethics, Morality and Co-ordination) : নীতি, নৈতিকতা ও সমন্বয় ইসলামী রাজনীতির বড় অনুসঙ্গ। ন্যায়নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ইসলামী রাজনীতির বিকল্প নেই। সংঘাত সৃষ্টি করা, ফাসাদ সৃষ্টি করা বা বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে ইসলাম কখনও অনুমোদন দেয় না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, মানুষের রক্ত, জান, মাল খুবই সম্মানের। এগুলো সবই আল্লাহর দেয়া আমানত ও রহমতও। ক্ষতি করা, ধ্বংস করা, বিনষ্ট করা সবই পাপ। বরং গঠন কর, সংহত করা, সমন্বয় করা, হেফাজত করা ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দাবি। ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিকভাবে, দলীয়ভাবে ইসলামী নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩। সৎ, যোগ্য ও নেক লোকরাই ইসলামী রাজনীতিতে মর্যাদা পান (Honest, capable and pious man are deem fit for Islamic Politics) : সৎ, যোগ্য ও নেক মানুষরা (Islamic man)ই ইসলামী রাজনীতিতে মর্যাদা পান। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা অর্থাৎ ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ন্যায়নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে, বিবেকের ভূমিকা ও সততা জোরদারকরণে ইসলামী রাজনীতির বিকল্প নেই।

১৪। ক্ষমতা, ধন ও ঐশ্বর্যকে আমানত মনে করা হয় (Power, wealth and prosperities are treated amanah in Islamic Politics) : ইসলামী রাজনীতিতে ক্ষমতা আমানত। ইসলামী আকীদা অনুযায়ী সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহরই। তিনিই সম্পদের স্রষ্টা। মানুষকে সীমিত সময়ের জন্য তিনি সম্পদের শর্তাধীন মালিক করে দিয়েছেন। সম্পদের মালিকানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। ইসলামে স্বেচ্ছাচারীভাবে কোন সম্পদ অর্জনের সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছেমত সম্পদ ব্যয় ও ভোগেরও কোন সুযোগ নেই। ইসলাম সম্পদ ভোগের একটা মানদণ্ড দিয়েছে। দুনিয়াতে সম্পদ কিভাবে অর্জন ও ভোগ ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়ে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

১৫। ঐক্য ও সংহতির রাজনীতি (Politics of unity and integrity) : ইসলামী রাজনীতি ঐক্য ও সংহতির রাজনীতি। ইসলামী রাজনীতি মানবীয় গুণাবলী আর ঐক্যের দিকগুলো জোরদার ও আকর্ষণীয় করে

সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। ইসলাম মানুষকে স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। অনৈক্য, বিভেদ, অসহিষ্ণুতা তাই এখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। একটি জনপদে ইসলামী রাজনীতি যত শক্তিশালী হবে সেখানে মানবীয় গুণাবলীর ফুলগুলো ততবেশি প্রস্ফুটিত হতে থাকবে। অহঙ্কারের পরিবর্তে বিনয় সেখানে প্রাধান্য পাবে। অপরকে উপেক্ষার পরিবর্তে আপন করে নেয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ঘৃণার পরিবর্তে সম্মানবোধ স্থান করে নেয়। ইসলামী রাজনীতি বিরোধী পক্ষকে দূরে ঠেলে দেয় না বরং কাছে টেনে নেয়। ভ্রান্ত পথযাত্রীকে সঠিক পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করে। বাক সংযত রাখে এবং সৌরভ সাদৃশ্য কর্মগুলো সকলকে মোহিত করার চেষ্টা করে। এভাবে ঐক্য-সংহতি-পরমত সহিষ্ণুতা গড়ে উঠে এবং পরস্পর স্বচ্ছন্দে সহঅবস্থান করে। তাই ইসলামী রাজনীতি আত্মকেন্দ্রিকতার অহঙ্কারের পরিবর্তে সবাইকে নিয়ে চলার উদার ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করে।

১.১৩ প্রচলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য : তুলনামূলক আলোচনা (Characteristics of Traditional Politics and Islamic Politics : Comparison)

প্রচলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা নিচে দেয়া হলো :

প্রচলিত রাজনীতি	ইসলামী রাজনীতি
১। রাজনীতি ও নৈতিকতার বিচ্ছিন্নতা।	১। নৈতিকতার প্রাধান্য।
২। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা।	২। সুশৃঙ্খল রাজনীতি।
৩। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতি।	৩। অনন্য একটি নির্বাচন নীতি ও পদ্ধতি।
৪। হিংসা, বিদ্বেষ, অসহনশীলতা-অরাজনৈতিক, অগণতান্ত্রিক আচরণ।	৪। সহনশীলতা-পারস্পরিক সহমর্মিতা।
৫। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন।	৫। দুর্বৃত্তায়নের মূলোৎপাটন।
৬। জবাবদিহিতা না থাকা বা জবাবদিহিতার অভাব।	৬। জনগণের আনুগত্য ও সরকারের দায়িত্বশীলতা।
৭। প্রতারণা ও ধূর্তামির রাজনীতি/ শিয়াল রাজনীতি।	৭। ভণ্ডামী নীতি সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

৮। পারস্পরিক দোষারোপ, প্রতিহিংসা, সংঘাত-সংঘর্ষ, বিভাজনের রাজনীতি।	৮। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আদর্শ, কর্মসূচি, গণতন্ত্র চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতি।
৯। রাজনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক।	৯। রাজনীতি আদর্শকেন্দ্রিক, সংগঠনকেন্দ্রিক।
১০। নেতিবাচক রাজনীতি।	১০। ইতিবাচক রাজনীতি।
১১। সংঘাত ও নীতিহীনতার রাজনীতি।	১১। নীতি, নৈতিকতা ও সমন্বয়ের রাজনীতি।
১২। তোষামোদকারী, মতলববাজ, ফন্দিফিকির আঁটায় অভ্যস্তদের ভিড়।	১২। সৎ, যোগ্য ও নেক লোকেরাই এ রাজনীতিতে মর্যাদা পান।
১৩। ক্ষমতা, ধন ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ।	১৩। ক্ষমতা, ধন ও ঐশ্বর্যকে আমানত মনে করা হয়।
১৪। দলীয় গণতন্ত্রের অভাব-বিষাক্ত পরিস্থিতি।	১৪। দলে গণতন্ত্রের অব্যাহত চর্চা, নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী।
১৫। কলহ-কোন্দলের রাজনীতি।	১৫। ঐক্য ও সংহতির রাজনীতি।

১.১৪ বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি/ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে আপত্তি ও তার জবাব (Objections regarding Islamic Polities/Religion Oriented Politics by the Secularist and resporese there of)

বাংলাদেশে ইদানিং কোন কোন মহল থেকে দাবি উঠেছে যে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তথা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হোক। এ দর্শন নতুন কিছু নয়। যারা আদর্শিক ও জনসমর্থনের দেউলিয়াত্বে ভুগছে তারাই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার এ দাবিতে। যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের দাবি জানাচ্ছে তাদের যুক্তি প্রধানত তিনটি। যেমন–

১. প্রথম যুক্তি– একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৭৫ পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির যোগসাজসে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বিনষ্ট করা হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনিবার্য দাবি হচ্ছে ইসলামী রাজনীতি বা ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধকরণ।

প্রথম যুক্তির পর্যালোচনা– বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রধান দল আওয়ামী লীগ জন্ম থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জনগণের সামনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কোন পরিকল্পনা পেশ করেনি। বরং বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভাষায় জনগণকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর কুশাসন ও আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কিছু নয় বরং তারা ক্ষমতায় গেলে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাশ করবেন না। তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকেও গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিবেন বলে ঘোষণা দেন। জনগণ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টকে[৩২], ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক মুক্তির আশায়, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রত্যাশায়। জনগণের কাছে কোনক্রমেই ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ভোট চাওয়া হয়নি বরং বিপরীত কথাই বলা হয়েছে। কাজেই এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে রয়েছে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়াস। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, আওয়ামী লীগের ৬ দফায়[৩৩] তাই বিধৃত হয়েছে। মতাদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা সেখানে ছিল না। এসব পরবর্তীতে সংযোজন ও আরোপের ফলমাত্র।[৩৪] ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করা

---

৩২. ১৯৫৩ সালের ৫ 'ডিসেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীতে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়), নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে রাব্বানী পার্টি মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফায় উপরে মোটা হরফে লিখা ছিল, 'কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হবে। দেখুন মাহমুদ উল্লাহ (সম্পা.) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, খণ্ড-১, পৃ. ২১৬-২২।

৩৩. ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং এই কর্মসূচির ভিত্তিতে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। ৬ দফার কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা ছিল না। শুধু তাই নয় নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারিত প্রচারপত্র কিংবা দলীয় প্রধানের রেডিও-টিভির ভাষণের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল না। বিস্তারিত দেখুন মাহমুদ উল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০-৩৩৩, ৩৪৫-৩৪৭।

৩৪. আহমদ আবদুল কাদের, বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা (প্রবন্ধ), ইসলামী রাজনীতি সংকলন, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা জানুয়ারী ২০০৮, পৃ. ৩৩।

হয়েছে দেশের সাধারণ জনগণের মনোভাবকে সামনে রেখে। পরবর্তী ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বা ইসলামী রাজনীতি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বকীয়তার পক্ষের রাজনীতি।

২. দ্বিতীয় যুক্তি– ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সন্ত্রাসী রাজনীতির জন্ম দেয়। কাজেই সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয় যুক্তির পর্যালোচনা– বাংলাদেশে সন্ত্রাসী রাজনীতির জন্ম দেন ভারতের চারু মজুমদার প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল উগ্র বামপন্থী গোষ্ঠী। ইদানিংকালে ইসলামের নামধারী কিছু মহল সন্ত্রাস চর্চা করছে অনেকটা অচেতনভাবেই ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার বিশ্বব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে। বাংলাদেশে এসব গোষ্ঠীর উত্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন দেশের ধর্মীয় মহল ও ইসলামী আন্দোলন। দেশের আলেম উলামার সম্মিলিত ভূমিকার কারণেই এ প্রবণতা প্রতিরোধ করা গেছে। কাজেই বলা যায় যে ইসলামী রাজনীতি যারা করেন তারা নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতা ও রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ইসলামে যেমন সন্ত্রাসের স্থান নেই তেমনি কোন ইসলামী রাজনৈতিক দলও সন্ত্রাসী হওয়ার সুযোগ নেই। বিশ শতকে সন্ত্রাস চর্চা করেছে উগ্র বামপন্থীরা। তাদের দেখাদেখি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু কিছু এডভাঞ্চারিস্ট মনোভাবাপন্ন যুবকও এ পথে এগিয়ে আসে, কিন্তু মূলধারার ইসলামী মহল বরাবরই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। কাজেই ইসলামী রাজনীতি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে না বরং সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধ করে। তারপরেও যারা ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের লেভেল এঁটে দিতে চায় তারা মূলত বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী-নব্য উপনিবেশবাদী শক্তির লেজুড় ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এ লেভেল লাগানোর কাজটি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী শক্তিই করে যাচ্ছে।

৩. তৃতীয় যুক্তি– ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বা ইসলামী রাজনীতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই অপর নাম। কাজেই সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

তৃতীয় যুক্তির পর্যালোচনা– ইসলাম সম্পর্কে খানিকটা জ্ঞান থাকলেও এ অভিযোগ কেউ করতে পারতেন না। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে কোন সম্প্রদায় যখন অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোন প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালায়, তাদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের অন্যায়ভাবে বিরোধিতা করে। যখন এক সম্প্রদায়কে

আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়, নিছক সাম্প্রদায়িক কারণেই তাদের অধিকার বিনষ্ট করা হয়, তাদের জান-মালে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হয় তখনই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থে ও অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করা, তাদের উন্নয়নের জন্য তৎপরতা চালানো সাম্প্রদায়িকতা হতে পারে না যদি না সে তৎপরতা অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হয়। কাজেই নীতিগতভাবে ইসলামী রাজনীতি যারা করেন তারা সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের কল্যাণের রাজনীতি করেন। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন অবকাশ নেই। তদুপরি বিগত কয়েক শত বছর ধরে ধর্মের যারা চর্চা করেন তাদের দ্বারা কোন সাম্প্রদায়িকতার ঘটনা ঘটেছে এমন এটি প্রমাণও ইতিহাসে নেই। বরং ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মহীন রাজনীতির ধ্বজাধারীরাই সাম্প্রদায়িক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছে এবং প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাঁধিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বাম চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই। ধর্মীয় তত্ত্ব এবং আচার আচরণকে ভিত্তি করে যে সমাজ ও সম্প্রদায় গঠিত হয় সে সম্প্রদায়ের ঐহিক স্বার্থই সাম্প্রদায়িকতার জনক। সাম্প্রদায়িকতার জন্য তাই ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাম্প্রদায়িকতা এ অর্থে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ।'[৩৫] তাই 'ধর্ম চর্চা করা এবং ধর্মকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এ দুই মনোবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য আছে এবং যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তার ক্ষেত্রেই এ প্রভেদকে স্বীকার করা প্রয়োজন।[৩৬] কাজেই ইসলামী রাজনীতি নয় বরং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিই সাম্প্রদায়িকতার উৎস। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী রাজনীতি কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে না বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশই সৃষ্টি করে। ইসলামী রাজনীতি সব ধর্মের লোকেরই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে। ইসলামী রাজনীতি তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাজনীতি।

১.১৫ বাংলাদেশে রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা (Misconception about Politics in Bangladesh)

বাংলাদেশে রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

১। ইসলাম সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞানের অভাবে ধার্মিকদের মধ্যেও আজ এমন লোক দেখা যায়, যারা দীনদার ও পরহেযগার বলে সমাজে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও

---

৩৫. বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৯।

৩৬. বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

রাজনীতি করাকে নিন্দনীয় বলে মনে করেন অথবা অন্ততপক্ষে অপছন্দ করেন। এরা দেশের রাজনীতি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখাকে দীনদারী ও তাকওয়ার জন্য জরুরী মনে করেন। মহানবী (সা) এর উপর বর্ণিত দায়িত্ব পালন করার জন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে অপরিহার্য ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত। রাজনীতির চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছতে পারলে তিনি ইসলামকে বিজয়ী দীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমই হতেন না। বর্তমান যুগে কেউ যদি দীন ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে রাজনীতির পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তার আর কোন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নেই।

২। দীনদারদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যারা মনে করেন যে ইসলামপন্থীদের যারা রাজনীতির অঙ্গনে সক্রিয় তারা ক্ষমতালোভী। অথচ রাজনীতি সম্পর্কে ক্ষমতাকেন্দ্রিক কল্পনা সংকীর্ণ ও বিভ্রান্তিমূলক। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিছক কোন রাজনীতি নয়– এটি হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে নামায ও রোযার মতোই একটি ফরয ইবাদত। তাওহীদে বিশ্বাসী কারও পক্ষে এই ফরয ইবাদত থেকে দূরে থাকার বা উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই। আল কুরআনে যারা এই প্রচেষ্টায় নিয়ত রত রয়েছেন তাদেরকে– 'আনসারুল্লাহ'- আল্লাহর সাহায্যকারী (৬১ : সূরা আস সাফ : ১৪) হিসেবে খেতাব দেয়া হয়েছে।

৩। সব লোককে ভাল না করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে এক শ্রেণীর দীনদার মানুষেরা অযথা কাজ বলে মনে করেন। তাদের অভিমত হচ্ছে, সব লোক ভাল হয়ে গেলে আপনাআপনিই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছয় শ'র বেশি ছিল না।

৪। বহু নামাযী, রোযাদার, দীনদার মুসলমান ইসলামী রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে সেক্যুলার দলের পক্ষে ভোট দিয়ে স্বচ্ছন্দবোধ করেন।

৫। একশ্রেণীর মানুষ পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন দর্শনের অনুসারী হওয়ার ফলে ইসলামকে হিন্দুবাদ এবং খ্রিস্টবাদের মত এক অনুষ্ঠান সর্বস্ব, পূজা পার্বণ বিশিষ্ট ধর্মমত বলে মনে করেন। তাদের বিশ্বাস মোতাবেক ধর্ম রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। তাদের মতে ইসলাম একটি ধর্ম মাত্র। আর ধর্মের সম্পর্ক মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এরা নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর অনুসারী। ইতালির নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী রেনেসাঁর যুগে রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে

ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম ও নৈতিকতা অনুসরণ করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রকে তার উর্ধ্বে থাকতে হবে। ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী নীতির প্রবক্তা নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী আরো বলেন, অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছু মাত্র উপকারী হয়, তবে তা করতে কোন বাধা নেই। ম্যাকিয়াভেলীর এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেক্যুলারিজম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ধারণাকে সমর্থন দিয়েছেন ইংরেজ দার্শনিক থমাস হবস (১৫৮৮-১৬৬৯ খ্রী:)। তাঁর মতে, একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনটাই থাকবে ক্ষমতার বেপরোয়া অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

৬। অনেকে আছেন যারা এতটুকু খবর রাখেন যে, মহানবী (সা) রাষ্ট্রশাসন করেছেন। তাদেরও অনেকের মনে পাশ্চাত্য সৃষ্ট এ ভ্রান্ত ধারণা বাসা বেঁধে আছে যে, তৎকালীন সহজ সরল জীবনযাত্রায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর ছিল আজকের জটিল জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে সে ব্যবস্থা সক্ষম নয়। ইসলাম সম্পর্কে মহানবী (সা) প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে এসব লোকের অজ্ঞতা এমন পর্যায়ে যে, তাদের অনেকে মনে করেন, ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্র কায়েম হলে বিমান ও ট্রেনের পরিবর্তে উটে চড়তে হবে এবং জঙ্গী বিমান, বোমা, কামান ও ক্ষেপণাস্ত্রের পরিবর্তে তলোয়ার, তীর, ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। তাই ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কথা শুনলে তারা পশ্চাৎগমনের ভয়ে আৎকে উঠেন। অবশ্য মুসলিম সমাজের অজ্ঞ-মূর্খ অংশের কতক তথাকথিত ধর্মপরায়ণ লোক আধুনিক জীবনের নির্দোষ উপায় উপকরণেরও বিরোধিতা করে উক্ত ধারণাকে বদ্ধমূল হতে সহায়তা করছে।

১.১৬ মহানবী (সা)-এর রাজনীতি (Politics of Prophet Sm.)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবী (সা)-কে যে বিরাট দায়িত্বসহ পাঠিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে তাঁকে রাজনীতি করতে হয়েছিল। নবী হিসেবে তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপ লিপ্ত হয়েছিলেন। তাই রাজনীতি করা ইসলামেরই তাগিদ। মহানবী (সা)-কে যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং আল্লাহ পাক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন :

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ - وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

"হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহূ বিলহুদা ওয়া দীনিল হাককি লিইয়ুজহিরাহূ আলাদ্দীনি কুল্লিহী ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহীদা।)

অর্থ : "তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও হক দীনসহ পাঠিয়েছেন। যাতে আর সব তন্ত্রমন্ত্রের উপর দীন-এ হককে বিজয়ী করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাকের সাক্ষীই যথেষ্ট।"[৩৭]

এ আয়াতের শেষ অংশটুকু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে প্রধানত কোন কাজ করার যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশি কারো পক্ষে জানবার উপায় নেই। সুতরাং এ বিষয়ে অন্য কারো সাক্ষ্যই গ্রাহ্য নয়, আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

বস্তুত দীন ইসলাম রূপ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানটিকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই মহানবী (সা)-এর প্রধান দায়িত্ব ছিল। দীন ইসলামকে মানব সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা ব্যতীত বিজয়ী করার কোন উপায় নেই। তাই ইসলামকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করাই মহানবী (সা)-এর মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি যখন যা কিছু করেছেন একমাত্র সে লক্ষ্যে পৌছার জন্যই করেছেন এবং সে চরম লক্ষ্যে পৌছবার উদ্দেশ্যেই একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেন। কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest) এ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। আরবের প্রচলিত সমাজকে সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দেয়ার জন্য মহানবী (সা)-কে আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে এক বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতে হয় এবং দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম চেষ্টায় সে বিপ্লব সফল হয়।

মহানবী (সা) যে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তাতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ অপরিহার্য ছিল। একটি দেশের শাসন কর্তৃত্ব যদি অনৈসলামিক লোকদের হাতে থাকে তাহলে ইসলাম একটি বিজয়ী শক্তি (আদর্শ) হিসেবে কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায় না। তাই ইসলামী আদর্শের বিজয় মানেই নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রচেষ্টাই চরম রাজনীতি, আর এ রাজনীতিই মহানবী (সা) সর্বশক্তি দিয়ে করেছিলেন।

রাজনীতিকে যারা দীনদারীর খেলাফ মনে করেন তাদের কারণেই আজ অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, যার ফলে অবিচার, অনাচার, সুবিধাবাদিতা নাগরিক জীবনকে প্রতিনিয়ত অশান্তির দিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

---

৩৭. ৪৮ : সূরা আল ফাতহ : ২৮ আয়াত

বিশ্বকবি ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) এ কথাই প্রকাশ করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'বাবে জিবরীল' গ্রন্থে 'দুনিয়া ও সিয়াসত' শীর্ষক কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তিতে :

"জালালে বাদশাহী হো ইয়া জমহুরী তামাশা হো

জুদা হো দীন সিয়াসত সে তো রাহজাতি হ্যায় চেংগিজী।"

অর্থ : শাহানশাহীর দাপট হোক বা গণতন্ত্রের প্রহসন

রাজনীতি থেকে ধর্ম আলাদা করলে বাকী থাকে চেংগিজী বর্বরতা।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম ও জরুরি সম্পর্কের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বাবে জিবরীল গ্রন্থে আল্লামা ইকবাল লিখেছেন :

ধর্ম ও রাষ্ট্র যেদিন হলো স্বতন্ত্র সর্বত্র

কায়েম হলো লালসার আধিপত্য।

রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়েই হলো ব্যর্থতার সূচনা,

এই পৃথকিকরণ হলো সভ্যতার অদূরদর্শিতার প্রমাণ।

ইকবালের মতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই বিচ্ছিন্নতা ও দ্বৈতবাদ মানবতার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই ভুল মতাদর্শের গোলক ধাঁ ধাঁ হতে বিশ্বমানবতাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই দ্বৈতবাদকে চূর্ণ করে মানব জীবনের স্বাভাবিক একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং রাষ্ট্রশক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধকে পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে দিয়েছে।

মহানবী (সা) প্রচারিত ইসলাম একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আদর্শ মাত্র নয় বরং একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থারও প্রতীক। ইসলাম ধর্মীয় রাজনৈতিক (Religio-Political) আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং তাতে ধর্ম হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান ও রাজনীতির উৎস হচ্ছে ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন এবং মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ। আল্লামা ইকবালের মতে, ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য। এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য, আর এদের পারস্পরিক বিরোধের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস। তিনি বলেন, "Islam as a polity, is only a practical means of making this principle (Tawhid). a living factor in the intelectual and emotional life of mankind. It demands loyalty to Allah and not to thrones. And since Allah is

ultimate spiritual basis of all life, loyalty to Allah actually amounts to man's loyalty to his own ideal nature."[৩৮]

অর্থাৎ এ নীতিকে (আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদ) মানুষের চিন্তাজগতে ও ভাবজগতে জীবন্ত রূপ দেয়াই কার্যত ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কাজ। ইসলাম দাবি করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য, কোন সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। আর যেহেতু আল্লাহই সমগ্র জীবজগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল ভিত্তি, তাই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বস্তুত মানুষের আপন আদর্শ প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যের নামান্তর।

ইসলাম এমন একটি রাজনীতি ও রাজনৈতিক শক্তির কথা বলে যেখানে কেবলমাত্র এক ও অবিভাজ্য সত্তার ইবাদতের কথা বলা হয় এবং তা ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়গত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পর্যন্ত ব্যাপৃত। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর উইলফ্রেড সি. স্মিথ মহানবী (সা)-এর রাজনীতি প্রসঙ্গে বলেন, "Infact, Islam is characterized among the religions by the particular emphasis which it has from the beginning given to the social order. The Prophet Muhammed (Sm) not only preached ethics, he organised a state... . That state was organised in accordance with Allah's revelation; it prospered and expanded and Islam as a process in human history was launched on its career. That career has continued until today."[৩৯]

মহানবী (সা) প্রদর্শিত রাজনীতি ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন সাদৃশ্য নেই। ইসলামে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের কোন স্থান নেই। ইসলামী রাষ্ট্র একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র, তবে তা আধুনিক সংবিধানের মত নয়, যার ব্যাখ্যা পার্লামেন্ট বা জনপ্রতিনিধিরা দিয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনীতি ও সংবিধানের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহতে বিধৃত যার কোন পরিবর্তন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক আইন প্রণয়নের মালিক মহান স্রষ্টা। মহানবী (সা)-এর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ ধর্মীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন মান্য করে।

---

৩৮. ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, দি রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম, ঢাকা, ১৯৮১।

৩৯. Wilfred C. Smith, Pakistan as an Islamic State, Lahore 1951.

বস্তুত রাজনীতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা শরীয়াতের স্বাভাবিক দাবি ও প্রবণতা। ইতিহাস প্রমাণ করে যে হযরত মুহাম্মদ (সা) এমনি একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মক্কা শরীফে থাকা অবস্থায়ই বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মদীনার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল (পুরুষ ও নারী ৭৩ জন) মক্কা শরীফে গোপনে মহানবী (সা)-এর সাথে এক সভায় মিলিত হয়ে একটি সুস্পষ্ট চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলেন যা 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ' নামে পরিচিত। এ চুক্তিতে তারা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রাসূল (সা)-এর উপর অর্পণ করে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। তারা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের কথা দিয়েছিলেন। তারা রাসূল (সা)-কে সাহায্য করা ও প্রতিরক্ষায় পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটিই ছিল মহানবী (সা)-এর রাজনীতি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। রাজনীতিবিদ মহানবী (সা) ছিলেন মদীনা রাষ্ট্রের নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান।

বস্তুত ইসলামী আইন ও অনুশাসন কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮) বলেছেন, জনগণের যাবতীয় বিষয় নিষ্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দীনের সর্বপ্রধান কর্তব্য। বরং রাষ্ট্র ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠাই হতে পারে না। আল্লাহ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এভাবে জিহাদ, ইনসাফ ও আইনের শাসন প্রভৃতি যেসব কাজ আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন তা রাষ্ট্র শক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যতীত কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না।[৪০]

এজন্যই মহানবী (সা) হিজরতের পর মদীনা সনদের (The Charter of Medina) মাধ্যমে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর রাজনীতি সফল হয়। মদীনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান (First written constitution of the world)। মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহানবী (সা) শতধা বিভক্ত আরববাসীদের আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে এনে তাদের পরিণত করেন এক মহাশক্তিশালী জাতিতে। মহানবী (সা) মদীনায় একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন। আরব উপদ্বীপকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে যোগ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিচারক নিয়োগ করেন। তিনি মসজিদে নববীতে বসে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান বিচারপতির যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন। আল কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক

---

৪০. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, সিয়াসতে শরীয়াহ উদ্ধৃত ড. আবদুল করিম জায়দান, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত, ইফসু প্রকাশনা, ১৯৮২, পৃঃ ৩।

বিশিষ্ট সাহাবীগণের পরামর্শ সভার মাধ্যমে তিনি মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। এভাবে মহানবী (সা) এক সুন্দর শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেন। এজন্যই ধর্ম ও রাজনীতির আদর্শিক সম্পৃক্ততার বড় উদাহরণ হচ্ছেন মহানবী (সা)। মদীনায় হিজরতের পর তিনি ক্ষমতা সম্পর্কের পুনর্গঠন করে আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেছেন। মদীনায় ইসলামের প্রথম রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যা রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক প্রধান ছিলেন মহানবী (সা)। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন, নামাযের ইমামতি করতেন, প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতেন এবং জন-নীতি নির্ধারণ করতেন। পণ্ডিতদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সকল মুসলমানের গ্রহণ ও অনুসরণের জন্য আদর্শস্বরূপ।

১.১৭ মহানবীর(সা) রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য (Fundamental Characteristics of Prophets (Sm.) Politics)

মহানবী (সা)-এর রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

১। চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি (Power of charecter and morality : মহানবী (সা)-এর রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি। তাঁর রাজনীতিতে নিঃস্বার্থকতা ও নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল ছিল। এজন্যই তাঁর বিরুদ্ধে কোন সস্তা শ্লোগান কার্যকরী হয়নি। তাঁর নিঃস্বার্থ চরিত্রের প্রভাবকে খোদাদ্রোহীরা শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারেনি।

২। উপায়-উপকরণের পবিত্রতা (Purities of ways and means) : মহানবী (সা)-এর রাজনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল উপায়-উপকরণের পবিত্রতা। তিনি কোন অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করেননি। তাঁর রাজনৈতিক দুশমনদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশও পোষণ করতেন না। কঠিন রাজনৈতিক শত্রুও যদি ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজী হত, তাহলে তিনি তাদের পূর্বের সব দোষ মাফ করে দিতেন।

৩। উদ্দেশ্যের পবিত্রতা (Purities of aims and objectives) : মহানবী (সা)-এর রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উদ্দেশ্যের পবিত্রতা।

ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য ছিল। ব্যক্তিগত ইমেজ প্রতিষ্ঠা যদি তাঁর উদ্দেশ্য হত তাহলে আন্দোলনের শুরুতেই তিনি মক্কার নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব মেনে নিতেন।[৪১]

চারিত্রিক পবিত্রতা, উপায় ও পন্থার পবিত্রতা এবং উদ্দেশ্যের পবিত্রতা– এ তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যই মহানবী (সা)-এর রাজনীতিকে স্বার্থপর ও দুনিয়াদারদের রাজনীতি থেকে পৃথক মর্যাদা দান করেছে। যদি কেউ এ যুগেও ইসলামী রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য সংগ্রাম করতে চায় তাহলে মহানবী (সা)-এর এ তিনটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। আর এ রাজনীতি মুসলমানদের জন্য প্রধানতম ফরয।

বস্তুতঃ ইসলামী রাজনীতি তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হচ্ছে জনতার আন্দোলন, গণমানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সমাজ থেকে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীদের অপসারণ করে আল্লাহর দাসত্ব ও মহানবী (সা)-এর নেতৃত্বের ভিত্তিতে গণমানুষের শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

১.১৮ ইসলামী রাজনীতির বিরোধিতা কারা করেন (Those Who oppose Islamic Politics)

ইসলামী রাজনীতির বিরোধিতা অনেকেই করেন। তাদের পরিচয় নিম্নরূপ :

১। বস্তুবাদে বিশ্বাসী নাস্তিক গোষ্ঠী।

২। ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ।

৩। অনৈসলামী সরকার।

৪। তাগুতী শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী।

৫। ধর্মবিরোধী সমাজতন্ত্রী, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট শক্তি।

৬। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গোষ্ঠী।

৭। রাজনীতি নিরপেক্ষ ধার্মিক গোষ্ঠী।

৮। ধর্ম ব্যবসায়ী মহল।

৯। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সুবিধাবাদী এলিট সম্প্রদায়।

---

৪১. প্রফেসর গোলাম আযম, বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি, বই কিতাব প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ১৯৭৬, পৃঃ ১৭।

১০। সুবিধাবাদী ও নৈতিকতা বর্জিত সংস্কৃতিসেবী।

১১। সেনাবাহিনী, আমলা ব্যবস্থা ও পুঁজি মালিকদের স্বার্থ আঁতাত।

১২। সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী, নব্যউপনিবেশবাদী শক্তির বিরোধিতা।

১৩। মুসলিম নামধারী স্বার্থান্ধ মানুষ তিনটি কারণে বিরোধিতা করেন।

ক. দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব।

খ. কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের মোহ।

গ. ইসলাম বিরোধী পরাশক্তির ক্রীড়নক হিসেবে নিযুক্তি লাভ।

১.১৯ আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণ (Reasons behind misconceptions about Islamic Politics among the modern educated persons)

আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণসমূহ হচ্ছে :

১। পশ্চিমা রাজনৈতিক বিশ্বাস (Western political beliefs).

২। ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ (The division between politics and religion).

৩। সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ (Secular nationalism).

৪। আমেরিকান আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রভাব (American modernization buffs); এ তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, উন্নয়নের বিরোধী। অথচ চলমান আমেরিকান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়ে ইসলাম মৌলিকভাবে শ্রেষ্ঠ এবং গোটা মানব জাতির দুঃখকষ্ট লাঘবে ও উন্নয়ন আধুনিকীকরণে ইসলামী সমাধান অনন্য।

৫। ইসলাম সম্পর্কে তাদের লজ্জাজনক অজ্ঞতা– এ কারণটি জ্ঞানগত। তারা ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা অনেক লেখাপড়া করেছেন, অনেক ডিগ্রী নিয়েছেন, কিন্তু নিজেদের ধর্ম গ্রন্থ আল কুরআন ভাল করে পড়েননি, কুরআনে আল্লাহ কি বলেছেন, হাদীসে মহানবী (সা) কি বলেছেন, তা বুঝে পড়ে জেনে নেয়ার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবার মূলে মানুষের অজ্ঞতাই তাদের বড় শত্রু।

১.২০ রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ইসলাম (Political Power and Islam)

প্রখ্যাত ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ খুররম মুরাদের মতে, "Power in Islam is that power which flows from becoming and remaining absolutely powerless before the all powerful."[৪২]

বার্ট্রান্ড রাসেলের 'Critical Essays' গ্রন্থে 'ক্ষমতা' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। এ প্রবন্ধে রাসেল বলেছেন, "রাজনৈতিক ক্ষমতা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া; ব্যক্তি নেতৃত্ব যেমন এর শুরু নয়, ব্যক্তিতে তেমন এর শেষও নয়।" যে ক্ষমতা সীমা থেকে অসীমে না গিয়ে সীমার মধ্যে থাকা অবস্থাতেই হাতবদল ঘটায়, তাকেই রাসেল অব্যাহত ক্ষমতা বলেছেন।

রাসেল ক্ষমতাকে (Power) তুলনা করেছেন প্রভাবের (Influence) সাথে। কর্তৃত্ব (Authority) এবং কৃতিত্ব (Indulgence) যেমন ক্ষমতা বৃক্ষের দুই শাখা তেমনি আনুগত্য (Loyalty) এবং শ্রদ্ধা (Affection) ও ক্ষমতার অপর দুই শাখা। প্রাচীন যুগে এরিস্টটল যেমন কঠোরতার উপর জোর দিয়েছিলেন, এ যুগে ম্যাকাইভার বা লাস্কি তেমনি সমধিক গুরুত্ব দান করেছেন দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতার উপর।

১.২১ রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি (Islamic concept about Political Power)

ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কিংবা জনগণের সেবা ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করার চিন্তা ও প্রচেষ্টা চালানো অন্যায় কিছু নয়। আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস সালামগণ এ চেষ্টাই করেছেন। সম্ভবত এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে, একটি ছোট আইন থেকে শুরু করে একটি পূর্ণ জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্য শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োজন, তা রাষ্ট্র এবং একমাত্র রাষ্ট্রশক্তিরই আছে। ইসলাম একটি জীবন বিধান হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিষ্ঠার দাবি করে। তাই দীনকে বিজয়ী করার জন্য তার বিপ্লবী কর্মকৌশলের লক্ষ্য হলো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত ও পূর্বশর্ত পূরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতাকে ইসলামের প্রয়োগ কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা।

"ইসলাম অন্য কোন জীবন বিধানের অধীনে বেঁচে থাকার জন্য আসেনি। কারণ কোন জীবনব্যবস্থাই অন্য কোন জীবন বিধানের অধীনে বেঁচে থাকতে ও উন্নতি

---

৪২. খুররম মুরাদ, Power and Islam. The Universal message, মে ১৯৮৬।

লাভ করতে পারে না।... ইসলাম কাউকে এ অনুমতি দেয় না যে, সে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে হবে একজন মুসলিম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হবে একজন সমাজতন্ত্রী বা কম্যুউনিস্ট, রাজনৈতিক ব্যাপারে হবে একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী গণতন্ত্রী এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে হবে একজন ভোগবাদী।"[৪৩]

উপরের কথাকে মেনে নিয়ে যদি বলতে হয় যে, মুসলিমকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও মুসলিম হতে হবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও হতে হবে মুসলিম, তাহলে এ একটি কথাই ক্ষমতা সম্পর্কে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতিরেকে ইসলামের ব্যবহারিক কোন মূল্য নেই। ইসলাম প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখা কিংবা কোটি কোটি পুস্তকে সুন্দর ভাষায় লিখিত থাকা অথবা শ্লোগানে উচ্চারিত হওয়ার জিনিস নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এর অনিবার্য দাবি।

১.২২ রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণ (Causes of positive outlook of Islam regarding political power)

রাজনীতি শাসন ক্ষমতা লাভের প্রক্রিয়া। রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে এজন্য ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

১। **অসৎ নেতৃত্বের অপসারণ, সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা** (Elimination of dishonest leadership and establishment of honest one) : মানবজীবনে শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা এবং ভাঙ্গন, বিপর্যয়, অধঃপতন একান্তভাবে নির্ভর করে মানব সমাজের যাবতীয় ব্যাপারের কর্তৃত্ব ও চাবিকাঠি কার হাতে নিবদ্ধ এ প্রশ্নের উপর। সাধারণ জনসমষ্টির জীবনধারা হবে নেতৃত্বের অনুসারী।

"ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় মানব সমাজের সার্বিক দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ মুসীবতের মূলীভূত কারণ হলো মানুষের উপর ফাসিক, আল্লাহ্ বিমুখ পাপী, অসৎ লোকদের নেতৃত্ব।" দুনিয়ার সমস্যার এ গোড়ার কারণ অনুধাবনে ব্যর্থতার জন্যই মানুষের সমস্যার যে সমাধান সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদরা দিচ্ছেন তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তাঁরা সুচিকিৎসক

৪৩. প্রফেসর গোলাম আযম, আধুনিক পরিবেশে ইসলাম, পৃঃ ১৭।

হিসেবে রোগ বিশ্লেষণ ও নির্ণয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাঁরা চামড়ায় কোন রোগ দেখে মলম লাগানোর নির্দেশ দেন অথচ রোগ থাকতে পারে রক্তে অথবা অন্য কোথাও।

দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার মূলীভূত এ কারণ নির্ধারণের উপর নির্ভর করছে সত্যিকার সমাধান। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস কিংবা ভয় করে না, পরকালীন জীবনের অস্তিত্বে সন্দিহান অথবা অস্বীকারকারী তাদের কাছ থেকে মানব জাতি সৎ মানসিকতা আর দায়িত্বশীলতা আশা করতে পারে না। নিজের ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য অসদুপায় অবলম্বন কিংবা অন্যায়- নিপীড়নমূলক কোন পন্থা থেকে কিসের ভয়ে, কোন্ চেতনায় তারা বিরত থাকতে পারে, যেখানে ক্ষমতাই তাদের হাতে নিবদ্ধ? আল্লাহভীতি আর পরকালীন জীবনে জবাবদিহির ভয় ব্যতিরেকে আর কোন জিনিস মানুষকে ক্ষমতার অপব্যবহার, যুলুম, নির্যাতনমূলক কর্মপন্থা, মানব ধ্বংসকারী পন্থা আবিষ্কার, অন্যদের অধিকার হরণ, অপরের স্বাধীনতা হরণ কিংবা হস্তক্ষেপ, অন্য ব্যক্তি, দল কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারে? আল্লাহর ভয়শূন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে মানুষ কিভাবে আশা করতে পারে যে, তারা সময় রক্ষায়, ওয়াদা পালনে, আমানতদারী, বিশ্বস্ততায়, ন্যায়নীতিতে নিজেদের সচেতন রাখবেন এবং মজুদদারী, কালোবাজারী, চোরাচালান, ফটকাবাজারী, মুনাফাখোরী, প্রতারণা, ধাপ্পাবাজি, টেন্ডারবাজি, আত্মসাৎ, ঘুষ, সুদ থেকে তারা দূরে সরে থাকবেন। সুতরাং প্রকৃত সমস্যা হলো অসৎ নেতৃত্বের সমস্যা। মানব জীবনের সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলামের প্রথম কর্মসূচি হলো অসৎ নেতৃত্বের অপসারণ।

আর অসৎ নেতৃত্বের অপসারণের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হলো রাষ্ট্র শক্তিতে সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। এ দু'টি কাজ যুগপৎভাবে দাবি করে যে, রাষ্ট্রক্ষমতা অবশ্যই সৎ লোকদের দ্বারা পরিচালিত হবে। 'সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা' দীন ইসলামের মূল লক্ষ্য হিসেবে ইসলামী বিপ্লবের কর্মকৌশল রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অসৎ নেতৃত্ব উৎখাতের মাধ্যমে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির মধ্যে আবর্তিত। রাসূল (সা)-এর নবুয়তী যিন্দেগী এ কারণের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। মক্কাতে তিনি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন, লোক তৈরি করেছেন, মদীনাতে হিজরত করে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁর বিপ্লবের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন করেছেন। যদি তিনি মক্কাতেই আপোষ করে থেকে যেতেন কিংবা ক্ষমতাকে নিজের পায়ের নিচে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা না চালাতেন, তাহলে যুক্তিসিদ্ধ কারণেই অথবা ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই তিনি সফল হতেন না। তাঁর অনুসৃত কর্মপন্থাই ইসলামী বিপ্লবের স্থায়ী কর্মকৌশল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অতএব ইসলামের অন্যতম মূল লক্ষ্য অসৎ নেতৃত্বের অপসারণ ও সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বলাবাহুল্য, ক্ষমতার প্রশ্নের সাথে রাজনৈতিক কর্মসূচি এসে যায়। এখানেই ইসলামী আন্দোলনকারীরা, যারা বিপ্লবের জন্য ক্ষমতাকে প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করেন, তাদের সাথে বিভ্রান্ত মুসলিম অবিপ্লবী শক্তিসমূহের মতপার্থক্য দেখা দেয়।

২। সৎ কাজের আদেশ, দুষ্কৃতির প্রতিরোধ [Instruction for Maruf (good deeds) and destruction of Munkar (evilone)] : একটি রাষ্ট্রে আদেশ দানের ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রশক্তিরই থাকে। কোন কিছু প্রতিরোধ করার শক্তিও সেই রাখে। কুরআনে সুকৃতির প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধের যে হুকুম দেয়া হয়েছে শরীয়াতের দৃষ্টিতে যা ফরয এবং যে কর্মসূচির জন্যই কুরআনে মুসলিম জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যে কর্মসূচিকে জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই মহান পবিত্র ও অপরিহার্য দায়িত্ব পালন ও বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ সহজ কথাটি যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, যে কোন প্রকারে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে কিংবা গোপনে তৎপরতা চালিয়ে অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই বিপ্লবের মূলতন্ত্র। পূর্ববর্তী আলোচনায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও শর্ত পূরণ করার মাধ্যমেই রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা চলতে পারে। এখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। ইসলাম শুধু মন মগজের কাছে সত্যের আবেদন পেশ করে না, বরং এর সাথে সে কঠোর আইনের প্রাচীর দাঁড় করায়। এজন্যই উভয় দিক থেকেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কার্যকরী দক্ষতা ও মজবুতী অনেক বেশি।

লক্ষ্যণীয় যে, সৎ কাজের আদেশ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে করতে পারে না, বড় জোর আহ্বান জানাতে পারে, অনুরোধ করতে পারে। অন্যদিকে গায়ের জোরেও কোন অন্যায়ের প্রতিরোধের ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে করতে পারে না, তাতে অহেতুক অরাজকতা-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। এজন্যই যার ক্ষমতা ও শক্তি আছে, সেই রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ। কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা দল এ দায়িত্ব তাদের মাথায় তুলে নিলেও এ কর্মসূচির হক আদায় হবে না।

৩। **রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার (Use of state machienary infavour of Islam) :** রাষ্ট্রক্ষমতা যেহেতু বর্তমান যুগে সর্বপ্রধান শক্তি, তাকে বাদ দিয়ে একটি জীবন কাঠামোর কথা চিন্তা করা যেতে পারে না। রাষ্ট্রের কথা মানুষ বাদ দিয়ে চিন্তা করতে চাইলেও মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে রাষ্ট্র এক পা ছেড়ে কথা বলে না। ইসলামী জীবন বিধান যা সমগ্র জীবনের জন্য হিদায়াত, তা রাষ্ট্রক্ষমতার মতো সর্বোচ্চ শক্তিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে পারে না। বরং কোন্ জীবনাদর্শ, কোন্ তন্ত্র রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে কথা বলেছে? রাষ্ট্রের সহায়তা ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে? হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে পারে। জীবনের প্রতিটি দিকে ইসলাম আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আর যোগ্যতা বলেই সে অধিকার সংরক্ষণ করে।

যদি কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম, ব্যক্তি অথবা দল ধর্মনিরপেক্ষতা (প্রকৃত অর্থে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করা) অথবা রাজনীতি নিরপেক্ষতার সমর্থক হন তাহলে উপরিউক্ত ক'টি কারণেই তাদের ইসলামের মিত্র বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই। তারা হয় ইসলামকে ও আল্লাহর রাসূল (সা)-এর জীবনকে অনুধাবনের প্রচেষ্টা না চালিয়েই কিংবা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে এ অজ্ঞতা দূর করতে পারেনি, অথবা 'একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন' দুনিয়ার এই সহজ সাধারণ বাস্তবতা অনুধাবনের যোগ্যতা তাদের নেই কিংবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাধারণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তারা ইসলামের সঠিক রূপকে অস্বীকার করছেন। উদ্দেশ্যমূলকতা যাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য তাদের জন্য এ পুস্তকে আখিরাতের কঠিন আযাব দেখিয়ে লাভ নেই, তবে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে এদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া অপরিহার্য এবং যারা এ হীনতা নীচতা থেকে মুক্ত তাদেরকে কুরআন ও রাসূল (সা)-এর যিন্দেগীর প্রতি দৃকপাত ও হিদায়াত প্রাপ্তির দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে।

ইসলাম একটি অট্টালিকার ভিত্তিস্বরূপ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এর পাহারাদার। যে দালানের ভিত নেই তা ধ্বসে পড়বেই এবং যার পাহারাদার নেই তার ধ্বংস অনিবার্য।

পবিত্র কুরআনে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ

لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

(লাকাদ আরসালনা রাসূলানা বিলবাইয়্যিনাতি ওয়া আন্‌যালনা মায়া'হুমুল কিতাবা ওয়াল মীযানা লিইয়াকূমান নাসা বিলকিসতি ওয়া আনযালনাল হাদীদা ফীহি বা'ছুন শাদীদুও ওয়া মানাফিউ লিন্নাসি।)

অর্থ : "বস্তুত আমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলগণকে এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদণ্ড যেন লোকেরা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আরো নাযিল করেছি লৌহ। এর মধ্যে রয়েছে বিযুক্ত অনমনীয় শক্তি এবং জনগণের জন্য অশেষ কল্যাণ।" (৫৭ : সূরা আল হাদীদ : ২৫)

এখানে লৌহকে তাফসীরকারকগণ রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআনের হিদায়াত পেয়ে যে বা যারা ইসলামের পথে চলতে চাইবে না তাদেরকে বিপর্যয় ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন। হযরত উসমান (রা) বলেছেন, "কুরআন দ্বারা যে হিদায়াত প্রাপ্ত হয় না আল্লাহ পাক তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা বা রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা হিদায়াত করেন।"

বস্তুত রাষ্ট্রক্ষমতায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী শরীয়াতের স্বাভাবিক দাবি ও প্রবণতা। ইসলামী আইন ও অনুশাসন কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা অপরিহার্য। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, "জনগণের যাবতীয় বিষয় নিষ্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দীনের সর্বপ্রধান কর্তব্য এবং রাষ্ট্র ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠাই হতে পারে না। আল্লাহ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়তদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি জিহাদ, ইনসাফ, আইনের শাসন প্রভৃতি যেসব কাজ ওয়াজিব করেছেন তা রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যতীত কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না।"[৪৪]

---

৪৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, সিয়াসতে শরীয়াহ।

প্রশ্নাবলী

১। রাজনীতি বলতে কি বুঝ? প্রচলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর। (What do you mean by politics? discuss about the characteristics of traditional politics.)

২। রাজনীতি কি? রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ব্যাখ্যা করো। (What is politics? Explain the concept of Islam about politics.)

৩। ইসলামী রাজনীতি কি? ইসলামী রাজনীতির উৎস কি? (What is Islamic politics? What are the sources of Islamic politics?

৪। ইসলামী রাজনীতি বলতে কি বুঝায়? ইসলামী রাজনীতির গুরুত্ব আলোচনা করো। (What is Islamic politics? Discuss the importance of Islamic politics?)

৫। ইসলামী রাজনীতি বলতে কি বুঝায়? ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর। (What is mean by Islamic politics? Discuss about the characteristics of Islamic politics.)

৬। প্রচলিত রাজনীতি ও ইসলামী রাজনীতি কি? প্রচলিত রাজনীতি ও ইসলামী রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (What is traditional politics and Islamic politics? Discuss differences between the traditional politics and Islamic politics.)

৭। সংক্ষেপে মহানবী (সা)-এর রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করো। (Discuss shortly about the politics of Prophet [Sm.])

৮। ইসলামী রাজনীতির বিশেষত্বগুলো কি কি? (What are the salient features of Islamic politics?)

৯। টীকা লিখ (Write short notes)

১. সিয়াসত (Siasat)

২. তাগুত (Tagut)

৩. ফতওয়া (Fatwa)

৪. জাহিলিয়াত (Jaheliat)

২

ইসলামী রাষ্ট্র

The Islamic State

২.১ ভূমিকা (Introduction)

ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবন, জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ স্বাতন্ত্র্য পরিব্যাপ্ত। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এর অপরিহার্য অংশ। ইসলামের মূল দর্শনের আলোকেই গড়ে উঠেছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমান কালে রাষ্ট্র এমন একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা যা মানব জীবনের বিভিন্ন দিককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাই পরিপূর্ণভাবে দীনের পথে চলতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিকল্প নেই।

২.২ ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Islamic Political System)

রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝাতে লেখকগণ Political System, Political order, Polity শব্দসমূহ ব্যবহার করেন। এই শব্দসমূহের অর্থ অভিন্ন, যার অর্থ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও সরকার ভিত্তিক একটি সমাজ। এই শব্দসমূহ রাষ্ট্র শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে, যেখানে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ভৌগোলিক ও অন্যান্য তাৎপর্যগত অর্থ বেরিয়ে আসে। ইসলামের প্রথম যুগের ফকীহগণ 'খিলাফত' (Khilafah) বা ইমামত (Imamah) শব্দদ্বয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political System) বুঝাতে ব্যবহার করেছেন।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নকীব সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (১৯০৩-১৯৭৯) মতে, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে তাঁর আদেশ ও অভিপ্রায় বাস্তবায়নে সকল মানুষের সম্মিলিতভাবে কাজ করা। (Islamic Political System is nothing more than a combination of men working together as servants of Allah to carry out His will and purpose.)[১]

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, দি প্রসেস অব ইসলামিক রিভলিউশান, দিল্লী, মারকাযী মাকতাবাহ জামায়াতে ইসলামী হিন্দ, ১৯৭০, পৃ. ৯।

আল্লামা মুহাম্মদ আসাদের (১৯০০-১৯৯২) মতে, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে জাতির জীবনে ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলোর সচেতন প্রয়োগ এবং রাষ্ট্রের মৌলিক সংবিধানে ঐসব নীতি আদর্শের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটানো। (Islamic Political System is a conscious application of the Socio-Political tenets of Islam to the life of the nation and by an incorporation of those tenets in the basic constitution of the country.)[২]

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজস্ব আদর্শিক তাত্ত্বিক ভিত্তি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। ইসলামের কতিপয় চিন্তা, দর্শন ও আনুষ্ঠানিকতার সাথে অনৈসলামী চিন্তা ও আনুষ্ঠানিকতার মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তবে ইসলামী ব্যবস্থায় মৌলিকভাবে... এমন বৈশিষ্ট্য ও মাত্রিকতা রয়েছে যা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, আধুনিক পাশ্চাত্য মডেল হতে তা বিপুলাংশে পৃথক এবং কেবলমাত্র নিজস্ব প্রেক্ষাপটে ও নিজস্ব পরিভাষা দ্বারাই একে সফলভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।[৩]

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে সংস্থাপিত। তাই এর রয়েছে কতিপয় গতিশীলতা এবং এতে বহু রকমের মডেল ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে, যার সাথে একটি সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের এবং সমকালীন সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের দাবি মেটানোর স্থিতিস্থাপকতা ও সামঞ্জস্যশীলতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামের সামগ্রিক ধারণা এসব মডেলগুলোর শেষ প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়।[৪]

২.৩ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of a State)

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র। আল কুরআনই প্রথম রাষ্ট্র শব্দটির ব্যবহার করেছে। আল কুরআনের ২৯ পারার শুরুতেই রয়েছে সূরা 'আল মুলক' (The State) বা রাষ্ট্র নামক সূরাটি। আল্লাহর নবী হযরত দাঊদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ

---

২. মুহাম্মদ আসাদ, ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি, শাহেদ আলী অনূদিত, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ২।

৩. মুহাম্মদ আসাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৪. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, মারাকাত আল ইসলাম ওয়া আল রাসমালিয়া, বৈরূত, দার আল শুরুক, ১৯৭৫, পৃ. ৬৬।

রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ) এবং মহানবী (সা)-ও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অবশ্য এরও আগে গ্রীক ও রোমান লেখকদের লেখায় রাষ্ট্র শব্দের পরিবর্তে যথাক্রমে 'পোলিস' (Polis) ও 'সিভিটাস' (Civitas) শব্দদ্বয়ের উল্লেখ দেখা যায়। তবে গ্রীকদের নগর রাষ্ট্র নগরের আশপাশের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়। এগুলোকে নগর রাষ্ট্র (City state) বলে আখ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

তবে গ্রীক দার্শনিকগণ প্রথম রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সুবিন্যস্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন। এরিস্টটলের মতে, 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব, একটি যূথবদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে বাস করা তার প্রকৃতি; কেবলমাত্র যার মধ্যদিয়ে মানুষ তার সর্বোচ্চ নৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটাতে পারে (Man is by nature a political being; it is his nature to live in a polis wherein alone he could attain his highest moral nature.)[৫]

এরিস্টটলের মতে, "কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সম্মিলনে রাষ্ট্র (Polis) গঠিত হয়।" এরিস্টটলের বর্ণিত রাষ্ট্র এর অভ্যন্তরে বসবাস রত জনগণের জন্য এক মহত্তর ও স্বাবলম্বী জীবন কায়েমের জন্য উদ্ভব হয়। তিনি বলেন, The state is a union of families and villages having for its and a perfect and self sufficing life by which we mean is happy and hono urable. অর্থাৎ পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র।

তাঁর মতে, "রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক কার্যক্রম। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীব। যে মানুষ সমাজ বহির্ভূত জীবন যাপন করে এবং যার জীবন কোন নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন নয় নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে হয় মানবেতর জীব, না হয় মানব প্রজাতি উর্ধ্ব কোন সত্তা।" এরিস্টটলের মতে, রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা মানুষের জন্য একান্তই প্রয়োজন। মানুষের প্রকৃতিই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে। শুধু তাই নয়, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনবোধ করে না, এরিস্টটলের দৃষ্টিতে সে হয় মানবেতর জীব, না হয় মানব প্রজাতিরও উর্ধ্বের কোন সত্তা, যার মধ্যে মানবীয় প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব নেই।

প্লেটো প্রাচীন গ্রীসের প্রখ্যাত দার্শনিক। তাঁর মতে, "রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনতা ব্যতিরেকে উন্নতমানের জীবন লাভ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। কেননা

৫. এরিস্টটল, দি পলিটিকস, অনুবাদ : জে এ সিনক্লেয়ার, ইংল্যান্ড, পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৯২, পৃ. ২৮।

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দিকে। মানুষ তার এ স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে কখনো মুক্ত হতে পারে না।"

প্লেটো ও এরিস্টটলের মতে, সাধারণ কল্যাণ ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয় বরং এটা একই সাথে ধর্মীয় সম্প্রদায়, সংঘ ও সামাজিকীকরণ সংস্থা হিসেবে কাজ করে যা সাধারণভাবে ব্যক্তি মানুষের মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে লিপ্ত থাকে। তাঁরা ব্যক্তি মানুষকে এমন এক সত্তারূপে দেখেছেন যার স্বাভাবিক প্রবণতা শুভের দিকে এবং তাই তারা মানুষের নৈতিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজনৈতিক আবহে মানুষের যুথবদ্ধতার অনুভূতির তথা নৈতিক বিশ্বাসের সাধারণ ঐকমত্যের উপর তারা জোর দিয়েছেন।

রোমানদের সময় থেকে রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। কেননা রোমান সম্রাট ও রাজারা একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর[৬] (১৪৬৯-১৫২৭) রচিত গ্রন্থ 'দি প্রিন্সে' (The Prince) রাষ্ট্র শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যদিও রাষ্ট্র শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় তথাপি সাধারণ ভাষায় রাষ্ট্র শব্দটি অসাবধানতাবশত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : রাষ্ট্র শব্দটি কখনো জাতি, সরকার, সমাজ, দেশ প্রভৃতিকেও বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব পরিভাষার প্রত্যেকটি একটি স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। অনেক সময় রাষ্ট্র বলতে যুক্তরাষ্ট্রের (Federation) অঙ্গরাজ্যগুলোকে বুঝায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (USA) ৫০টি অঙ্গরাজ্যকে আলাদাভাবে রাষ্ট্র (State) বলা হয়ে থাকে।

২.৪ রাষ্ট্রের কতিপয় প্রামাণ্য সংজ্ঞা (Some Authentic Definitions of State)

জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লুন্টসলি (Bluntschli) রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, "একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে

৬. নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁরThe Prince বইখানি প্রকাশ করেন। তিনি ইতালির অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মতে, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতির কোন স্থান নেই। সুবিধাবাদই চরম ও পরম নীতি। প্রাচীন ভারতের চানক্যের চিন্তাধারার সাথে এ নীতির হুবহু মিল রয়েছে।

সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র।" (The state is a politically organized people of a definite territory.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) মতে, "রাষ্ট্র হলো কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত একটি জনসমষ্টি।" (The state is a people organized for law within a definite territory.)

উপরের সংজ্ঞা দু'টি খুবই সংক্ষিপ্ত। রাষ্ট্রের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য উপাদান সরকার ও সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সংজ্ঞাদ্বয়ে প্রত্যক্ষ কোন উল্লেখ নেই।

অধ্যাপক বার্জেস (Prof Burges) বলেন, "মানব জাতির কোন অংশ সংঘবদ্ধভাবে বাস করলে রাষ্ট্র গঠিত হয়।" (Particular portion of mankind viewed as an organized unit.)

রাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কির (Prof H.J. Laski) সংজ্ঞা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক সমাজ যা সরকার ও জনগণের মধ্যে বিভক্ত এবং যা উক্ত এলাকাধীন সকল সংগঠনের উপর স্বীয় প্রাধান্য দাবি করে।" (The modern state is a territorial society divided into government and subjects. claiming within its allotted physical area supremacy over all other institutions.)[৭]

অধ্যাপক ম্যাকইভারের (Maciver) মতে, "রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সংগঠিত সরকারের প্রবর্তিত আইন মোতাবেক প্রয়োজন অনুযায়ী বল প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনে সামাজিক শৃঙ্খলার চিরন্তন বাহ্যিক শর্তগুলো রক্ষা করে।" এখানে উল্লেখ্য যে, ম্যাকাইভারের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। তিনি বলেছেন, বল বা শক্তি রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হতে পারে না। তাঁর মতে, 'Coercive Power is a criterion of the state but not its essence.'

রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন অধ্যাপক ডঃ গার্নার (Prof Dr. Garner)। তাঁর মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে একটি জনসমাজ যা সংখ্যায় বিপুল, যা স্থায়ীভাবে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে। যা কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন অথবা প্রায় স্বাধীন এবং যার একটি সংগঠিত সরকার আছে এবং

৭. হ্যারল্ড জে. লাস্কি, এ গ্রামার অব পলিটিকস, পৃ. ২১।

যার প্রতি প্রায় সকলেই স্বভাবত আনুগত্য স্বীকার করে।" (The state is a community of persons more or less numerous. permanently, occupying a definite portion of territory independent of external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.) অধ্যাপক গার্নারের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের চারটি উপাদান (Elements) বেরিয়ে আসে। যেমন : জনসমষ্টি (Population), নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Definite territory), সরকার (Government) এবং সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)। যে কোন রাষ্ট্রের জন্য এ চারটি উপাদান অত্যাবশ্যক।

সাম্প্রতিককালে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্র শব্দটিকে নতুনভাবে নামকরণ ও ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তারা রাষ্ট্র শব্দটির পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political system) শব্দটি ব্যবহার করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ডেভিড ইস্টন, জি.এ. এলমন্ড, জেমস কোলম্যান ও রবার্ট এ. ডল প্রমুখ।

এলমন্ড ও কোলম্যান-এর মতে, "রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজের বৈধ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা পরিবর্তন আনয়নকারী ব্যবস্থা।" (The political system is the legitimate order maintaining or transforming system in the society.)[৮]

রবার্ট ডল বলেছেন, "রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের সমন্বয়ে গঠিত এবং উক্ত ভূখণ্ডের সরকার হলো রাষ্ট্র।" (The political system is made up of the territorial area and government of the area is a state.)[৯] ডল রাষ্ট্রকে শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী কেন্দ্রীয় স্থান দখলকারী লোক সমষ্টি ও শাসিত শ্রেণীর লোকবর্গের সম্মিলন হিসেবে দেখেছেন (The state is a collection of individuals occupying role positions (those of governing authority) and acting as a group to govern.) রাজনৈতিক জগতটি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সমষ্টি দ্বারা গঠিত যাদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক শক্তি ও সম্পদ রয়েছে। বিভিন্ন স্বার্থ ও সম্পদরাজির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে জননীতি নির্ধারিত হয়।

---

৮. G. A. Almond, J.S. Coleman (ed); The Politics of Developing Areas; p. 7.

৯. R. A. Dahl, Modern Political Analysis, P. 12.

২.৫ রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মত/কার্ল মার্কসের মত (Karl Marx on the State)

মার্কসবাদীরা 'রাষ্ট্র'কে ব্যাখ্যা করেছেন পুঁজিপতিদের শোষণের অস্ত্র হিসেবে।

কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) মতে রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী সংঘাত ও শ্রেণী সংগ্রামের ফসল এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী গোষ্ঠী দ্বারা।

"The state is the product of class contradictions and class struggle and is controlled by the economically dominant class." মার্কসের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে নিপীড়নের অস্ত্র মাত্র। (State is a instrument for oppression) তাঁর মতে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র হচ্ছে উৎপাদনের অধিকারী শোষক শ্রেণীর হাতে সমাজের নিগৃহীত ও শোষিত শ্রেণীর উপর শাসন ও শোষণের যন্ত্র। মার্কসের মতে যেহেতু রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীভিত্তিক এবং শ্রেণীর অস্তিত্বে রয়েছে বিরোধ ও বিভাজন, তাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রে পরস্পর বিরোধী শক্তির প্রবণতা বিরাজ করে। লেনিনের কথায় 'The state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another.' রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে এঙ্গেলসের অভিমতও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়, 'The means of subduing and exploiting the oppressed masses-' রাষ্ট্র হল শ্রেণী স্বার্থের ধারক ও বাহক এবং কেন্দ্রীভূত পশুশক্তির প্রকাশ। মার্কসীয় ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র হল শ্রেণী শাসনের প্রতীক এবং একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে শোষণ করার যন্ত্র বিশেষ। সর্বকালেই একশ্রেণী এজেন্টস্বরূপ হয়ে আরেক শ্রেণীর উপর নিপীড়নের স্টীম রোলার চালিয়ে আসছে। মার্কস কল্পিত সমাজে সবরকম শ্রেণী শত্রুতার অবসান হওয়ায়, শ্রেণীভেদ লোপ পাওয়ায়, শ্রেণী শোষণের অস্ত্র যে রাষ্ট্র, তার আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না। অতএব তা আপনাআপনি উঠে যাবে (Will automatically wither away)। মানুষের কাজকর্ম তখন স্বাভাবিক গতিতে পরিচালিত হবে। সবাই তখন স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীন ও স্বেচ্ছায় স্বতোৎসারিত হয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় সক্রিয় থাকবে। শ্রেণী বিভেদের অবসান হওয়ায় মানুষের শাসনের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে জিনিসের শাসন। তখন রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে বিধায় মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতারও অবসান হবে। এ রকম ব্যবস্থার শেষ পরিণতির ফলস্বরূপই একদিন এক সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ সুন্দর সাম্যবাদী সমাজ (Communism) প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে দু'টি বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রথমত. মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়ের মাধ্যমে সম্পদের সঠিক মালিকানা যখন সমগ্র সমাজের হাতে ন্যস্ত হবে তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। সেখানে মানুষের শাসনের (Government of persons) কোন প্রয়োজন থাকবে না। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে জিনিসের শাসন (Administration of things)। মার্কসের এ উক্তির মধ্যে আন্তরিকতা যাই থাকুক না কেন মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এটি সম্পূর্ণ একটি অবাস্তব ধারণা। মার্কস রাষ্ট্রহীন সমাজের যে রঙ্গীন চিত্র উপস্থাপন করেছেন কল্পনা হিসেবে তা যতই উন্নত হোক না কেন বাস্তবতার সাথে তার আদৌ কোন মিল নেই। মার্কসের এ বক্তব্য তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের কাফনে আবৃত করে সমাহিত করে ফেলেছে। মানুষের শাসনের স্থলে জিনিসের শাসন প্রবর্তিত হবে বলে মার্কস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ইতিহাস তাকে নির্মমভাবে অসত্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাষ্ট্রই হচ্ছে মানব সভ্যতার অপরিহার্য নিয়ামক। অথচ এ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করে মার্কস সভ্যতার অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, ১৯১৭ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে তথাকথিত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কেন্দ্রীয় শাসনের রাজনৈতিক চরিত্রের অবসান হয়নি বরং তা উত্তরোত্তর আরো দৃঢ়মূল হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা কেউ স্বীকার না করলেও সেখানে মানুষের শাসনের জায়গায় যে জিনিসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেকথা কেউ অস্বীকার করবেন না।[১০]

২.৬ রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েভার (Max Weber on the state)

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় বিশ্লেষণের বহু বিষয়ের সাথে ম্যাক্স ওয়েভার একমত পোষণ করেন, তবে তিনি মার্কসের শ্রেণীহীন সমাজের ধারণাকে অবাস্তব বলে অভিহিত করেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মার্কসীয় সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে ওয়েভার মন্তব্য করেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কোন ফারাক নেই কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেমন বুর্জোয়া শ্রেণী আধিপত্য বিস্তার করে তেমনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী

১০. রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, Origin of the Family, Private Property and the State মস্কো, প্রগতি পাবলিশার্স, ১৯৬৯।

(Bureaucratic elite) আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রাধান্য ও আধিপত্য যা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে থাকে।[১১] (The state is a relation of men dominating men, a relation supported by means of violence) ওয়েভার এ সম্পর্ককে বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োজনীয় মনে করেন, যেহেতু সম্পত্তিই প্রাধান্য ও আধিপত্যের বস্তুগত ভিত্তি ও উপকরণ সরবরাহ করে, সে আধিপত্য প্রশাসনিক বা নিপীড়নমূলক যাই হোক না কেন। এ আধিপত্যকে কিভাবে আইনসঙ্গত রূপ দেয়া যায় তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করাকেই তিনি তার সমীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেন। 'সহিংস শক্তির প্রয়োগ রীতি সম্পর্কে অবহিত' কোন সামাজিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান না থাকলে সমাজে 'নৈরাজ্যের' (Anarchy) সৃষ্টি হবে এ মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।[১২] ওয়েভারের মতে, রাষ্ট্রকে এমন একটি মানব সংগঠন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বৈধভাবে শক্তি প্রয়োগের একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে পারে।[১৩] (The state is defined as a human community that (Successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical violence in a given territory) শক্তি প্রয়োগের একচেটিয়া অধিকারকে সংগত বলা যায় এ কারণে যে এতে সংঘাত, সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আধিপত্যের যৌক্তিকতা অবশ্য বৈধ আদেশ পালনের সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রেক্ষাপট হতে রাষ্ট্র ধারণার অবয়ব গ্রহণ কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। এতে রাষ্ট্রীয় আচরণের ব্যাখ্যায় জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্বের সনাতন বিশ্লেষণের সাথে শ্রেণী বিশ্লেষণ বা গোষ্ঠী মিথস্ক্রিয়া ও গতিশীলতা যুক্ত হয়েছে। যে শ্রেণী অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সে শ্রেণীই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণীর জন্য কিছু ভূমিকা সংরক্ষণ করে, তদ্রূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat)

---

১১. ম্যাক্স ওয়েভার, 'Politics as a vocation,' এইচ এইচ গার্থ এবং সি রাইট মিলস সম্পাদিত From Max Weber, লন্ডন, রুটলেজ এন্ড কেগান পল, ১৯৭০, পৃ. ৭৮।

১২. ম্যাক্স ওয়েভার, পূর্বোক্ত

১৩. ম্যাক্স ওয়েভার, পূর্বোক্ত

ব্যবস্থাও সমাজতন্ত্রের পথে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও উপাদান অক্ষুণ্ণ রাখে। উভয় ব্যবস্থাতে শ্রেণী ও জাতীয় স্বার্থকে সমাজের ব্যক্তি মানুষের স্বার্থ ও অধিকারের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয় পরিশেষে উভয় অবস্থাই ব্যক্তি মানুষের আধ্যাত্মিক এমনকি বস্তুগত কল্যাণের বিষয়েও সমাজের সামষ্টিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে।

২.৭ রাষ্ট্রের আরো কতিপয় সংজ্ঞা (Some other Definitions of State)

আইনবিদ ফিলিমোর

রাষ্ট্র হল চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী, যারা সাধারণ আইন, অভ্যাস ও প্রথার ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রদেহে আবদ্ধ এবং এক সুব্যবস্থিত সরকারের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা সহযোগে এলাকাধীন যাবতীয় মানব ও বস্তু নিয়ন্ত্রণের, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি রক্ষার এবং পৃথিবীর সম্প্রদায়গুলোর সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারী।

প্রফেসর এস এল ওয়াজবি (Professor S.L. Wasby)

রাষ্ট্র হল কোন ভূখণ্ডে বসবাসকারী এমন জনসমষ্টি যার সুসংগঠিত সরকার রয়েছে এবং যা অন্যান্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। (The state is a collection of people having organized government and possessing autonomy with respect to other such units)

প্রফেসর রাফায়েল (Professor Rafael)

রাষ্ট্র হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা বল প্রয়োগের দ্বারা বলবৎযোগ্য, আইনের সাহায্যে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করে, যার ভৌগলিক সীমার মধ্যে সার্বজনীন এখতিয়ার রয়েছে এবং রয়েছে স্বীকৃত সার্বভৌম কর্তৃত্ব।

২.৮ একনজরে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার আবশ্যকীয় নীতিমালা (Essential Principles of the Islamic Political System at a glance)

নীতিমালা (Principles)	অর্থ (Meaning)	কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ Some related Quranic verses
তাওহীদ (Tawhid)	আল্লাহর একত্ববাদ, গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা, অধিপতি ও নিয়ন্ত্রক এক আল্লাহ। সর্বময় ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে। আল্লাহই একমাত্র আইন প্রণেতা ও ক্ষমতার উৎস।	১ঃ২; ৩ঃ১৫৪; ৫ঃ৩৮-৪০; ৬ঃ১০২, ১৬৪; ৭ঃ৩, ৫৪; ১০ঃ৩১; ১২ঃ৪০; ১৩ঃ৩৭ ১৫ঃ৩৬; ৪২ঃ১০, ৪৮ঃ৪ ৫৭ঃ২-৩; ১১২ঃ১-৪।
শরীয়াহ (Shariah)	কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রণীত ইসলামী আইন। আল্লাহর আনুগত্যের জন্য যে বিধান বা আইন-কানুন দেয়া হয়েছে এর বিশেষ নাম হলো শরীয়াহ।	৫ঃ৪৮; ৭ঃ১৬৩; ৪২ঃ১৩, ২১; ৪৫ঃ১৮।
আদালাহ (Adalah)	ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।	৪ঃ৫৮, ১৩৫; ৫ঃ৩, ৯ : ৪৫; ৭ঃ২৯, ১৬ঃ৯০, ১৫২; ৪২ঃ১৫, ৫৫ঃ৯।
স্বাধীনতা/হুররীয়াত (Freedom)	শরীয়ার নীতিমালার আওতায় ব্যক্তির যাবতীয় চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের অধিকার; ব্যক্তি ও সমষ্টির চাহিদার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।	২ঃ২৮৬; ৪ঃ৮০; ১০ঃ৯৯; ১৮ঃ২৯; ৭৪ঃ৩৯, ৫৬; ৭৬ঃ২৯, ৮১ঃ২৮।
সাম্য/সমতা/ মুসাওয়াহ (Equality)	ব্যক্তির জন্য সমান সুবিধাদি নিশ্চতকরণ যাতে ব্যক্তি মানুষ নিজের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে।	২ঃ৩০, ৪ঃ১; ৬ঃ১০৪, ১৫১; ১২ঃ৪০; ১৭ঃ৩৩।
শূরা (Shura)	পরামর্শভিত্তিক কাজ, পারস্পরিক পরামর্শ Consultation	২ঃ২৩৩; ৩ঃ১৫৯; ৪২ঃ৩৮।

২.৯ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌল নীতিমালা (Essential Principles of an Islamic Political Order)

কুরআন ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেকগুলো নীতিমালা পেশ করেছে যা উপরে একনজরে দেখান হয়েছে। মৌলিক নীতিমালাগুলো হচ্ছে:

১। **তাওহীদ (Tawhid)** : তাওহীদ মানে আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব। এটি আল্লাহর সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিধি-বিধানসমূহ বর্ণনা করে। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রধান মূলনীতি হলো এ বিশ্ব আল্লাহর এবং সৃষ্টিও তাঁরই। আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান মেনে তাঁরই চির অনুগত হয়ে জীবন যাপনের মধ্যেই মানুষের যথার্থ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং বিধানদাতাও তিনিই।

আল্লাহর একত্বে ঈমানের প্রাণশক্তি এই যে, প্রতিটি কাজ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় এবং একান্তই আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে করতে হবে। আল্লাহই হচ্ছেন রব। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আদেশ দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। (৬ : সূরা আল আনআম : ৫৭)। আল্লাহ হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন (১ : সূরা আল ফাতিহা : ১) এবং তিনিই বিধানদাতা (৮৭ : সূরা আল আ'লা : ৩)।

২। **শরীয়াহ (Shariah)** : 'শরীয়াহ' একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দীন, জীবন পদ্ধতি, ধর্ম, জীবনাচার, নিয়মনীতি ইত্যাদি।[১৪] পরিভাষায় শরীয়াহর সংজ্ঞায় প্রখ্যাত তাবেয়ী কাতাদাহ (রহ) বলেন, শরীয়াহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আরোপিত নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা, সীমারেখা ও ফারায়েজ।[১৫] ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেসব আকীদা ও আমল মানুষের জন্য প্রণয়ন করেছেন, তাই শরীয়াহ।[১৬] সহজভাবে শরীয়াহর সংজ্ঞায় বলা যায় যে, 'মহান আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জগৎ পরিচালনার জন্য মহানবী (সা) এর মাধ্যমে স্বীয় বান্দাহদেরকে যে সার্বিক হুকুম ও বিধান প্রদান করেছেন তাই হলো শরীয়াহ। শরীয়াহ হচ্ছে মানব আচরণের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা যা হযরত মুহাম্মদ

---

১৪. আল-সিহাহ, ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী, ৩/১২৩৬; লিসানুল আরব, ইবনু মানযুর, ৮/১৭৪।

১৫. আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন-৬/২১১।

১৬. মাজমু' আল-ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়াহ ১৯/৩০৬।

(সা)-এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামী শরীয়াতের সংবিধান ও প্রথম উৎস আল কুরআন এবং দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ। ইসলামী শরীয়াহ ছাড়া কারো পক্ষে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। শরীয়া মুসলিম জীবন সাধনার এক অপরিহার্য উপাদান। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিমরা কিভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার নিষ্পত্তি করবে, তারই নির্দেশক হচ্ছে ইসলামী শরীয়াহ। এতে ব্যক্তি মানুষের যাবতীয় সমস্যার যেমন সমাধান রয়েছে, তেমনি রয়েছে সামাজিক-সামষ্টিক মানুষের সমস্যাবলীর সঠিক ও সুষ্ঠু সমাধান। কুরআন সুস্পষ্টভাবে বিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান জানায়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তাদের মধ্যে তোমরা বিচার করো।' (৫ : সূরা আল মায়েদা : ৪৯) এবং কুরআন আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘনকারীদের 'খেয়ানতকারী', দুষ্কৃতকারী ও বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে নিন্দা করেছে (৫ : সূরা আল মায়েদা : ৪৪, ৪৫, ৪৭)। শরীয়াহর পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে ইসলাম ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে নয় বরং সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সরকারের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছে। শরীয়াহর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রদত্ত কোন আইন, পদ্ধতি, বিধি-বিধান, সিদ্ধান্ত, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত আইগতভাবে বাধ্যতামূলক ও বৈধভাবে জনগণের উপর প্রয়োগযোগ্য হতে পারে না যদি না তা আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা) প্রদর্শিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।

৩। **আদালাহ (Adalah) :** ইসলামী রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার। সকল মানুষের প্রতি সুবিচার। ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত স্বার্থ, যুলুম-নির্যাতন, বাড়াবাড়ির পরিবর্তে ন্যায়বিচার কায়েম হবে। কুরআন সুন্নাহর আইন সকলেরই জন্য সমান। রাষ্ট্রের গণমানুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলের জন্য সুবিচার সমভাবে প্রয়োগ করা অপরিহার্য। এতে কোন নাগরিকের জন্য কোন ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কুরআন মুসলিমদের আদেশ করে যে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সমতা, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রাথমিক সাক্ষ্যের অকপটতার স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করার জন্য। তাই শুধু ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী নয়, গোটা মুসলিম সমাজ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীল। কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক মহানবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন :

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ.

উচ্চারণ : ওয়া উমিরতু লিআ'দিলা বাইনাকুম।

অর্থ : বলুন, "আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি।" (৪২ : সূরা আশ শূরা : ১৫)

অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার নীতি অবলম্বন করার জন্য মহানবী (সা) আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া নবীর কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে মহানবী (সা)-এর সম্পর্ক হচ্ছে 'আদল ও সুবিচারের সম্পর্ক।' আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ। তোমরা ইনসাফের ধারক হও ও খোদার ওয়াস্তে সাক্ষী হও। তোমাদের এ সুবিচার ও এ সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের উপর কিংবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় যার উপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী ও দরিদ্র, যেই হোক না কেন, তাদের সবার চেয়ে আল্লাহর অধিকার অনেক বেশি যে, তোমরা তার দিকেই লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি মন রাখা কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে থাক, তবে জেনে রেখো। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।' (৪ : সূরা আন নিসা : ১৩৫) আল্লাহ আরও বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে সত্যনীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের যেন এতদূর উত্তেজিত না করে যে, (তার ফলে) তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার কর, বস্তুত আল্লাহপরস্তির সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৮) বিশ্বাসীদের ন্যায়পরায়ণ হতে আদেশ করা হয়েছে, কেননা ধর্মপরায়ণতার পরই ন্যায়পরায়ণতার স্থান। নবী রাসূলগণ এজন্যই দুনিয়ায় আগমন করেছেন যাতে মানুষ ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে পারে (৫৭ : সূরা আল হাদীস : ২৫) 'সত্য' এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মহানবী (সা) নির্দেশিত হয়েছিলেন।

দীন ইসলামে কারো প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারের কোন অবকাশ নেই। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য, যা গুনাহ তা সকলের জন্যই গুনাহ, যা হারাম তা সবার জন্যই হারাম, যা হালাল তা সবার জন্যই হালাল, আর যা ফরয তা সকলের জন্যই ফরয।

ইসলামী শরীয়াতের ছায়াতেই ন্যায় ইনসাফ বিস্তৃতি লাভ করেছে, সমস্ত মানুষ

তার সুফল ভোগ করেছে। কারণ শরীয়াহ আইন যেসব রাষ্ট্রে কার্যকর হয়েছে সেখানে কাউকেই তার ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা বা পারিবারিক অবস্থা কিংবা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বা মন্দাবস্থা অথবা তার বর্ণ ও ভাষার কারণে যুলুম করেনি। আর কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বও করেনি।

ইসলামের এ সুবিচার ও ইনসাফ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই ইনসাফ। আল্লাহ হলেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বিধানদাতা।

ব্যক্তি মানুষের প্রতি সৎকাজের দায়িত্ব পালন, আত্মীয়-পরিজনের প্রতি সদাচরন, সন্ত্রাস, বাড়াবাড়ি, যুলুম, অবিচার, লজ্জাকর ও গর্হিত কাজ পরিহার; অসৎ ইচ্ছা বা বিদ্বেষের বলে অন্যের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা প্রভৃতি বিষয়ের উপর কুরআন বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন শুধুমাত্র দুর্বল ও নিপীড়িতের প্রতি সুবিচারের কথাই বলেনি বরং সমাজে সন্ত্রাস-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ও সীমা লঙ্ঘনকারীদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। কুরআন ব্যক্তি মানুষের কাছে এমন উচ্চতর নৈতিক আদর্শ দাবি করে যে প্রয়োজনে সে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। একটি ন্যায়পরায়ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো এমন সব ন্যায়বান ও দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয় যারা ন্যায় ও সততার সাথে জননীতি পরিচালনা এবং সকল সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে তিনি বণ্টন ও বিন্যস্ত করবে।

দুনিয়াবাসী ইসলামী আদালতের ন্যায় অন্য কোন আদালত কখনও দেখতে পায়নি। যেখানে খলীফা বা আমীরুল মুমিনীনের সাথেও সাধারণ জনগণের মতই সমান ব্যবহার করা হত। তাঁকেও সে রকম বিচার ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হত। বিচারক একজন ইহুদী বা খ্রিস্টানের আনিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করতেন। কুরআনে আল্লাহপাক মিযান (Scale বা দাঁড়িপাল্লা), কিসত (Qist), আদল (Adl) ইত্যাদি বহুবিধ শব্দ ব্যবহার করেছে ন্যায়বিচারের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য।

৪। **স্বাধীনতা (Hurriah/Freedom)** : ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে হুররিয়াত বা স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা হচ্ছে অধিকার, আজাদী, সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিক দায়িত্ব সচেতনতা ভিত্তিক। ড. আবদুল হামিদ আবু সুলাইমান স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছেন, স্বাধীনতা বা হুররিয়াত হচ্ছে, 'এমন একটি পরিবেশ যেখানে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের নৈতিক ও শুভ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আদর্শিক অভীপ্সা ও পছন্দ ঘোষণা করতে পারে এবং বিশ্বাস ও পছন্দমাফিক স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।' "To act according to

one's own moral convictions, to the ideological or intellectual choices and to take decisions on the basis of these convictions and choices"[১৭] নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে তাদের নৈতিক ও শুভ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে এবং আদর্শিক ইচ্ছা ও পছন্দ ঘোষণা করতে পারে এবং বিশ্বাস ও পছন্দ অনুযায়ী স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন। মানুষের এ স্বাধীনতা কোনভাবেই খর্ব করা যাবে না। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়াদিতে নিশ্চয়তা প্রদান রাষ্ট্রের বুনিয়াদি নীতিমালাসমূহের অন্তর্গত। এ ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, আদর্শিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতাই সবকিছু নয়। বস্তুত মানুষ তখনই প্রকৃত স্বাধীন বলে গণ্য হবে যদি ভৌগোলিক স্বাধীনতার সাথে সাথে আদর্শিক স্বাধীনতাও তার হাসিল হয়ে হয়। পক্ষান্তরে, মানুষ যদি মানব রচিত আইন-শাসনের অধীনে পরিচালিত হয় তবে ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও তারা পরাধীন। ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীলতা হল দুটি পরিপূরক ভিত্তি স্তম্ভ। মুসলিমগণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না যদি না এটি দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পৃক্ত হয়। ইসলামে স্বাধীনতা বলতে বুঝায় যে, ব্যক্তি যে কোন রকম দাসত্ব থেকে স্বাধীন হবে, মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহরই গোলাম হবে, অন্য কারো নয়। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর নমনীয়তা যা ব্যক্তিকে এর মধ্যে স্বাধীনতা প্রদান করে। তবে মনে রাখতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য এই স্বাধীনতা চূড়ান্ত নয় বরং তাদের দায়িত্ব সচেতনতা ও পরিচিতি ও মাত্রাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীনতার অধিকার অস্বীকার কোন চরম ভ্রান্তি, তেমনি স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতার দাবিও দায়িত্বজ্ঞান হীন। মানব জীবনকে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়কে কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামে যে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তা শুধু মুসলিম নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু ও অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

৫। সাম্য (**Equality**) : মানুষের জীবনে সাম্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সাম্য অপরিহার্য। সাম্য বলতে সমতাভিত্তিক অবস্থা বুঝায়। এ সাম্য অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা এবং কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে

১৭. ড. আবদুল হামিদ আবু সুলাইমান, মুসলিম মানসে সংকট, আই আই আই টি, ১৯৯৩, পৃ. ৮৯।

পরিস্ফুট হতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, বিশ্বাস, নির্বিশেষে নাগরিকগণ রাষ্ট্রে সাম্য ভোগ করবে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মানবিক সত্তার বিকাশ এবং সে সাথে সুখ-সমৃদ্ধ জীবন উপভোগের জন্য সাম্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সাম্য হলো সে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোন ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার বেদীতে আত্মবিসর্জন দিতে না হয়। ইসলামী শরীয়াতের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ব্যক্তি ও সমষ্টির কারো স্বার্থহানি না করে সকলের স্বার্থের প্রতি সমান দৃষ্টিদান। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মধ্যে সমভাবে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী রাষ্ট্র যে কোন কল্যাণ বাস্তবায়ন করতে এবং যে কোন অনাচার রহিত করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে তেমনি স্বাধীনতা সংস্করণের সাথে সাথে আইনের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে যেখানে সকলের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হয়। আল্লামা মুহাম্মদ আসাদের (১৯০০–১৯৯২) মতে, "সাম্য মূলনীতির মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার অর্থ এবং যৌক্তিকতা খুঁজে পায়।" (It is in these principles and in these alone, that the concept of Islamic polity finds its meaning and justification.)[১৮]

আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই সমান; তারা পৃথক হতে পারে শুধুই তাদের আচরণ ও কার্যাবলীর মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সকল! জেনে রাখ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদের জাতিও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিবান...। (৪৯ : সূরা আল হুজুরাত : ১৩) মহানবী (সা) এ ধারণাটিকে একটি সুন্দর তুলনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে জোরারোপ করেছেন, 'জনগণ হলো এমনভাবে সমান, যে রকম চিরুনীর দাঁতগুলো সমান; কোন আরবের অন্য কোন অনারবের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শুধু তাকওয়ার গুণের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে।' কোন ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির পূর্ব খ্যাতির গুরুত্বও নেই, নেই কোন দলের উপর অন্য দলের, কোন জাতির উপর অন্য জাতির, কোন বর্ণের উপর অন্য বর্ণের, কোন মনিবের তার চাকরের উপর, কোন শাসকের তার শাসিতের উপর। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হতে পারে তাদের ধার্মিকতার ভিত্তিতে, তাদের তাকওয়ার ভিত্তিতে, এটিই ব্যতিক্রম। সমতার এ

১৮. মুহাম্মদ আসাদ, 'The Principles of State and Government in Islam' দার আল আন্দালুস, জিব্রালটার, ১৯৮০, পৃ. ৩৩।

আদর্শটি প্রতিফলিত হয়েছিল মহানবী (সা) এর শাসনামলে এবং মহান খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে।

৬। শূরা (**Shura/Consultation**) : ইসলামী রাষ্ট্রে শূরা বা পরামর্শ গ্রহণ (Consultation) কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষের উপর আরোপিত অন্যতম বাধ্যবাধকতা হচ্ছে তারা উম্মতের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের সাথে পরামর্শ করে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শাসনকার্য পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, মুসলমানদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। (৪২ : সূরা আশ শূরা : ৩৮) সাইয়েদ কুতুব শহীদের (১৯০৬–১৯৬৬) মতে, ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক স্বেচ্ছাচারী কিংবা স্বৈরাচারী হবে না বরং তথায় পরামর্শভিত্তিক শাসন পরিচালিত হতে হবে।[১৯]

এ পারস্পরিক পরামর্শ থেকে মহানবী (সা)-কেও ব্যতিক্রম করা হয়নি। মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, (হে রাসূল) কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (৩ : সূরা আলে ইমরান : ১৫৯) মহানবী (সা) স্বয়ং শাসক ছিলেন। তিনি সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ লাভ করতেন। তিনি কারো সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে যেহেতু পরবর্তীকালে শাসকদের জন্য নমুনা হতে হবে তাই তাঁর মারফতে পারস্পরিক পরামর্শ গ্রহণের ঐতিহ্য কায়েম করা হয়েছে। মহানবী (সা) নিজেই রাজনীতি, রাষ্ট্র, যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনুসারী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীকে বলেছেন, পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলাফলের জন্য ভয় পাবেন না। বরং আপনার রাষ্ট্রের সব দৈনিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আপনার লোকজনের সাথে পরামর্শ করে কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখুন। কারণ, মুসলিম সমাজের কার্যাবলীর উপর কারও চরম কর্তৃত্ব নেই, শূরা হল মৌলিক এবং কোন মতামত প্রদান করার চেয়ে পরমার্শ করা শাসকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। শূরা শুধুমাত্র জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের অংশগ্রহণই নিশ্চিত করে না- একই সাথে তা স্বৈরাচারী শাসন প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করে।

উপসংহারে বলা যায় যে, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সরকার শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবে না, একই সাথে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও

---

১৯. আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, পৃ. ৫৪২-৫৪৩।

বাস্তবায়িত করবে। ডঃ আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সময় কালের প্রেক্ষাপটে তাওহীদ, আদল, সমতা, শূরা ও স্বাধীনতার ধারণা সমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট মানব সংগঠনের মাধ্যমে রূপদানের প্রচেষ্টা। (Islamic Political order is as endeavour to transform the principles of tawhid, adl, equality, shura and freedom into space time references, an aspiration to realize them in a difinite human organisation.)[২০]

২.১০ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র (The Concept of State in Islam)

ইসলামের মূল দর্শনের আলোকেই গড়ে উঠেছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দু'টি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রকে মানব কল্যাণ সাধনের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের যথার্থতা সম্বন্ধে কুরআন বলেছে ইসলামী রাষ্ট্রের অবর্তমানে মানুষ সাধারণত কলহপ্রিয়,[২১] ঝগড়াটে,[২২] সংকীর্ণমনা,[২৩] ব্যয়কুণ্ঠ,[২৪] চির অবিমৃষ্যকারী, তাড়াহুড়াকারী,[২৫] ঐশ্বর্যলোভী,[২৬] কল্যাণের প্রতি ঈর্ষাপ্রবণ[২৭] হয়। তদুপরি মানুষ প্রবল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী বলে অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ন্যায়নীতির গণ্ডি অতিক্রম করে। এজন্যই মানুষের সমাজের ঐক্য, শৃঙ্খলা, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। নবী ও রাসূলদের পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল তারা আল্লাহর দীনকে সর্বপ্রকার প্রচলিত ব্যবস্থা ও সিস্টেম এবং সব রকমের আনুগত্যের বিধানের উপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় দীনকে বিজয়ী করতে না পারলে এ কাজটি আদৌ সম্ভব নয় এটা সহজে বোধগম্য। তাই দীন ইসলামের অনুসারীরা রাষ্ট্রের প্রয়োজন সব সময়

---

২০. ড. মুহাম্মদ ইকবাল,The Reconstruction of Religious Thought in Islam (লাহোর, মুহাম্মদ আশরাফ, ১৯৭১) পৃ. ১৫৫।

২১. ১৮ : সূরা আল কাহাফ, আয়াত-৫৪

২২. ৭০ : সূরা আল মাআরিয, আয়াত-১৯

২৩. ১৭ : সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-১০০

২৪. ১৭ : সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-১১

২৫. ৮৯ : সূরা আল ফজর, আয়াত-২০

২৬. ৭০ : সূরা আল মাআরিয, আয়াত-২১

২৭. ৯ : সূরা আত তাওবা-৩৩, ৪৮ : সূরা আল ফাতহ-২৮, ৬১ : সূরা আস সফ-৯

অনুভব করেন। রাজনৈতিক পন্থায় আল্লাহর দীনের প্রাধান্য সৃষ্টি, দীন ইসলামের মহান আদর্শ ও মঙ্গলময় শাসননীতির ভিত্তিতে নাগরিকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন গঠন; রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন নাগরিক যাতে মানবোচিত জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য উপকরণ হতে বঞ্চিত না থাকে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক যাতে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের পূর্ণ সুযোগ সুবিধার গ্যারান্টি পায় তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই রাষ্ট্রের উপস্থিতি অপরিহার্য। নেতিবাচক দিক থেকে এ রাষ্ট্র সমাজজীবন হতে পাপ-পঙ্কিলতা, অনাচার-অবিচার, সামাজিক নীতি বিরোধী নিষ্ঠুর প্রহসন ও শোষণ, অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং যে কোন প্রকারের ভেদ বৈষম্য মূলোৎপাটন করবে। ইতিবাচক দিকে মানুষের প্রতিভা এবং যেসব মহান গুণাবলী দিয়ে আল্লাহ মানুষকে ভূষিত করেছেন সেগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশের পথও উন্মুক্ত করবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র আল্লাহর দেয়া একমাত্র দীন 'আল ইসলাম'কে বিজয়ী সিস্টেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ও রাখার বাহন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যক্তি বিশেষের বা শাসন কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের এবং জনগণের উপর স্বীয় উচ্চাভিলাষ ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উপকরণ নয়।

২.১১ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definitions of Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয় এমন রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্র ইসলামী নীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। অন্যকথায় যে রাষ্ট্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একচ্ছত্র প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সকল মানুষ সমানভাবে মহান আল্লাহর বান্দাহ হওয়া ও তাঁর নিকট জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির উপর যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতি-নীতির পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের কতিপয় প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে, যে দেশের অধিবাসীগণ ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হন তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

২. ইমাম আবু হানীফা (রহ) (৬৯৯-৭৬৭)-এর মতে, "যে ভূখণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং শাসক ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসারে যাবতীয়

কার্যসম্পাদন করে তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে।" ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

৩. আল্লামা আবুল হাসান আল মাওয়ার্দী (৯৭২-১০৫৮)-এর মতে, "দীনের পাহারাদারী, সংরক্ষণ ও দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনা ও নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।"

৪. আল্লামা ইবনে খালদুনের (১৩৩২-১৪০৬) মতে, 'ইসলামী শরীয়াতের দাবি অনুযায়ী নাগরিকদের বৈষয়িক, ইহজাগতিক ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনই ইসলামী রাষ্ট্র।'

৫. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯)-এর মতে, "ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নই এ রাষ্ট্রের লক্ষ্য। মানব জীবনের সকল দিককে এ রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বলে এটিকে সর্বাত্মক রাষ্ট্রও বলা যায়।"

৬. বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ-এর মতে, "যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মোতাবেক লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক প্রয়াস যে রাষ্ট্রে চালানো হয় তা-ই ইসলামী রাষ্ট্র।" (Islamic state is one which opts to conduct its affairs in accordance with the revealed guidance of Islam and accepts the sovereignty of Allah and the supremacy of this law and which devotes its resources to achieve this end.)[২৮]

৭. অধ্যাপক গোলাম আযম-এর মতে, "যে রাষ্ট্রের আইন রচনা, শাসন কার্য ও বিচারব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তারই নাম ইসলামী রাষ্ট্র।"[২৯] তাঁর মতে, ইসলামী রাষ্ট্র রাসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের দেখানো নমুনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

৮. আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ (১৯০০-১৯৯২)-এর মতে, "একটি রাষ্ট্রকে তখনই

২৮. প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ, ইসলামিক ল' এন্ড কনস্টিটিউশন গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ৬।
২৯. অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রশ্নোত্তরের আসর, দৈনিক সংগ্রাম, ৮ অক্টোবর, ১৯৮২।

ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় যখন ইসলামের সমাজ রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং দেশের মৌলিক শাসন সংবিধানে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"[৩০]

৯. বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এ. জেড. এম. শামসুল আলম-এর মতে, "আল কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সংগঠিত এবং পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।"[৩১] এরূপ রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান না হলেও তা হবে ইসলামী রাষ্ট্র।

১০. প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ (রহ)-এর মতে, "যে ভূখণ্ডে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য, সরকার, জনগণ ও আল্লাহর আইন তথা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ নীতির বুনিয়াদে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা ব্যবস্থাকে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্র।"[৩২]

১১. ড. মুহাম্মদ আহমদ সাকর-এর মতে, "ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান যা সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন সংগঠন, বৈধ লক্ষ্যসমূহের সার্থক রূপায়ণ, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন এবং বিশ্বাস ও আদর্শের সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য অপরিহার্য।"[৩৩]

১২. মুফতী মুহাম্মদ সফি (র)-এর মতে, "কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত নীতিমালার আওতাধীন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।"

১৩. ইমাম গাজ্জালী (রহ) (১০৫৮-১১১১)-এর মতে, "যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা অনুযায়ী ন্যায়নীতি আদর্শ অনুসরণে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং যে রাষ্ট্রে আদর্শ-ন্যায়নীতি সংরক্ষণ ও অনুশীলন করে তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"[৩৪]

১৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রহ) (১২৬৩-১৩২৮) মতে, 'ইসলামী রাষ্ট্র

---

৩০. মুহম্মদ আসাদ, ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি, ১৯৮০, পৃ. ২।

৩১. এ জেড এম শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৭১।

৩২. আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ১৯৮১, পৃ. ৪০।

৩৩. ড. মুহাম্মদ আহমদ সাকর, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা (সংকলন) ইসলাম ও নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিআইআইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯৯।

৩৪. ইমাম গাজ্জালী, তাহফাতুল ফালাসিফা

হল আদর্শভিত্তিক এমন প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে স্রষ্টা প্রদত্ত সকল আইন প্রয়োগ করা যায়'।

১৫. ড. আবদুল হামিদ আবু সুলায়মানের মতে, নিজেদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ বাস্তবায়নের জন্য উম্মাহ যে ধরনের সরকার নিজেদের জন্য পছন্দ ও বাঞ্ছনীয় মনে করবে তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলে গণ্য হবে এবং সে ব্যবস্থাকেই উম্মাহর সমর্থন করা প্রয়োজন। (Whatever system of government the Ummah chooses for itself in order to realise its spiritual and temporal aspirations is the one that should be understood as the Islamic State system and thus deserving of the ummah's support)[৩৫]

১৬. মাওলানা মুশাহিদ আলীর মতে, ইসলামী রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে ন্যায়-ইনসাফ তথা সুবিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং যেখানে জনগণের সামগ্রিক জীবনধারা পরিশুদ্ধ।[৩৬]

১৭. আল্লামা হিফজুর রহমানের মতে, ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা এবং দেশের মৌলিক শাসন-সংবিধানে যখন সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এরূপ রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

১৮. আল্লামা তাফতাযানী (রহ)-এর মতে, ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহানবী (সা) এর প্রতিনিধিত্বের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ইসলামী রাষ্ট্র।

পরিশেষে বলা যায় যে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত সে রাষ্ট্রই কেবল ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ রাষ্ট্র। এককথায় ইসলামী নীতি বা কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। অন্য কথায় ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর সামগ্রিক অগ্রগতি এবং মর্যাদার প্রসার ও ব্যাপ্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র।

---

৩৫. ড. আবদুল হামিদ আবু সুলায়মান, মুসলিম মানসে সংকট, আইআইআইটি, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯।

৩৬. মাওলানা মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, পৃ. ১।

২.১২ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিভাষা (Terminology of Islamic State)

১। খিলাফত।

২। খিলাফতে ইলাহিয়া/হুকুমতে ইলাহিয়া।

৩। ইসলামী হুকুমত।

৪। দারুল ইসলাম।

৫। খিলাফত আলা মিন হাজিহিন নবুওয়াত।

৬। ফালাহী রাষ্ট্র (Falahi state/welfare state)

২.১৩ ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্র (Islamic State and Muslim State)

ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলিম রাষ্ট্র এক নয়। কোন রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক এমনকি সকল নাগরিক মুসলমান হলেও সে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র নাও হতে পারে। তবে তাকে মুসলিম রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। মুসলিম অধ্যুষিত হলেই কোন রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হয় না।

প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদের মতে, "মুসলিম শাসক দ্বারা শাসিত যে কোন রাষ্ট্রকেই 'মুসলিম রাষ্ট্র' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।" (A Muslim state is any state which is ruled by Muslims)।[৩৭] এ ধরনের রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত আইনকানুন প্রতিষ্ঠিত নাও থাকতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী রাষ্ট্র	মুসলিম রাষ্ট্র
১। শরীয়াহ হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন।	১। শরীয়াহ সর্বোচ্চ আইন নয়। মানব রচিত আইন দ্বারা পরিচালিত।
২। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত।	২। জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত।
৩। রাষ্ট্রপ্রধান হতে হলে শরীয়া অনুযায়ী যোগ্যতা থাকতে হয়।	৩। যে কোন মুসলিম এমনকি অমুসলিমও মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন। যেমন : লেবাননের প্রেসিডেন্ট।

৩৭. প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ, ইসলামিক ল এণ্ড কনস্টিটিউশন গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ৬।

	একজন ম্যারোনাইট খ্রিস্টান লেবাননের প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকেন।
৪। রাষ্ট্রীয় আদর্শ ইসলাম।	৪। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র।
৫। রাষ্ট্র নির্বাহীগণ আল্লাহর নিকট, জনগণের নিকট ও বিবেকের নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন।	৫। আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি সক্রিয় থাকে না।
৬। ইসলামী রাষ্ট্র আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র বিধায় ইসলাম বাস্তবায়ন করাই হয় এ রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলাম বাস্তবায়নের উপায় মাত্র।	৬। মুসলিম রাষ্ট্র আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র নয় বিধায় ইসলাম বাস্তবায়ন এর প্রধান দায়িত্ব নয়।
৭। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ বিশ্বাসী নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়।	৭। মুসলিম রাষ্ট্র যে কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা যায়।

২.১৪ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic State)

একটি রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়, যখন ইসলামের রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং দেশের মৌলিক সংবিধানে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১। কুরআন সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র (Islamic State is Quran-Sunnah based) : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ রাষ্ট্র আল্লাহর আইন তথা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ নীতির বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী রাষ্ট্র সেসব বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলী কার্যকরী করবে, যা আল্লাহর প্রদান করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কোথাও বিস্তারিত আইন দিয়েছে, কোথাও শুধু মূলনীতি নির্ধারণ করেছে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে যখন যেখানে বিস্তারিত সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না তখন সেসব ব্যাপারে সত্যিকার ইসলামী চিন্তানায়কগণ কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতিকে সামনে রেখে চিন্তাভাবনা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌছেন। কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে এ চিন্তা গবেষণার নামই হচ্ছে ইজতিহাদ। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল আইন-কানুনকে কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক বিধি-বিধান অনুযায়ী হতে হবে।

২। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর (Sovereignty belongs to Allah) : ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র বুনিয়াদিভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেনে নেবে। সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর এবং তা কোন ব্যক্তি বা গ্রুপের নয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধিকে অথবা জনগণকে সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ শক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বভৌম শক্তি বলতে চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব ও সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিকেই বুঝায়। এ শক্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কুরআন শরীফে আয়াতুল কুরসীতে সার্বভৌম শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যিনি ছাড়া আর কোন সার্বভৌম শক্তি নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না তিনিই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আসমান ও যমীনের সবকিছুর একমাত্র মালিক তিনি তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করার সাহস কার আছে? অতীত-ভবিষ্যতের সবকিছু তিনি জানেন। তার জানার বাইরে কিছু নেই।[৩৮]

কুরআন শরীফে আরো বলা হয়েছে, "সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকারও কারো নেই, তাঁর সমকক্ষ কোন ক্ষমতাবান নেই। তাঁর হুকুম পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই।"[৩৯]

মহানবী (সা) বলেছেন, "জেনে রেখো, আল্লাহ ব্যতীত কোন সর্বোচ্চ ক্ষমতা নেই। তিনি ছাড়া হুকুম চালাবার অধিকার কারো নেই।"

তাই ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত সার্বভৌমত্বের উৎস হচ্ছে শরীয়ার নির্দেশাবলীতে প্রকাশিত আল্লাহর ইচ্ছা। মুসলিম সমাজের ক্ষমতা পরোক্ষ ধরনের এবং মুসলিম সমাজের সে ক্ষমতা সকলে যেন আল্লাহর দেয়া আমানত হিসেবেই ভোগ করে। ইসলামী রাষ্ট্র যার অস্তিত্ব জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং যা জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে সে রাষ্ট্র চূড়ান্ত পর্যায়ে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর কাছ থেকেই পায়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে প্রকৃত সার্বভৌম শক্তি আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা। খিলাফতের বা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দিয়েই তাকে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।[৪০]

---

৩৮. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৫

৩৯. ৫৯ : সূরা আল হাশর : ২৩-২৪

৪০. ২ : সূরা আল বাকারা : ৩০

এ খিলাফত শুধু হযরত আদম (আ)-এর নয় বরং বনি আদমের।[৪১]

কাজেই নীতিগতভাবে সমস্ত মানুষই আল্লাহর খলীফা। আর সেই কার্যত: খলীফা হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তার অধীনে ও নির্দেশক্রমে দায়িত্ব পালন করে, প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে বসবে তারা কার্যত: খলীফার মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে।[৪২] কাজেই বলা যায় যে, সব মানুষ নীতিগতভাবে খলীফা হলেও কার্যত আল্লাহর প্রতি ঈমানদারগণই খলীফা। খিলাফত বা সরকার এক ধরনের কর্তৃত্ব। ইসলামী সমাজে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই। এখানে খিলাফত বা সরকার প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকারী। ইসলামী দর্শনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের তুলনায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সীমিত। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্রে 'সম্রাট' কিংবা রাজা ইত্যাদির পরিবর্তে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যটি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিচের বিষয়সমূহ লক্ষণীয় :

১. প্রকৃত এবং নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।
২. পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কেবলমাত্র সীমিত সার্বভৌমত্বের অধিকারী।
৩. মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য দুই-ই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত।

৩। আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র (Islamic State is an Ideological State) : ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মতে, ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতেই এ রাষ্ট্র গড়ে উঠে। কোন ভাষা, বর্ণ, ভূগোল, গোত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে এ রাষ্ট্র গঠিত হয় না। এখানে ইসলাম গ্রহণ করলে যে ভাষার, যে গোত্রের, যে বর্ণের হোক তারা এক জাতি– এক উম্মাহ। আর যারা, তা করে না ভাষা, বর্ণ, গোত্র, দেশ এক হলেও তারা পৃথক হয়ে পড়বে। তাই রাষ্ট্রের মূল পরিচালনায় থাকবে আদর্শে বিশ্বাসী লোকগণ। যারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের মূল পরিচালনায় থাকবে না। অবশ্য নাগরিক হিসেবে আইনের আওতায় অন্যান্য অধিকার ভোগ করবে ও সুবিধা লাভ করবে।

৪। কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) : ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যক্রম ও দায়দায়িত্ব

---

৪১. দ্রষ্টব্য ৬ : সূরা আল আনআম : ১৬৫, ২৭ : সূরা আন নামল : ৬২, ৩৫ : সূরা আল ফাতির : ৩৯

৪২. ৩৫ : সূরা আল ফাতির : ৩৯

পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এটি একটি ব্যাপকভিত্তিক সর্বোত্তম কল্যাণ রাষ্ট্র। মানুষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিভিত্তিক, আর্থ- সামাজিক-রাজনৈতিক কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য। সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এ রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোর মর্যাদা প্রদান ও নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের মৌল কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নাগরিকদের আত্মিক-বৈষয়িক-সার্বিক দিকের বিকাশ, উন্নয়ন, অগ্রগতির পরিবেশ সৃষ্টি, আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দান রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বস্তুত মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনই ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ।

৫। নির্বাচিত শাসক (Elected Government) : ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক হবেন নির্বাচিত। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই শাসক নির্বাচিত হবেন। আর এ মতামতও স্বাধীন, ভয়ভীতিহীন পরিবেশে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসন পরিচালনার ভার একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের/আমীরের উপর ন্যস্ত করা হয়। একটি নির্বাচিত শূরা বা আইন পরিষদ সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ দান ও সহযোগিতা করবেন। জনগণের আস্থার উপর রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকালের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

শাসক যে নির্বাচিত হবেন খিলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্ত থেকেও এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে। মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হন। প্রথমে সাকীফায়ে বনি সাঈদায় আনসারগণ মিলিত হন। পরে মুহাজিরগণ সেখানে যান। খলীফা কে হবেন বা কাদের মধ্য থেকে হবেন এ আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু বকরের নাম প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সবাই শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে মদীনার জনগণ (যারা তখন কার্যত সারাদেশের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন) কোন প্রকার চাপ ব্যতীতই সন্তুষ্টচিত্তে হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর ইনতিকালের পূর্বে পরবর্তী খলীফার ব্যাপারে প্রধান প্রধান সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে খলীফা হিসেবে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর বিষয়টি তিনি সাধারণ সভায় পেশ করেন এবং সবাই তা গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয়জনের একটি নির্বাচনী বোর্ড গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে শেষ পর্যন্ত পরবর্তী খলীফার নাম প্রস্তাব করার অধিকার দেয়া হয়। তিনি মদীনায় রাষ্ট্রের ঘরে ঘরে গিয়ে জনমত যাচাই করেন এবং বুঝার চেষ্টা করেন কে বেশি জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। সে অনুযায়ী হযরত উসমান (রা)-এর নাম প্রস্তাব করা হয় এবং সাধারণ সমাবেশে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর জনগণ হযরত আলী (রা)-কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বললে তিনি বলেছিলেন, 'খলীফা নির্বাচিত হবে মুসলমানদের মর্জি অনুযায়ী।'[৪৩] এসব দৃষ্টান্ত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান একটি নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলিম বা তাদের প্রতিনিধিদের পারস্পরিক পরামর্শ ও স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই তা কায়েম হতে পারে।

এক্ষেত্রে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের (রহ) (৭১৭–৭২০) বক্তব্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ) সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক (৭১৫–৭১৭) কর্তৃক গোপন অসিয়াতক্রমে খলীফা হলে তিনি নিজেই তার প্রথম ভাষণে খিলাফত নিষ্পন্ন হওয়ার সঠিক পদ্ধতি জনসম্মুখে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমার উপর এ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আমি এটা চাইনি। এ ব্যাপারে আমার মতামত নেয়া হয়নি। মুসলমানদের পরামর্শও গ্রহণ করা হয়নি। তোমাদের ঘাড়ে আমার আনুগত্যের যে রজ্জু পরিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি নিজে তা খুলে ফেলছি। এখন যাকে খুশি তোমরা নিজেদের নেতা বানাতে পারো।"

তখন জনতা সমবেত কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রতি সমর্থন জানান। এরপরই তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অতএব একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে ইসলামের নেতৃত্ব ও খিলাফত একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা। শক্তির জোরে বা বংশানুক্রমিকভাবে এ পদ লাভসিদ্ধ নয়।

অবশ্য নির্বাচন, পরামর্শ গ্রহণ ও জনমত যাচাইয়ের নির্দিষ্ট কোন পন্থা ইসলাম বিধিবদ্ধ করে দেয়নি কারণ সব যুগের সব দেশের জন্য এসব ব্যাপারে একই পদ্ধতি অবাস্তব। তাই বিষয়টি মুসলমানদের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে

৪৩. আততাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫০।

তারা ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার মূলনীতি স্বাধীন পরামর্শ ও স্বাধীন বায়াতের নীতির ভিত্তিতে যুগ-দেশ ও পরিস্থিতির আলোকে একটি শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারে।

৬। শূরাভিত্তিক সরকার (Shura-Consultative Government) : ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, সরকার পরিচালনা, নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কুরআন ও সুন্নাহর যেখানে কোন নির্দেশ নেই যেখানে শূরায়ী নীতি কার্যকর হবে। 'শূরার' তাৎপর্য ও গুরুত্ব ইসলামী রাষ্ট্রে অপরিসীম।

মোটকথা, 'শূরার' উপস্থিত ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র সঠিক পথে চলতেই পারে না। অবশ্য মজলিসে 'শূরার' গঠন পদ্ধতি বা জনগণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বিধিবদ্ধ করেনি– শুধু কতিপয় নীতিমালা দিয়েছে। যার আলোকে ও স্থান কালভেদে নিয়মিত মজলিসে শূরা গঠন ও জনগণের মতামত গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্তমানে কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত 'শূরা' কায়েম করা প্রয়োজন। যাতে সর্বস্তরে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় উপযুক্তভাবে অংশ নিতে পারে।

৭। রাষ্ট্রীয় কোষাগার বায়তুলমাল একটি আমানত (Baitulmal- State Treasury is Amanah) : ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল-ধনভাণ্ডার-সহায়-সম্পদ সবই জনগণের আমানত। শরীয়াহ্ মোতাবেক ও জনগণের কল্যাণের নিমিত্তেই ন্যায়সঙ্গত পন্থায় রাষ্ট্রের আয় করতে হবে, ব্যয়ও করতে হবে। কোন প্রকার অপচয়, অন্যায় ব্যয়, বে-ইনসাফী করা চলবে না। হযরত সালমান ফারসী (রা) দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, "মুসলমানদের ভূমি থেকে আপনি যদি এক দেরহামও অন্যায়ভাবে উসূল করেন এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তাহলে আপনি খলীফা নন, বাদশাহ্।" একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) স্বীয় মজলিসে বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি এখনও বুঝতে পারছি না আমি বাদশাহ্ না খলীফা!" এতে জনৈক ব্যক্তি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, হযরত ওমর ফারুক (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি পার্থক্য? তিনি বললেন, খলীফা অন্যায়ভাবে কিছুই গ্রহণ করে না, অন্যায়ভাবে কিছু ব্যয় করেন না। আপনিও অনুরূপ। আর বাদশাহ্ তো মানুষের উপর যুলুম করে, অন্যায়ভাবে একজনের নিকট থেকে সংগ্রহ করে, অন্যায়ভাবেই অপরজনকে দান করে।[৪৪]

---

৪৪. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬-৩০৭।

ইমাম আবু হানীফার মতে, "যে ইমাম (শাসক) ফাই অর্থাৎ জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ-ব্যবহার করবে অথবা নির্দেশের ক্ষেত্রে অন্যায়ের আশ্রয় নেয় তার ইমামত-কর্তৃত্ব বাতিল, তার নির্দেশ বৈধ নয়।"[৪৫]

মোটকথা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের আয় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করেছে। শাসক ও তার সহযোগীরা ইচ্ছেমত বা জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে জনগণের সম্পদ ব্যয় করবে এটা কোনক্রমেই ইসলামী রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

৮। সরকারের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা (Governments responsibility and accountability) : ইসলামী রাষ্ট্রে শাসকগণ, মূলত জনগণের প্রতিনিধি। জনগণের বিষয়াবলী পরিচালনায় দায়িত্বশীল। তাই তাদের কাজকর্মের জন্য ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে একদিকে যেমন তারা আল্লাহর নিকট দায়ী হবে অপরদিকে জনগণের নিকটও দায়ী থাকবে। ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, শাসন ক্ষমতা একটি আমানত। রাসূল (সা) বলেছেন :

وَاِنَّهَا اَمَانَةٌ وَاِنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ اِلاَّ مَنْ اَخَذَ بِحَقِّهَا وَاَدَى الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا.

উচ্চারণ : ওয়া ইন্নাহা আমানাতুন ওয়া ইন্নাহা ইয়াওমুল কিয়ামাতি খিযয়ুন ওয়া নাদ্বামাতু ইল্লা মান আখাযা বিহাক্কিহা ওয়া আদাল্লাযী আলাইহি ফীহা।

অর্থ : ইহা (নেতৃত্ব) হচ্ছে একটি আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যিনি ন্যায়ভিত্তিক নেতৃত্বের অধিকারী, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন তার কথা আলাদা।"[৪৬]

অন্যদিকে এ 'আমানত'কে সঠিক পাত্রে সোপর্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانَاتَ اِلٰى اَهْلِهَا.

উচ্চারণ : ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরুকুম আন তুয়াদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা।

---

৪৫. আযযাহাবী : মানাকিবুল ইমামিল আযম আবি হানীফা ওয়া সাহাবাইহে, পৃ. ১৭; আলমাক্কী : মানাকিবুল ইমামিল আযম আবি হানীফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০।

৪৬. সহীহ মুসলিম

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদের যোগ্য ব্যক্তির হাতে আমানত সোপর্দ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।"[৪৭]

কাজেই নেতৃত্বের আমানত যেমন যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে সোপর্দ করতে হবে ঠিক তেমনি নেতৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিদেরকে নিজেদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির জন্য বাধ্য করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلاَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ فَاِمَامُ الْاَعْظَمَ الَّذِىْ عَلٰى رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهٖ.

উচ্চারণ : আলা কুল্লুকুম রা'ইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলিন 'আন রাইয়িতিহি ফাইমামুল আ'যামুল্লাযি 'আলা রায়্যিন ওয়া হুয়া মাসউলুন আন রাইয়াতিহি।

অর্থ : "সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা– যিনি সবার উপর শাসক হন– তিনিও দায়িত্বশীল তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"[৪৮]

শাসক শ্রেণীর দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড ও দায়িত্বের অপব্যবহার অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

مَا مِنْ اَمِيْرٍ يَلِىْ اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لاَ يَجْهَرْ لَهُمْ وَلاَ يَنْصَحُ اِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِىْ الْجَنَّةِ.

উচ্চারণ : মা মিন আমীরিন ইয়ালী আমরাল মুসলিমীনা ছুম্মা লা ইয়াজহার লাহুম ওয়া ইয়ানছাহু ইল্লা লাম ইয়াদখুলু মাআ'হুম ফিল জান্নাহ।

অর্থ : "মুসলিম রাষ্ট্রের পদাধিকারী কোন শাসক যিনি দায়িত্ব পালনের প্রাণপণ চেষ্টা করেন না, নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন না তিনি কখনও মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না।"[৪৯]

مَنْ اَخْوَنَ الْخِيَانَةِ تِجَارَةَ الْوَلِىِّ فِىْ رَعْيَتِهٖ.

উচ্চারণ : মান আখওয়ানাল খিয়ানাতি তিজারাতিল ওয়ালা ফী রায়্যিতিহী।

---

৪৭. ৪ : সূরা আননিসা : ৫৮

৪৮. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, মুসলিম : কিতাবুল ইমারাত

৪৯. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত

অর্থ : "শাসকের জন্য শাসিতের সাথে ব্যবসা করা নিকৃষ্ট খিয়ানত।"[৫০]

দায়িত্বের এ কঠিন বোঝার অনুভূতিতে হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেছিলেন, "ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরির বাচ্চাও ধ্বংস হয়, তবে আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ্ আমাকে সেজন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"[৫১]

খোলাফায়ে রাশেদীন আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতির পাশাপাশি জনগণের নিকটও জবাবদিহির ব্যাপারে ছিলেন সতর্ক। হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হওয়ার পর যে ভাষণ দেন তাতে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, "আমি সঠিক কাজ করলে আমাকে সহযোগিতা করবে, অন্যায় করলে আমাকে সোজা করে দেবে।... তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবল যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের অধিকার দান না করি।... আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) নাফরমানি করলে তোমাদের উপর আমার কোন আনুগত্য নেই।"[৫২]

হযরত ওমর ফারুক (রা) এক ভাষণে বলেন, "হে লোক সকল! আমার উপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে আমি তোমাদের নিকট তা ব্যক্ত করছি। এসব অধিকারের জন্য তোমরা আমাকে পাকড়াও করতে পারো।"[৫৩]

একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) প্রকাশ্য ঘোষণা দেন যে, "তোমাদের পিটাবার জন্য আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আমি গভর্ণরদেরকে নিযুক্ত করিনি। তাদেরকে নিযুক্ত করেছি এজন্য যে তারা তোমাদেরকে দীন ও নবীর পদ্ধতি শিক্ষা দিবে। কারো সাথে এ নির্দেশ বিরোধী ব্যবহার করা হলে আমার কাছে অভিযোগ পেশ করো। আল্লাহর কসম : আমি তার (গভর্ণর) কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।"

একবার হজ্জ উপলক্ষে হযরত ওমর ফারুক (রা) সমস্ত গভর্ণরদের ডেকে প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলেন, "এদের বিরুদ্ধে কারো উপর কোন অত্যাচারের অভিযোগ থাকলে নির্দ্বিধায় পেশ করতে পারো। এক ব্যক্তি মিসরের গভর্ণর আমর ইবনুল আসের (রা) বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে চাবুক মারার অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে গভর্ণরের নিকট থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়ার নির্দেশ দেন।"[৫৪]

---

৫০. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং-৭৮।

৫১. কানযুল উম্মাল : ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২৫০৫।

৫২. আততাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫০; ইবনে হিশাম, আস সীরাতুন্নববীয়া, ৪র্থ খণ্ড।

৫৩. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১১৭।

৫৪. ঈমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১১৬।

শুধু গভর্ণরদের ব্যাপারেই নয় নিজেও তার সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য জনসম্মুখে জবাবদিহি করতেন। একবার এক ব্যক্তি প্রকাশ্য মজলিসে তার নিকট কৈফিয়ত তলব করেন যে, "আমাদের সকলের ভাগে একখানা চাদর পড়েছে। আপনি দু'খানা চাদর কোথায় পেলেন? তখন খলীফাতুল মুসলিমিনকে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর সাক্ষ্য পেশ করতে হলো যে, তিনি তার নিজেরটা পিতাকে ধার দিয়েছেন।[৫৫]

একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) মজলিসে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যদি কোন ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাই তোমরা কি করবে?" হযরত বিশ্‌র ইবনে সাদ (রা) বললেন, "এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মত সোজা করে দিব।" তখন হযরত ওমর করুক (রা) বললেন, "তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ।"[৫৬] অন্যান্য রাশেদ খলীফাগণও একই নীতি অবলম্বন করতেন।

কাজেই সরকারকে অবশ্য তার কাজকর্ম, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সম্বন্ধে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সরকারের নিকট নিয়মমাফিক জনগণ কৈফিয়ত তলব করতে পারবে। প্রয়োজনে এর জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধি রচনা করতে হবে। মোটকথা, ইসলামী সরকারকে অবশ্যই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে ও জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৯। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Freedom of Judiciary) : খিলাফত ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বিচারকগণ যাতে সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও বাইরের প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ আইনের কর্তৃত্বের অধীনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।

বাইরের চাপ, হস্তক্ষেপ কোন কিছু দ্বারাই বিচার বিভাগকে প্রভাবিত হলে চলবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ.

উচ্চারণ : ওয়া আনিহকুম বাইনাহুম বিমা আনযাল্লাহু ওয়া লা তাত্তাবিউ' আহওয়াআহুম ওয়াহযুরহুম আইয়্যাফতিনুকা আন বা'দি মা আনযালাল্লাহু ইলাইকা।

---

৫৫. ইবনুল জাওযী, সীরাতে ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃ. ১২৭।

৫৬. কানযুল উম্মাল : ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২৪১৪।

অর্থ : "আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করো এবং তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো না। সাবধান থাকো, তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহর নাযিল করা হিদায়াত থেকে এক বিন্দু দূরে সরাতে না পারে।"[৫৭]

কাজেই বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক। আইনই তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে– কোন প্রশাসক বা নির্বাহী বা অন্য কোন ব্যক্তি নয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেও এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

খলীফাগণ কোন অবস্থাতেই বিচারের রায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেননি। এমনকি খলীফার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলেও যথারীতি তাদেরকে বিচারকের সামনে হাজির হতে হয়েছে এবং অভিযোগ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হয়েছে।

বিচার বিভাগের মূল দায়িত্ব যেহেতু ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তাই এক্ষেত্রে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ এবং সুপারিশের দরজা বন্ধ থাকা উচিত। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পদমর্যাদার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করা যাবে না।[৫৮]

আমি একবার ইমাম আবু হানীফা (৬৯৯-৭৬৭) বিচারপতির পদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণ দর্শাতে গিয়ে আব্বাসীয় শাসক আবু জাফর আল মনসুরকে (৭৫৪–৭৭৫ খ্রি:) বলেন, "কোন ব্যাপারে যদি আমার ফয়সালা আপনার বিরুদ্ধে যায় আর আপনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেন যে, তোমার ফয়সালা পরিবর্তন না করলে তোমাকে ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে– মারব তখন হয়তো আমি নদীতে ডুবে মরব, কিন্তু ফয়সালা পরিবর্তন করব না...।"[৫৯]

অতএব, পূর্ব যুগ এবং এ যুগের ইসলামী বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে যে, বিচার বিভাগ অবশ্যই প্রশাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন থাকবে।[৬০] এটি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য।

---

৫৭. ৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৯।

৫৮. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৫২-১৫৩।

৫৯. আলমাক্কী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০; আল খতীব, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩২০।

৬০. ১৯৫১ সালের ২১-২৪শে জানুয়ারী পাকিস্তানের সব দলের ও মযহাবের নেতৃস্থানীয় উলামাগণ কর্তৃক সর্বসম্মত রায়ে গৃহীত ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের ১৯শ' প্রস্তাব দ্রষ্টব্য। এছাড়াও Ansaris Commission's Report on Form of Government, 4th August 1983, Pakistan Chap iv.

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে, ইনসাফ কায়েম করা। জনগণের এটি মৌলিক অধিকার। তাই বিচার পাওয়ার জন্য, ইনসাফের জন্য কোন প্রকার ফি প্রদান, মূল্য প্রদানের নীতি ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্র ইনসাফ করার জন্য অভিযোগকারীর নিকট থেকে অর্থ আদায় করবে এর চেয়ে বে-ইনসাফী আর কি হতে পারে? অতএব, ইসলামী রাষ্ট্রে বিনা মূল্যেই বিচার হতে হবে।

১০। সরকারের আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ (Allegiance to Government is conditional) : ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হয় ইসলাম অনুযায়ী সমাজকে পরিচালনা করার জন্য। তাই সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, নিজেরা ইসলামের পথে চলবে এবং দেশকেও ইসলামের পথে চালাবে। আর এমনি অবস্থায় জনগণেরও কর্তব্য হচ্ছে, সরকারের আনুগত্য করা– তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদের সহযোগিতা করা। কিন্তু এ আনুগত্য ও সহযোগিতা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর যতক্ষণ সরকার তথা শাসকগণ সত্যের পথে থাকে। অন্যায় পথে ধাবিত হলে, পাপাচারের দিকে চললে আর আনুগত্য-সহযোগিতা চলতে পারে না।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى - وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

উচ্চারণ : ওয়া তা'আওয়ানু 'আলাল বিররি ওয়াত্তাকওয়া ওয়া লা তা'আওয়ানু 'আলাল ইছমি ওয়াল উদওয়ান।

অর্থ : "ভালো ও তাকওয়ামূলক কাজে সহযোগিতা করো, আর পাপ-অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কারো সহযোগিতা করো না।"[৬১]

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "একজন মুসলমানের উপর তার আমীরের আনুগত্য করা অপরিহার্য তা পছন্দ হোক আর না হোক যতক্ষণ তাকে পাপাচারের নির্দেশ না দেয়া হয়। মাসিয়াত বা পাপাচারের নির্দেশ দেয়া হলে কোন আনুগত্য নেই।"[৬২]

আর একটি হাদীসে রয়েছে :

لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةَ فِى الْمَعْرُوْفِ.

উচ্চারণ : লা তা'আতা ফী মাছিয়াতিল্লাহি ইন্নামাত ত'আতি ফিল মা'রূফি।

---

৬১. ৫ : সূরা আল মায়িদা : ২।

৬২. বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ।

অর্থ : "আল্লাহর নাফরমানিতে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল ভালো কাজে।"[৬৩]

খলীফা হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা) প্রথম ভাষণেই বলেন, "আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি তোমরা আমার আনুগত্য করো। যখন আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করব তখন আমার প্রতি তোমাদের কোন আনুগত্য নেই।"[৬৪]

হযরত আলী (রা) বলেন, "আল্লাহর আনুগত্য করে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তা মেনে চলা তোমাদের উপর ফরয– সে নির্দেশ তোমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আর আল্লাহর নাফরমানী করে আমি তোমাদের যে নির্দেশ দেই– আল্লাহর সাথে মাসিয়াত বা পাপাচারের ক্ষেত্রে কারো জন্য আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল ভালো কাজে।"[৬৫]

অতএব, এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আনুগত্য শর্তহীন ও নিরঙ্কুশ নয়, বরং শুধু ভালো কাজেই আনুগত্য করতে হবে। অন্যায় কাজে আনুগত্যের দাবী কোন ইসলামী সরকারই করতে পারে না, এমন কিছু দাবী করা হলে তা মানাও যাবে না।

১১। ইসলামী রাষ্ট্র একটি সর্বাত্মক রাষ্ট্র (Islamic state is a totalitarian state) : ইসলামী রাষ্ট্র একটি সর্বাত্মক রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের জীবনের সকল বিভাগের উপর এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। এই সর্বাত্মক ব্যবস্থার ভিত্তি হলো আসলে আল্লাহর যে আইন দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সেই আইনই সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী। আল্লাহ্ পাক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যেসব নির্দেশ জারী করেছেন তা ইসলামী রাষ্ট্র সর্বোতভাবে কার্যকর করে। কিন্তু ঐসব নির্দেশের প্রতিকূলে ইসলামী রাষ্ট্র স্বয়ং জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। রাশিয়া, ইতালী ও জার্মানীর একনায়কগণ যেসব স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন ইসলাম কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদেরকে এ ধরনের ক্ষমতা দেয়নি। এছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিকট দায়ী। এই ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা এমন একটি ব্যাপার যাতে ব্যক্তির কোন অংশীদারিত্ব নেই। সুতরাং

---

৬৩. মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ।

৬৪. কানযুল উম্মাল : ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২২৮২।

৬৫. কানযুল উম্মাল : ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-২৫৮৭।

আইনের সীমানার মধ্যে নাগরিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, যাতে সে নিজের জন্য যে কোন পথ অবলম্বন করতে পারে এবং যেদিকেই তার ঝোঁক হয় সেদিকেই নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারবে। শাসক যদি নাগরিকের পছন্দে বাধা দেয় তাহলে সে যুলুমকারী হিসেবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে। এ কারণে মহানবী (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের নাম নিশানাও চোখে পড়ে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একনায়কসুলভ শাসক হয়ে জেঁকে বসার কোন অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকই খলীফা। সাধারণ মুসলমানদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হওয়ার অধিকার কারো নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে যিনি বা যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তার বা তাদের প্রকৃত অবস্থা হলো, সকল মুসলিম অথবা পারিভাষিকভাবে বলতে গেলে সকল খলীফা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ খিলাফতকে প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে তার বা তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে দেয়। এজন্য শাসক একদিকে আল্লাহর সামনে অপরদিকে যারা তার কাছে নিজ নিজ খিলাফতকে অর্পণ করেছে সে সমস্ত খলীফার সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য এরপর যদি কেউ দায়িত্বহীন একনায়কে পরিণত হয় তাহলে সে আর খলীফা থাকে না, বরং শোষক ও জবরদখলকারীতে পরিণত হয়। কেননা একনায়কত্ব আসলে জনগণের সার্বজনীন খিলাফতের অস্বীকৃতি।

১২। ইসলামী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক (Islamic state is Democratic) : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন এবং পরিচালনা ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে এটি ইসলামী গণতন্ত্রের প্রধান নীতি। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ বল্গাহীন নয়। রাষ্ট্রের আইন-কানুন, জনগণের জীবন যাপনের মূলনীতি, আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি, রাষ্ট্রের উপায়-উপকরণ সবকিছুই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হবে এমন নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত বিধান, মহানবী (সা)-এর প্রদর্শিত পন্থা, ইসলামের নৈতিক বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলী দ্বারা জনগণের কামনা-বাসনা-প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র যখন আল্লাহর আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয় তখন এর পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ কারো থাকে না। সামাজিকভাবে গোষ্ঠী জাতিও যদি এর পরিবর্তন সাধন করতে চায় বা করে ফেলে তাহলে মুসলিম জনগণ ঈমানের গণ্ডী থেকে দূরে সরে যাবে।

আধুনিককালে সমগ্র বিশ্বে জনমতের ভিত্তিতে নেতা বা শাসক নির্বাচনের মূলনীতি সর্বজন স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। এটি ইসলামের শিক্ষারই ফল। ইসলাম নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এখানে গণতন্ত্র মানে নির্বাচনী গণতন্ত্র। আইন তৈরির গণতন্ত্র নয়। কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ এবং সূরা আশ শূরার ৩৮ নং আয়াতের ভিত্তিতেই নির্বাচনী গণতন্ত্র সার্বজনীনতা লাভ করেছে। সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশই অনুকূল পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই সার্থক পদ্ধতি। ইসলামে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশ গ্রহণকেই বুঝান হয়ে থাকে।

১৩। আইনের প্রাধান্য বা আইনের শাসন (Rule of law) : ইসলামী রাষ্ট্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনের শাসন কায়েম হবে, কেউ-ই আইনের উর্ধ্বে থাকবে না। আইনের চোখে প্রতিটি মানুষ সমান বিবেচিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের চোখে সবাই সমান। রাষ্ট্রের আদালত সবার জন্য সমভাবে আইন প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সমাজের একজন সাধারণ লোক পর্যন্ত সবাই সমান। সমস্ত ক্ষমতাসীনদের কার্যক্রম নির্ধারিত হবে আইনের দ্বারা। স্বেচ্ছাচার, অরাজকতা, একনায়কতন্ত্রসুলভ কার্যক্রম, দমননীতি কোন কিছুই এখানে চলতে পারে না। আইনের বাইরে কেউ যেতে পারে না, কেউ আবার ইচ্ছেমত আইন নিজ হাতে তুলেও নিতে পারবে না। আইন প্রয়োগও আইনসম্মত পন্থায় হতে হবে। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

১৪। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য (Equilibrim between individualism and collectivism) : ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে। ব্যক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও ইসলামের নীতি নয়। ব্যক্তির কল্যাণ, সমষ্টির কল্যাণ উভয়ই সমভাবে বিবেচ্য। অবশ্য সমষ্টির কল্যাণই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু সমষ্টির কল্যাণের নামে যা কিছু ইচ্ছা করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। এর জন্যও ইসলামী শরীয়াতের আওতায়ই পদক্ষেপ নিতে হবে। ইসলামী তত্ত্বে ব্যক্তি ও সমাজ পরিপূরক-পরস্পর সহযোগী। তাই সমন্বিত ভাবধারাই ইসলাম পোষণ করে। সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিকে যেমন ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ঠিক তেমনি সমাজকে ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত দাবীর দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

২.১৫ ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী (Aims and Objectives of Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্রকে এক ব্যাপকভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী, যা কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

১। সালাত ও যাকাতভিত্তিক সমাজ গঠন : ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বপ্রথম যেসব বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে, সালাত কায়েম করা, যাকাত ব্যবস্থা চালু করা। আল্লাহ্ বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

উচ্চারণ : আল্লাযীনা ইমমাক্কান্নাহুম ফিল আরদি আকামুছ সালাতা ওয়া আতাউয্ যাকাতা ওয়াআমারু বিল মা'রূফি ওয়া নাহাও আনিল মুন্কার।

অর্থ : "তাদেরকে (মুসলমানদের) যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, ভালো কাজের নির্দেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে।"[৬৬]

উপরিউক্ত আয়াত স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে সালাত কায়েম ও যাকাত ব্যবস্থা চালু করা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সালাত ও যাকাত দীনের শুধু মৌলিক অংশই নয় বরং তা মূলত গোটা দীনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। 'সালাত' হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে বান্দা-প্রভু সম্পর্কের প্রতীকী প্রকাশ আর 'যাকাত' হচ্ছে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক অধিকার ও বৈষয়িক সহযোগিতার প্রতীকী ব্যবস্থা। তাই সালাত কায়েম ও যাকাত ব্যবস্থা চালু মানেই হচ্ছে আল্লাহর উলুহিয়াত-উবুদিয়াত-রবুবিয়াত- মুলুকিয়াত ও মানবীয় ভ্রাতৃত্বের এবং বৈষয়িক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ কাঠামো নির্মাণ করা। মোটকথা, সালাত ও যাকাতভিত্তিক সমাজ গঠন ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

২। আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা : ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায়-অবিচার নির্মূল করা, আইনের শাসন কায়েম করা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ দ্ব্যর্থহীন :

---

৬৬. ২২ : সূরা আল হাজ্জ : ৪১

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ـ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ـ

উচ্চারণ : ওয়া কুল আমানতু বিমা আনযালাল্লাহু মিন কিতাবি ওয়া উমিরতু লিআ'দিলা বাইনাহুম।

অর্থ : "এবং বল (হে নবী), আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে আমি তোমাদের মাঝে সুবিচার করব।"[৬৭]

সর্বক্ষেত্রে সুবিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুমিনদেরকে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ.

উচ্চারণ : ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ কূনূ কাওয়ামীনা বিলকিসতি।

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনসাফের ধারক হও।"[৬৮]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ.

উচ্চারণ : ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ কূনূ কাওয়ামীনা লিল্লাহি শুহাদাআ বিলকিসতি।

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর জন্য (সত্যনীতির উপর) দণ্ডায়মান হও এবং ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও।"[৬৯]

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ... وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ـ

উচ্চারণ : ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিলআদলি ওয়ালইহসান... ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্সায়ি ওয়ালমুংকারি ওয়ালবাগ্য়ি।

অর্থ : "আল্লাহা তা'আলা আদল-সুবিচার-অনুগ্রহ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্যায় পাপ-নির্লজ্জতা ও যুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন।"[৭০]

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ـ

---

৬৭. ৪২ : সূরা আশ শূরা : ১৫
৬৮. ৪ : সূরা আন নিসা : ১৩৫
৬৯. ৫ : সূরা আল মায়িদা : ৮
৭০. ১৬ : সূরা আন নাহল : ৯০

উচ্চারণ : ওয়া ইযা হাকামতুম বাইনান নাসি আন্ তাহকুমূ বিল'আদলি।

অর্থ :"এবং লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) ফয়সালা করবে তখন সুবিচারসহকারে করবে।"[৭১]

রাসূল ও কিতাব পাঠাবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ -

উচ্চরণ : লাকাদ আরসালনা বিলবাইয়িনাতি ওয়া আনযালনা মা'আহুমুল কিতাবা ওয়াল মীযানা লিইয়াকূমান্নাসু বিলকিসতি।

অর্থ : "আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী দিয়ে পাঠিয়েছি, সে সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"[৭২]

হযরত দাউদ (আ)-কে খিলাফত দানের পর আল্লাহ তায়ালা সত্য সুবিচারসহকারে শাসনকার্য চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন :

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.

উচ্চারণ : ইয়া দাউদু ইন্না যা'আলনাকা খালীফাতান ফিল আরদি ফাহকুম বাইনান্ নাসি বিলহাক্কি।

অর্থ : "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব লোকদের মধ্যে সত্যতাসহকারে শাসন চালাও।"[৭৩]

অতএব, হক ইনসাফ কায়েম করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌল লক্ষ্য।

৩। সামগ্রিকভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় বিদূরণও ইসলামের লক্ষ্য : সমাজে যত অন্যায়-মন্দ আছে, তা অবশ্যই নির্মূল করা এবং সর্বপ্রকার ন্যায় ও ভালো কাজকে প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সূরা আল হাজ্জের ৪১ নং আয়াতে ক্ষমতা লাভ করলে নামায কায়েম ও যাকাত ব্যবস্থা চালু করার সাথে

---

৭১. ৪ : সূরা আন নিসা : ৫৮

৭২. ৫৭ : সূরা আল হাদীস : ২৫

৭৩. ৩৮ : সূরা সাদ : ২৬

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নির্মূল করার কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম জাতির সামষ্টিক দায়িত্বও আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

উচ্চারণ : কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি তামুরূনা বিলমা'রূফি ওয়া তানহাওনা আ'নিল মুনকার।

অর্থ : "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। তোমাদেরকে মানব জাতির জন্যই উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে, অন্যায়-অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।"[৭৪]

আর রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মুসলমানদের জাতিগত দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করা সম্ভব। অতএব, আমর বিল মারূফ নাহি আনিল মুনকার রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রষ্টা মানুষের মধ্যে যেসব গুণাবলী দেখতে চান সেগুলোর প্রচলন, প্রতিপালন ও বিকাশ এবং তিনি যেগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন সেগুলোকে বাধা দেয়া ও দূর করা। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ধার্মিকতা, নৈতিক উৎকর্ষতা, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্রতা, সফলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমৃদ্ধির আদর্শ গুণাবলী অর্জনের জন্য প্রয়াস চালাবে। তারা সকল ধরনের অন্যায়, দুর্নীতি, ভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ইসলাম এমন প্রগতিশীল ব্যবস্থা যা কিছু ভালো তার সবই ইসলাম গ্রহণ করে, মানব কল্যাণকে উৎসাহিত করে এবং মানবতার জন্য যা কিছু খারাপ ও ক্ষতিকর তার সবই এড়িয়ে যায়। আল্লাহর বিধান দ্বারা উদ্দীপ্ত ইসলামী জীবন ব্যাবস্থা ও রাষ্ট্র পুরোপুরি টেকসই ও কল্যাণকর।

৪। **শরীয়াত জারি ও কার্যকর করা :** ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আওতায় শরীয়াত-ইসলামী আইন কানুন জারি করা। ইসলামী দণ্ডবিধি, দেওয়ানী আইন-কিসাস, হদ-হুদুদ ইত্যাদি বিধি-বিধান অবশ্যই জারি করতে হবে। শরীয়াত চালু না করলে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অর্থহীন। তাই ইসলামী রাষ্ট্রকে দীনের পূর্ণ অনুসৃতি, দীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েম করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৭৪. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ১১০

৫। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ : ইসলাম নাগরিকদের যে সমস্ত অধিকার ও হক নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এগুলো যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সংরক্ষণ করা। মৌলিক অধিকারগুলো অলঙ্ঘনীয় এবং সম্মানার্হ।

৬। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা : ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন যদি ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় পূরণ করতে অপারগ হয় তাহলে অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে এর জন্য এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের পক্ষে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা এ পাঁচটি জিনিস না হলে বেঁচে থাকা ও আল্লাহর খলীফা হিসেবে সম্মানজনক জীবন যাপন সম্ভব নয়। তাই এসব মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে।

মানুষের মৌল প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই 'যাকাত'কে স্থায়ীভাবে ফরয করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন, "ইহা (যাকাত) ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে।"[৭৫]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছেন যে, "সরকার হচ্ছে তাদের অভিভাবক যাদের কোন অভিভাবক নেই।"[৭৬]

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "যে কেউ কোন দায় রেখে (যেমন : ঋণ, দুঃস্থ পরিবার) মারা যাবে সে দায় আমাদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) উপর অর্পিত হবে।"[৭৭]

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন, যার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ফকীহ্ ইমাম ইবনে হাজমের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "প্রত্যেক দেশ-স্থানের ধনী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, সেখানকার গরীব জনগণের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়াবে। সরকার তাদেরকে এজন্য বাধ্য করবে।"

যাকাত যদি তাদের জন্য যথেষ্ট না হয় এবং মুসলমানদের 'ফাই' সম্পদ যদি প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ হয় তাহলে তাদের জন্য অপরিহার্য, যে খাদ্য তারা খায়, শীত-গ্রীষ্মের যে পোশাক তার পরিধান করে, যে ঘর তাদেরকে বৃষ্টি, শীত,

---

৭৫. বুখারী, মুসলিম
৭৬. আবু দাউদ, তিরমিযী
৭৭. বুখারী, মুসলিম

সূর্যতাপ ও পথিকদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে পারে তাই দিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।[৭৮]

কাজেই নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌল দায়িত্ব।

৭। বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার ব্যবস্থা গ্রহণ : ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর বাণী দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া, সত্যের সাক্ষী হওয়া, দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। মানবতার মুক্তির জন্য, মযলুম জনতার পরিত্রাণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রকে অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে। মুসলমানগণ শ্রেষ্ঠ উম্মত তাই তার দায়িত্ব বিশ্ব মানবতাকে পথ দেখান :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

উচ্চারণ : কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিননাসি তা'মুরূনা বিলমারূফি ওয়া তানহাওনা 'আনিল মুনকার।

অর্থ : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির জন্য তোমাদের উদ্ভব। তাই তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"[৭৯]

মুসলমানগণ মধ্যমপন্থী উম্মত, তাই তার দায়িত্ব দুনিয়ার মানুষের সামনে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হওয়া :

وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

উচ্চারণ : ওয়া কাযালিকা জা'আলনাকুম উম্মাতাওঁ ওয়াসাতাল লিতাকূনূ শুহাদাআ 'আলান নাস।

অর্থ : "আর এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পারো।"[৮০]

ফিতনা-ফাসাদ দূরীভূত করা ও দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ের নির্দেশ রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে :

---

৭৮. আল মুহাল্লা, ৬ষ্ঠ খণ্ড

৭৯. ৩ সূরা আলে ইমরান : ১১০

৮০. ২ : সূরা আল বাকারা : ১৪৩

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ـ

উচ্চারণ : ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লা তাকূনা ফিতনাতুওঁ ওয়া ইয়াকূনাদ দীনু কুল্লুহু লিল্লাহ।

অর্থ : "তাদের সাথে লড়াই করো যেন ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"[৮১]

"মযলুম মুস্তাদআফীন মানুষের মুক্তির জন্যও ইসলামী রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে।"

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ... وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

উচ্চারণ : ওয়া মা লাকুম লা তুকাতিলূনা ফী সাবীলিল্লাহি ওয়াল মুসতাদ'আফীনা মিনার্‌রিজালি ওয়ান্‌নিসায়ি... ওয়াজ'আল লানা মিল্লাদুনকা নাছীরা।

অর্থ : "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব পুরুষ-নারী-শিশু যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে তাদের জন্য লড়াই করবে না। যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে উদ্ধার করো এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক পাঠাও।"[৮২]

বিশ্বজোড়া আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার দায়িত্বটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে হাদীস থেকে জানা যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চালু থাকবে শাসক যেমনই হোক না কেন। কাজেই ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং সমস্ত বিশ্বে ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত

আল মাওয়ার্দীর (৯৭২-১০৫৮) মতে, 'নবুওয়তের কার্যাবলী উত্তরাধিকার হিসেবে অব্যাহত রাখা এবং ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ এবং মানুষের দুনিয়াবী কার্যাবলী সুচারুভাবে পরিচালনা করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্য।[৮৩]

---

৮১. ৮ : সূরা আল আনফাল : ৩৯

৮২. ৪ : সূরা আন নিসা : ৭৫

৮৩. আল মাওয়ার্দী, আল আহ্‌কামুস সুলতানীয়া, পৃ. ৬।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (১২৬৩-১৩২৮) মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে জীবনের সকল স্তর ও মানবতার সর্বমাত্রায় বিস্তৃত এবং আল্লাহ্ পাকের আদেশ নিষেধ যে চূড়ান্ত তা সুনিশ্চিত করা।

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) আল মাওয়ার্দীর 'জাগতিক বিষয় পরিচালনা' ও ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (১২৬৩-১৩২৮) 'আল্লাহ্ পাকের আদেশ নিষেধই চূড়ান্ত' এ দুটি বক্তব্যকে সমন্বিত করেছেন যে শরীয়ার বিধানানুসারে সকল জাগতিক বিষয়াবলীকে ইহকালীন কল্যাণের সাথে সংযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ইবনে খালদুন এভাবে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতে কল্যাণ লাভের জন্য শরীয়ার অনুসরণের বিষয়টি সহজ ও বেগবান করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

২.১৬ ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of Islamic State)

১। সালাত কায়েম করা (To establish the Salat) : আল্লাহ্ পাক ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের প্রধানত যে ৪টি কার্যাবলীর উল্লেখ করা হচ্ছে তার প্রথমটি সালাত বা নামায কায়েম করা। রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে চরিত্রবান, বিবেকবান ও সৎ বানানোর জন্য আল্লাহ্ এ কর্মসূচি নির্ধারণ করেছেন। নামায হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে বান্দা-প্রভু সম্পর্কের প্রতীকী প্রকাশ।

২। যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা (Establishment of Zakat based Economy) : ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ হচ্ছে যাকাতব্যবস্থা বাস্তবায়ন। যাকাতব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুঃস্থ অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান। যাকাত মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক অধিকার এবং বৈষয়িক সহযোগিতার প্রতীকী ব্যবস্থা।

৩। মারূফের নির্দেশ দান : সৎ কাজের আদেশ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। সূরা আল হাজ্জের ৪১ নং আয়াতে ক্ষমতা লাভ করলে নামায কায়েম ও যাকাতব্যবস্থা চালু করার সাথে ন্যায়ের আদেশ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অন্য কথায়, যা মানুষের জন্য উপকারী তা সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু করতে হবে।

৪। মুনকার (দুষ্কৃতি) দমন করা : অসৎ কাজ ও অন্যায় প্রতিরোধ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কর্মসূচি। অন্য কথায়, যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য ক্ষতিকর তা সমাজ থেকে উৎখাত করা। অন্যায় নির্মূল করার এ কর্মসূচি আল্লাহ্ পাকই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৫। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা : রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রু তথা মানবাধিকারের হিফাযত, আইনের শাসন কায়েম, সন্ত্রাস নির্মূলকরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ করা। মৌলিক অধিকারগুলো অলঙ্ঘনীয়। ইসলাম মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ অবশ্য পালনীয়। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো মর্যাদা প্রদান ও নিশ্চিতকরণ ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৬। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন-জরুরিয়াতসমূহ পূরণ করা (Fulfilment of Zaruriat Basic Needs) : জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। ইসলামী রাষ্ট্রে জান-মাল ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে এবং খাবার, আশ্রয় নিয়ে উদ্বেগ থাকবে না। প্রতিটি নাগরিকের জরুরিয়াত (Basic needs) পূরণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক যদি ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় পূরণ করতে অপারগ হয় তাহলে তা পূরণে অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে।

৭। আল্লাহর আইন কার্যকরী করা : আল্লাহর আইন কার্যকরী করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন চালু না করলে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অর্থহীন। ইসলামী দণ্ডবিধি, দেওয়ানী আইন– কিসাস, হদ, হুদুদ, রজম ইত্যাদি আইন-কানুন অবশ্যই জারী করতে হবে। মোটকথা কুরআন ও সুন্নাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করাই এ রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।

৮। ইসলামের প্রচার ও প্রসার সাধন করা : ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর বাণী আল ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া, দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা, সাধনা, ত্যাগ, সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

৯। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা (Establishment of Woman's Dignity) : কুরআনে নারীর মর্যাদার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার অধিকারের উপর ইসলামী রাষ্ট্রে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়। ইসলামী আইনে নারী একজন দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীন সত্তা বিশেষ।

১০। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (Establishment of Rule of Law) : ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন কায়েম করা

এবং কাউকেই আইনের উর্ধ্বে না রাখা। ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের চোখে প্রতিটি নাগরিক সমান বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সমাজের একজন সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলে সমান। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

১১। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা (Establishment of Social Justice) : ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে সামাজিক সুবিচার, ন্যায়ের বিকাশ এবং অন্যায়ের বিনাশ সাধনের নিমিত্তে নৈতিকভাবে কাজ করা।

১২। দেশরক্ষা (Defence) : ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, স্বাধীনতা রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এ লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারণবাদী যে কোন বহিরাক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে ইসলামী রাষ্ট্রকে হিফাযত করার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে।

১৩। সাংস্কৃতিক কার্যাবলী (Cultural activities) : ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যাবলীর মধ্যে সাংস্কৃতিক কার্যাবলী অন্যতম। ইসলামী রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে একথাই বলে দেয়া হয় যে, পৃথিবীতে শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের বাণী ও তাঁর হুকুমই বিরাজ করবে অন্যকিছু নহে। প্রত্যেক মুসলিম নাগরিক তথা নর-নারীর এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১৪। পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য (Foreign Affairs related Functions) : আন্তর্জাতিকতার এ যুগে অন্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। এ কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত বা কূটনীতিক প্রেরণ করে অন্য রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের নিজ দেশে গ্রহণ করে। বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা, কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। রাজনৈতিক ও আদর্শিক উন্নতির জন্যই মূলত ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রতিবেশী ও দূর রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়।

১৫। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কার্য (Maintenance of Law and order) : ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার

দায়িত্বও ইসলামী রাষ্ট্রকে পালন করতে হয়। এ উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্র পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে।

১৬। প্রশাসন সংক্রান্ত কার্য (Administrative functions) : আভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ। এ লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের পোস্টিং- দায়িত্ব বন্টন তদারকী করে। মুদ্রা, টাকশাল পরিচালনা, কর বা খাজনা ধার্য ও আদায়, বাজেট প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে।

১৭। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য (Educational functions) : ইসলামে জ্ঞানার্জন ফরয। শিক্ষাই শক্তি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা হচ্ছে শক্তি (Education is power)। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়। একটি দক্ষ ও উন্নত মানব সম্পদ সমষ্টি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য শর্ত। তাই জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র শিক্ষা সংক্রান্ত বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ, মাদরাসা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।

১৮। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ (Public Health related functions) : স্বাস্থ্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, মেডিকেল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করে।

১৯। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ (Agricultural, Industrial and Trade related functions) : ইসলামী রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তৎপর থাকে। এ লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ব্যবস্থা জোরদার, বৃহদায়তন-মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপন, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি কাজ ইসলামী রাষ্ট্র করে থাকে।

২০। জনহিতকর কার্য (Welfare activity) : জনহিতকর কাজের অংশ হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র দুঃস্থ, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

২.১৭ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র (Islamic Welfare State)

মহানবী (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীন যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সত্যিকার অর্থে ছিল কল্যাণ রাষ্ট্র। আল্লাহ্ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহানবী (সা) ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে মানব জাতির সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

২.১৮ আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র (Modern Welfare State)

অধুনা কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) পরিভাষাটি বেশ শোনা যাচ্ছে। সাধারণত: এটি ধরে নেয়া হয় যে রাষ্ট্র বা সমাজে সুনির্দিষ্ট কিছু মৌলিক মূল্যবোধ বজায় রয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা রয়েছে, সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজকর্ম করার বা পাবার অধিকার রয়েছে, যেখানে বৈষম্যের স্থান নেই, এমন পরিবেশই কল্যাণকামী রাষ্ট্রে বিদ্যমান। পশ্চিমা বিশ্বে এমনতর রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশের উপস্থিতিকেই কল্যাণ রাষ্ট্রের মৌলিক দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যা কিনা প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য চাবিকাঠি সেটি এসব দেশের জনগণের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত উৎকর্ষতা লাভ করছে।[৮৪]

বর্তমানে সব রাষ্ট্রই কম বেশি উপযুক্ত জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। এজন্য আধুনিক রাষ্ট্রগুলোকেও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা হয়।

২.১৯ কল্যাণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definations of Welfare State)

কল্যাণ রাষ্ট্রের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

হার্বার্ট লেম্যান (Herbert lehman)

যেখানে জনগণের ব্যক্তি সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তাদের প্রতিভা পূর্ণাঙ্গভাবে পুরস্কৃত হয়, তাকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

জি. ডি. কোল (G.D. Cole)

জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হল এমন একটি সমাজ যেখানে প্রত্যেক নাগরিককে ন্যূনতম

---

৪৩. Eric Allardt, 'Representative Government ina Bureancratic Age', DAEDALUS : Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 113, No.4, Winter 1984, পৃ. ১৭০।

জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। (The welfare state is a society in which an assured minimun standard of living and opportunity becomes possession of every citizen)

আর্থার স্লেসিংগার (Arther Slesinger)

জনকল্যাণ রাষ্ট্র হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সরকার সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান, অর্থোপার্জন, শিক্ষা লাভ, চিকিৎসার সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইবনস্টাইন (Ebenstein)

যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির ন্যূনতম জীবন যাত্রার মান নিশ্চিত করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধান করে এবং পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করে তাকে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়।

২.২০ কল্যাণ রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of Welfare State)

১. কল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন

২. ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুগম করা

৩. সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

৪. অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন

৫. সংস্কারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

৬. মধ্যম পন্থার অনুসারী

৭. শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের পরিপন্থী

৮. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

২.২১ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of Islamic Welfare State)

ড. এম. রিফাত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রকে 'ফালাহী রাষ্ট্র' (Falahi State) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮৫] ফালাহ্ শব্দটি একটি কুরআনী পরিভাষা এবং অত্যন্ত

৮৫. ড. এম. রিফাত, Welfare state or Falahi state, Radiance, ১৬-২২ জুলাই, ২০০৬ সংখ্যা, পৃ. ১২।

ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফালাহ্ বা কল্যাণ শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ফালাহ্ শব্দটি এবং এর উদগত শব্দ পবিত্র কুরআনে ৪০ বার ব্যবহার করা হয়েছে। আর একটি শব্দ 'ফাউজ' যা ফালাহ্ শব্দটির সমার্থক এবং এর থেকে উদগত শব্দ পবিত্র কুরআনে ২৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলাম ব্যক্তি মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এক ব্যাপক, ভিন্নধর্মী ও ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণ রাষ্ট্রের দিক নির্দেশনা পেশ করে। ইসলামের উদ্দেশ্যকে ড. এম. উমর চাপরা বর্ণনা করেছেন 'মাকাসিদ আল শরীয়াহ' হিসেবে। যা শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে ফালাহ্ বা কল্যাণ আহরণ এবং হায়াতে তাইয়্যেবা বা পবিত্র জীবন বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি হচ্ছে সে লক্ষ্য যার দিকে প্রতিদিন মুয়াজ্জিন পাঁচবার বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে থাকেন। এভাবে ইসলাম বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে ফালাহ্র প্রতি গুরুত্ব প্রদর্শন করা হয়।[৮৬] আরবী ফালাহ্ শব্দটি এসেছে আফলাহা, ইউফলিহু থেকে যার অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধি অর্জন করা, উন্নতি করা, সুখী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া। আল্লামা রাগিব ইস্পাহানীর[৮৭] মতে 'ফালাহ' শব্দ পার্থিব জীবনের জন্য তিনটি অর্থ তুলে ধরে। যেমন–

১. বাকা (Survival) - বেঁচে থাকা

২. ঘ্যানা (Freedom from want) - অভাব থেকে মুক্তি

৩. ইজ্জ (Power and honour) - ক্ষমতা ও সম্মান

আর আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য ফালাহ্র ৪টি অর্থ হচ্ছে–

১. বাকা বিল ফানাহ (Eternal survival) - অনন্ত জীবন সত্তাকে সার্থক করা।

২. ঘ্যানা বিল ফকর (Eternal prosperity) - অনন্ত সমৃদ্ধি

৩. ইজ্জ বিল দুউল (Everlasting glory) - চিরস্থায়ী সম্মান

৪. ইলম বিল জাহেল (Knowledge free from all ignorance) - অজ্ঞতামুক্ত জ্ঞান

---

৬৫. ড. এম. উমর চাপরা, ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন (প্রবন্ধ), অর্থনৈতিক গবেষণা, সংখ্যা-৯, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ৫। ড. এম. উমর চাপরা প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনীতিবিদ ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। তিনি পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (IRTI) এর গবেষণা উপদেষ্টা।

৮৭. আল্লামা রাগিব আল ইস্পাহানী, আল মুফ্‌রাদাত ফি গারীব আল কুরআন (করাচী)।

কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পরকালের অনন্ত অসীম জীবনে কল্যাণ (falah) লাভ করা। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ, কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, এ বিশ্ব জাহানের সবকিছু একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে মানব কল্যাণের গঠন উপকরণ শুধু বস্তুবাদী লক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে বস্তুবাদী লক্ষ্যে সাথে আধ্যাত্মিক উপকরণও সমগুরুত্বসহকারে সংযুক্ত। ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয়জগতের সর্বাধিক কল্যাণ করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য। এ কল্যাণ এমন যা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না, অথচ তা তার দৈহিক আরাম, মানসিক শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করে।[৮৮] ইসলামী রাষ্ট্রে কল্যাণ সর্বাধিক হয়, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কল্যাণ বিঘ্নিত না করে নিজের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে তাকে কুরআন ও সুন্নাহর অবকাঠামোর মধ্যে সীমিত থাকতে হয়। এজন্যই ড. এম. নিজতুল্লাহ্ সিদ্দিকী বলেন, 'According to the Quran, the end of life is falah in this world and in the life hereafter. The Quran urges us to direct all our attention towards the achienement of falah. All our activities whether individual or collective should aim at this goal, falah should become the end of our thought and actions. We should be anxious to do that which ensures falah and not to do that which is incompatible with it.'[৮৯]

মানুষের সামগ্রিক জীবনকে সার্বিকভাবে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত করার জন্য যে রাষ্ট্র সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাই ফালাহী রাষ্ট্র বা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র। এ ধরনের ফালাহী রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখার স্বাধীনতা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা-উপকার লাভের ক্ষেত্রে সমঅধিকারের ব্যবস্থা করা।

ইসলামী ফালাহী রাষ্ট্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকারের

---

৮৮. অধ্যাপক ড. এম এ হামিদ, মানব কল্যাণ ও ইসলামী অর্থনীতি, দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ৫।

৮৯. ড. নিজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, Some Aspects of the Islamic Economics

পুরোপুরি নিশ্চয়তা প্রদান করে। সব নাগরিকের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনই ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য। এটি একমাত্র আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে ব্যাপৃত কোন পুলিশী রাষ্ট্র নয়। ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। আমীর হাসান সিদ্দিকী মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'It was a unique welfare state ever designed by mankind.'[৯০] মদীনায় মহানবী (সা) যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন করেছিলেন তাকে কল্যাণ রাষ্ট্রের (Welfare State) মডেলরূপে পেশ করা যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কাঠামো ছিল গণতন্ত্র ভিত্তিক। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পন্ন করতেন। মদীনা সনদে তাঁকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল সে ক্ষমতা বলে ইচ্ছা করলে তিনি কারো পরামর্শ না নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নবী কার্যত তা করেননি। কুরআন ও তাঁর স্বীয় মতামতের আলোকে তিনি সাহাবীগণের পরামর্শ নিতেন। Every Political philosopher is the prisoner of his time and environment-এ নীতি মহানবী (সা) এর জীবনে দেখা যায় না। এ নীতি অনুসরণ করলে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) কে স্বেচ্ছাতন্ত্র কায়েম করতে হতো। কিন্তু স্বৈরাচারের লেশমাত্রও তার রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় পরিলক্ষিত হয় না।

২.২২ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর ফারুক (রা) (Islamic Welfare State and Hazrat Umar Faruq [R])

ইসলামের মহান দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) (৬৩৪-৬৪৪) তাঁর শাসনাধীন বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রে বহুবিধ নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যা ফালাহী রাষ্ট্রের জন্য একটি স্থায়ী নীতিমালার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। হযরত উমর ফারুক (রা) প্রারম্ভিক ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইসলামী সভ্যতার একজন বিনির্মাণকারী ছিলেন।

ইসলামী খিলাফতের ধারাবাহিকতা প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) থেকে শুরু হয়েছিল। এটি নিঃসন্দেহে যে হযরত আবু বকর (রা) বিস্ময়করভাবে একটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে। কিন্তু অধিক সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে হযরত উমর (রা)-এর সময় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। হযরত উমর ফারুক (রা) শুধু একজন

---

৯০. উদ্ধৃত ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, বুকস প্যাভিলিয়ন, রাজশাহী, আগস্ট, ১৯৮৯, পৃ. ৪৪।

বিজেতাই ছিলেন না, তদানীন্তন দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করে তাদের সাম্রাজ্যকে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত করেন এবং একটি সুন্দর পদ্ধতির কল্যাণমূলক প্রশাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত উমর ফারুক (রা) এর শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সব অঞ্চলের ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন ও অগ্রগতির নীতিমালাই ছিল প্রধান রাষ্ট্রীয় নীতি। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থ হলো সরকারী সেবার পরিধি বাড়ানো যা হযরত উমর ফারুক (রা) এর শাসনামলে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

ইসলামী ফালাহী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর ফারুক (রা) এর পদক্ষেপসমূহ
Steps taken by Hazrat Omar Faruq (R) for establishment of Islamic falahi/Welfare State

১. আদম শুমারীর ব্যবস্থা : ইতিহাসে প্রথম আদম শুমারীর ব্যবস্থা করেছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা)। যাবতীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন। এ শুমারীতে প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

২. ভাতা বন্টন ব্যবস্থা : আদম শুমারীর ভিত্তিতেই হযরত উমর ফারুক (রা) প্রথম ভাতা বন্টন তালিকা তৈরী করেন। বায়তুলমালের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে ভাতা দেয়া হত। পঙ্গু, অন্ধ, চিররোগী প্রভৃতি ব্যক্তির জন্য বায়তুলমাল থেকে বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খলীফা উমর ফারুক (রা) প্রথম সকল নাগরিকদের মধ্যে ভাতা বন্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি মহানবী (সা)-এর আত্মীয়বর্গ ও দীন ইসলামের জন্য ত্যাগ এবং ইসলাম গ্রহণের সময়কালের ভিত্তিতে ভাতা প্রদানের শ্রেণীভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করেন। সে তালিকাতে দাসগণও বাদ পড়েনি। ঐতিহাসিক মূর বলেন, 'উমর ফারুক (রা)-এর ভাতা প্রদান রীতি সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে নজীরবিহীন।'

৩. বেকার ভাতা : হযরত উমর ফারুক (রা) সর্বপ্রথম বেকারদের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা করে।

৪. কৃষি জমি আলাদাকরণ : হযরত উমর ফারুক (রা) কৃষি জমি সুনির্দিষ্টকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৫. কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন : বিজিত অঞ্চলসমূহে প্রচলিত নিবর্তনমূলক কৃষি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন ছিল হযরত উমর ফারুক (রা)-এর শাসন ব্যবস্থার একটি

বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। অনধিক তিন বছর পর্যন্ত কোন জমি অনাবাদী পড়ে থাকলে তা বাজেয়াপ্ত হত।

৬. খাল খননের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন : তিনি কৃষি কার্যের সুবিধার্থে খাল খননের মাধ্যমে পানি সেচের ব্যবস্থা করেন। তিনি টাইগ্রীস থেকে বসরা পর্যন্ত দীঘ নয় মাইল খাল কেটে পানি সংকট দূর করেন।

৭. কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা : হযরত উমর ফারুক (রা) এর শাসনামলে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ দিয়ে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা হত।

৮. কৃষি কর আরোপ : তিনিই প্রথম কৃষি উৎপাদনের উপর কৃষি কর আরোপ করেছিলেন।

৯. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণ : খলীফা উমর ফারুক (রা) বহির্বাণিজ্যের পরিব্যাপ্তির জন্য আদমানি-রপ্তানি কর কমিয়ে দেন। অন্য কথায়- এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত শুল্ক চালু করেন।

১০. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা : হযরত উমর ফারুক (রা) সর্বপ্রথম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং হযরত আবু উবায়দাকে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন যাকে স্বয়ং মহানবী (সা) 'আমিন উল উম্মাত' (Trustee of the Nation) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

১১. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম : হযরত উমর ফারুক (রা)-এর শাসনামলে ১৮ হিজরীতে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তিনি রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের সকল সঞ্চয় দুর্ভিক্ষ কবলিতদের মধ্যে ত্রাণ সরবরাহ ও পুনর্বাসনে ব্যয় করেন। দুর্ভিক্ষ কবলিতদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করেন।

১২. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি রাস্তা, সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অগণিত কালভার্টও নির্মিত হয়েছিল।

১৩. অভিযোগ তদন্তের জন্য দফতর প্রতিষ্ঠা : হযরত উমর ফারুক (রা) খলীফার দফতরে আসা অভিযোগ তদন্তের জন্য এক বিশেষ দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খুবই বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল লোকদের এ দফতরে নিয়োগ দান করেন।

১৪. হজ্জের সময় মক্কায় বাৎসরিক সাধারণ সভা : হযরত উমর ফারুক (রা) হজ্জের সময় মক্কায় বাৎসরিক সভা আয়োজন করার নিয়ম চালু করেন, যেখানে সব গভর্ণর, কর সংস্কারক, বিচারক ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ হজ্জকালীন

একত্রিত হতেন। খলিফা সকল সাধারণ জনগণকে ঐ সাধারণ সভায় গভর্ণর, বিচারক ও সকল সরকারী কর্মকর্তাসহ কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে জনসমক্ষে পেশ করতেন।

১৫. ভূমি জরিপ ও ভূমি কর বিভাগ প্রতিষ্ঠা : হযরত উমর ফারুক (রা) কর আরোপের লক্ষ্যে ভূমি জরিপের প্রচলন করেন এবং দিওয়ান আল খারাজ নামক একটি ভূমিকর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৬. সরকারী মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা : তিনি মদীনা ও কূফায় সরকারী মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭. মুক্ত দরজা নীতি : হযরত উমর ফারুক (রা) এর শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল 'মুক্ত দরজা'র নীতি। তিনি সাধারণ জনগণের জন্য দরজা বন্ধ করে রাখেন এমন কোন গভর্ণর বা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে পছন্দ করতেন না।

১৮. পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা : নাগরিকদের জান, মাল ও ইজ্জতের যথার্থ হিফাযতের জন্য হযরত উমর ফারুক (রা) একটি সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনীর পরিচালনা ও কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের জন্য 'দিওয়ান উল আহদাত' নামক একটি দফতর স্থাপন করা হয়। পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ছিল চুরি-ডাকাতি বন্ধ করা, মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করা, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, কালোবাজারী, মওজুদদারী বন্ধ করা, ওজন পরীক্ষা করা ইত্যাদি। হযরত উমর ফারুক (রা) রাতে পাহারা ও টহল দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

১৯. কারাগার নির্মাণ : দাগী অপরাধীদের কয়েদ করার জন্য হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়ার বাড়ি ৪০০০ দিরহামে ক্রয় করে তা কারাগারে রূপান্তরিত করা হয়। কেন্দ্রীয় কারাগার অবস্থিত ছিল মদীনায়। এছাড়াও হযরত উমর ফারুক (রা) প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানী ও জেলা সদর দফতরেও কারাগার নির্মাণের আদেশ দান করেন।

২০. নির্বাসন দণ্ড প্রবর্তন : হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে সর্বপ্রথম নির্বাসন দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মুহাম্মদ আল ব্যুরে বলেন, হযরত উমর ফারুক (রা)ই প্রথম শাসক যিনি শাস্তি হিসেবে নির্বাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।[৯১]

---

৯১. মুহাম্মদ আল ব্যুরে, প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী, বিআইআইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২৪৯।

২১. আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন : হযরত উমর ফারুক (রা) আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে জনজীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২২. বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ : হযরত উমর ফারুক (রা) বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করেন। তিনি বিচারক কাজীগণকে ন্যায় ও আদল প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁর আমলে বিচার ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তি অর্জন করে এবং বিচারের শুনানী ও রায় দানের বিধি-বিধান সুষ্ঠু নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান ছিল। অমুসলিমদের বিচারকার্য তাদের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী হত।

২৩. বিচারকদের উচ্চ বেতনের ব্যবস্থা : বিচারক ও কাজীদের প্রলোভন ও দুর্নীতি হতে দূরে রাখার জন্য যোগ্যতানুসারে উচ্চহারে বেতন দেয়া হত।

২৪. আইন বিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ সংকলন : হযরত উমর (রা) ইসলামী আইনের বিধি-বিধানসমূহ সংকলন ও গ্রন্থ রচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

২৫. বড় বড় শহরে প্রশস্ত সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন : হযরত উমর ফারুক (রা) কয়েকটি বড় বড় শহরে উন্নত রাস্তা বা সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছিলেন। যেমন– বসরা, কূফা, মসুল, হাবিজা, ফুসতাত প্রভৃতি। সড়ক ২০, ৩০, ৪০, ৬০ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়েছিল।

২৬. ইসলামী ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন : হযরত উমর (রা) ইসলামী ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন করেন যা মহানবী (সা) এর হিজরতের সময়কাল থেকে শুরু হয়, যা ছিল নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী পঞ্জিকা। এতে এক বছর ছিল ৩৫৪ দিনের চান্দ্র বছর। এ ক্যালেণ্ডার ছিল ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে হযরত উমর (রা) এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতিনিধিত্বকারী।

২৭. সরকারী অফিস নির্মাণ : তিনি সকল প্রদেশে প্রাদেশিক সচিবালয় এবং জেলা সদরে আল আমিল (জেলা প্রশাসক)-এর কার্যালয় স্থাপন করেন।

২৮. সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা : খলীফা উমর (রা) সমগ্র প্রশাসনিক অঞ্চলকে ৯টি 'জুনদ' বা সামরিক এলাকায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অঞ্চলে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রত্যেক সেনানিবাসে ৪০০০ করে অশ্বারোহী সৈন্য সর্বদা মওজুদ থাকত। এছাড়াও মদীনা রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল শহরে, সীমান্ত এলাকায় এবং উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক চৌকি প্রতিষ্ঠা করেন।

২৯. সরকারী হোস্টেল ও পর্যটন লজ নির্মাণ : তিনি সরকারী হোস্টেল, পর্যটকদের জন্য ভিজিটর লজ ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন।

৩০. ডাক বিভাগ চালুকরণ : হযরত উমর (রা) প্রথম ডাক বিভাগ চালু করেন।

৩১. সংবাদপত্র চালুকরণ : তিনি সংবাদপত্র প্রকাশ ও বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

৩২. গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা : তিনি গোয়েন্দা বিভাগ চালু করেন। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর নজরদারী করার দায়িত্ব বিভাগ পালন করত। গোয়েন্দা হযরত উমর ফারুক (রা)কে কর্মকর্তাদের কোনরূপ ক্ষমতা অপব্যবহার কিংবা নাগরিকদের প্রতি অধিকার সংক্রান্ত খবরাখবর দিতেন।

৩৩. ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ : হযরত উমর (রা) ইসলামী রাষ্ট্রে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

৩৪. শিশু ভাতা প্রবর্তন : তিনিই ইতিহাসে সর্বপ্রথম শিশু ভাতা প্রবর্তন করে অনন্য নজীর স্থাপন করেন।

৩৫. বেকার ভাতা প্রবর্তন : হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম বেকার মানুষদের জন্য সর্বপ্রথম বেকার ভাতা প্রবর্তন করেন।

৩৬. অনাথ ও ইয়াতীমদের সাহায্য প্রবর্তন : তিনি অনাথ ও ইয়াতীমদের সহায়তা ও আশ্রয় দেয়ার জন্য সহায়তা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং তাদের জন্য দৈনিক ভাতার ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে মনিব-দাস এবং ধর্ম-বর্ণের কোন পার্থক্য করা হত না।

৩৭ : ওয়াকফ বিভাগ প্রতিষ্ঠা : হযরত উমর (রা) ওয়াকফ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। গরীব ও অভাবীদের সাহায্য করার জন্য এ বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা) এর উপদেশ মতে স্বয়ং খলীফা উমর (রা) নিজের কিছু জমি ওয়াকফ করেন– যাতে ঐ জমির অর্জিত আয়– থেকে অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা যায়।

এটিই ছিল হযরত উমর (রা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র যেখানে যাকাত-ওশর এবং অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব-নফল গ্র্যান্ট ম্যাকানিজমে অর্থ প্রদানকারী অনেক ছিল কিন্তু তা নেয়ার লোক খুব একটা খুঁজে পাওয়া যেত না।

উপসংহারে বলা যায় যে, হযরত উমর ফারুক (রা)ই হলেন প্রাথমিক ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং এর প্রশাসনিক এককগুলোর সংগঠক ও অগ্রগামী দূত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর শাসনামল ছিল মুসলিমদের জন্য স্বর্ণযুগ।

২.২৩ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অপরিহার্যতা (Obligations for Movement of Establishing Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির এক স্বাভাবিক দাবি।

পরিপূর্ণভাবে দীনের পথে চলতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানকালে রাষ্ট্র এমন একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা যা মানব জীবনের বিভিন্ন দিককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইসলামী রাষ্ট্র বর্তমানে দু'টি রাষ্ট্রে[৯২] ছাড়া মুসলিম বিশ্বের আর কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত নেই। এমতাবস্থায় কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার নমুনা জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য এরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা সমগ্র ইসলামী উম্মাহর সামনে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর কয়েকটি জনপদে যদি সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠে, বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বদৌলতে যদি এর শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য এবং কল্যাণময় বার্তা পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইসলামী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা এবং এ লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো নিছক একটি রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীনী প্রয়োজন ও দায়িত্ব। এ দীনী দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া বা একে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। অথবা রাজনীতি বলে এ থেকে নিস্পৃহ থাকারও কোন অবকাশ নেই ইসলামী শরীয়াতে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অপরিহার্যতার কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১। মানুষ আল্লাহর খলীফা[৯৩]– তাই খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে এ পৃথিবীতে খলীফা করে সৃষ্টি করেছেন।

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ

উচ্চারণ : ইন্নী জা'য়ীলুন ফিল আরদি খালীফাতাহ)

---

৯২. এ দুটি রাষ্ট্র হচ্ছে সুদান ও ইরান। এছাড়াও মালয়েশিয়ার কেলানতান রাজ্য এবং নাইজেরিয়ার জামফারা, নাইজার, কাতমিনা, কাদুনা, কানু, সুকুতোসহ ১০টি রাজ্যে ইসলামী শরীয়াহকে সুপ্রীম আইন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

৯৩. 'খলীফা' তাকে বলে, যে কারো মালিকানায় থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মালিকের দেয়া ক্ষমতা ও অধিকার ব্যবহার করে।

অর্থ : "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা পাঠাতে চাই।"[৯৪]

শুধু হযরত আদম (আ) ব্যক্তিগতভাবেই খলীফা নন বরং গোটা মানব জাতিই আল্লাহর খলীফা।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ ـ

উচ্চারণ : ওয়া হুয়াল্লাযী জা'আলাকুম খালায়িফাল আরদি।

অর্থ : "তিনিই তোমাদের পৃথিবীর খলীফা করেছেন।"[৯৫]

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ـ

উচ্চারণ : হুয়াল্লাযী জা'আলাকুম খালায়িফা ফিলআরদি, ফামান কাফারা ফা'আলাইহি কুফরুহু।

অর্থ : "তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন, এখন যে কুফরী করবে তার কুফরীর (শাস্তি) তারই উপর বর্তাবে।"[৯৬]

অতএব, সমস্ত মানুষই আল্লাহর নীতিগত খলীফা। আর খিলাফতের তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহরই অধীনে তাঁর নির্দেশ মত এ পৃথিবীতে দায়িত্ব পালন করবে, জীবন যাপন করবে, অন্যান্য সৃষ্ট জীব ও বস্তুর উপর তাঁর অধিকার প্রয়োগ করবে। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর হুকুম পালন করলেই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা হবে না। রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন খিলাফতের দায়িত্বের আওতাভুক্ত। ব্যক্তি জীবনের বাইরের কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিমণ্ডল আল্লাহর নির্দেশিত বিধানের বাইরে রেখে পরিচালনা করলে মানুষের দায়িত্ব পালন হবে না। খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন অপরিহার্য।

২। দীন কায়েম করা আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে হিদায়াতের বিধান দিয়ে নবী-রাসূল (আ)-গণকে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষে এসেছেন পূর্ণাঙ্গ দীন নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ যে বিধান পাঠিয়েছেন তা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন

৯৪. ২ : সূরা আল বাকারা : ৩০

৯৫. ৬ : সূরা আল আন'আম : ১৬৫

৯৬. ৩৫ : সূরা আল ফাতির : ৩৯

নবী (আ)-গণকে। তাই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের এবং সবশেষে মহানবী (সা)-এর দায়িত্ব ছিল আল্লাহ প্রদত্ত দীন কায়েম করা–

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

উচ্চারণ : সারা'আ লাকুম মিনাদ দীনী মা ওয়াছছা বিহী নূহান ওয়াল্লাযী আওহাইনা ইলাইকা ওয়া মা ওয়াছছাইনা বিহী ইবরাহীমা ওয়া মূসা ও ঈসা আন আকীমুদ্ দীনা ওয়া লা তাতাফার্‌রাকূ ফীহ্।

অর্থ : "তিনি তোমাদের জন্য দীনের সে নিয়ম বিধানকে নির্দিষ্ট করেছেন যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ সা.) এখন তোমার প্রতি ওহী করেছি। আর যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা, ঈসাকে দিয়েছিলাম যে দীন কায়েম করো এবং এতে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না।"[৯৭]

কাজেই দীন প্রতিষ্ঠা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ যুগে যুগে নবীগণের প্রতি এবং শেষ নবীর প্রতিও এবং তাঁর উম্মত হিসেবে আমাদের জন্যও এ নির্দেশ প্রযোজ্য। আর দীন প্রতিষ্ঠা মানে দীনের আংশিক প্রতিষ্ঠা বুঝায় না বরং গোটা দীনকেই প্রতিষ্ঠা বুঝায়। কারণ দীন ইসলাম হচ্ছে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান– জীবনের সবদিক ও বিভাগই এতে নিহিত রয়েছে। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে জীবনের সর্বস্তরেই তা করতে হবে।

এখন এটা কি কেউ বলতে পারবে যে, ইসলামী রাষ্ট্র না হলে গোটা দীন কায়েম করা সম্ভব? রাষ্ট্রে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, বিচার, আদালতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, সমাজে, শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ইসলাম কায়েম করা না হয়, তাহলে পূর্ণাঙ্গ দীন কায়েম হবে কি করে? আর রাষ্ট্র ইসলামী না হলে সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ করে রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট দিকগুলোতে যে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয় তাতো স্পষ্ট। অতএব, ইকামতে দীনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র একান্ত অপরিহার্য।

৩। গোটা জীবনকে ইসলামের অনুবর্তী বানাতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন : মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হওয়া, গোটা জীবনকে ইসলামের অনুবর্তী বানানো। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ দ্ব্যর্থহীন :

---

৯৭. ৪২ : সূরা আশ শূরা : ১৩

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً - وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ -

উচ্চারণ : ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুদখুলূ ফিস্‌সিলমি কাফফাহ্ ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ্ শাইতায়ান।

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"[৯৮]

ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হতে হলে জীবনের যত বিভাগ আছে, স্তর আছে, সবকিছুকেই ইসলামের অধীনে নিয়ে আসতে হবে। কোন অংশ যদি ইসলামের বাইরে থেকে যায় বা ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য পথ ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত করা হয়, তাহলে তা হবে শয়তানের অনুসরণ, ইসলামের নয়। এখন যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিকভাবে ইসলাম অনুসরণ করে চলে আর রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন-কানুন, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর বাইরে থেকে যায় তাহলে কি পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা হলো? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে যে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়া কোনক্রমেই ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হওয়া সম্ভব নয় তাতো সুস্পষ্ট। অতএব, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঈমানদারদের জন্য অতীব জরুরি।

৪। ইসলামের অধিকাংশ বিধানই ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয় : ইসলামী শরীয়াতে তথা কুরআন ও সুন্নাহে যে সমস্ত আহকাম, বিধি-বিধান নিহিত রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া বাকী অংশ রাষ্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন : চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি, নৈরাজ্য সৃষ্টি, যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, খুন-যখম, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি সম্পর্কে শরীয়াতের যে বিধান রয়েছে তা ইসলামী রাষ্ট্র না হলে কার্যকর করা অসম্ভব। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও শরীয়াত মোতাবেক হক-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়। ইসলাম যে সমস্ত অধিকার মানুষকে দিয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র না হলে তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ইসলাম বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ও পাপকর্মের জন্য যে শাসন ও শাস্তির (তাযীর) ব্যবস্থা করেছে তা ইসলামী রাষ্ট্র না হলে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। খারাজ, ওশর, যাকাত, ফাই ইত্যাদি বিষয়ক শরীয়াতের যে আহকাম তা রাষ্ট্র ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সম্ভব নয়– এ কথা যদি সবাই স্বীকার করেন তাহলে কি এখন এসব বিধি-বিধান, কুরআন, সুন্নাহর নির্দেশ মুলতবি থাকবে? নিশ্চয়ই তা কেউ বলবেন না। তাহলে এসব হুকুম

৯৮. ২ : সূরা আল বাকারা : ২০৮

আহকামের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উপায় কি? এই নীতি ইসলামী শরীয়াতে সর্বসম্মতভাবে বিধিবদ্ধ যে ফরয কাজ সম্পাদন করা যে সমস্ত উপায় উপকরণের উপর নির্ভরশীল সে সমস্ত ফরয কাজ করা ও সে সমস্ত উপায় উপকরণ সংগ্রহ করাও ফরয। যেমন : নামায পড়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন জরুরি। তাই নামায যেমন ফরয, ঠিক তেমনি পবিত্রতা অর্জনও ফরয। তাই রাষ্ট্র ও সরকার ছাড়া যে সমস্ত ফরয কাজ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না তা সম্পাদন করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কি ফরয হবে না? হদ-হুদুদ জারি, কিসাস প্রয়োগ, হক-ইনসাফ কায়েম যদি ফরয হয়, তাহলে এসব ফরয পালনের উপায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তা প্রতিষ্ঠা করাও ফরয। অতএব আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বিচার বিভাগীয় বিধিবিধান বাস্তবায়ন চাই, এসব কার্যকর করা ফরয মনে করি, তাহলে এর জন্য ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের কাজকেও ফরয মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

৫। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তি জীবনেও পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম মানা সম্ভব নয় : সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যদি ইসলাম কায়েম না থাকে তাহলে একজন ব্যক্তির পক্ষে সমাজে বাস করে ও সমাজের বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পর্ক রেখে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যক্তি জীবনেও ইসলাম মানা সম্ভব নয়। আমরা সবাই জানি, ব্যক্তিগতভাবে হালাল রুজি অনুসন্ধান করা ফরয। অথচ আজকের সমাজে হালাল রুজি অর্জন যে কত কঠিন তা তো সবাই জানেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, অফিস-আদালত কোথাও শরীয়াত পুরো মানা সম্ভব হচ্ছে না। সবদিক বাদ দিয়ে শুধু সুদের ব্যাপারটাই বিবেচনা করা যেতে পারে। চাকরি ও ব্যবসার সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক সরাসরি। ব্যাংক সুদভিত্তিক পরিচালিত। আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ছি। অথচ সুদগ্রহীতা, দাতা, সাক্ষী, দলীল লেখক সবাইকে হাদীসে লানত দেয়া হয়েছে। আজকের গোটা অর্থনীতিই সুদনির্ভর। জাতীয়ভাবে আমরা সুদের সাথে জড়িয়ে আছি।

অথচ সুদ যে কত বড় পাপ তাতো কারো অজানা নয়। অফিস আদালতে ঘুষ ছাড়া আজকে সহজে কোন হক আদায় করা যায় না। অথচ ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই মহাপাপী বলা হয়েছে। বিচার ফয়সালার জন্য আমাদেরকে মানবীয় আইনের দ্বারা পরিচালিত কোর্ট আদালতে যেতে হয়। ফাসিক, ফাজির ও নাফরমান ব্যক্তিদের নিকট বিচার চাইতে হয়, অথচ আল্লাহ আমাদের বলেছেন—

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ ...

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ...

উচ্চারণ : আলামতারা ইলাল্লাযীনা ইয়ায'উমুনা আন্নাহুম আমানু বিমা উনযিলা ইলাইকা... ইউরিদুনা আইয়্যা তাহাকামু ইলাত তাগূতি ওয়া কাদ উমিরূ আইয়্যাকফুরূ বিহী...

অর্থ : "তুমি সেসব লোককে দেখনি, যারা দাবী করে যে তোমার উপর নাযিল করা কিতাবের প্রতি তারা ঈমান এনেছে... অতঃপর বিচার ফয়সালার জন্য তাগুতের[৯৯] (খোদাদ্রোহী শক্তি) নিকট নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করার? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দূরে নিয়ে যেতে চায়।"[১০০]

হয়ত বলা হবে যে শরীয়াতভিত্তিক কোর্ট নেই বলেই তো বাধ্য হয়ে এসব আদালতে যেতে হচ্ছে। এ অবস্থায় শরীয়াভিত্তিক কোর্ট প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অবশ্যই জরুরি হয়ে পড়ে। স্থায়ী মানবীয় আইনে পরিচালিত আদালত মেনে নেয়া জায়েয হবে না। এসব পরিবর্তন করার চেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। যারা চাকরি করেন তাদেরকে এমন অনেক কিছুই চাকরির খাতিরে অনেক সময় করতে হয় যা শরীয়াতে অনুমোদন নেই। দেশে যেসব যুলুমমূলক আইন ও নীতি চালু আছে তা কোন না কোনভাবে সরকারী কর্মচারীদের বাস্তবায়ন করতে হয়। আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় দীন বিরোধী এমন অনেক কিছু আছে, এগুলোকে আমাদেরকে অধ্যয়ন ও এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে ডিগ্রী অর্জন করতে হয়। রাস্তাঘাট, বাজার হাটে আমাদেরকে অনেক উলঙ্গপনা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেপর্দা প্রত্যক্ষ করতে হয়। চাকরি ও ব্যবসার কারণে অনেক সময় আমাদেরকে ইসলামের হিজাব, দৃষ্টির সতর্কতা ইত্যাদি লঙ্ঘন করতে হয়। মোটকথা, উকিল, মোক্তার, বিচারক, সরকারী আমলা, পুলিশ বাহিনী, আইন

---

৯৯. আভিধানিক অর্থে এরূপ লোককেই তাগুত বলা হয়, যে নিজের বৈধ সীমা লঙ্ঘন করে। কেউ যখন দাসত্ব বা বন্দেগীর সীমা লঙ্ঘন করে নিজে মনিব ও প্রভু হওয়ার ঠাট জমিয়ে আল্লাহর বান্দাহদেরকে দিয়ে নিজের দাসত্ব করায় তখন কুরআনের পরিভাষায় তাকে তাগুত বলা হয়। ঐ শাসককেও তাগুত বলা হয় যে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং আল্লাহর কিতাবকে সর্বোচ্চ সনদরূপে মান্য করে না।

১০০. ৪ : সূরা আন নিসা : ৬০

প্রয়োগকারী সংস্থা, সেনাবাহিনী, ব্যাংক-বীমা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভেবে দেখলে দেখা যায় শরীয়াতে-এর কিছুই মানা হচ্ছে না। এতে আপনার আমার মেধা ও শক্তি যুলুমমূলক শাসনের স্থায়িত্বের জন্য ব্যয় হচ্ছে। ব্যক্তি জীবনে নামায-রোযা, অযু-গোসল ইত্যাদি কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে আমাদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবেই ইসলাম তেমনটা অনুশীলন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় দীনদার লোকদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। যারা ব্যক্তিগত জীবনেও ইসলাম মেনে চলার চেষ্টা করেন না তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু আমরা যারা মানতে চাই তাদের চিন্তা করে দেখা অবশ্যই উচিত। অপারগতার দোহাই দিয়ে আমরা বাঁচতে পারব না। যেখানে চেষ্টা করলে, জোরদার আন্দোলন গড়ে তুললে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব সেখানে উপায়হীনতার ও অপারগতার ওযর আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ব্যক্তি জীবনে শরীয়াতের যথাযথ অনুসারী হতে বলে ব্যক্তি হিসেবেও সমস্ত কাজকর্ম ইসলামের সীমার ভিতর থেকে সম্পাদন করতে হলে শরীয়াতভিত্তিক রাষ্ট্র তথা ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তি জীবনেও বিশেষ করে আজকের যুগে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য চেষ্টা করা অপরিহার্য ও জরুরি।

৬। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ছাড়া মুসলমানদের জন্য অন্য রাষ্ট্র গ্রহণযোগ্য নয় : আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁর ছাড়া কারো সার্বভৌমত্ব নেই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তাঁর নির্দেশ ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ চলবে না :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ -

উচ্চারণ : ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ।

অর্থ : "আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম নেই।"[১০১]

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ -

উচ্চারণ : আলা লাহুল খালকু ওয়াল আমরু।

অর্থ : "সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই, নির্দেশও তাঁরই।"[১০২]

অতএব, পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। কোন রাজা-বাদশাহ, একনায়ক, পার্টি, শ্রেণী, বংশ, পার্লামেন্ট

---

১০১. ১২ : সূরা ইউসুফ : ৪০

১০২. ৭ : সূরা আল আরাফ : ৫৪

এমনকি জনগণও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহর খলীফা– সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। এটা নিছক বিশেষ রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব বা মতবাদ নয়। এটা মুসলানদের ঈমানের ব্যাপার। যে রাষ্ট্র মানবীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত তাকে সানন্দে মেনে নেয়া ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক ছাড়া আর কিছু নয়। এ অবস্থায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের খিলাফতের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৭। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইন মুসলিম দেশে চলতে পারে না : পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে মুমিনের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় সমস্ত কাজই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইনে সমাজ ও দেশ পরিচালনাকে পবিত্র কুরআনে কুফরি, যুলুম ও ফাসিকী বলে আখ্যায়িত করেছে :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ... هُمُ الظّٰلِمُوْنَ... هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

উচ্চারণ : ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনযালাল্লাহু ফাউলায়িকা হুমুল কাফিরূন... হুমুয যালিমূন... হুমুল ফাসিকূন।

অর্থ : "আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, শাসন চালায় না, তারা কাফির[১০৩]... তারা যালিম... তারা ফাসিক।"[১০৪]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইনের ব্যাপারে মুসলমানদের কোন ইখতিয়ার নেই, যে পছন্দ হলে মানব, না হলে মানব না :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

উচ্চারণ : ওয়া মা কানা লিমু'মিনিন ওয়া লা মু'মিনাতিন ইযা কাদাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আমরান আইয়্যাকূনা লাহুমুল খিইয়ারাতু মিন আমরিহিম।

---

১০৩. কাফির মানে আল্লাহকে অস্বীকারকারী। কাফির শব্দটি অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুফরীর বিভিন্ন অর্থ আছে। যেমন– প্রথমত: সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা, দ্বিতীয়ত: মুখে মান্য করা; কিন্তু অন্তর দিয়ে মান্য না করা কিংবা নিজের কাজ ও চাল-চলনের দ্বারা প্রমাণ করা যে, সেগুলো স্বীকার করে বটে, বাস্তবে মান্য করে না।

১০৪. ৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৪-৪৫-৪৭

অর্থ : "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেয়ার পর সে ব্যাপারে কোন মুমিন নারী-পুরুষের কোন ইখতিয়ারই থাকে না।"[১০৫]

মুমিনদের দায়িত্ব হচ্ছে যখন কুরআন সুন্নাহর আইনের দিকে আহ্বান জানানো হবে তখন বিনা শর্তে অকুণ্ঠ চিত্তে তা মেনে নেবে, অনুসরণ করবে :

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ـ

উচ্চারণ : ইন্নামা কানা কাওলাল মু'মিনীনা ইযা দু'য়ূ ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহী লিইয়াহকুমা বাইনাহুম আইয়্যাকূলূ সামি'উনা ওয়া আতা'উনা।

অর্থ : "ঈমানদারদের কাজ হচ্ছে যে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় যেন রাসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিতে পারেন তখন তারা বলে আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি।"[১০৬]

যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) ফয়সালা তথা কুরআন সুন্নাহর বিধান নিরঙ্কুশভাবে মেনে চলা মুমিনদের জন্য অপরিহার্য সেখানে মুসলমানদের রাষ্ট্র ও সমাজ-এর বাইরে থাকতে পারে না। কখনই নয়! মুসলমানরা কখনই কুরআন-সুন্নাহ পরিহার করে দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার, বিচার-আদালত, অর্থনীতি ও শিক্ষানীতি পরিচালনা করতে পারে না। এটা ঈমান বিরোধী কাজ এবং এ ধরনের শাসনকেও তাঁরা বরদাশত করতে পারে না। মুসলমানদের জীবন ও কাফেরের জীবনের মধ্যে যদি কোন পার্থক্যই না থাকে তাহলে এ ধরনের ঈমানের দাবী যেমন হাস্যকর, ঠিক তেমনি মুসলমানদের রাষ্ট্র ও কুফরী রাষ্ট্রের যদি একই ধরনের শাসনতন্ত্র, আইন-নীতিমালা ও পদ্ধতি হয় তাহলে কুফরী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রে পার্থক্য থাকবে না। এমতাবস্থায় মুসলমানরা চুপ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাদের জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। কোন ছলছুতা করে এ ফরয ও ঈমানের দাবীকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কুরআন-সুন্নাহর প্রতি বিমুখ কোন রাষ্ট্র ও সরকারকে ঈমানদাররা কবুল গ্রহণ করে নিতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহর প্রতি বিমুখ হলে কেউ মুমিন থাকতে পারে না। আল্লাহ্ বলেছেন :

---

১০৫. ৩৩ : সূরা আল আহযাব : ৩৬

১০৬. ২৪ : সূরা আল নূর : ৫১

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

উচ্চারণ : ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনূনা হাত্তা ইউহাক্কিমূকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম ছুম্মা লা ইয়াজিদূ ফী আনফুসিহিম হারাজান মিম্মা কাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমূ তাসলীমা।

অর্থ : "না, তোমার রবের শপথ। তারা কখনও মুমিন হবে না যতক্ষণ তারা তোমাকে (হে নবী) নিজেদের সকল বিরোধে ফয়সালাকারী বলে মেনে না নেবে। অতঃপর তুমি যে ফয়সালা করবে, তাতে নিজেদের অন্তরে তারা কোন রকম কুণ্ঠাবোধ করবে না, বরং পুরোপুরি তা মেনে নেবে।"[১০৭] এমনি অবস্থায় যত ঈমানের দাবী, আর মুসলমান হবার গৌরব প্রকাশ করা হোক না কেন, কুরআন-সুন্নাহর বিধানের প্রতি বিমুখ হলে পবিত্র কুরআন কিন্তু এদের মুমিন বলে স্বীকার করেনি :

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ - وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

উচ্চারণ : ওয়া ইয়াকূলূনা আমান্না ওয়া বিররাসূলি ওয়া আ'তানা ছুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা ফারীকুম মিনহুম মিম বা'দি যালিকা, ওয়া উলাইয়িকা বিলমু'মিনীন। ওয়া ইযা দুয়ূ ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহী লিইয়াহকুমা বাইনাহুম ফারীকুম মিনহুম মু'রিদূন।

অর্থ : "তারা বলে আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য কবুল করেছি অতঃপর তাদের একজন মুখ ফিরিয়ে নেয়! তারা কখনও মুমিন নয়। তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় যাতে রাসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন। তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[১০৮]

অতএব, ইসলামের বিধিবিধান ও অনুশাসন বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ,

---

১০৭. ৪ : সূরা আন নিসা : ৬৫

১০৮. ২৪ : সূরা আন নূর : ৪৭-৪৮

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কত্ব ইত্যাদি যত তন্ত্রমন্ত্রের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হোক না কেন তা যে ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক তা তো অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনি অবস্থায় কুরআন-সুন্নাহর প্রতি বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব হচ্ছে প্রচলিত রাষ্ট্র ও সরকার পরিবর্তন করে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও জিহাদ[১০৯] শুরু করা।

৮। সুন্নাহর যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের জন্যও ইসলামী রাষ্ট্র তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন : আমরা সবাই জানি যে, রাসূলুল্লাহর (সা) যথাযথ অনুসরণ ও পায়রুবির মধ্যেই আমাদের মুক্তি ও নাজাত নিহিত। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য তাঁকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কেননা আল্লাহ ঘোষণা করেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

উচ্চারণ : লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ।

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[১১০]

এখন প্রশ্ন রাসূলের (সা) জীবনের খণ্ডিত অংশটি কি আমাদের জন্য আদর্শ না তাঁর সমগ্র জীবন? তিনি কি শুধু আমাদের ইবাদত বন্দেগী, ব্যক্তি চরিত্র, পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি ক্ষেত্রেই আদর্শ নাকি আমাদের গোটা জীবনের জন্যই আদর্শ? নিশ্চয়ই সবাই বলবেন যে গোটা জীবনের জন্যই রাসূল (সা) আদর্শ ও উত্তম নমুনা। আর এ গোটা জীবন নিশ্চয়ই রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, সংস্কৃতি ইত্যাদি বাদ দিয়ে নয়। এখন যদি আমরা আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, সমাজ ইত্যাদি পরিচালনা করি- প্লেটো, এরিস্টটল, ম্যাকিয়াভেলী, হব্স, লক, রুশো, ফ্রয়েড, মার্ক্স, লেনিন, উইলসন, লিংকন, স্মীথ, রিকার্ডো, মার্শাল, কিনস প্রমুখের আদর্শ অনুসারে তাহলে কি রাসূল (সা)-কে আদর্শ বলে গ্রহণ করা হলো, না রাসূলের অনুসরণ করা হলো? বর্তমানে তো আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি সবই পরিচালিত হচ্ছে

---

১০৯. 'জিহাদ' অর্থ- কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রচেষ্টা কাজে লাগানো। 'জিহাদ' মানে যুদ্ধ নয়। জিহাদ বলতে শুধু যুদ্ধ বোঝায় না। যুদ্ধের জন্য কুরআনে 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। জিহাদ শব্দের অর্থ ব্যাপক। জিহাদের ব্যাপক অর্থের মধ্যে যুদ্ধও শামিল আছে। অবশ্য যুদ্ধ জিহাদেরই একটা পর্যায়।

১১০. ৩৩ : সূরা আল আহযাব : ২১

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের মতবাদ অনুসরণে। এ অবস্থায় রাসূলের (সা) অনুসরণের ও তাঁর ভালোবাসার দাবী কতটুকু যথার্থ?

আমরা অনেকেই সুন্নাতের অনুসরণের কথা বলি। রাসূল (সা) তেইশ বছরের নবুওয়াতী যিন্দিগীতে শুধু কি নামায-রোযা, তসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও আত্মশুদ্ধির কাজই করেছেন? শুধু কি তাহারাত, পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম-কানুনই শিখিয়েছেন? তিনি কি দীনের দাওয়াত নিয়ে ঘরে ঘরে যাননি? অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেননি? গালিগালাজ, অত্যাচার-অনাচার সহ্য করেননি? তিনি কি হিজরত করেননি? জাতি গঠন (Nation building), রাষ্ট্র গঠন (State building) ও পরিচালনা করেননি? যুদ্ধ-জিহাদ ও সন্ধি করেননি? বিচার-আদালত ও হক-ইনসাফ কায়েম করেননি? দেশে দেশে দূত পাঠাননি? যাকাত, উশর, খারাজ, কাফফারা, গণিমত, ফাই আদায় ও বণ্টন করেননি? মানুষের অভাব পূরণ ও মানুষের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করেননি? এসব কি তাঁর যিন্দিগীর বাইরে? যদি তিনি এ সবকিছু করে থাকেন, এসব যদি তাঁর মহান যিন্দিগীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো অনুসরণ করা কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়– এগুলো কি সুন্নাহ নয়? রাসূলের এ সমস্ত কার্যক্রম বাদ দিয়ে কি রাসূলের প্রকৃত অনুসারী হওয়া যাবে? নিশ্চয়ই নয়? তাহলে কি আমাদেরকে নবীজীর (সা) অনুসরণে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য, হক-ইনসাফ কায়েমের জন্য এগিয়ে আসা উচিত নয়? অবশ্যই। অতএব, সুন্নাতু রাসূল (সা)-এর প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের এবং অনুশীলনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একান্ত জরুরি।

৯। মুসলমানদের শাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদেল ইমাম বা ন্যায়পরায়ণ শাসক নিয়োগ অতীব জরুরি : মুসলিম জনগোষ্ঠী কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। তাদেরকে সর্বদাই সংঘবদ্ধ ও নেতৃত্বের অধীনে থাকতে হবে। এমনকি সফরের মত অস্থায়ী বিষয়েও আমীর বা নেতা নিযুক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা) জরুরি করে দিয়েছেন।

اِذَا اُخْرِجَ ثَلَثَةٌ فِى السَّفَرِ فَلْيُؤْمِرُوْا اَحَدُهُمْ -

উচ্চারণ : ইযা উখরিজা ছালাছাতুন ফিস্‌সাফারি ফালইউ'মারূ আহাদুহুম।

অর্থ : "তিন ব্যক্তি যদি সফরে বের হয় তবে তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে।"[১১১]

১১১. আবু দাউদ

এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী বিশেষজ্ঞ ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দল যতই ক্ষুদ্র হোক, তারা একান্ত অস্থায়ী কিংবা সফররত থাকুক যে কোন অবস্থাতে তাদের মধ্য হতে একজন আমীর নিযুক্ত করে নেয়া ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন। এটা এজন্য যে অন্যান্য সকল দলের পক্ষে যেন সতর্ক বাণীরূপে গণ্য হয় যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মাত্র তিন ব্যক্তি জমায়েত হলেও যেক্ষেত্রে নিজেদের আমীর বা নেতা নির্বাচন করা ওয়াজিব সেক্ষেত্রে অন্যান্য জামায়াতের উপর এ হুকুম কার্যকর করা আরো অধিক প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ্ পাক সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আর আমীর ছাড়া অন্যান্যদের সাথে নিয়ে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে জিহাদ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, হজ্জ পালন, জুমা ও দুই ঈদের নামায কায়েম করা, আর্ত-নির্যাতিতের সাহায্যে, হদ কার্যকর করা ইত্যাদি ফরয-ওয়াজিবসমূহ শক্তি ও নেতার নেতৃত্ব ছাড়া বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়।"[১১২]

নেতৃত্বের এ গুরুত্বের কারণেই প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য আকায়েদের কিতাব শরহে আকায়েদে নসফীতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে ইমাম নিয়োগ বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা যে ওয়াজিব এটার উপর ইজমা হয়েছে :

ثُمَّ الْاَجْمَعَ عَلٰى اِنَّ نَصَبَ الْاِمَامَ وَاجِبٌ -

উচ্চারণ : ছুম্মাল আজমা'আ 'আলা ইন্না নাছিবাল ইমামা ওয়াজিবুন।

অর্থ : "অতঃপর একথার উপর ইজমা হয়েছে যে ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব।"

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম তাফতাযানী লিখেছেন, "সঠিক মযহাব এই যে, এটি (অর্থাৎ নেতৃত্ব) বান্দার উপর নকলী দলীলের দ্বারা ওয়াজিব।"[১১৩] কেননা মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ مَاتَ لَمْ يَعْرِفْ اِمَامِ زَمَانَةِ فَقَدْ مَاتَ مَيْتَه جَاهِلِيَّةً -

উচ্চারণ : মান মাতা লাম ইয়া'রিফ ইমামি যামানাতি ফাকাদ মাতা মাইয়্যিতাহু জাহিলিয়্যাহ।

অর্থ : "যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে সেই যুগের ইমামকে সে জানে না তাহলে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণই করল।"[১১৪] এবং এজন্যই নবীজীর

১১২. আসসিয়াসাতুশ শারঈয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ২৮তম পরিচ্ছেদ।

১১৩. ইমাম তাফতাযানী, শরহে আকায়েদে নসফী, ২য় খণ্ড।

১১৪. আল হাদীস।

ওফাতের পরে সাহাবাগণ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার ব্যাপারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এমনকি নবীজীর দাফনের উপরও তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এমনিভাবে প্রত্যেক ইমামের মৃত্যুর পর এবং এ কারণে এটি ওয়াজিব যে বহু ওয়াজিবাতে শরীয়া এর উপর নির্ভরশীল। এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম নসফী বলেছেন যে মুসলমানদের জন্য এমন একজন রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন যিনি তাদের মধ্যে আহকাম (শরয়ী বিধিবিধান) প্রবর্তন করবেন, হদ-হুদুদ কায়েম করবেন, রাষ্ট্রীয় সীমানা রক্ষা করবেন, সৈন্যদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও সংগ্রহ করবেন, সাদকা (যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদি) আদায় করবেন, অত্যাচার ও চোর, ডাকাত, দুষ্কৃতকারীদের দমন করবেন, জুমা ও ঈদের নামায পড়াবেন, পরস্পরের ঝগড়া মিটাবেন, হকের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, যাদের অভিভাবক নেই এমন বালেগ ছেলেমেয়েদেরকে বিয়ে দিবেন, গণিমতের মাল বন্টন করবেন ইত্যাদি।[১১৫]

এখন যেসব নেতৃত্ব ও শাসক মুসলিম দেশসমূহে ক্ষমতাসীন তারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে ইসলামের প্রয়োজন ও দাবী পূরণ করতে পারছেন না। তাছাড়া যে সমস্ত প্রয়োজন ও কারণে শাসক বা ইমাম নিয়োগ মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব তা পূরণ করার জন্য বর্তমান প্রচলিত নেতৃত্ব ও শাসকদের পরিবর্তন করে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরি।

হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি হাদীসে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ দিচ্ছি– "জামায়াত গঠন (সংঘবদ্ধতা), আদেশ শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও আল্লাহর পথে জিহাদ।"[১১৬]

এ থেকে বুঝা যায় যে মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। সংঘবদ্ধতার জন্য তো নেতৃত্ব অপরিহার্য। নেতার আদেশ শোনা ও মানা জরুরি। কাজেই মুসলমানদেরকে অবশ্যই ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ হতে হবে। একথা তো সুস্পষ্ট যে নেতৃত্ব আনুগত্যের জন্যই। এখন যদি ইসলামী রাষ্ট্র না হয় তার নেতৃত্ব ইসলামী না হয় তাহলে মুসলমানগণ কার আনুগত্য করবে? রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে যেহেতু মানুষ বাধ্য হয় তাই সে রাষ্ট্র ও সরকারকে অবশ্যই ইসলামী হতে হবে। আনুগত্য করার মত সরকার ও রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। আর এটিও সুস্পষ্ট যে মুসলমানদের জন্য বর্তমান নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তাদের ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা ও যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য

---

১১৫. ইমা তাফতাযানী, শরহে আকায়েদ নসফী, ২য় খণ্ড

১১৬. তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। এটা উম্মতের জন্য, মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব।

তাছাড়া আরেকটি বিষয়ও চিন্তা করে দেখতে হবে। মুসলমানদের 'বায়আত' বা আনুগত্যের শপথকে জরুরি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

উচ্চারণ : মান মাতা ওয়া লাইসা ফী উনকিহী বাই'আতি মাতা মাইয়্যিতাতু জাহিলিয়্যাহ।

অর্থ : "যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গলদেশে 'বায়আত' ছিল না সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।"[১১৭]

এখন যদি বায়আত গ্রহণ করা জরুরি হয়ে থাকে তাহলে সে ওয়াজিব পালনের জন্য কি আমরা বর্তমান ফাসিক, যালিম ও অনৈসলামী শাসকের হাতে বায়আত গ্রহণ করব? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কি ইসলামী ও আদেল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তার হাতে বায়আত নেয়ার জন্য সংগ্রাম করা জরুরি হয়ে পড়ে না? অবশ্যই। অতএব, শাসক নির্বাচন ও বায়আতের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

১০। কোন ফাসিক,[১১৮] ফাজির ও যালিমের আনুগত্য করা সিদ্ধ নয় : ইসলাম মুসলমানদেরকে আদেল-ন্যায়পরায়ণ তথা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী নেতৃত্বের আনুগত্য করতে বলেছে। যারা যালিম, ফাসিক, যারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তাদের আনুগত্য করতে পবিত্র কুরআন বারণ করেছে :

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ - الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَايُصْلِحُوْنَ -

উচ্চারণ : ওয়া লা তুতিউ আমরাল মুসরিফীনাল্লাযীনা ইউফসিদূনা ফিল আরদি ওয়া লা ইউছলিহূন।

অর্থ : "সেসব সীমালঙ্ঘনকারীর আনুগত্য করো না যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে– সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করে না।"[১১৯]

---

১১৭. সহীহ মুসলিম

১১৮. ফাসিক অর্থ আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী, তাঁর আনুগত্য সীমা লঙ্ঘনকারী।

১১৯. সূরা আশ শূআরা : ১৫১-১৫২

যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি বিমুখ, যারা নফসের কামনা বাসনার দাসত্ব করছে, যারা সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত, তাদের আনুগত্য করা যাবে না:

وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا.

উচ্চারণ : ওয়া লা ত'তিয় মান আগফালনা কালবাহু 'আন যিকরিনা ওয়াত্তাবা'আ হাওয়াহু ওয়া কানা আমরুহূ ফুরুতা।

অর্থ : "এমন লোকের আনুগত্য করো না, যার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে গিয়েছে, যে তার নফসের কামনা বাসনার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং যার কাজকর্ম সীমাতিক্রম করেছে।"[১২০]

একটি অনৈসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ প্রকাশ্যভাবে ফাসিক ও যালিম, তারা শরীয়াতের কোন পরোয়াই করছে না। তারা ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার জন্য সব ধরনের অপকর্ম ও যুলুমমূলক কাজ করছে। অথচ মুসলমান জনগণকে বাধ্য হয়ে তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মেনে নিতে হচ্ছে, আনুগত্য করতে হচ্ছে। দীনদার লোকদেরকেও কি ঐসব ফাসিক, যালিম শাসকদের কুরআন-সুন্নাহর প্রতি বিমুখ নেতাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আনুগত্য করতে হচ্ছে না? আমরা মুখে যাই বলি না কেন কার্যত তাদের নির্দেশই আমাদের শুনতে হচ্ছে। যদিও কুরআন-সুন্নাহ এ ধরনের লোকদের কর্তৃত্ব মানতে ও আনুগত্য করতে নিষেধ করেছে। এমনি অবস্থায় এসব ফাসিক, যালিম ও দীন বিরোধী লোকদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো অবশ্যই জরুরি হয়ে পড়ে। তদস্থলে মুত্তাকী আদেল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাও অপরিহার্য। সাময়িকভাবে ফাসিক-ফাজির যালিম নেতৃত্ব বরদাশত করা গেলেও স্থায়ীভাবে ঐসব নেতৃত্ব বরদাশত করা আদৌ জায়েয নয়। দেশের দীনদার লোকদেরকে বিশেষ করে উলামায়ে কেরামকে এসব ব্যাপারে (অবশ্যই) ভেবে দেখা উচিত। বস্তুত জনগণের বিশেষ করে আলেম শ্রেণীর দায়িত্ব হচ্ছে এসব বাতিল, যালিম, ফাসিক, নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার অর্থ হলো যে, সমাজের সর্বস্তরে সৎ, যোগ্য, আমানতদার, আদেল ও মুত্তাকী লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাই এ জন্য চেষ্টা করা প্রতিটি মুমিনের অপরিহার্য দায়িত্ব।

১১। অন্যায় ও পাপের কাজে আনুগত্য নিষিদ্ধ : ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের

---

১২০. ১৮ : সূরা আল কাহাফ : ২৮

জন্য এটি বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে যে, কোন অন্যায় ও পাপ কাজে কারো আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল (সা) স্পষ্ট করে বলেছেন যে–

لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ - اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ -

উচ্চারণ : লা তা'আতা ফী মা'ছিয়াতিল্লাহি ইন্নামাত্ তা'আতি ফিল মা'রূফি।

অর্থ : "আল্লাহর নাফরমানীতে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল মারূফ তোলা কাজে।"[121]

অন্য হাদীসে আছে–

فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ -

উচ্চারণ : ফাইযা আমরু বিমা'ছিয়াতি ফালা সামি'আ 'আলাইহি ওয়া লা তা'আতা।

অর্থ : "যখন কোন মা'সিয়াত-পাপ ও অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয়া হয় তখন কোন আনুগত্য নেই।"[122]

উপরিউক্ত সহীহ হাদীস দু'টি থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কোন পাপ কাজে, অন্যায় কাজে, কারো আনুগত্য করা যাবে না। কিন্তু আমরা বর্তমান রাষ্ট্রের ও সরকারের অনেক অন্যায় কাজে আনুগত্য করতে বাধ্য হচ্ছি। তারা যেসব নিয়মকানুন বিধিবিধান পদ্ধতি চালু করেছে তার অনেকগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও তা মেনে নিতে হচ্ছে। জনগণের কথা বাদ দিলেও যারা জাতীয় সরকারের অধীনে চাকরি করছে তাদেরকে সরকারের অন্যায় যুলুমমূলক ও শরীয়াত বিরোধী নীতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সাহায্য করতে হচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন–

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

উচ্চারণ : ওয়া লা তা'আওয়ানূ 'আলাল ইছমি ওয়াল'উদওয়ান।

অর্থ : "গুনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করো না।"[123]

আমরা প্রত্যেকেই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে এসব সরকারী নীতির সাহায্যকারী। প্রতিষ্ঠিত সরকারকে কর দিতে হয় এবং তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে হয়।

---

১২০. মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী

১২২. বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ

১২৩. ৫ : সূরা আল মায়িদা : ২

জনগণের অর্থ অন্যায়, অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অপচয়মূলক ও যুলুমমূলক কাজে ব্যয় হচ্ছে। তাহলে পরোক্ষভাবে হলেও আমরা অন্যায়ের শরীক হয়ে পড়ছি। অথচ যুলুম ও মিথ্যা কাজে সহযোগিতাকারীকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের উম্মত বলে স্বীকার করেননি–

اِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ـ

উচ্চারণ : ইন্নাহু সাইয়াকূনু বা'দী আমারায়ি মান ছাদ্দাকাহুম বিকাযিবাহুম ওয়া আ'আনাহুম 'আলা যুলমাহুম ফালাইসা মিন্নী ওয়া লাসতু মিনহুম।

অর্থ : "আমার পরে কিছু লোক শাসক হবে। যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে সমর্থন করবে, যুলুমের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে সে আমার নয়, আমিও তার নই।"[১২৪]

এখন কি আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা অনুসরণ করে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকব, না প্রচলিত সরকারের অন্যায় অসত্যের সহযোগী হব? নিশ্চয়ই আমরা রাসূলুল্লাহর উম্মতই থাকতে চাই। তাহলে এ অবস্থায় প্রচলিত সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র ইসলামী না হবে, সরকার মুত্তাকী লোকের না হবে, ততক্ষণ তো ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সরকার ও রাষ্ট্রের অন্যায় ও অপকর্মের কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও পরোক্ষভাবে হলেও সহযোগী হতে হবে। বর্তমান যুগে এ থেকে পরিত্রাণ নেই। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অতীব জরুরি।

১২। সালাত ও যাকাতের প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন : সালাত ও যাকাত ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ দু'টো মৌল বিধান। এ দু'টো ঈমানের পরিচয়। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে– রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সালাত প্রতিষ্ঠা ও যথাযথভাবে যাকাত সংগ্রহ ও সুষ্ঠু বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাযীনা ইম্‌মাক্কান্নাহুম ফিল আরদি আকামুছ্‌ ছালাতা ওয়া আতুউয্‌ যাকাতা।

অর্থ : "তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে।"[১২৫]

---

১২৪. নাসায়ী, কিতাবুল বায়আত অধ্যায় : ৩৪-৩৫

১২৫. ২২ : সূরা আল হজ্জ : ৪১

ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া তো কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না। দেশের কে নামায পড়ল, কে যাকাত দিল বা না দিল অথবা যাকাত পাওয়ারযোগ্য ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া হলো কি হলো না– এসব ব্যাপারে সরকার ও রাষ্ট্রের কোন মাথা ব্যথা নেই। অথচ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র না হলে এসব ব্যাপারে সার্বিক তত্ত্বাবধান ও কার্যকর করা অসম্ভব।

শুধু নামায ও যাকাতই নয়। ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা, হজ্জের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সবকিছুর জন্যই সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ইসলামের আরকানগুলো পর্যন্ত বাস্তবে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যদিও এ সমস্ত ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে ফরয কিন্তু প্রতিটি মুসলমান যাতে এ সমস্ত ইবাদত সম্পাদন করে তার জন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। এটি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌল কর্তব্য। আর ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এ জাতীয় বিশুদ্ধ ধর্মীয় কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য চেষ্টা চালানো প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

১৩। হক ও ইনসাফ কায়েম করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে সুবিচার কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ ـ

উচ্চারণ : ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ কূনূ কাউয়্যামীনা বিলকিসতি।

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনসাফের ধারক হও।"[১২৬]

এছাড়া রাসূল পাঠানোর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ

উচ্চারণ : লাকাদ আরসালনা রুসুলানা বিলবায়্যিনাতি ওয়া আনযালনা মা'আহুমুল কিতাবা ওয়ালমীযানা লিয়াকূমান্‌নাসু বিলকিসতি।

অর্থ : "আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী দিয়ে পাঠিয়েছি। সে সাথে দিয়েছি কিতাব ও মীযান যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"[১২৭]

---

১২৬. ৪ : সূরা আন নিসা : ১৩৫

১২৭. ৫৭ : সূরা আল হাদীদ : ২৫

তাই আল্লাহর নির্দেশ সুবিচার সদাচরণ প্রতিষ্ঠা করা।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ... وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ -

উচ্চারণ : ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল'আদলি ওয়ালইহ্সানি... ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শায়ি ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগয়ি।

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সুবিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।... এবং নির্লজ্জতা অন্যায় ও যুলুম করতে নিষেধ করেছেন।"[১২৮]

কাজেই এটা স্পষ্ট যে মুসলমান সমাজে অবশ্যই সুবিচার ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। আর এ ইনসাফও হবে আল্লাহর বিধান অনুসারে, মনগড়া আইনে নয়। রাষ্ট্র ছাড়া সমাজে শরীয়াত মোতাবেক ইনসাফ কায়েম করা অসম্ভব। আজকে মুসলিম সমাজে যে বেইনসাফী, অত্যাচার, অনাচার বিরাজ করছে তা দূর করতে হলে রাষ্ট্র ও সরকারের হস্তক্ষেপ অবশ্যই লাগবে। সুবিচার প্রতিষ্ঠা, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র ও সরকার ছাড়া অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। এটা যে সম্ভব নয় তা প্রত্যেকে স্বীকার করতে বাধ্য। ব্যক্তিগতভাবে কেউ ভালো হতে পারে, ইনসাফের উপর কায়েমও থাকতে পারে। কিন্তু গোটা সমাজের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা তো ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন ইনসাফের সীমালঙ্ঘন করা হয়, কোন শক্তিশালী গোষ্ঠী নিরীহ জনতার উপর যুলুম নির্যাতন চালায় তার প্রতিকার রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব নয়। হয়ত বলা হবে রাষ্ট্র তো কোন না কোনভাবে রয়েছে। এরাই ইনাসফ কায়েম করবে– এটা তাদের দায়িত্ব। ইনসাফ করার দায়িত্ব আল্লাহ মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করেন। আর এ দায়িত্ব পালন করা অবশ্যই জরুরি। এ দায়িত্ব পালন কুরআন-সুন্নাহর আইনে করতে হবে। মানব রচিত আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালার কাজ করলে চলবে না। এমতাবস্থায় কোন অনৈসলামী সরকারের কাছে তা আশা করা যায় না। এহেন সরকার নিজেইতো যুলুমের মদদগার। তার মাধ্যমে ইনসাফ কায়েম আশা করা যায় না। এমনি অবস্থায় ইনসাফ করার জন্য যে রাষ্ট্র শক্তির প্রয়োজন সেটা করায়ত্ত করা তথা একটি ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করা প্রতিটি মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব।

১৪। সমাজ থেকে পাপ নির্মূল এবং ভালো কাজের প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজন : আমরা সবাই জানি যে আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎকর্মের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়, অনাচার, যুলুম, ফাহেশা কাজ বন্ধ করতে আদেশ করেছেন :

---

১২৮. ১৬ : সূরা আন নাহল : ৯০

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ -

উচ্চারণ : ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শায়ি ওয়ালমুনকারি ওয়াল বাগয়ি।

অর্থ : "তিনি তোমাদেরকে ফাহেশা, অন্যায়, পাপ ও যুলুম করতে নিষেধ করেছেন।"[১২৯]

ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় থেকে বারণ করা– এটি মুসলমানদের জাতিগত কর্তব্য :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

উচ্চারণ : কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্‌নাসি তা'মুরূনা বিলমা'রূফি ওয়া তানহাওনা 'আনিল মুনকারি।

অর্থ : "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। তোমাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যই উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে।"[১৩০]

মোটকথা, আমর বিল-মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করার পন্থা হিসেবে প্রথমত ব্যক্তিগতভাবে সদুপদেশ দান, বুঝানো, প্রতিবাদ করা যেতে পারে। সম্মিলিতভাবে চাপও সৃষ্টি করা যেতে পারে। এতে কিছু কিছু সীমিত ক্ষেত্রে অন্যায় পাপ দূর করা সম্ভবও হতে পারে। তবে এটাও সত্য যে, সমাজের বুক থেকে পাপ নির্মূল হওয়া রাষ্ট্র ও সরকারের সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপ ছাড়া অসম্ভব। অন্যায় ও পাপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরা যখন সংঘবদ্ধভাবে অন্যায় করবে, পাপ চালু করবে, ফাহেশা কাজকে ব্যবসায় পরিণত করবে তখন শুধু উপদেশ নসীয়ত দ্বারা তা দূর করা সম্ভব নয়। তাছাড়া রাষ্ট্র ও সরকার নিজেই যদি পাপের সাহায্যকারী হয়, তার মাধ্যমেই যদি অন্যায়-পাপ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটে তাহলে তার সমাধান হবে না। এক্ষেত্রে সরকার ও রাষ্ট্রকে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার গঠন তখন অবশ্যই জরুরি হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র ও সরকার ইসলামী না হলে তাতে আশা করা যায় না যে তারা পাপ দূর করবে। অনৈসলামিক সরকার নিজেই পাপ-অশ্লীলতার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহ দানকারী। সরকারের সমর্থন আছে বলেই

---

১২৯. ১৬ : সূরা আন নাহল : ৯০

১৩০. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ১১০

তো একটি মুসলিম দেশে প্রকাশ্যে শরীয়াত লঙ্ঘন, পাপ-অন্যায় ও ফাহেশা কাজ চলতে পারছে। এ অবস্থায় সরকার পরিবর্তন করে ইসলামী সরকার গঠন একান্ত জরুরি।

১৫। দীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য : আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীন পাঠিয়েছেন যাতে করে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা এবং মতবাদের উপর বিজয়ী করা যায়। আল্লাহর দীন কারো অধীন থাকতে পারে না–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

উচ্চারণ : হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়াদীনিল হাক্কি লিউযহিরাহু 'আলাদ্দীনি কুল্লিহি ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকূন।

অর্থ : "তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে করে সমস্ত জীবন ব্যবস্থার উপর তাঁকে বিজয়ী করে দিতে পারেন।"[১৩১]

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

উচ্চারণ : ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লা তাকূনু ফিতনাতুঁও ওয়াইয়াকূনাদ দীনু কুল্লুহু লিল্লাহি।

অর্থ : "তাদের সাথে লড়াই করো যেন ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"[১৩২]

এখন যদি দীনকে সবকিছুর উপর বিজয়ী ও গালেব করতে হয় তাহলে রাষ্ট্র ও সরকারকে ইসলামের কর্তৃত্বের বাইরে রেখে তা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র ও সরকারের উপর ইসলামের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে দীনের বিজয় আদৌ হবে না। রাষ্ট্র ও সরকারের উপরই যদি দীন বিজয় লাভ না করে তাহলে দীন সবকিছুর উপর বিজয় লাভ করবে না। তাই যদি আমরা দীনকে বিজয়ী করতে চাই তাহলে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ইসলামের কর্তৃত্ব তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

১৬। অনৈসলামী কর্মকাণ্ড ও যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও জিহাদ করা ঈমানের অনিবার্য দাবী : যেখানেই কোন অন্যায় ও যুলুম হবে, শরীয়াত

১৩১. ৬১ : সূরা আছ ছফ : ৯

১৩২. ৮ : সূরা আল আনফাল : ৩৯

বিরোধী কাজ সংঘটিত হবে সেখানেই প্রতিটি মুমিনকে এসবের পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা সাধনা করতে হবে। এ ব্যাপারে শরীয়াতের নির্দেশ সুস্পষ্ট :

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ - فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ -

উচ্চারণ : মান রায়া মিনকুম মুনকিরান ফালইয়ুগাইয়্যিরাহু বিইয়াদিহী ফাইল লাম ইয়াসতাতিয়্যি ফাবিলিসানিহী। ফাইললাম ইয়াসতাতি ফাবি কালবিহী ওয়া যালিকা আদ'আফুল ঈমান।

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন অন্যায় দেখে তখন তার তার কর্তব্য হলো হাত দিয়ে (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগে) তার পরিবর্তন করা, তা যদি করার সামর্থ্য না থাকে তবে মুখ দিয়ে প্রতিরোধ করবে, যদি তাও না পারে তবে অন্তর দিয়ে চেষ্টা করবে, (অর্থাৎ খারাপ জানবে, ঘৃণা করবে, প্রতিকারের ও প্রতিরোধের আগ্রহ ও চিন্তা থাকবে এবং কোন অবস্থায়ই সমর্থন ও সহযোগিতা করবে না) এ হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন পর্যায়।"[১৩৩]

সাধারণভাবে সমস্ত অন্যায় প্রতিরোধ করার জন্য মুমিনদের দায়িত্ব বর্ণনার পাশাপাশি শাসকদের তথা সরকারী অন্যায় যুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, জিহাদ করার দায়িত্বও মুমিনদের উপর অর্পণ করা হয়েছে :

ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَيُؤْمَنُوْنَ - فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِه فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ - وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ -

উচ্চারণ : ছুম্মা ইন্নাহা তাখালুফা মিম্ বা'দিহিম খুলূফিন ইয়াকূলূনা মা লা ইয়াফ'আলূনা ওয়া ইয়াফ'আলূনা মা লা ইয়ুমারূনা– ফামান জাহাদাহুম বিইয়াদিহী ফাহুয়া মু'মিনু ওয়া মান জাহাদাহুম বিলিসানিহী ফাহুয়া মু'মিনু ওয়া মান জাহাদাহুম বিকালবিহী ফাহুয়া মু'মিনু ওয়া লাইসা ওয়ারাআ যালিকা মিনাল ঈমানি হাব্বাতা খারদালিন।

অর্থ : "অতঃপর অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থানে বসবে। তারা এমন সব কথা

১৩৩. মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

বলবে যা নিজেরা করবে না, এমন সব কাজ করবে যার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। তখন যারা হাতের সাহায্যে তাদের সাথে জিহাদ করবে সে মুমিন, যে জিহ্বার সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সে মুমিন, অন্তর দিয়ে যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মুমিন। ঈমানের এর চেয়ে ক্ষুদ্রতম পর্যায় আর নেই।"[১৩৪]

এমতাবস্থায় আমাদের চোখের সামনে কত অন্যায় হচ্ছে, শরীয়াত কিভাবে প্রকাশ্যে লঙ্ঘিত হচ্ছে, প্রকাশ্যেই ইসলামী অনুশাসন, কখনও কখনও খোদ ইসলামেরই অবমাননা করা হচ্ছে। এমনকি মুসলমানদেরই (?) একটি অংশ একথাও বলে বেড়াচ্ছে যে, ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ যুগে অচল (নাউযুবিল্লাহ)। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তথাকথিত মৌলবাদ আখ্যা দিয়ে নস্যাৎ করার জন্য জোর চেষ্টা চলছে। এ অবস্থায় আমরা ঈমানের দাবীদাররা কিছুই করছি না। অথচ ঈমানের সর্বোচ্চ দাবী হচ্ছে হাত দিয়ে অর্থাৎ শক্তি দিয়ে জিহাদ করা, তা সম্ভব না হলে মুখ দিয়ে প্রতিহত করা আর নিম্নতম পর্যায় হচ্ছে অন্তর দিয়ে জিহাদ করা। প্রথম পন্থায় করার সামর্থ্য না থাকলে অবশ্যই দ্বিতীয় পন্থায় অর্থাৎ মুখ দিয়ে বক্তৃতা বিবৃতি, মিটিং-মিছিল, বিক্ষোভ, ধর্মঘট ইত্যাদি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চেষ্টা চালাতে হবে। আর কোথাও তারও সুযোগ না থাকলেই শুধু অন্তর দিয়ে ঘৃণা করার মধ্যে জিহাদ সীমাবদ্ধ থাকবে। দেশের আলেম উলামা ও সমস্ত ঈমানদাররা যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ইসলামের স্বপক্ষে দাবী তুলে রাস্তায় নামেন তাহলে অবশ্যই একটা সাড়া সৃষ্টি হবে এবং দীন কায়েমের পথ প্রশস্ত হবে। তাহলে সামর্থ্য নেই, এটা গোটা জাতির জন্য বলা যায় না। আর অন্তরের জিহাদ তো ঈমানের সর্বনিম্ন পর্যায়। আমরা এ জিহাদও অংশ নিচ্ছি না। অন্তরের জিহাদের অনিবার্য দাবী হচ্ছে অন্যায় যুলুমের প্রতিকার করতে না পারলেও তাতে শরীক হওয়া যাবে না; সহযোগিতা করা যাবে না। আমরা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছি এবং করতে বাধ্য হচ্ছি। গোটা দেশের মানুষও চলমান অবস্থাকে সমর্থন করছে যা কমপক্ষে মেনে নিচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের কি করার কিছুই নেই। দেশের মানুষকে খিলাফত, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী শাসন ইত্যাদি সম্পর্কে কি সচেতন করছি? শাসকদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা কয়জন স্পষ্ট সত্য কথা, হক কথা তুলে ধরছি, চাপ সৃষ্টি করছি? অথচ আল্লাহর রাসূল বলেছেন :

---

১৩৪. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়-২০

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٌ (اَوْ حَقٌّ) عِنْدَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ -

উচ্চারণ : আফদালুল জিহাদি কালিমাতু 'আদলুন (আও হাক্কুন) 'ইনদা সুলতানুন জায়িরুন।

অর্থ : "যালিম স্বৈরাচারী শাসকদের সামনে ন্যায় (বা সত্য কথা) বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"[১৩৫]

অথচ আমরা অনেকেই এ সর্বোত্তম জিহাদে লিপ্ত হচ্ছি না। শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য না থাকলে যেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে সেখানে আমরা অনেকেই এতে সক্রিয়ভাবে শরীক হচ্ছি না। অথচ এসব যালিম, ফাসিক সরকারের বিরুদ্ধে হকের আওয়ায তুলতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয় তাহলে তাকে শহীদ বলা হয়েছে :

"অনতিবিলম্বে এমন সব লোক তোমাদের উপর শাসক হবে যাদের হাতে থাকবে তোমাদের জীবিকা, তারা তোমাদের সাথে কথা বললে মিথ্যা বলবে। কাজ করলে মন্দ ও অন্যায় কাজ করবে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মন্দ কাজে প্রশংসা না করবে, তাদের মিথ্যা সমর্থন না করবে ততক্ষণ তারা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না। সত্যকে বরদাশত করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সামনে সত্যকে গোপন করে যাও। তারপর যদি তারা সীমালঙ্ঘন করে যায় তাহলে যে ব্যক্তি এজন্য নিহত হবে, সে শহীদ।"[১৩৬]

শুধু সাধারণ শহীদই নয় অন্য একটি হাদীসে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে :

اَفْضَلُ الشُّهَدَاءُ حَمْزَةُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ اِلٰى اِمَامٍ جَائِرٌ فَاَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَتَلَ -

উচ্চারণ : আফদালুশ শুহাদাউ হামযাতু বিন আবদুল মুত্তালিব ওয়া রাজুলুন কামা ইলা ইমামি জায়িরুন ফাআমারাহু বিলমা'রূফি ওয়া নাহাহি 'আনিল মুনকারি ফাকাতালা।

অর্থ : শহীদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং ঐ ব্যক্তি যিনি অত্যাচারী অনাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যের আদেশ

---

১৩৫. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

১৩৬. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড; হাদীস নং-৩০৯

ও অন্যায়ের নিষেধ করার কারণে নিহত হন। (ইমাম আবু বকর আল জাসসাস (র) তাঁর আহকামুল কুরআনের প্রথম খণ্ডে–

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا - (ইন্নী জা'য়িলুকা লিন্নাসি ইমামা।) আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।)

অতএব সমাজে বিরাজমান সমস্ত পাপাচার, অন্যায়, যুলুম বিশেষ করে যে সরকার ও রাষ্ট্র অন্যায় যুলুম ও অনৈসলামী ব্যবস্থার ধারক ও বাহক তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, আন্দোলন করা এবং এসবের পরিবর্তনের সংগ্রাম করা যে ঈমানের অনিবার্য দাবী তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ঈমানের দাবী পূরণ করার জন্য অবশ্যই এ লক্ষ্যে জিহাদ ও সংগ্রাম করা অপরিহার্য কর্তব্য। মুমিন মাত্রই সাধ্যানুযায়ী এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

১৭। মযলুম মানুষের মুক্তির জন্য : পৃথিবীর বিশেষ করে বিভিন্ন মুসলিম দেশের অধিকাংশ মানুষ কোন না কোনভাবে মযলুম, অত্যাচারিত, নিপীড়িত। এদের মুক্তির জন্য আমাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? অবশ্যই আছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাদের মুক্তির জন্য লড়াইয়ের কথা বলেছেন :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا -

উচ্চারণ : ওয়া মালাকুম লাতুকাতিলূনা ফী সাবীলিল্লাহি ওয়াল মুসতাদ'আফীনা মিনার্ রিজালি ওয়ান্ নিসায়ি ওয়াল উইলদানিল্লাযীনা ইয়াকূলূনা রব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল কারইয়াতিয্ যালিমি আহলুহা ওয়াজ'আল লানা মিন্ লাদুনকা নাছীরা।

অর্থ : "তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে সেই সব পুরুষ, নারী, শিশু যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে তাদের জন্য লড়াই করবে না? যারা ফরিয়াদ করছে যে, "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে উদ্ধার করো... এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক পাঠাও।"[১৩৭]

মযলুম জনতার মুক্তি যালিম ফাসিকদের হাতে কর্তৃত্ব রেখে সম্ভব নয়। তাদের

---

১৩৭. ৪ : সূরা আন নিসা : ৭৫

উপর কৃত অত্যাচারের প্রতিকার স্বয়ং যালিমদের মাধ্যমে অসম্ভব। যালিম সরকার নিপীড়িত জনতার বন্ধু ও সাহায্যকারী হতে পারে না। মযলুম মানুষের ফরিয়াদের প্রতিকার একটি নাফরমান সরকারের পক্ষে অসম্ভব। না– তার কাছে তা আশা করা যায় না। যদি তাই না হয় তাহলে মযলুম মানুষের সাহায্যকারী ও বন্ধু হিসেবে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। মযলুম মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিকল্প নেই।

১৮। অর্থনৈতিক সমস্যা ও দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন : অধিকাংশ মুসলিম দেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। অথচ তার পাশাপাশি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে। একদিকে অনাহার, অর্ধাহার, অন্যদিকে সম্পদের পাহাড়, বিলাসী জীবন। এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হলে এমন এক সরকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যা ধনসম্পদের এমন বন্টন ব্যবস্থা চালু করবে যাতে–

كَىْ لاَ يَكُوْنَ دَوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

উচ্চারণ : কাই লা ইয়াকূনা দাওলাতান বাইনাল আগনিয়ায়ি মিনকুম।

অর্থ : "যেন ধনসম্পদ শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হতে থাকে।"[১৩৮]

ইসলামী সরকার ধনিক শ্রেণীর সম্পদে বঞ্চিত নিগৃহীত মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে এবং আদায়ের ব্যবস্থা করবে। কেননা–

فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

উচ্চারণ : ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুম মা'লূমুন লিস্‌সায়িলি ওয়াল মাহরূম।

অর্থ : "তাদের ধনসম্পদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট অধিকার প্রার্থী ও বঞ্চিত মানুষের জন্য।"[১৩৯]

এমন সরকার ও অর্থব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, যা মুনাফাখোরী, সুদ, ঘুষ, ফটকাবাজী, মওজুদদারী, চোরাকারবারী, ওযনে কম দেয়া, প্রতারণা, ধোঁকা, শোষণ, লুণ্ঠন, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ছিনতাই, ধনসম্পদের বেআইনি কুক্ষিগতকরণ বন্ধ করবে, অপচয় রোধ এবং দেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র,

---

১৩৮. ৫৯ : সূরা আল হাশর : ৭

১৩৯. ৭০ : সূরা আল মায়ারিজ : ২৪-২৫

বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করবে। যদি আমরা এসব কিছু চাই তাহলে অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্র, কায়েমের জন্য আন্দোলন করতে হবে; সংঘবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখা দরকার সম্পদ দিয়ে মানুষের সম্ভাব্য সর্বাধিক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার ব্যবস্থাই হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে দারিদ্র্য দূর করা। তাই ইসলামী উম্মাহর জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিকল্প নেই। সব মতবাদ ও ব্যবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং সব ব্যর্থ হয়েছে। এখন ইসলাম একমাত্র বিকল্প। তাই একেই এখন কায়েমের চেষ্টা চালাতে হবে।

আখিরাতে যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে তাদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.

উচ্চারণ : ইন্নাহু কানা লা ইউমিনু বিল্লাহি 'আযীম। ওয়া লা ইয়াহুদ্দু 'আলা তা'আমিল মিসকীন।

অর্থ : "সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না এবং দরিদ্রকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করত না।"[১৪০]

অন্যত্র–

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ -

উচ্চারণ : কালূ লাম নাকু মিনাল মুছাল্লীনা ওয়া লাম নাকু নুত্'য়িমুল মিস্কীন।

অর্থ : "তারা বলবে আমরা নামাযীদের মধ্যে ছিলাম না এবং দরিদ্রকে খাদ্য দান করতাম না।"[১৪১]

অতএব মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করা ঈমানের দাবী ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর রাসূল (সা) ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি পেট পুরে খায় আর তার প্রতিবেশী উপোষ থাকে সে মুমিন নয়।" কাজেই যে অর্থব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণে লক্ষ লক্ষ বনি আদম উপোষ করছে, উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ থাকছে, বাসস্থানের অভাবে ফুটপাতে থাকছে, বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন করছে এ জাতীয় রাষ্ট্র পরিবর্তন করা অবশ্যই ঈমানের দাবী। প্রতিবেশী না খেয়ে থাকলে যদি প্রকৃত ঈমানদার না হওয়া যায় তাহলে যে রাষ্ট্রে মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয় তাকে মুমিনদের রাষ্ট্র বলা চলবে না। তাই অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন ও লক্ষ কোটি বনি

---

১৪০. ৬৯ : সূরা আল হাক্কাহ : ৩৩-৩৪

১৪১. ৭৪ : সূরা আল মুদ্দাসসির : ৪৩-৪৪

আদমের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের এবং সুষ্ঠু বণ্টননীতি ও সবার জন্য সম্ভাব্য স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে।

১৯। স্বৈরাচারের নির্মূল, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন ও শূরায়ী ব্যবস্থা কায়েমের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য : ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্যতম মৌলনীতি হচ্ছে যে জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই ক্ষমতা লাভ করতে হবে। জোরজবরদস্তি করে শক্তির জোরে ক্ষমতা লাভ ইসলামে সমর্থিত নয়। কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সমস্ত কাজ হতে হবে পরামর্শের বা শূরার ভিত্তিতে–

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ -

উচ্চারণ : ওয়া আমরুহুম শূরা বাইনাহুম।

অর্থ : "তাদের যাবতীয় কার্যাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।"[১৪২]

কাজেই জনগণের মতামত ছাড়া ক্ষমতায় জোরপূর্বক বসার চেষ্টা এক মারাত্মক অপরাধ। এটি এমন অপরাধ যে হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেছেন :

فَمَنْ بَايِعُ رِجَالاً عَلٰى غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يَتَابِعُ هُوَ وَ لاَ الَّذِيْ تَابِعَهُ تَغرَةِ اَنْ يُّقْتَلاَ -

উচ্চারণ : ফামান বা'ইউ রিজালান 'আলা গাইরি মাশওয়ারাতি মিনাল মুসলিমীনা ফালা ইয়াতাবিউ' হুয়া ওয়া লাল্লাযী তাবি'আহু তাগারাতি আন্ইয়উকতালা।

অর্থ : "যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত গ্রহণ করে এমতাবস্থায় তার এবং তার যে আনুগত্য করে তাকে অনুসরণ করা যাবে না। বরং তাদের উভয়ই কতলের উপযুক্ত হয়ে পড়ে।"[১৪৩]

অতএব জবরদস্তি দ্বারা কোন শাসন পদ লাভ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ক্ষমতায় আসার পরও জনগণের মতামত ছাড়া দেশ পরিচালনা সিদ্ধ নয়।

এখন আমাদের এ বিশ্বের দেশে দেশে যারা ক্ষমতায় আসেন এবং ক্ষমতা চালান তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জোরজবরদস্তি করে ক্ষমতায় আসছেন। তাদের শাসনে দেশের জনগণের মতামত প্রতিফলিত হচ্ছে না। শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী পন্থায় ক্ষমতা ও শাসন চালাচ্ছেন। এ অবস্থায় নাগরিকদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা

---

১৪২. ৪২ : সূরা আশ শূরা : ৩৮

১৪৩. বুখারী, কিতাবুল মুহারেবীন

জায়েয হবে না। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ছাড়া ইসলামী জনতার মতামত শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হবে না। ইসলামী রাষ্ট্র পদ্ধতি ছাড়া বর্তমানে সত্যিকার জনগণের আস্থাভাজন সৎ ও যোগ্য লোক নেতৃত্বে সমাসীন হতে পারবে না। যদি তা না হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরি– এটা সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে।

এমনকি বর্তমানে যে পন্থায় নির্বাচন হচ্ছে তাতে সৎ ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল লোকদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। যতই সৎ ও যোগ্য হোন না কেন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় না করলে নির্বাচনে জয় লাভ করা যায় না। বর্তমান সুবিধাবাদী ও টাকার খেলার রাজনীতি ও নির্বাচনে অনেক সৎ ও ইসলামী লোকের পক্ষে অংশগ্রহণ অসম্ভব। বর্তমান অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে একজন 'সৎ ও ইসলামী' লোককেও নির্বাচনে যেতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই আপোষ করে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

অর্থ না থাকলে বা পারিবারিক ও বংশীয় আভিজাত্য ও আধিপত্য না থাকলে অনেক সৎ ও ইসলামপন্থী লোকের পক্ষেই নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। অথচ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সে ব্যক্তিই নেতৃত্বদান করবে– তারই নির্বাচিত হওয়া উচিত যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী-আলেম, আদেল-মুত্তাকী, সৎ ও যোগ্য এবং বিশ্বস্ত হবে– তার টাকা পয়সা থাক আর না থাক। এমন নির্বাচন ব্যবস্থাই ইসলামে কাম্য যেখানে সর্বাধিক সৎ, যোগ্য ও দীনদার ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারবে। বর্তমান পুঁজিবাদী নির্বাচন ব্যবস্থায় এটা হওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন ও জনগণের মতামত নিয়ে শাসন পরিচালনার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র গঠন জরুরি হয়ে পড়েছে।

২০। **আল্লাহর শাস্তি ও আযাব তেকে বাঁচার জন্য :** যদি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র না থাকে তাহলে প্রকাশ্যভাবে শরীয়াত লঙ্ঘন হয় ও পাপকর্ম চলতে থাকে। জনগণ নিজেরা পাপ কাজ না করলেও শাসকদের ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পাপকর্ম ও শরীয়াত বাদ দিয়ে অন্য কোন পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনায় যদি বাধা না দেয়া হয়, এসব পরিবর্তনের চেষ্টা না হয়, তাহলে এর জন্য বিশেষ লোক ও সাধারণ জনগণ সবাইকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। পবিত্র হাদীসে রাসূল (সা)-এর এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে :

إِنَّ اللّٰهَ لَايُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ

ظَهْرًا فِيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَن يُّنْكِرُوْا فَلاَ يُنْكِرُوْا فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَذَابَ اللّٰهِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ -

উচ্চারণ : ইন্নাল্লাহা লা ইউ'আযযিবুল 'আম্মাতা বি'আমালিন খাস্‌সাতিন হাত্তা ইয়ারাউল মুনকারা বাইনা যাহ্‌রান ফীহিম ওয়াহুম কাদিরূনা 'আলা আইইয়ানকিরূ ফালা ইয়ানকারূ ফাইযা ফা'আলূ যালিকা 'আযাবাল্লাহিল 'আম্মাতি ওয়ালখাস্‌সাতিন।

নবী করীম (সা) বলেছেন, "আল্লাহ্ কখনও বিশেষ লোকদের (অন্যায়) কাজের জন্য সাধারণ লোকদের উপর আযাব নাযিল করেন না, কিন্তু তারা (সাধারণ লোক) যদি তাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে পাপকাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পায় এবং তারা এর প্রতিবাদ করতে ও বন্ধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ লোক ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিক্ষেপ করবেন।"[১৪৪]

আর একটি হাদীসে আছে–

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَن يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلاَ يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا -

উচ্চারণ : মা মিন রাজুলিন ইয়াকূনু ফী কাওমিন ইয়্যামালু ফীহিম বিলমা'আছী ইয়াকদিরূনা 'আলা আইয়্যুগাইয়্যিরূ 'আলাইহি ওয়া লা ইউগায়্যিরূনা ইল্লা আছাবাহুমুল্লাহু মিনহু বিই'কাবিন কাবলা আইয়্যামূতূ।

অর্থ : "যে জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি পাপকার্য করতে থাকে অথচ সে জাতির লোকেরা পাপকাজ বন্ধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা না করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাদের উপর কঠিন আযাব চাপিয়ে দেবেন।"[১৪৫]

قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدِى الظَّالِمِ وَلَتَاْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرَاءً

---

১৪৪. শরহে সুন্নাহ

১৪৫. আবু দাউদ

وَلْتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ -

উচ্চারণ : কালা কাল্লা ওয়াল্লাহি লাতামুরুনা বিলমা'রূফি ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকারি ওয়া লাতা'খুযুনা 'আলা ইয়াদিয্ যলিমি, ওয়ালিতা'তারনাহু 'আলাল হাক্কি আতরাউ' ওয়ালতাকসুরুন্নাহু 'আলাল হাক্কি কাসরাস আও লিইয়াযরিবান্নাল্লাহু বিকুলূবি বা'দুকুম 'আলা বা'দিন ছুম্মা লাইয়ালআনুকুম কামা লানাহুম।

অর্থ : নবী করীম (সা) বলেছেন, "কখনও না, আল্লাহর শপথ তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং যালিমের হস্তধারণ করে তার যুলুম বন্ধ করে দেবে এবং তাকে অন্যায় পথ হতে ফিরিয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মনকে সংযুক্ত করে দেবেন এবং পূর্বকালের পাপীদের মত অভিশাপ নাযিল করবেন।"[১৪৬]

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে– নবী করীম (সা) বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই মা'রূফের আদেশ দেবে এবং মুনকার হতে লোকদের বিরত রাখবে। তাদেরকে কল্যাণকর কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে কোন আযাবে নিক্ষেপ করবেন অথবা তোমাদের উপর অন্যায়কারী যালিম শাসক নিযুক্ত করে দেবেন। তখন তোমরা মুক্তির জন্য দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।"[১৪৭]

উপরের কয়টি হাদীস থেকে স্পষ্ট হলো যে, (১) প্রকাশ্যভাবে যদি অন্যায় পাপ চলতে তাকে তাহলে বাধা দান ও এসব দূর করা জনগণের দায়িত্ব। (২) তাদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি অন্যায় যুলুম থেকে বিরত না রাখে, এর জন্য চেষ্টা না চালায় তাহলে আল্লাহ সবাইকে শাস্তি দেবেন। এ শাস্তি বিভিন্নরূপ হতে পারে, তন্মধ্যে দুষ্ট ও যালিম লোকের শাসন অন্যতম।

বর্তমান বিশ্বে দেশে দেশে প্রকাশ্যভাবে শরীয়াত বিরোধী কাজ রাষ্ট্রের আনুকূল্যে সংঘটিত হচ্ছে। তাছাড়া দেশে দেশে অশ্লীল ছবি, পতিতাবৃত্তির মত বিষয়ও আইনসঙ্গত করে দেয়া হয়েছে। দেশের শাসনতন্ত্রে তো কুরআন সুন্নাহর স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত নেই– চালু তো দূরের কথা। যুলুম অত্যাচারের তো শেষ নেই। এ অবস্থায় এসব পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করা জরুরি। যদি বলা হয় সামর্থ্যের

---

১৪৬. আবু দাউদ

১৪৭. মুসনাদে আহমদ

অভাব রয়েছে তাহলে একথা সত্য যে দেশের সমস্ত আলেম-উলামা ও দীনদার লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা শুরু করলে অনেক কিছু করা সম্ভব। তাহলে সামর্থ্যের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে কেউ মুক্তি পাবে না। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ যেখানে ইসলাম কায়েম ও পাপ-অন্যায় দূর করা মুমিনদের উপর ফরয। সেখানে সামর্থ্যের কথা আসবে না। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য জনগণের এ সামর্থ্য নেই তাহলেও দেখা যায় যে, দেশের মুসলিম জনগণ সম্মিলিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য দাবী জানালে, আন্দোলন গড়ে তুললে যালিম, ফাসিক লোক ক্ষমতায় থাকতে পারে না। এতে ইসলাম কায়েম সহজ হবে। এটা সত্য যে কেউ নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা, কেউ বা নীরব সমর্থন দ্বারা, কেউ বা সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা বর্তমানে অনৈসলামী ব্যবস্থা ও তার ধারক বাহক শাসকগোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখছে। এ অবস্থায় সামর্থ্যহীনতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের দ্বীনদার ঈমানদার জনগণ ময়দানে নামলে অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে। রাসূল (সা)-এর হাদীস ঈমানদারদের হুঁশিয়ারীর জন্য যথেষ্ট। এরপরও নিষ্ক্রিয় থাকার সুযোগ নেই। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েমে আমরা এগিয়ে আসব। শাস্তি যখন আসবে তখন সবার উপরই আসবে। এখনও আমাদের উপর আযাব চলছে। আযাব মানে তো শুধু নৈসর্গিক আযাব নয়। দুঃখ-দারিদ্র্য, অপমান-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, নিরাপত্তাহীনতা, যালিম শাসককে চাপিয়ে দেয়া, প্রতিপক্ষ বিজয়ী হওয়া, মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া, অনৈক্য, পারস্পরিক যুদ্ধ-সংঘাত ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য খোদায়ী আযাব। আমরা এখনও এসব আযাবের সম্মুখীন হই। মুসলমানরা কোন্ অবস্থান থেকে বর্তমানে কোন্ অবস্থানে এসেছে সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। কুফুরী ও মুশরিক শক্তি এখন বিজয়ী। আমাদের স্বাধীনতা নিরাপত্তা বর্তমানে হুকমীর সম্মুখীন। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের অবস্থার দিকে দেখলে দেখা যায় এখনই সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। এ অবস্থায় ফিসক-ফুজুরী-ফাহেশা, অন্যায়-অসত্যের পরিবর্তন করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অবশ্যই জরুরী। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার আর সুযোগ নেই।

২১। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য : মুসলমানদের মধ্যে আজ নানারকম অনৈক্য, মতবিরোধ ও কলহ-কোন্দল বিরাজ করছে। ইসলামের নামেও অনৈক্যের অন্ত নেই। বর্তমান শাসনব্যবস্থায় এ সমস্ত অনৈক্য ও বিরোধ দূর করা সম্ভব নয়। বরং তারা বিভিন্নভাবে এসব বিরোধ জিইয়ে রাখছে নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থের জন্য। এসব অনৈক্য ও বিরোধ দূর করার জন্য প্রয়োজন একটি সর্বোচ্চ ইসলামী কর্তৃত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রই এ কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে যা

মুসলমানদের যাবতীয় অনৈক্যকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দূর করতে পারে। আল্লাহ্ পাক বলেছেন–

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ـ

উচ্চারণ : আতিউল্লাহ্ ওয়াআতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম ফাইনতানাযাতুম ফী শাইয়িন ফারুদ্দূহু ইলাল্লাহি ওয়াররাসূলি।

অর্থ : "তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য করো কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিতদের। যদি তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে পেশ করো।"[১৪৮]

অর্থাৎ যাবতীয় মতবিরোধ ও অনৈক্যের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্ই হবে মানদণ্ড। আর ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া কুরআন সুন্নাহর– ভিত্তিতে যাবতীয় অনৈক্য ও বিরোধের সমাধান অসম্ভব। আজ যে এত বিরোধ, ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে তার সমাধান অতি সহজে হত। এখন যে কেউ যথেচ্ছ ফতোয়া দিচ্ছে, ফির্কাবাজী করছে, ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে অতি সহজে এসব বিষয়ের ফয়সালা ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী করা যেত। তাই এ জাতীয় বিরোধে জড়িয়ে যারা সময় ও শ্রম দিচ্ছেন তাদেরও কর্তব্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সত্যিকার কুরআনী শাসন জারি হলে বিরোধেরও মীমাংসা হবে সহজে। এখন ধর্মীয় বিষয়েও অনেক সময় মধ্যস্থতা করতে হয় জাহেল লোকদের। ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে তো এমনটা হত না।

২২। মুসলমানদের অতীত গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনা এবং বিশ্বজনীন ইসলামী সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য : মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে নানাভাবে আজ সম্রাজ্যবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ, ইহুদিবাদের ষড়যন্ত্রের শিকার। মুসলমানরা তাদের গৌরব হারিয়ে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, পাতানী, মিন্দানাও, কসভো, আরাকান, পশ্চিম সাহারা, চেচনিয়া, পূর্ব তুর্কিস্তান, লেবাননসহ হাজারো সমস্যা আমাদের দুশমনরা সৃষ্টি করে রেখেছে। আজকের দেড়শ কোটি মুসলমান তা প্রতিরোধে সক্ষম হচ্ছে না। তার মূলীভূত কারণ হচ্ছে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্বশীল কোন নেতৃত্ব নেই, নেই সমস্ত মুসলমানের শক্তিশালী রাজনৈতিক কোন সংস্থা। বস্তুত ওআইসি বা মুসলিম জাতিসংঘ ধরনের সংস্থা হবে বিশ্ব মুসলিমের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক

---

১৪৮. ৪ : সূরা আন নিসা : ৫৯

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের মুসলিম বিশ্ব সংস্থার দায়িত্বই হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের সংরক্ষণ, তাদের সমস্যার সমাধান, শত্রুদের মোকাবিলা করা, বিশ্ব মুসলিমকে সংঘবদ্ধ ও ঐকবদ্ধ রাখা। তাই মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধন, তাদের গৌরব ফিরিয়ে আনা এবং সাম্রাজ্যবাদী ইহুদিবাদী শক্তির মোকাবিলায় মুসলমানদের বিজয় সূচিত করতে হলে শক্তিশালী বিশ্ব মুসলিম সংস্থা অপরিহার্য।

কিন্তু বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বস্তুত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদের ঐক্য ও শক্তিকে সমূলে বিনাশ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে, মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক উসমানী খিলাফতকে ধ্বংস করে দেয়। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ শাসক ঐসব সাম্রাজ্যবাদীদের লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত। তাই তাদের দ্বারা মুসলিম বিশ্বের স্বার্থরক্ষা সম্ভব নয়। বরং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতিষ্ঠাই এসবের সমাধান করতে পারে। আবার শক্তিশালী ওআইসি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা দরকার। কেননা মুসলিম দেশের বর্তমান সরকারগুলো ইসলাম কায়েমের পথে যেমন বাধা, তেমনি শক্তিশালী বিশ্ব মুসলিম সংস্থা কায়েমের পথেও বাধা। তারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নানা ধরনের জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের সূত্রকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এমনি অবস্থায় বিভিন্ন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে পারলেই মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ সুগম হবে।

প্রশ্নাবলী
Questions

১. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি? ব্যাখ্যা করো।
(What is Islamic Political System? Explain.)

২. রাষ্ট্র কি? রাষ্ট্র সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা ব্যাখ্যা করো।
(What is State? Explain the western concept about State.)

৩. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনা করো।
(Define State? Discuss about the nature of state.)

৪. রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মত আলোচনা করো।
(Discuss about the marxist concept of state.)

৫. রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েভারের মত আলোচনা করো।
(Discuess about the opinion of Max weber about state.)

৬. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌল নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করো।
(Discuss about the essential principles of Islamic political order)

৭. রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি?
(What is the concept of state in Islam)

৮. ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
(Define Islamic state. Discuss the charactristics of Islamic State.)

৯. ইসলামী রাষ্ট্র কাকে বলে? ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি?
(What is mean by Islamic state? What are the charactristics of Islamic state.)

১০. ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝ? ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।
(What do you mean by Islamic state? Distinguish between Islamic state and Muslim state.)

১১. ইসলামী রাষ্ট্র কি? ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী আলোচনা করো।
(What is Islamic state? Discuss the objectives and goals of Islamic state.)

১২. ইসলামী রাষ্ট্র কাকে বলে? ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মসূচি/কার্যাবলী আলোচনা করো।
(What is Islamic state? Discuss about the functions of Islamic state.)

১৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্যাবলী ও কার্যাবলী আলোচনা করো।
(Deifine Islamic state. Discuss the features, objectives and functions of an Islamic State.)

১৪. কল্যাণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?
(Define Welfare State. What is the characteristics of Welfare State.)

১৫. ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো।
(Define Islamic Welfare State. Discuss the characteristics of Islamic Welfare State.)

১৬. ইসলামী রাষ্ট্র কি? ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করো।
(What is Islamic State? Discuss the importance/ obligations for movement of establishing Islamic State.)

১৭. হযরত ওমর ফারুক (রা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের বিশেষত্ব আলোচনা করো।
(Discuss the features of Islamic Welfare State as established by Hazrat Omar Faruq (R).

১৮. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অপরিহার্যতা আলোচনা করো।
(Discuss about the obligations for movement of establishing an Islamic State.)

৩

ইসলামী রাষ্ট্র ও আধুনিক রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা

Islamic State Vs. Modern State : A Comparative Analysis

৩.১ ইসলামী রাষ্ট্র বনাম আধুনিক রাষ্ট্র (Islamic State Vs. Modern State)

আধুনিক রাষ্ট্র বলতে বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক একনায়ক শাসিত রাষ্ট্রকেই বুঝায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর তথা সমাজতন্ত্রের বিদায়ের পর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থারই জয় জয়কার। তবুও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন, কিউবাসহ পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে অদ্যাবধি টিকে আছে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নামে পরিচিত এ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের বহুবিধ পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী ও ইসলামী রাষ্ট্রের তুলনা

পার্থক্যের ধরন	পুঁজিবাদী রাষ্ট্র	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র	ইসলামী রাষ্ট্র
১। ক্ষমতার উৎস Sources of Power	পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার উৎস শ্রমিক মেহনতী মানুষ কিন্তু কার্যতঃ একটি দল তথা কমিউনিস্ট পার্টি তাও আবার এ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ।	ইসলামী রাষ্ট্র চূড়ান্ত ক্ষমতা, ইচ্ছার মালিকরূপে আল্লাহ ছাড়া কাউকে স্বীকার করে না। আল্লাহই হচ্ছেন মূলত নির্দেশ দানের অধিকারী। সমস্ত জনগণকে শর্তহীনভাবে তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশের নিকটই মাথা নত করতে হবে। কুরআন বলছে, হুকুম দেয়ার মালিক আল্লাহ। (৩ : সূরা আলে ইমরান :

			১৪৫) সাবধান, সৃষ্টি তার নির্দেশও তার। (৭ : সূরা আল আ'রাফ : ৫৪)। মানুষ খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের অধিকারী। ইসলামী সরকার আল্লাহর আইনকে কার্যকর করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।
২। আইনের উৎস Socrces of Law	পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এবং এ ক্ষেত্রে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভিমত ও ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য পায় বিধায় অনেক সময় জনগণের স্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হয়।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি মাত্র দল ক্ষমতাসীন থাকে বিধায় আইন প্রণয়নে তাদের মতামতই প্রতিফলিত হয়। সাধারণ জনগণ মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ পায় না। তারা কমিউনিস্ট পার্টি প্রণীত আইনের গোলামী করে মাত্র।	আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ এবং কুরআনের বাহক রাসূলের (সা) সুন্নাহই ইসলামী রাষ্ট্রের আইনের উৎস। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির বাস্তব প্রকাশ ও প্রয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কুরআন ও সুন্নাহর আইনকে বাস্তবায়িত করা, সমস্ত আইন ও নিয়মনীতি নির্ধারণের মূল ভিত্তি ও উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করা হয়।
৩। কাঠামোগত পার্থক্য Structural difference	পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ধর্মহীন সেকুলার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক দু'ধরনেরই হতে পারে।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কমিউনিজমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একদলীয় স্বৈরশাসিত রাষ্ট্র।	ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

৪। নির্বাচন পদ্ধতি Election System	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান, আইনসভার সদস্য, স্থানীয় সংস্থা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার জন্য যে কোন যোগ্য নাগরিক নিজের যোগ্যতা দাবী করে উক্ত পদের প্রার্থী হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোট পেয়ে তারা নির্বাচিত হন।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিদেরকেই রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন লাভজনক ও প্রতিনিধিত্বমূলক পদে নিয়োগ করা হয়।	ইসলামী রাষ্ট্রে কোন পদের জন্য কেউ প্রার্থী হন না। রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম জনগণের মতামত ও আস্থার ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত হন। মুসলিম জনগণের পারস্পরিক পরামর্শ ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন।
৫। নেতৃত্ব নির্বাচন Election of leader	পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কেউ নেতৃত্ব পদে আসীন হতে পারে।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেবল মাত্র ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত ব্যক্তিরাই নেতৃত্বে আসীন হন।	ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব পদে আসীন হওয়ার জন্য ঈমানাদর হওয়া শর্ত। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরই নেতৃত্ব পদে বরণ করা হয়।
৬। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য Balance between Individual and Society	পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে না। সবক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। সমষ্টির কল্যাণের নামে কর্তৃত্বশীলদের কল্যাণই বেশি হয়ে থাকে।	ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। ব্যক্তির কল্যাণ ও সমষ্টির কল্যাণ উভয়ই সমভাবে বিবেচ্য, ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর সহযোগী।

৭। বিচার ব্যবস্থা Judicial System	পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে মানব রচিত আইন দ্বারা অপরাধের বিচার করা হয়।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় স্বার্থে আইন প্রণীত হয়, দলের বিরোধিতাই অপরাধ এবং সে হিসেবেই বিচার ফয়সালা করা হয়।	ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ আইনের কর্তৃত্বের অধীনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। বাইরের চাপ হস্তক্ষেপ দ্বারা বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করা চলে না।
৮। রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার State Treasury	পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ধনভাণ্ডার মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদীদের মর্জিমত নিয়ন্ত্রিত হয়। অপচয়, অন্যায় ব্যয়, বেইনসাফী এ ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণী বা পার্টিই অর্থ ভাণ্ডারের মূল নিয়ন্ত্রক। সম্পদের চাবিকাঠি মুষ্টিমেয় পার্টি এলিটের কর্তৃত্বে ন্যস্ত থাকে।	ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল-ধনভাণ্ডার-সহায় সম্পদ সবই জনগণের আমানত। শরীয়ত মোতাবেক ও জনগণের কল্যাণের নিমিত্তই ন্যায়সঙ্গত পন্থায় রাষ্ট্রের আয় করতে হবে, ব্যয়ও করতে হবে।
৯। প্রশাসনিক নীতিমালা ও পদ্ধতি Administrative principle and method	পুঁজিবাদী আমলা ব্যবস্থা (Bureaucracy) অত্যন্ত শক্তিশালী। কায়েমী স্বার্থের স্বার্থ রক্ষাই এ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নীতি।	সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মেহনতী মানুষের নামে একদলীয় স্বৈরশাসন চালু করা হয়। সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই এ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নীতি।	জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে গোটা প্রশাসন ব্যবস্থা নিরন্তর কর্মরত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে মানুষের খিলাফতের মর্যাদার ভিত্তিতে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শূরায়ী পদ্ধতিতে গঠিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্র এ পৃথিবীতে সর্বাধিক ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠন করে। ইসলাম রাষ্ট্রে মানুষ তার মৌলিক চাহিদার পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র সামগ্রিক অগ্রগতি ও মর্যাদা, প্রসার ও ব্যাপ্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির মাধ্যম হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রের

অন্তসারশূন্যতা আজ সুস্পষ্ট। সে তুলনায় ইসলামী রাষ্ট্র একটি সর্বোত্তম ব্যাপকভিত্তিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

৩.২ ইসলামী রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনা (Islamic State Vs. Western Democratic State)

১। ভূমিকা : রাষ্ট্র ও সরকার মানব জীবনের দু'টি অপরিহার্য বিষয়। দুনিয়ায় মানুষের স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক। ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার এই জীবনব্যবস্থার দু'টি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২। ইসলামী গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র : পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এক কথায় জনগণের শাসন, জনগণের উপর, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য শাসন বলা হয়। ইংরেজিতে তা হচ্ছে, Government of the people, by the people and for the people ইসলামের গণতন্ত্র বিষয়ক ধারণা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলামী গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হচ্ছে, "Rularship of Allah on man, by Pious Rular with justice." অর্থাৎ আল্লাহর শাসন জনগণের উপর, সৎ লোকদের দ্বারা, ন্যায় বিচারসহকারে।

৩। পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা :

পার্থক্যের ভিত্তি	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র	ইসলামী রাষ্ট্র
১। সার্বভৌমত্বের ধারণা Concept about sovereignty	জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। সার্বভৌমত্ব মানুষেরই করায়ত্ত। অন্য কথায়, Sovereignty belongs to the people. এ ব্যবস্থা কার্যত মানুষের নিরঙ্কুশ শাসন। সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতেই ব্যবহৃত। এ সার্বভৌমত্বের বলেই মানুষ মানুষের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী।	ইসলামী রাষ্ট্রে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। অন্যকথায়, Sovereignty belongs to Allah. যে রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশভাবে গৃহীত হয় তাই ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সম্পদ বন্টন ও বিচার-অনুষ্ঠান এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

২। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক Religion and state relation	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদা (Church and state are separate)। অন্যকথায় এ ধরনের রাষ্ট্রে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে রাখা হয়।	ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম তথা দীন ও রাষ্ট্র একই সূত্রে গৃহীত (Religion) Din and State are united। এখানে ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
৩। আইনের উৎস Sources of law	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন সেজন্য তাদের রচিত আইনই হয় দেশের আইন (Law of the Land)। তাই মানতে বাধ্য হয় গোটা জনগণ। এভাবে জনগণ হয় মানব রচিত আইন দ্বারা শাসিত।	ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত সুন্নাহ্ই আইনের একমাত্র উৎস। অন্য কথায়, Rule of the Shariah is the governing Principle.
৪। ভোটাধিকার Right to vote	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক ব্যক্তি এক ভোট (One man one vote) নীতি অনুসৃত হয়।	ইসলামী রাষ্ট্রেও এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি অনুসৃত হতে পারে।
৫। ভোট সম্পর্কিত ধারণা Concept about vote	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটকে অনেক ক্ষেত্রেই আমানত মনে করা হয় না। প্রত্যেক প্রার্থী নিজের বা নিজ দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে ভোট পেতে চায়। সেজন্য ক্যানভাসার বাহিনী ময়দানে নামিয়ে দেয়া হয়। বিপুল মৌখিক প্রচারণার সাথে পান-সিগারেট-চায়ের প্রবাহ চলে। সাধারণ অসচেতন জনমত কোন প্রার্থীর প্রচারণার ব্যাপকতা, চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে, অথবা নগদ অর্থ পেয়ে বা পাওয়ার লোভে পড়ে ভোট দিয়ে থাকে। আর ভোটটা দিয়ে দেয়ার পর তার আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। ফলে জনগণের অসহায়ত্ব অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠে।	ইসলামে ভোটাধিকারকে আমানত মনে করা হয়। আমানত প্রয়োগ করেই বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি আমানতের খেয়ানত করে, যদি জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সে জনগণই তাদের নিকট থেকে এ আমানত কেড়ে নেয়ার অধিকার রাখে। এ আমানত সে ধরনের সৎ ও যোগ্য লোকদের নিকট সমর্পণ করতে হবে, যারা তা যথাযথভাবে পালন করবে।

৬। জবাবদিহিতা Accountability	এ ধরনের রাষ্ট্রে শাসকগণ জনগণের কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। অন্য কথায় Accountability of the rulers before the people. আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ এখানে অনুপস্থিত।	আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি নিয়ে শাসকগণ দায়িত্ব পালন করেন। অন্য কথায়, Accountability of the rulers before Allah. শাসকগণ রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে প্রতিনিধিত্ব করেন মাত্র। এই প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালন বিষয়ে তারা উভয় জগতে জবাবদিহি করতে বাধ্য।
৭। জনগণের ভূমিকা Role of the People	পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের নামে জনগণ ভোট দেয়ার অধিকারী হয় বটে কিন্তু যে ভোট দান ক্ষমতা তারা নিজের ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারে না। ভোট দান কেবল ভোট প্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রার্থীদের মধ্যে কাউকে না কাউকে ভোট দিতে হবে। প্রার্থীদের বাইরের কাউকে ভোট দেয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রার্থীদের কেউই ভোটদাতার পছন্দ না হলেও তাদের কোন একজনকেই ভোট দিতে হবে। ভোট দানের স্বাধীনতা এখানে ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। ভোট প্রার্থী কোন না কোন দলের মনোনীত হয়ে থাকে। ব্যক্তি হিসেবে কোন প্রার্থীকে পছন্দ না হলেও তার দলকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর দল পছন্দ হলে আর প্রার্থীকে পছন্দ করতে না পারলেও ভোট তাকেই দিতে হবে। এভাবে দলীয় প্রভাবের দোহাই দিয়ে কত কলা গাছ যে ভোট পেয়ে বট গাছে পরিণত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।	ইসলামী রাষ্ট্রে জনসমর্থন প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমিত উৎস। নিরঙ্কুশ উৎস আল্লাহ তা'আলার। এ সীমিত উৎস শুধু আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করতে ও ইসলামী আইন কানুন মাত্র জারিকরণের আওতায়। ইসলামে জনগণই সরকার, সংসদ গড়ে তোলা, স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়াগ ও নির্বাচনের জন্য দায়িত্বশীল। জনগণকে কল্যাণের দিকে পরিচালনায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়। এরাই আল্লাহর শরীয়তী বিধানকে সামষ্টিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে, মুসলিম জনগণ এভাবে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের উৎস। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নির্বাচন এ জন্যই মুসলিম উম্মাতের অধিকার ও কর্তব্য। জনগণ আল্লাহর খলীফা হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের খিলাফতী অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালন করে।

৮। আইন সভার ক্ষমতা Power of Parliament	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় আইন জারি করতে পারে।	ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে না।
৯। ধর্মের ভূমিকা Role of Religion	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকৃত কোন ধর্ম নেই এবং কোন ধর্মকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেয়া হয় না। ধর্ম এ রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র।	ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামী নীতিমালাকে বাস্তবায়িত করা।
১০। বিচার ব্যবস্থা Judicial System	মানব রচিত আইনে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অন্য কথায় মানব রচিত নিজস্ব রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা অপরাধের বিচার করা হয়।	ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন অনুযায়ী দেওয়ানী ও ফৌজদারী ম্যমলার বিচার ফয়সালা করা হয়। বিচার ব্যবস্থা বা বিচার বিভাগ আইনের কর্তৃত্বের অধীনে সম্পূর্ণ স্বাধীন।
১১। কাঠামোগত পার্থক্য Structual Difference	পাশ্চাত্য ধাঁচের রাষ্ট্র সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র-গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক উভয় ধরনেরই হতে পারে।	ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণমূলক/গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
১২। ধনভাণ্ডার Treasury	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোষাগার ক্ষমতাসীন মুষ্টিমেয় লোকের মর্জিমত পরিচালিত।	ইসলামী রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার বায়তুল মাল আমানত। অর্থের মালিক আল্লাহ ও জনগণ।
১৩। নির্বাচন পদ্ধতি Election System	পাশ্চাত্য ধাঁচের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নিজের ইচ্ছে মত নির্বাচনে প্রার্থী হন। এখানে স্বাধীন মতামত নাও প্রতিফলিত হতে পারে।	ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণতঃ নিজে নিজে কেউ প্রার্থী হন না। এখানে স্বাধীন মতামতের প্রতিফলন ঘটে।

১৪। নেতৃত্ব নির্বাচন Election of leader	যে কেউ নেতৃত্বে নির্বাচিত হতে পারেন।	ঈমানদার-তাকওয়াবান সৎ ও যোগ্য হওয়া শর্ত।
১৫। প্রশাসনিক নীতিমালা ও পদ্ধতি Administrative principle and method	পুঁজিবাদী আমলা ব্যবস্থা, কায়েমী স্বার্থ ও লালফিতার দৌরাত্ম্যে প্রশাসন জর্জরিত থাকে।	জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে প্রশাসন নিরন্তর কর্মরত থাকে।
১৬। রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা Power of Head of state	পাশ্চাত্য ধরনের আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান নিজস্ব বিবেচনায় যে কোন বিলে ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন।	ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হলে এমন যে কোন বিলে ভেটো প্রদান করতে পারেন। তবে শরীয়াসম্মত জনকল্যাণমূলক কোন বিলে ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন না।
১৭। ন্যায়-অন্যায় প্রসংগ Connection with right wrong	পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয় কোন নীতিমালার নিকট দায়বদ্ধ নয়।	ইসলামী রাষ্ট্রে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি আল্লাহ্‌র বিধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী রাষ্ট্র নিঃশর্তভাবে আল্লাহর বিধানের নিকট দায়বদ্ধ যা চিরন্তন ও সর্বজনীন।
১৮। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা Individual freedom	পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ব্যক্তি চিন্তা, বিশ্বাস, ধর্ম, কর্ম ও মত প্রকাশ, সভা-সমিতিতে যোগদান, প্রকাশনা ইত্যাদিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যা নিজের জন্য লাভজনক ও স্বার্থের অনুকূল মনে করে সেসব ক্ষেত্রে সে স্বাধীন এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা ধর্মীয় আদর্শ ব্যক্তির উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না।	ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তির এ ধরনের কোন স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রদর্শিত পথে চলতে হয়। এদিক থেকে যে কোন বিচ্যুতির জন্য ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাতে আযাব ও গযবের সম্মুখীন হতে হয়।
১৯। আইনের শাসন Rule of law	পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে আইনের চোখে সকল মানুষ সমান এ দাবী করা হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে কোন ভেদাভেদ করা হয় না।	ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের চোখে সকলে সমান। এ রাষ্ট্রে ধর্ম, মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকে বিবেচনায় আনা হয়নি। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষ রচিত আইন দ্বারা শাসিত। এ রাষ্ট্র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসন নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন। এ ব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক লোক দ্বারাই শাসিত হয় দেশের কোটি কোটি মানুষ। মানব রচিত আইন কানুন মানতে হয় গোটা জনগণকে। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই হচ্ছে রাজনৈতিক ও আইনগত শিরক। আইন পাস করার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লোকেরা জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থটাই বড় করে দেখে থাকে অতি স্বাভাবিকভাবে। এটাই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের আসল রূপ। সার্বিক বিবেচনায় ইসলামী রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ।

৩.৩ ইসলামী রাষ্ট্র বনাম ধর্মীয় রাষ্ট্র (Islamic State Vs. Religious State/Theocratic State)

ইসলামের আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে। অনেকে এ রাষ্ট্রকে 'হুকুমাতে ইলাহিয়া'– আল্লাহর শাসনব্যবস্থা নামে আখ্যায়িত করেন। যে রাষ্ট্রের আইন রচনা, শাসনকার্য ও বিচারব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তারই নাম ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলাম প্রচলিত অর্থে কোন ধর্মের নাম নয়। ইসলাম কতক অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস সর্বস্ব ধর্মমত মাত্র নয়। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রাষ্ট্র বলা চলে না। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যত কিছু প্রয়োজন সেসব বিষয়েও ইসলাম আইন-কানুন দান করে। যে রাষ্ট্র ইসলামকে আইনের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেয়া যায়।

ইসলামে প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহর খলীফা হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রত্যেকটি মানুষ তার কাজের জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী থাকে। আল্লাহ এবং মানুষের ভেতরে কোন মধ্যস্থতা বা মোল্লাতন্ত্রের স্থান প্রকৃত ইসলামী সমাজে থাকতে পারে না। ইসলামের আধ্যাত্ম্য বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য আলেম থাকতে পারেন, তাঁরা মানুষের জন্য প্রার্থনাও করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে সুপারিশ করতে পারেন না বা ধর্মের চাবিকাঠি তাঁদের হাতে থাকে– এরূপ ভাব পোষণ করা ইসলামী জীবন দর্শনের ঘোর বিরোধী।

"তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে না।"[১]

---

১. ১০ : সূরা ইউনুস : ৪

"আল্লাহ তোমাদেরকে ফেরেশতা বা নবীদের খোদা হিসেবে মনে করবার আদেশ দেননি।"[২]

পরবর্তী খ্রিস্টানদের পৌত্তলিকতা ও মোল্লাতন্ত্রের ইসলাম কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে ও অর্থনৈতিক শোষণের ঘোর নিন্দা করেছে।

"তারা (খ্রিস্টানেরা) তাদের মোল্লা ও পাদ্রীদের আর মেরীর ছেলে ঈসাকে খোদা বলে মনে করে, কিন্তু কেবলমাত্র এক আল্লাহকেই উপাসনা করতে বলা হয়েছিল।"[৩]

"হে মুমিনরা, মোল্লা ও পুরোহিতদের ভেতরে এমন অনেকে আছে যারা মানুষের ধনসম্পদ গ্রাস করে ও তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভুলিয়ে রাখে। যারা সোনা রূপা মজুদ রাখে ও আল্লাহর পথে অর্থাৎ ভালো কাজে খরচ করে না তাদের কাছে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করো।"[৪]

প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে উঁচু-নিচু, শাসক-শাসিত সবাই একই আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে কারোর কোন বিশেষ অধিকার নেই। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মনে করা হয়। সেজন্য ইসলামী রাষ্ট্রকে পুরোহিততন্ত্র বলা যায় না। পুরোহিততন্ত্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বুঝায় যে রাষ্ট্রে কতকগুলো পুরোহিত বা মোল্লা নিজের ইচ্ছামত ধর্মীয় আইন বা আল্লাহর ইচ্ছাকে ব্যাখ্যা করে ও নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার উপর তথাকথিত ধর্মীয় রাষ্ট্র বা খোদার শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আইন দ্বারা পরিচালিত হবার ফলে এ রাষ্ট্রকে আইনানুগ রাষ্ট্র বা Nomocracy, Theistic or Theocratic বলা যেতে পারে। C. Ryder Smith ও Sidgwick-এর দেয়া Theocracy বা পুরোহিততন্ত্রের সংজ্ঞা থেকেই একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

"A state is Theocratic if it claims to be governed by Gods or Goddesses."[৫]

"Theocracy is a social organisation in which the persons who assume a special intimacy with heaven, a special acquaintance with the Divine will, are organised in a

---

২. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ৮০

৩. ৯ : সূরা আত তাওবা : ৩১

৪. ৯ : সূরা আত তাওবা : ৩৪

৫. The Encyclopaedia of Religion and Ethics - 'Theocracy' Vol-VII, P. 87-89 by C. Ryder Smith.

professional body specially devoted to their religious calling and for the most part distinct and separate from the ordinary secular government; then in proportion as this separate body acquires power in secular affairs, the Government tends to have a distinctly and preponderantly theocratic character, and when this ecclesiastical body obtained supreme control, we have theocracy complete."[৬]

ধর্মীয় রাষ্ট্র কথাটি ইউরোপের ইতিহাস হতে নেয়া হয়েছে। হোলিরোমান এমপায়ার (পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য) নামে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল তাকে ইংরেজিতে 'থিউক্রেসী' (Theocracy) বলা হয়। এ থিউক্রেসীই হচ্ছে ধর্মীয় রাষ্ট্র। সেখানে ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরই হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার ছিল। গির্জাকে কেন্দ্র করে পাদ্রীগণ রাজ্য শাসন করত। পাদ্রীদের নিকট রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী আল্লাহর কোন বিধান ছিল না। তাদের ইচ্ছাই আইনের মর্যাদা লাভ করত। তাদের সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন মতামত যুক্তিপূর্ণ হলেও তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হত না। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা স্বেচ্ছাচারিতা করত। তাই থিউক্রেসী বলতে ইউরোপবাসী যা বুঝে থাকে, ইসলামী রাষ্ট্র তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। ইউরোপীয় থিউক্রেসীতে নির্দিষ্ট একদল ধর্মযাজক (Priest class) খ্রিস্টিয় প্রভুর নামে নিজেদের মনগড়া আইন জারি করে থাকে এবং কার্যত নিজেদেরই প্রভুত্ব সাধারণ নাগরিকদের উপর স্থাপন করে। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে 'শয়তানী হুকুমাত' বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহর ন্যায় কোন স্পষ্ট বিধানের শাসন কায়েম ছিল না বলে সে রাষ্ট্রকে ধর্মযাজকদের শাসন বলা যেতে পারে। সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একমাত্র তাদেরই হাতে ছিলো।

ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরনের ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। এটা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর বা গোত্রের রাজত্বও নয়। ইসলাম যে রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলে তার পরিচালনার ভার কোন ধর্মীয় দলের উপর ন্যস্ত হয় না, তা দেশের সাধারণ মুসলমানদের হাতেই অর্পিত হয়ে থাকে। তবে জনসাধারণ এটাকে নিজেদের মর্জিমত না চালিয়ে চালায় আল্লাহর কিতাব ও মহানবী (সা) এর সুন্নাহ অনুসারে। সাইয়েদ আবুল

৬. Sidgwick, The Development of European Polity, P. 219.

আ'লা মওদূদী (রহ) এ ধরনের শাসনব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে 'আল্লাহর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলো অভিহিত করেছেন। এতে মহান আল্লাহর উচ্চতর ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের (Paramountcy) অধীন মুসলমানদেরকে সীমাবদ্ধ প্রভুত্বের অধিকার (Limited popular sovereignty) দান করা হয়েছে। এতে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ (Executives) মুসলিম জনসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত হবে, মুসলিমরাই এটাকে পদচ্যুতও করতে পারবে, এছাড়া শাসন শৃঙ্খলা স্থাপনের যাবতীয় ব্যাপার এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর শরীয়ত স্পষ্ট বিধান দেয়নি মুসলমানদের সম্মিলিত মতামত (ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় ইজমা) অনুসারেই আইন প্রণয়ন করা হবে। আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা, বাস্তব প্রয়োগ ও নীতি নির্ধারণও বিশেষ কোন শ্রেণী বা অংশ বা গোত্রের ইখতিয়ারভুক্ত নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিচালক ও জনসাধারণ একই কুরআন এবং সুন্নাহর অধীন। যে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। সুতরাং ধর্মীয় রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে মোল্লাদের বা কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের, তথাকথিত ধর্মীয় মুক্তিদাতার (Redeemer) কোন বিশেষ অধিকার থাকে না। এ সমাজে কারোর ঐশ্বরিক অধিকার বা Divine right নেই। প্রত্যেকটি মানুষই আল্লাহর খলীফা। তাঁর কাছে এ আইনের চোখে সবাই সমান।

ইসলামের মতে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ বলতে সে রাষ্ট্র ও সমাজকে বুঝায় না যেখানে ধর্মের নামে মোল্লা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মের নাম করলেই বা তথাকথিত 'ধর্মীয়' নেতার অস্তিত্ব থাকলেই ইসলামী সমাজ হবে না। শাসন পরিচালনা সার্বজনীন ধর্মীয় নীতির উপর ভিত্তি করে করা হয় কিনা সেটাই আসল কথা। আরও পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, তথাকথিত ধর্মীয় নেতার সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের মিলন ঘটালেই ইসলামী সমাজ গড়ে উঠে না। ধর্মীয় নীতির সাথেই সামাজিক জীবনের পারস্পরিক গ্রন্থি সংযোগ ঘটাতে হবে। কাজেই ইসলামী নীতির সাথে সমাজের সহজ সম্মেলন ঘটলেই ইসলামী সমাজ পাওয়া যাবে, তথাকথিত ধর্মীয় নেতার হাতে শাসন যাওয়াই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপ নির্ণয়ের মাপকাঠি নয়। চার্চ বা মোল্লাতন্ত্র ও সামাজিক বিষয় মিশিয়ে ফেলে বলেই ইসলামী রাষ্ট্র ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়, ইসলামী নীতি ও সমাজের মিলনই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের মাপকাঠি।

৩.৪ ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ও ইসলাম (Fascist State and Islam)

ইতালিতে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি বেনিটো মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪২) Fascismo নামে যে মতাদর্শ ও আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রচলন করেন তার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ফ্যাসিজম (Fascism)। মুসোলিনি লিখেছেন, 'ফ্যাসিবাদ হলো একাধারে কর্ম ও চিন্তা।' বস্তুত ফ্যাসিবাদ ছিল পরস্পরবিরোধী দু'টি মনোভাব-তত্ত্ববিমুখ কর্মবাদিতা ও হেগেলীয় অধিবিদ্যার সমন্বয়। কর্মবাদের উৎস ছিল উনিশ শতকের সিন্ডিক্যালিস্ট বিশেষ করে মুসোলিনির গুরু ঝর্জ সর্ল এর মতাদর্শ। সর্ল এর ছিল হিংসাশ্রয়ী মনোভঙ্গি, যাতে ভাঙনের মাধ্যমে গঠনের পথে এগোনোর কথা বলা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার পর, তাঁর ফ্যাসিস্ট পার্টি (Fascist Party) ইতালীতে একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত পায়, ইতালী একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মুসোলিনি বলেছেন, "All within the state; none outside the state, none against the state" 'সকলেই রাষ্ট্রের ভিতরে, কেউই রাষ্ট্রের বাইরে বা বিরুদ্ধে নয়।'

যে সমাজে আইনের কোন বালাই নেই, শাসকের খামখেয়ালি হাবভাব ও মর্জিমাফিক সমাজ পরিচালিত হয়, সেই সমাজকেই সাধারণ ভাষায় স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী সমাজ বলা যায়। বর্তমান দুনিয়ায় সুবিধাবাদকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করার ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শের সার্বজনীন রূপায়ণ হয়নি। বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী হেরে যাওয়ায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিকট আকার ধারণ করে। ইতালী মিত্রপক্ষে থাকলেও যেসব সুযোগ সুবিধা তাকে গোপন চুক্তিতে দেবার কথা ছিলো তা দেয়া হয়নি। এ অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র জার্মানীতে ও ইতালীতে হিটলার ও মুসোলিনীর নেতৃত্বের মারফত ফ্যাসিবাদ আত্মপ্রকাশ করল। রাষ্ট্র, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়া হলো। নেতার খামখেয়ালী ইচ্ছাই হলো আইন ও বিচার। প্রকৃতপক্ষে নেতার ও তার দলের সুবিধাই হলো নৈতিক মানদণ্ডের চরম লক্ষ্য। রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতরে যখন কোন পার্থক্য থাকে না, যে সমাজ কোন মানবিক ও সুবিচারমূলক আইন ও বিচার পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয় না, তখনই তাকে ফ্যাসিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র বলা হয়। ফ্যাসিবাদ এক নিকৃষ্ট ধরনের একনায়কতন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফ্যাসিবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী। সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক সংগঠন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধবাদকে ফ্যাসিবাদ

প্রশ্রয় দেয় এবং সাম্রাজ্যবাদকে আহ্বান জানায়। ফ্যাসিবাদ মানবতাবিরোধী এবং বিশ্বশান্তির শত্রু। মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিবর্তে ফ্যাসিবাদ দ্বন্দ্ব, কলহ ও শঙ্কটকে স্বাগত জানায়। প্রকৃত বিচারে ফ্যাসিবাদকে কোন দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদা দেয়া যায় না। এর পেছনে কোন ভাবাদর্শ নেই। তাই মুসোলিনীর পতনের পর ইতালীতে ফ্যাসিবাদের পতন হতে বিলম্ব হয়নি। বস্তুত ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক শক্তির কাছে ফ্যাসিবাদী দানব বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। স্পেন, জার্মানী, চীন ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ইতিহাস এ সত্যকে প্রমাণ করেছে। ফ্যাসিবাদের উগ্র জাতীয়তাবাদী উল্লাস, সাম্রাজ্যবাদী বিভীষিকা এবং সন্ত্রাসবাদী স্বৈরাচার ইতিহাসের কিছু অশুভ মুহূর্তের ঘটনা মাত্র। এ কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। গণতান্ত্রিক ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাওহীদী ভাবধারায় পরিচালিত মানবগোষ্ঠীর হাতে ফ্যাসিবাদীরা পরাস্ত হবে–একথা অনস্বীকার্য।

ইসলামী সমাজে, ইসলামী নীতিই সমাজের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করে। কিন্তু এ সমাজে আদর্শ বা ধর্ম গ্রহণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেজন্য ফ্যাসিবাদের কোন চিহ্ন এ সমাজে থাকে না। জোর করে কারোর উপর কোন ধর্ম চাপিয়ে দেয়া হয় না। সেজন্য অমুসলিম বা যার কোন ধর্মই নেই, তার পক্ষে ধর্ম বা আদর্শও একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, যে ধর্ম ও আদর্শ তাঁর পছন্দ হয় তিনি সেই ধর্ম বা আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলেন তাঁকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকেই ইসলামী আদর্শের রূপায়ণ করতে হবে। সব মানুষের মঙ্গলের জন্য সুষ্ঠু সমাজ গঠন করাও মুসলমানের জন্য একটা অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃত ইসলামী সমাজে অমুসলিমকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় না। সেজন্য প্রকৃত ইসলামী সমাজে রাষ্ট্র ও সমাজ একপদে মিশে যায় না। রাষ্ট্রের পক্ষে অমুসলিমকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা এটা করা ইসলামী নীতির ঘোর বিরোধী। রাষ্ট্রের মত বাহ্যিক একটি সমাজযন্ত্রের পক্ষে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও ঈমানই খাঁটি মুসলমানের মন পরিচালিত করবে। ইসলাম চায় মানুষ তাঁর আদর্শ সম্পর্কে সৎ হোক। সে মুখে এক কথা বলবে আর কাজ অন্যভাবে চলবে ইসলাম এটা মানতে পারে না। মানবতাবাদে বিশ্বাসী চিন্তানায়ক, যে কোন মুনাফিক, মুসলিম এর চাইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ যে ব্যক্তি মুনাফিক, সে প্রকৃত মুসলিম নয়। মানববাদী চিন্তানায়ক হয়ত খাঁটি মুসলিম নন তবু মুনাফিকের চাইতে তার স্থান অনেক উপরে। থামাসপেইন

(Thomas Paine)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটির সঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে :

"But it is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing or in disbelieving. It consists in professing to believe what he does not believe."[৭]

৩.৫ রাজতন্ত্র ও ইসলাম (Monarchy and Islam)

সাধারণভাবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজাই রাষ্ট্রের প্রধান এবং রাজা হওয়ার ব্যাপারটা উত্তরাধিকারমূলক সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেই বলা হয় রাজতন্ত্র।

বর্তমান বিশ্বের বহু দেশে রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন রাজবংশ, কোন বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। একজন রাজার মৃত্যু বা বিদায়ের পর পরবর্তী রাজা উক্ত বংশ, পরিবার বা গোষ্ঠী থেকেই মনোনীত হন এক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রশ্নটি গৌণ বিষয়। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার চেয়ে যোগ্যও হয় তবুও তাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিয়োগ না করে রাজপরিবারের বা রাজবংশের একজনকেই রাষ্ট্রনায়ক করা হয়। আর সে রাজ্য ও রাজবংশের মর্জি মোতাবেকই রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

রাজতন্ত্রে রাজা বা রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। তিনি তার অধীনস্থ কর্মকর্তা অথবা রাজবংশের অভিজাতদের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন। এ ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

রাজতন্ত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন−

১. **নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র** (Absolute Monarchy) : এ ধরনের রাজতন্ত্রে রাজা শুধু রাষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রধানই নন বরং সর্বোচ্চ প্রশাসকও বটেন। তিনিই দণ্ড মুণ্ডের কর্তা।

২. **স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র** (Tyranical Monarchy)

৩. **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র** (Constitutional Monarchy) : রাজা বা রাণী রাষ্ট্রপ্রধান হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে। জাপান, সুইডেন, ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্যের

---

৭. The Age of Reason, Thinkers Library, 1947, P. 2

শাসনব্যবস্থা হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা বা রাণীর হাতে ন্যস্ত থাকে আইনগতভাবে। আসলে তিনি নাম মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালিত হয় মন্ত্রীসভা কর্তৃক। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণী রাষ্ট্রপ্রধান হলেও, কার্যত এসব দেশ শাসনে রাজা বা রাণীর বলতে গেলে কোন ক্ষমতা এখতিয়ার নেই।

৪. **জনমঙ্গলকর রাজতন্ত্র** (Benevolent Monarchy) : সৌদী আরব, কাতার, ওমান, কুয়েত, জর্ডানের রাজতন্ত্র এ ধরনের রাজতন্ত্রের উদাহরণ।

রাজতন্ত্রের আরবি পরিভাষা হচ্ছে মুলুকিয়াত। ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র এক পর্যায়ে এসে মুলুকিয়াত বা রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। আর এর উদ্গাতা ছিলেন উমাইয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) (৬৬১–৬৮০)। মহানবী (সা) রাষ্ট্রশাসন ও রাষ্ট্রনীতির যে দর্শন বাস্তবায়িত করে উত্তরসূরী খলীফাদের জন্য চলার পথ কণ্টকমুক্ত করে যান তারই নাম খিলাফত। এটি নির্মম সত্য যে, মহানবী (সা)-এর তিরোধানের পর তিন দশকেরও কম সময়ের মধ্যে খিলাফত ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ধূলিসাৎ হয়ে যায় আর একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে তার স্থান গ্রহণ করে মুলুকিয়াত বা রাজতন্ত্র। শরীয়াহ ক্ষমতা জবর দখল করা বা বংশানুক্রমিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইসলাম রাজতন্ত্র বা রাজতান্ত্রিক শাসন বা স্বৈরশাসন সমর্থন করে না। আবার কোন ব্যক্তি শক্তির প্রয়োগ করে মানুষের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এটাও সমর্থন করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে এমন ব্যক্তিরই শাসক হওয়া অনুমোদিত, যাঁর প্রতি শাসিতদের সমর্থন রয়েছে। যোগ্যতা, সততা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে যিনি উপযুক্ত, তাকেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। আর সকলকেই তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তাকে রাজবংশের লোক হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে যোগ্যতার ভিত্তিতেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এখানে বংশ মর্যাদা কোন বিষয় নয়। মহানবী (সা) বলেন, 'যদি নাক কাটা হাবশী গোলাম তার যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তবুও তোমরা কোন বংশ মর্যাদার প্রশ্ন না করে তার আনুগত্য করবে।' ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের ছেয়ে অনেক উন্নত এবং কল্যাণকর। রাজতন্ত্র কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় কেননা

ইসলামে বাদশাহীতন্ত্র বা আমীর শাহীর কোন স্থান নেই, বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকার নির্বাচনেরও কোন অবকাশ নেই।[৮] ইসলাম ব্যক্তিগত কর্তৃত্বকে ঘৃণা করে এবং ইকবালের ভাষায় ইসলাম ব্যক্তিগত কর্তৃত্ববাদের বিরোধী (Inimical to human individuality)[৯]

৩.৬ একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম (Dictatorship and Islam)

৩.৬.১ ভূমিকা
Introduction

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অঙ্গনে যে সকল পুরনো রাজনৈতিক মতবাদ আলোচিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যে স্বৈরতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে একনায়কতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের কয়েকটি দেশে যেমন– ইতালী, জার্মানী, স্পেনে যথাক্রমে বেনিটো মুসোলিনী (১৮৮৩–১৯৪৫), হিটলার (১৮৮৯–১৯৪৫) ও ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। একনায়কতন্ত্রে একজন শাসকের হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিকে উৎসর্গিত হতে হয়।

৩.৬.২ একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা
Definition of Dictatorship

ল্যাটিন শব্দ Dictator (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) থেকে একনায়কত্ব (Dictatorship) কথাটির উৎপত্তি। কোন শাসক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষ যখন শাসিতের মতামতের ধার না ধেরে একচ্ছত্রভাবে শাসনকাজ চালিয়ে যায়, তখন তাঁর বা তাঁদের শাসনকে বলে একনায়কত্ব।

যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করে অপ্রতিহত স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলে। একনায়কের নির্দেশেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী নিউম্যান তাঁর 'Domocratic and Authoritarian State' গ্রন্থে বলেন, 'একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির একটি গোষ্ঠী যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং

---

৮. গডফ্রে এইচ জ্যানসেন, মিলিট্যান্ট ইসলাম, নিউইয়র্ক, হারপার এন্ড রো, ১৯৭৯, পৃ. ১৭৩।

৯. জামিল উদ্দিন আহমদIqbals concept to Islamic Polity, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, পৃ. ২১।

অবাধে একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলে।' ('By dictatorship we understand the rule of a person or group of persons who arrogate to themselves and monopolise power in the state, exercising it with out restraint.') অস্টিন রেণী (Austin Ranney) র মতানুসারে, 'একনায়কতন্ত্র হল এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রশাসনিক চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় একজন ব্যক্তির বা বাছাই করা কয়েকজনের হাতে।' (Political scientist ... ... now use the term dictatorship to denote a form of government in which the ultimate ruling power is held and exercised by one man or a small elite.) রজার ইসক্রুটনের মতে, 'একনায়কতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সকল জনগণের নিকট থেকে আনুগত্য আদায় করে।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফোর্ডের মতে, Dictatorship is the assumption of extra legal authority by the state of the state.

রোমান প্রজাতন্ত্রের সময় থেকে একনায়কতন্ত্রের উৎপত্তি। এ সময় জরুরি অবস্থায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসহ সাত বছরের জন্য একজন ডিক্টেটর নিয়োগের ক্ষমতা রোমান সিনেটকে প্রদান করা হয়। বর্তমান দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের একনায়কত্ব কায়েম আছে। যেমন- বুর্জোয়া একনায়কত্ব, সর্বহারা একনায়কত্ব, সামরিক একনায়কত্ব ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, একনায়কত্ব সর্বদাই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের একচ্ছত্র স্বার্থে প্রতিপক্ষের ওপর সার্বিক নিষ্পেষণ চাপিয়ে দেয়।

৩.৩.৩ একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ
Features of Dictatorship

অধ্যাপক ফাইনার তাঁর 'Theory and Practice of Modern Government' গ্রন্থে একনায়কতন্ত্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. প্রচারণার ব্যাপক প্রয়োগ

২. একদলীয় শাসনব্যবস্থা

৩. নামমাত্র ও নিয়ন্ত্রিত আইনসভা

৪. ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ

অটো স্ট্যামার (Otto Stammer) একনায়কতন্ত্রের ৫টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. স্বৈরাচারী ও একচেটিয়া ক্ষমতার প্রভাব

২. সাংবিধানিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি

৩. নাগরিকদের পৌর ও অন্যান্য অধিকারের অবলুপ্তি

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আবেগতাড়িত অন্যান্য মনোভাবের প্রাধান্য

৫. সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের স্বৈরাচারী পদ্ধতি

একনায়কতন্ত্রের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য–

১. সর্বাত্মক রাষ্ট্র

২. রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন

৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী

৪. সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাদী নীতি

৫. বিরোধীদের দমন/কণ্ঠরোধ

৬. দায়িত্বহীনতা

৭. এক রাষ্ট্র এক নেতা

৮. রাষ্ট্র হল শক্তির প্রতীক

৯. আইন-বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ

১০. গুপ্তচর বাহিনী

১১. একক আদর্শের প্রচার

১২. সরকারী নীতি ও পরিকল্পনা কঠোরভাবে প্রয়োগ

১৩. মিথ্যা প্রচার

১৪. সকল ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা

১৫. সবকিছুতেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ

৩.৬.৪ একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম
Dictatorship and Islam

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি একনায়কতান্ত্রিক নয়। একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই একনায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক হতে পারে না। একমাত্র সে রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয় যে রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়, আল্লাহ ও

তাঁর রাসূলের শরীয়তকে শ্রেষ্ঠ আইন এবং আইনের প্রধান ও প্রথম উৎস বলে মেনে নেয় এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কাজ করার স্বীকৃত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে কর্তৃত্বশীলদের কর্তৃত্ব লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর বিধানের পুনরুজ্জীবন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অসৎ বৃত্তির বিনাস ও সৎবৃত্তির বিকাশ সাধন। এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোন সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নয় বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব ও তাঁর আমানত।

ইসলামী রাষ্ট্রে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে যে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠিত হয় তাদের সাথে পরমার্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'হে নবী, আপনি সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর পরামর্শের ভিত্তিতে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করুন।'[১০] এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রনীতি গণমুখী এবং জনসমর্থিত। অন্য কথায় ইসলামী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন স্বৈরাচারী শাসকের স্থান নেই।

৩.৭ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (Secular State and Islam)

সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শন

Secular Political Thought

সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনেরই আরেক নাম সেকুলারিজম। সেকুলারিজম (Secularism) মানবতার জন্য এক অভিশাপ। এটি মানবতা বিধ্বংসী কালনাগিনী, যার বিষাক্ত বিষ প্রতিক্রিয়ায় বিদগ্ধ আজ সারা পৃথিবী। বেশ কিছুদিন আগের কথা। ইউরোপীয় গির্জা অধিপতিদের ধর্মের নামে অধর্মের প্রচলন, ধর্মের দোহাই দিয়ে যুলুম-নির্যাতন, নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সমগ্র বিশ্ববাসী। ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য অস্বীকার করা হয়। চার্চের নির্দেশ অমান্য করে বিজ্ঞান চর্চা করার কারণে অনেক বিজ্ঞানী চরম যুলুম নির্যাতনের শিকার হন। তাদের এ সকল অপকর্মের দুর্গন্ধ আবর্জনার উপরে জন্ম হয় মানবতার আজন্ম শত্রু Secularism-এর। মূলত ধর্মযাজকদের অবাঞ্ছিত যুলুমের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ ও তাদের ধর্মের নামে অধার্মিক অনুশাসনের খড়্গ হস্তকে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে এ মতবাদের উদ্ভব হয়। এ মতবাদের রূপরেখা অনেকটা অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তির কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

১০. ৩ ঃ সূরা আলে ইমরান : ১৬৯।

সেকুলারিজমের সংজ্ঞা (Definition of Secularism) : সেকুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সেকুলারিজম (Secularism) ল্যাটিন শব্দ Secularis থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে বৈষয়িক (Worldly), অস্থায়ী (Temporal), প্রাচীন (Oldage) ইত্যাদি। সেক্যুলার শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহলৌকিক, ইহজাগতিকতা, পার্থিব, পরকাল বিমুখতা, আখিরাত বিমুখতা ইত্যাদি। খ্রিস্টান গীর্জার কোন খাদেমা যদি বৈরাগ্যবাদী খানকাহী জীবন পরিত্যাগ করে, সাংসারিক বৈষয়িক জীবনে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে সেক্যুলার বলে অভিহিত করা হয়। আভিধানিক দিক দিয়ে সেকুলারিজম হচ্ছে বৈষয়িকতাবাদ, ইহলোকিকতাবাদ, ইহজাগতিকতাবাদ। অভিধানের ভাষায় সেক্যুলার বা ইহজাগতিকতা মানে–

* যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

* যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

* যা কোনও ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

* এমন সামাজিক বা রাজনৈতিক দর্শন, যা ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়। অন্যকথায় যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোনও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোনও ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধী তারাই সেক্যুলার বা ইহজাগতিক।[১১]

কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। পারিভাষিক অর্থে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন একটি মতবাদ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস, যা পারলৌকিক ধ্যান ধারণা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। ধর্মনিরপেক্ষাতাবাদ হলো একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়। র‍্যানডম হাউস অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ-এ সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতা-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয় (Not regarded as religious or spiritually sacred); যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় (Not pertaining to connected with religion); যা কোন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয় (Not belonging to a religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি হলো একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়

১১. ডঃ মাহফুজ পারভেজ, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৮৯।

(Rejects all forms of religious faith)। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার সংজ্ঞাও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং আধ্যাত্মিকতা, জবাবদিহিতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ।

চেম্বারস ডিকশনারীর মতে সেকুলারিজম হচ্ছে, "The belief that the state morals, education should be independent of religion" অর্থাৎ "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার মতে রাষ্ট্র, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু ধর্মমুক্ত থাকবে।"

এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানার মতে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অহীর সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।' (Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religions or supernaturalism)[১২]

অক্সফোর্ড এডভান্সড লার্নারস ডিকশনারীর মতে, সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারেনা এমন বিশ্বাসই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।' (Secularism is the belief that religion should not be involved in the organisation of society, education etc.)[১৩]

জ্যাকব হোলিয়ক (Jacob Holyoake ১৮১৭-১৯০৬)-এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি- যা পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেবল মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অনির্দিষ্ট, অবিশ্বাস্য মনে করে তাদের জন্য প্রণীত। (Secularism is a code of duty pertaining to this life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite, unreliable or unbelieveable.)[১৪]

Oxford Dictionary-এর মতে, "Secularism means the doctrine that morality should be based solely on regard to the wellbeing of mankind in the present life to be

---

১২. Encyclopaedia American, ২৪তম খণ্ড, পৃ. ৫১০।

১৩. Oxford Advanced Learners Dictionary.

১৪. জর্জ জ্যাকব হোলিয়ক, English Eecularism : A Confession of Belief, শিকাগো, ১৮৯৬; উদ্ধৃত, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮, বিআইসি, পৃ. ২১৯।

exclusion of all considerations drawn from belief in God or in future state. অর্থাৎ "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ, যা মনে করে আল্লাহ্ বিশ্বাস বা পরকাল বিশ্বাস নির্ভর সমস্ত বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানব জাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।"

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথ-এর মতে, "The Secular state is a state which guarantees of religion, deals with individuals as citizen irrespective of his religion is not constitutionally connected to a particular religion nor does it seek either to promote or interrfere with religion."

অর্থাৎ "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝায়, এমন একটি রাষ্ট্রকে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে, ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র কোন ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে না। ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তক্ষেপও করে না।[১৫]

'Secularism is a code of duty pertaining to life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelieveable. Its essential principles are three : the improvement of this life by material means. That science is the available providence of men. That it is good to do good. Whether there is other good or not, the good of present life is good and it is good to Seek that good,' অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল মানুষের ইহলৌকিক দায়িত্ব সংক্রান্ত গুণাবলী এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অপূর্ণ, অস্পষ্ট, আস্থা স্থাপনের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতা তাদের জন্য। এর মূল উপাদান তিনটি : **এক.** ইহলৌকিক জীবনের উন্নয়ন কেবল বস্তুর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। **দুই.** বিজ্ঞানই মানুষের জন্য একটি প্রাপ্তিসাধ্য ঈশ্বর। **তিন.** যে কোন ভালো কাজই ভালো। অন্য কোন ভালো থাকুক বা না থাকুক বর্তমান জীবনের জন্য যা ভালো তার সন্ধানই শ্রেয়।'[১৬]

---

১৫. D. E. Smith, India as a Secular State, Princeton University Press, Newyork.

১৬. English Secularism, পৃ. ৩৫, উদ্ধৃত। ইসলামী রাজনীতি সংকলন, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ প্রকাশিত, জানুয়ারী ২০০৮, পৃ. ৫২-৫৩।

বস্তুত Secularism বলতে বুঝায় এমন এক মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যান ধারণা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা হবে না। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির একান্ত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করা।

কেউ কেউ মনে করেন যে, যদি নেহায়েত কেউ প্রয়োজন মনে করে তাহলে ব্যক্তিগত জীবনেই ধর্মের অনুশীলনের অনুমতি রয়েছে। মানুষের জীবনের অন্য যেসব দিক রয়েছে যেমন : পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসায়, রাষ্ট্র প্রভৃতি আঙিনায় ধর্মের অনুপ্রবেশ কাম্য নয়। তবে হ্যাঁ, কেউ মানতে চাইলে তার অনুমতি রয়েছে। এটি হচ্ছে কিছু সংখ্যক বিদ্বানদের দৃষ্টিতে Secularism-এর ব্যাখ্যা। এসব বিদ্ধানদের মতে সেকুলারিজম আল্লাহকে অস্বীকার করে না, তবে দীনকে দুনিয়া থেকে পৃথক মনে করে। এ ব্যাখ্যাটি আসলে ভুল। ইসলামের জন্য এটাই বেশি মারাত্মক। কেননা এর মাধ্যমে মুসলিম গণ মানুষকে প্রতারিত করা হয়। কেননা এ মতবাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে চিরতরে মুছে ফেলা। মানুষকে ধর্মদ্বেষী, ধর্মত্যাগী বানানো; এমনকি ব্যক্তিগত জীবনকেও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই হচ্ছে এ মতবাদের মূল উদ্দেশ্য। এ আলোকে Secularism-এর অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা। জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম পালন নয়।

বাংলা ভাষায় Secularism-এর অনুবাদ করা হয়ে থাকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, যার ধর্ম তার কাছে, পরধর্ম সহিষ্ণুতা এর উদ্দেশ্য। আসলে ইসলাম বিদ্বেষীদের দ্বারা মুসলমানরা আজীবন প্রতারিত হয়েছে। এমনকি শুধুমাত্র বিভিন্ন পরিভাষাকেই পরিবর্তন বা বিকৃত করে তাদেরকে ধোকা দেয়া হয়নি বরং অনেক পরিভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রেও মুসলমানদেরকেও ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষেপ করে উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' হওয়াটাও মূলত এ ধরনের ষড়যন্ত্রের প্রামাণ্য দলীল। এখানে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে যার অর্থ 'নেই'। অন্য কথায় অপেক্ষা নেই যার। এখানে 'অপেক্ষা'-এর যে অর্থগুলো বাংলা একাডেমীর বাংলা অভিধানে স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় 'ভরসা' বা 'নির্ভরতা'। তাহলে ধর্মের উপরে নির্ভরতা না থাকার নামই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কোন কোন অভিধানে 'নিরপেক্ষতা'-এর অর্থ হচ্ছে পক্ষপাতশূন্য বা উদাসীন। সুতরাং কোন

ধর্মের পক্ষপাত না করা ও কোন ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' যা মূলত ধর্মহীনতারই আর এক নাম। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যার ধর্ম তার কাছে একথা মোটেও ঠিক নয়। এর অর্থ ধর্মহীনতা বললে মুসলমানরা এটাকে গ্রহণ না করে বরং এর মুখে থু থু নিক্ষেপ করবে সেজন্য অত্যন্ত চালাকি করে চমকদার মোড়কে এমন একটি শব্দ এর জন্য চয়ন করা হয়েছে যাতে কিছুটা হলেও অর্থগত দিক থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। আর এটি এজন্য যে যাতে মুসলমানদেরকে অন্ধকারে রেখে বিভ্রান্ত করে তাদের ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক এ ধর্মহীনতাকে গেলানো যায়, এটি তারই একটি সুনিপুণ ষড়যন্ত্র। সুতরাং Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষবাদ' হওয়াটা মূলত মুসলমানদেরকে এ শব্দটির বাস্তব অর্থ থেকে আড়ালে রাখারই অপপ্রয়াস, যাতে এর গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস না পায়। উল্লেখ্য যে, এ শব্দটিকে যখন আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছে তখন কিন্তু এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখা হয়েছে যেখানে সামান্য বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। Secularism-এর আরবিতে অনুবাদ হচ্ছে 'আল লাদিনিয়াহ' অর্থাৎ ধর্মহিনতা।

এমনকি "The Oxford Study Dictionary"তেও Secular-এর অর্থ করা হয়েছে Not involving or belonging to religion, যার অর্থ এককথায় ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতা, ধর্মহীনতা ইত্যাদি। সুতরাং Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলে একে 'যার ধর্ম তার কাছে' ব্যাখ্যা দিয়ে চালিয়ে দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ব্যর্থ চেষ্টা। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই ধর্মনিপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে 'ধর্মহীনতা'। সাম্প্রতিককালে কোন কোন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেকুলারিজমকে ধর্মহীনতা বলতে নারাজ। কোন বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা বা প্রশাসন পরিচালনা না করে সকল ধর্মাবলম্বীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাকেই কেউ কেউ সেকুলারিজম অর্থে গ্রহণ করেন। অন্য কথায় সকল ধর্মের অস্তিত্বই সমভাবে স্বীকৃত দেশসমূহই তাদের মতে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে স্বীকৃত।

এ প্রসঙ্গে ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী লিখেছেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল কিছু খারাপই নয়, এটি সত্য-বিধ্বংসী ইবলিসী কালকূট। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতাকে সামান্যতম ছাড় দেয়াটাও একজন ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে অসম্ভব। আর নিশ্চয়ই কোন মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষ নয়, আর যে ধর্মনিরপেক্ষ সে মুসলিম নয়, খোদাদ্রোহী। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র সত্য, পূর্ণাঙ্গ, মনোনীত দীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ ও প্রসার করার

ঘোষণা দেয়ার পর আর কোন মানব রচিত দীন, ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের সহযোগে ককটেল বা সত্য-মিথ্যার, হক-বাতিলের, নূর-যুলুমের সহাবস্থানরূপী ব্যবস্থাস্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ গুমরাহী ও ইবলিসী কারবার। দীন বা জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামের প্রশ্নে কোন আপোষ, ছাড় নেই; মিথ্যার সাথে সহাবস্থান নেই, দীনকে ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ রাখার বিষয়ও নেই। সমগ্র জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, সাধনা ও সংগ্রামই কেবল গ্রহণযোগ্য।[১৭] কাজেই কোন মুমিন ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতে পারে না। সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অসদাচরনের মত। কেননা দেখা গেছে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দেন তারা মূলত ধর্মবিরোধী।[১৮]

ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ 'যার ধর্ম তার কাছে নয়।' শুনতে বড়ই অবাক লাগে যখন কোন মুসলমান আল কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন– বুখারী শরীফে আছে– "লাকুম দীনুকুম অলিয়াদীন।" অর্থাৎ যার ধর্ম তার কাছে। এখানে কুরআন-হাদীসের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারার ক্ষেত্রে জ্ঞানের দৈন্যতার সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থের বিকৃতি মূলত তাদের মূর্খতারই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।[১৯] ধর্মনিরপেক্ষতা মানে মানুষকে ধর্মহীন করে রাখা।[২০]

৩.৭.৩ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা
Fundamental ideas of Secularism

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলার রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা হচ্ছে–

❒ রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না। রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। ইহজাগতিক বা পার্থিব জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা হয়।

---

১৭. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, এক সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আনন্দিত বিহঙ্গের সঞ্চালিত ডানার নিস্বরণ, আবু জাফর এর ইসলামের শত্রু মিত্র শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনির, ২৪ জুলাই, ১৯৯৯।

১৮. সৈয়দ আলী আহসান, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আমি আমার সাক্ষ্য, ঝিঙে ফুল, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ৩৩।

১৯. ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে ধর্মদ্রোহিতা, দৈনিক সংগ্রাম, ৫ জুন, ২০০০।

২০. ডঃ খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, ২৯ জানুয়ারী, ২০০৯ পল্টনস্থ ভাসানী মিলনায়তনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা, দৈনিক সংগ্রাম, ৩০ জানুয়ারী, ২০০৯, পৃ. ১২।

❑ ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে। এটি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। ধর্মীয় কর্মকান্ডকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখাতে হবে।

❑ রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা হবে না। এ মতবাদ ঈশ্বর বা পরকালীন জীবনের কথা স্বীকার করে না। এটি ইহকালীন জীবন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত মতবাদ। ইহকালীন বিষয়ে ধর্মের কোন স্থান নেই, পরজগত বিষয়েও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন বক্তব্য নেই।

❑ কেবল বস্তুগত উপায়ে মানব সমাজের উন্নতির প্রচেষ্টা চালানো। মানব কল্যাণে শুধুমাত্র বস্তুগত উপায়-উপকরণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ– এক্ষেত্রে কোন অদৃশ্য শক্তির বা স্রষ্টার কোন ভূমিকা নেই এবং স্রষ্টার সাহায্যেরও কোন প্রয়োজন নেই।

❑ মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির একান্ত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা।

❑ ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে ইসলামের সাথে সম্পর্কহীনভাবে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে পরিচালনা করার মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলাম থেকে জীবন, রাজনীত, সমাজনীতি, পারিবারিক প্রথা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সকল কিছুকেই পৃথক করতে চায়। এটা তাদের এক কৌশলী হাতিয়ার।

❑ ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজ সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে ধর্মহীন করা, ইসলামমুক্ত করা। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সকল প্রকার অপচেষ্টা। ইসলামের মূল আদর্শ, চেতনা এবং প্রেরণা মানুষকে দূরে রাখতে চায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

❑ ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কার্যত রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মহীনতা। মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন আদর্শ নেই। নেই কোন ভিত্তি। এ মতবাদের অনুসারীরা ইসলামের মূল আদর্শ, চেতনা এবং স্প্রীট থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চায়।

৩.৭.৪ সেকুলারিজমের নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য
Characteristics and Rules of Secularism

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কতিপয় নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রধান প্রধান নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন এক উদার নীতির পরিচায়ক– যার মধ্যে ফ্রয়েডের

যৌনদর্শন, কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র, পশ্চিমা পুঁজিবাদ, ভাববাদ এসবই একাকার হয়ে যায়।

২। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কেবলমাত্র বস্তুগত উপায়-উপাদানের মাধ্যমে মানুষের উন্নতির প্রচেষ্টা। এ মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র বস্তুগত উপায়-উপাদানের মাধ্যমে মানুষ তার বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জন করতে পারে।

৩। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তাগণের মতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন : পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদির মতই মানুষের আচরণ ও সমাজের কল্যাণের জন্য যে নীতিমালা ও আইন-কানুনের প্রয়োজন তা একমাত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রচনা করা সম্ভব। এর জন্য কোন ধর্মবিশ্বাস, নবী-রাসূল, প্রত্যাদেশ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

৪। তত্ত্বগতভাবে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ জগতকে দু'ভাগ করেন– একটি বস্তুগত জগৎ বা প্রাকৃতিক জগৎ যার মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আর একটি হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগৎ বা অতিপ্রাকৃতিক জগৎ যা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব। তাদের মতে আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃতিক জগৎ একটি অজ্ঞেয় জগতও বটে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতে, প্রথমটিতে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং এ জগতে মানববুদ্ধি পরীক্ষা নিরীক্ষা বা অভিজ্ঞতাই একমাত্র পথ নির্দেশক। আর দ্বিতীয় জগৎটিতেই ধর্ম বিচরণ করার অধিকার পেতে পারে– অন্য কোথাও নয়।

৫। তত্ত্বগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নাস্তিকতা বা আস্তিকতা কোনটাই নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা নাস্তিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হলিয়কের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি সরাসরি নাস্তিকতার কথা না বললেও ব্রেডলাফের নেতৃত্বাধীন অপর শক্তিশালী গ্রুপ একই সাথে নাস্তিকতার প্রচার করতেন এবং তাদের মতে, ধর্ম বিশ্বাসের সরাসরি বিরোধিতা না করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

৬। নৈতিকতার ভিত্তি ধর্ম বিশ্বাস নয় বরং যুক্তিবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নির্ভর নয় বরং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অভাব থেকে সৃষ্টি। হলিয়কের মতে, বিজ্ঞান যেভাবে স্বাস্থ্য বিধি শিক্ষা দেয়, তদ্রূপ নৈতিক শিক্ষাও দিতে সক্ষম।

৩.৭.৫ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

Orgin and Development of Secularism

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রাচীন একটি মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভাবধারা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের সফিস্টদের চিন্তাধারার[২১] মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সক্রেটিসের (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯) চিন্তাধারাতেও এ ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবে রোমান ও গ্রীক সমাজ প্রধানত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ যার ভাবধারা রেনেসাঁর মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আধুনিক ভাবধারার প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে মধ্যযুগের শেষদিকে পশ্চিম ইউরোপে। এক্ষেত্রে স্কলাস্টিক ও নমিনলিস্ট দার্শনিকদের চিন্তাধারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রাথমিক ক্ষেত্র তৈরি করে। লুথার কিং-এর খ্রিস্টান প্রটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলন (যা ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে আখ্যায়িত করে), ইতালীর ম্যাকিয়াভেলীর নৈতিকতামুক্ত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার মতবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে।

১৯ শতকের মাঝামাঝিতে এসে একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ মতবাদ হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের অভ্যুদয় ঘটে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল প্রবক্তা ছিলেন ব্রিটেনের জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৪)। তিনি ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত হলেও পরবর্তী সময়ে সমাজ ও মানুষের প্রতি প্রচলিত চার্চের সহানুভূতির অভাব দেখে তনি চার্চের প্রতি বিমুখ হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৪১ সালে পুরোপুরিভাবে ধর্ম ও খোদা বিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি আজীবন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হলিয়কের যারা সহযোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে চার্লস ব্রেডলাফ (১৮৩৩–১৮৯১), চার্লস সাউথওয়েল, থোমাস কপার, চার্লস ওয়াটস, ডি. ডব্লিও ফুটের (১৮৫০–১৯১৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাদের আন্দোলন শুরু হয় ১৮৬৪ সালে। সে সময় নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন নামে আর একটি আন্দোলন চলছিল। সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জনমন থেকে

---

২১. সোফিস্ট (Sophist) দার্শনিকগণ রাষ্ট্র, সরকার ও অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। সোফিস্ট দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হলো গর্জিয়াস (Gorgias), প্রোটোগোরাস (Protagoras), থ্রাসিমেকাস (Thrasimachus), হিপ্পিয়াস (Hippias), প্রোডিকাস (Prodicus) প্রমুখ।

খোদা বিশ্বাসকে চিরতরে মুছে ফেলা। তারই পাশাপাশি শুরু হয়েছিল কার্ল মার্কস[২২] (১৮১৮–১৮৮৩) ও এঙ্গেলস (১৮২০–১৮৯৫)-এর কমিউনিজমের আন্দোলন। সেটাও এক ধরনের নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন ছিল।

তদানীন্তন ইউরোপের জনগণ যতই ধর্মবিমুখ হোক না কেন নাস্তিকতার সরাসরি প্রচারণা তারা মেনে নিতে পারল না। এমনকি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি পর্যন্ত স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকৃতির ব্যাপক প্রচারণাকে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতে থাকেন। তাদের যুক্তি ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার বা চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

হোলিয়ক ও তার সঙ্গীরা মূলত সেই সময়কার নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনের বিকল্প অথচ সহধর্মী একটি আন্দোলন গড়ে তোলার জোর প্রচেষ্টা শুরু করেন।

১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম তাদের আন্দোলনটিকে বুঝানোর জন্য সেকুলারিজম পরিভাষাটির প্রয়োগ শুরু হয়। এ শব্দটি এজন্যই প্রয়োগ করা হয়েছিল যাতে করে লোকেরা এ আন্দোলনটিকে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন মনে না করে। কেননা যারা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তারা প্রায় সবাই বিশেষ করে ব্রেডলাফ ও তার সহযোগী চার্লস ওয়ার, ডি. ডব্লিও ফুট প্রমুখ সবাই কট্টর নাস্তিক ছিলেন। এমনকি ব্রেডলাফ ও তার সহযোগীরা এ আন্দোলনকে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন বলে প্রচার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। ব্রেডলাফের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলনকে সফল করতে হলে অবশ্যই নাস্তিকতার ধারণাও প্রচার করতে হবে। তার মতে, নাস্তিকতাবাদ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ টিকে থাকতে পারে না। অবশ্য জেকব হোলিয়ক নাস্তিকতাবাদ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। অবশ্য এর কারণও ছিল। তদানীন্তন খ্রিস্টিয় ইউরোপে এমন অনেকেই ছিলেন যারা ধর্মের নিগড় থেকে মুক্তি চাচ্ছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপ তারা মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু ঐসব লোক আবার সরাসরি নাস্তিক হতেও রাজি ছিলেন না। ব্যক্তির সীমিত পরিসরে ধর্মের উপযোগিতা তারা অস্বীকার করতে চাইতেন না। জর্জ জেকব হোলিয়ক যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন শুরু করেন– তখন তিনি চাচ্ছিলেন এমন সব লোকদের আন্দোলনে শরীক করতে, যারা চার্চের প্রতি বীতশ্রদ্ধ অথচ নাস্তিক নয়। আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য চার্চবিরোধী

---

২২. কার্ল মার্কস একজন ইহুদী ছিলেন। প্রুশিয়ার রাইনল্যান্ড প্রদেশে ট্রিভস নামক স্থানে এক চরমপন্থী ইহুদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

সর্বশ্রেণীর লোকদের তারা ব্যক্তিজীবনে আস্তিক হোক, নাস্তিক হোক, ধার্মিক বা অধার্মিক হোক না কেন তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন যাতে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনে পরিণত না হয় সেজন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করতেন। তারা প্রচার করতেন যে, তাদের আন্দোলন আস্তিকতাও নয়, নাস্তিকতাও নয়। যদিও তারা জানতেন যে, আস্তিকতাও নয়, নাস্তিকতাও নয়, এমন ধরনের অবস্থার বাস্তবতা নেই। তবুও তারা বাস্তব কারণেই প্রকাশ্যে আস্তিকতা প্রশ্নেই চুপ থাকাকে শ্রেয় মনে করতেন।

যতদিন পর্যন্ত হোলিয়ক আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সরাসরি নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনরূপে প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু পূর্ববর্তী এবং ১৯ শতকের সত্তরের দশকের বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমন : ম্যাকিয়াভেলী, থমাস হব্‌স, মাঁবোদা, ইউগু গুসিয়াস, জর্জ জেবক হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৬), ব্রেডলাফ, মার্কস, এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিকতাবাদী, বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

পশ্চিমা জগতে চার্চের প্রভাব ও হস্তক্ষেপমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেকুলার রাষ্ট্রদর্শন গড়ে উঠে। মনে রাখা প্রয়োজন, চার্চ যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, সে খ্রিস্ট ধর্ম গোড়া থেকে কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রবক্তা ছিল না। সে ধর্ম রাষ্ট্র পরিচালনার কোন নীতি, বিধি-বিধান প্রণয়ন করেনি। তাই প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে খ্রিস্ট ধর্ম বিকশিত হয়েছে। গোড়া থেকেই এখানে স্রষ্টা ও রাষ্ট্রের (সিজারের) পৃথক পৃথক বা দ্বৈত আনুগত্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল :

"Render therefore unto Caesar the thing that are Caesars and unto God the things that are Gods."

চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টেনটাইনের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে খ্রিস্ট ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের 'রাষ্ট্রীয়' ধর্মে পরিণত হয়। পঞ্চম শতকে প্রথম গ্যালাসিয়াস দু'তলোয়ার তত্ত্বের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক- ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও পার্থিব, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরবর্তীতে মধ্যযুগে পোপের শুধু ধর্মীয় কর্তৃত্ব নয়, বরং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। ফলে রাষ্ট্র কার্যত পোপ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় নিরঙ্কুশ পোপের শাসন। অথচ মূল খ্রিস্ট ধর্মে বা খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে এর কোন অবকাশ ছিল না, ছিল না কোন নীতিমালা, বিধি-বিধান। পোপের শাসন সমাজের অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও

মানুষের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার মাধ্যমে পশ্চিমা জগৎ মূলত পোপের স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যেহেতু মূল খ্রিস্ট ধর্মে এমন কোন নীতিমালা ও বিধিবিধান ছিল না, যা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব। তাই খ্রিস্ট ধর্মের পক্ষে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না।

কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত, ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও নীতিমালা দিয়েছে। 'খিলাফত' তত্ত্ব হচ্ছে ইসলামের মূল রাষ্ট্রতত্ত্ব। যার মূলকথা, সমস্ত কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছে আল্লাহ। জনগণ তার প্রতিনিধি হিসেবে মূল সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশরূপে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। একজন মুসলমান সেই ব্যক্তি, যে ইসলামে বিশ্বাসী ও ইসলামের অনুবর্তী। একজন মুসলমান যেমন ব্যক্তিজীবনে ইসলামের অনুবর্তী হবে, তেমনি তাকে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামের অনুবর্তী হতে হবে। কাজেই ইসলামী তত্ত্বে রাজনীতি ও ইসলামকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ একজন মুসলমান বা মুসলিম সমাজ নীতিগত বা তত্ত্বগতভাবে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।

মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্র ও রাজনীতি বরাবরই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্র ছিল সার্বিকভাবে ইসলামভিত্তিক। আইন-কানুন, নীতিনিয়ম সবকিছুরই মূল উৎস ছিল কুরআন-সুন্নাহ। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ও ইসলামের বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। তবুও অনেক বিচ্যুতি সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিল ইসলাম। কুরআন-সুন্নাহ ছিল আইনের মূল উৎস। স্বৈরাচারী নিপীড়ক শাসককেও তাদের শাসনের বৈধতার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে মেনে নিতে হত। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ ইসলামী খিলাফতের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি পর্যন্ত কমবেশি এ অবস্থা বিরাজ করছিল। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম বিশ্বে সেকুলার ভাবধারার প্রসার ঘটে।

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮)-এর নেতৃত্বে সেকুলার তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের মধ্যদিয়ে মুসলিম বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

৩.৭.৬ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিভিন্ন রূপ
Various Types of Secularism

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কুফরী মতবাদ। স্বতন্ত্র মতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে শুরু হলেও বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এর অনুশীলন হচ্ছে। তত্ত্বগতভাবেও তাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এর বিভিন্ন ধরনের মধ্যে প্রধানত চারটি ধরনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। **উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ :** উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মের প্রতি উপেক্ষা নীতি গ্রহণ করে। ধর্মের ব্যাপারে এ মতবাদ প্রকাশ্যভাবে মারমুখো নয়। ব্যক্তির নিজস্ব পরিমণ্ডলে ধর্মের অনুশীলন উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা স্বীকার করে থাকেন। তাদের মূল আপত্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ধর্মের কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে। ব্যক্তিজীবনে কেউ ধার্মিক হলে তাতে আপত্তি করার তেমন কিছু নেই। ব্যক্তিগত জীবনে যে কোন ধর্মে বিশ্বাস ব্যক্তির অধিকারও বটে। তবে এ বিশ্বাস যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে। পাশ্চাত্য জগতের গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব রয়েছে।

২। **চরমপন্থী বা মারমুখো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ :** যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা ধর্মের বিরুদ্ধে চরমনীতি অবলম্বন করে থাকে তাই চরমপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। "ধর্মই অনিষ্টের মূল, শোষণের হাতিয়ার, জনগণের জন্য আফিমস্বরূপ, তাই ধর্মকে শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নয় ব্যক্তির মন মগজ থেকেও উৎখাত করতে হবে।" চরমপন্থী ধর্মনিপেক্ষতাবাদ ধর্মের প্রতি উল্লিখিত মারমুখো মনোভাবই পোষণ করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ কমিউনিজমই প্রধানত এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা। তত্ত্বগতভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইকে এ মতবাদ ঐতিহাসিক দায়িত্ব মনে করে। ইদানিং অবশ্য কৌশলগত কারণে ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব কিছুটা কমে এসেছে। তবে তত্ত্বগত অবস্থানের তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি।

৩। **সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা :** বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা কোন ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধার প্রতি অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করলেও যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত তার প্রতি মোটেই গুরুত্ব না দেয়াকে

সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হলো সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখা হবে ঠিকই কিন্তু যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত, সে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি পুনর্গঠন করতে প্রস্তুত না হওয়া। যেমন : বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে এমন অনেকেই রয়েছেন যারা মুসলমানদের জন্য বিগলিত প্রাণ, মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি তাদের মাঝে মাঝে প্রবল উৎসাহ। কিন্তু সমাজজীবনে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে তারা এড়িয়ে যান বা অস্বীকার করেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ মুসলমানদের স্বার্থেই নাকি রাজনীতির সাথে পবিত্র ধর্মকে জড়িত করা উচিত হবে না– এ তত্ত্বও প্রচার করে থাকেন। তারা মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন। সাথে সাথে তারা ধর্মনিরপেক্ষতারও সমর্থক। এ দু'য়ের অদ্ভুত সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা। ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মনিরপেক্ষতাও এমনি আর একটি উদাহরণ।

৪। **ছদ্মাবেশী ধর্মনিরপেক্ষতা :** আর এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব রয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে, তা হচ্ছে ছদ্মাবেশী ধর্মনিরপেক্ষতা। এর তাৎপর্য হচ্ছে, প্রকাশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হবে না, কিন্তু কাজে কর্মে সব বিষয়েই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাধান্য লাভ করবে। শুধু কথা বা প্রচারের সময় ধর্মের নামটা ব্যবহার করা হবে। অথবা কোথাও কোথাও ধর্মের ছদ্মাবরণে ধর্মনিরপেক্ষতারই শাসন চলবে। কারণ জনমতের ভয়ে ক্ষমতার স্বার্থে ক্ষমতাসীনরা ও রাজনীতিকগণ জনগণকে বিভ্রান্তি করার জন্য এ ভণ্ডামীর আশ্রয় নেন। তারা প্রকাশ্যে তাদের মনের কথা বলতে সাহস পান না। তাই ইসলামের নাম ব্যবহার করেন শুধু ধোকা দেয়ার জন্য। তারা ধর্মের ব্যবসায় করেন, ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে রাজনীতি করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে ম্যাকিয়াভেলীর পরামর্শক্রমে ধর্মকে ব্যবহার করেন। এরা কখনো সাম্প্রদায়িকতাকেও কাজে লাগায়। এ ধরনের ভণ্ডামীপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতাকেই ছদ্মাবেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলা হয়।

৩.৭.৭ ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পার্থক্য
Islam vs Secularism

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য। দুটির দুই প্রান্তসীমায় অবস্থান। ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দূরতম কোন সম্পর্ক থাকাও সম্ভব নয়। উভয় মতবাদের পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)	ইসলাম (Islam)
১। মানুষের তৈরি মতবাদ। অন্যকথায় মানব রচিত। Man- made in origin.	১। আল্লাহ্ প্রদত্ত। Divine in origin.
২। এ পৃথিবীকেন্দ্রিক। ইহজগতমুখী। সম্পূর্ণরূপে পার্থিব। This- worldly orientation.	২। এ পৃথিবী এবং পরকালীন জীবন উভয় ক্ষেত্রেই জোর দেয়। Emphasizes this world and the here after.
৩। যুক্তি, কার্যকারণ, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের উপর জোর দেয়। Emphasizes reason, observation and experiment.	৩। অহী বা প্রত্যাদেশ, যুক্তি, কার্যকারণ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের এবং অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়। Emphasizes revelation, reason, observation and experience.
৪। মানবতায় বিশ্বাসী। Believes in humanism.	৪। মানবতায় বিশ্বাসী তবে তা ইসলামী শরীয়াহ্‌র আওতায়। Believes in humanism but within the framework of shariah.
৫। ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করা। ধর্মকে রাজনীতি হতে পৃথক করে। Separates religion and politics.	৫। ধর্ম ও রাজনীতিকে সংযুক্ত করে। একসূত্রে গ্রথিত করে। Integrates religion and politics.
৬। ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত গণ্ডীকে আবদ্ধ রাখে। Relegates religion to personal sphere.	৬। ইসলাম বিশ্বাসীগণের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকেই নিয়ন্ত্রণ করে। Islam governs all aspects of a believer's life.

ইসলামের দর্শন অত্যন্ত পরিষ্কার। তার অবস্থানও সংশয়হীন ও সুদৃঢ়। এজন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামকেই প্রধানতম শত্রু মনে করে।

৩.৭.৮ পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
Western Secularism

গ্রীক নগর রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে

একটি জটিল সম্পর্ক চলে আসছে। আধুনিককালের পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা 'সেকুলারিজম'কে আধুনিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের মতো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন যে, সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ অখণ্ড সমাজ মানব মনীষা প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এতে প্রাকৃতিক কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। প্রাচীন রোমের ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা গ্রীসের এ ধর্মনিরপেক্ষ উত্তরাধিকারকে গ্রহণ, লালন ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করে। গ্রীক সভ্যতার এ ভাবধারা আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার সামগ্রিক চিন্তাচেতনার উপর গভীর প্রভাব ফেলে।[২৩]

মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় এবং তার ফলে সম্রাট ও পোপের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। চার্চ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং সম্রাট ও চার্চের উপর খবরদারি শুরু করে। চার্চ গ্রীক দর্শন থেকে এমন কতগুলো তত্ত্ব ও বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল যাকে তারা 'পরম সত্য' বলে মনে করত এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও তার বিরোধিতা করা ধর্ম বিরোধিতা বলে গণ্য করত। ধর্মযাজকদের এ গোঁড়ামির ফলে ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস ও ধর্মযাজকদের প্রতি অবিশ্বাস প্রবল হতে থাকে। চার্চ যতই ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করতে থাকে এবং সেই ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দমননীতি অনুসরণ করতে থাকে, ততই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে।

ধর্মযাকজদের বাড়াবাড়ি এক সময় এমন পর্যায় পৌছায় যে, পৃথিবী গোলাকার এ বক্তব্যের জন্য বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারা আরম্ভ হয়। জনসাধারণের দৃষ্টিতে এ সময় ধর্ম পরিণত হয় এমন একটা দানবে যার অত্যাচারে দিবারাত্র অতিষ্ঠিত হতে হয়। ধর্মের নামে এরূপ মিথ্যাচার, কুসংস্কার ও প্রতারণার প্রতিবাদে ইউরোপের বিবেকমান স্বাধীনচিত্ত মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠে। মার্টির লুথার (১৪৮৩–১৫৪৬) প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের (Protestant Reformation Movement) মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। পঞ্চদশ শতকে এ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠে।

একই সময় ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে 'মানবতাবাদ' তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এ মতের পণ্ডিতরা ধর্ম প্রসঙ্গটিকে আমলে না এনে মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনার কথা বলেন। এরপর রেনেসাঁর ফলে চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে

---

২৩. মরিয়ম জামিলা, ইসলাম এন্ড মর্ডানাইজেশন, ১৯৭৬, ঢাকা, পৃ. ৮।

ইউরোপে বিপ্লব সংঘটিত হয়। রেনেসাঁর ফলশ্রুতি হতে আধুনিকতা এর সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতকে ফরাসি দার্শনিক হিউম, ভলটেয়ার, ফ্রান্সিস বেকন প্রমুখের হাতে এবং পূর্ণ বিকাশ ঘটে ঊনবিংশ শতকে ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), মার্কস, ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), ব্রাটান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), আরনল্ড টয়েনবি প্রমুখের মাধ্যমে। প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের পর রেনেসাঁর পণ্ডিতরা চার্চের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকেই সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অপরিবর্তনীয় গাণিতিক আইনে সমগ্র সৌরজগৎ পরিচালিত হয়- নিউটনের এ মতবাদে আত্মহারা হয়ে রেনেসাঁর যুগের পণ্ডিতরা বলতে শুরু করেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বিপরীতে সকল বিশ্বাসকে পরিহার করতে হবে, ভল্টেয়ার, হিউম, ফ্রান্সিস বেকন, রুশোর মতো দার্শনিকরা অতীতের সকল জ্ঞান ও ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এ বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে, সর্বজনীন গণশিক্ষা যে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিজ্ঞান প্রচার করেছে তাতে বিশ্বে একটি সত্যিকার স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের ভাগ্য রূপ দেয়ার বৈজ্ঞানিক যাদু এখন মানুষের করায়ত্বে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য এবং সর্বজনীন শান্তি বিরাজ করবে। ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মানবজীবনকে দীর্ঘায়িত করবে এবং সকল রোগ ও কষ্ট নিঃশেষ করে দেবে। পরবর্তী শতকের প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এ নতুন বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছে যে, কোন অলৌকিক সাহায্য ছাড়াই বিশ্বে মানবজীবন পরিপূর্ণতা অর্জন করে।[২৪] ইউরোপীয় দার্শনিকদের এ বস্তুবাদী চিন্তা ডারউইন, ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস, ব্রাটান্ড রাসেল তুঙ্গে পৌঁছে দেন। তারা মানবজীবনে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশাসনকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করেন। তাদের দৃষ্টিতে নৈতিকতা একটি আপেক্ষিক বিষয় মাত্র।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ফরাসি চিন্তাবিদ অগাস্ট কোঁতে মানুষের চিন্তার ক্রমোন্নতির ইতিহাসকে তিনটি স্তরে (Theological stage, Metaphysical stage and Positive stage) ভাগ করে আধুনিক স্তরকে Positive stage (নিশ্চিত জ্ঞানের স্তর) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ হলো কোন ঘটনারাজি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এসব কার্যকারণের বরাত দেয়া হয়, যা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জানা ও বুঝা যায়, Scientific Empiricism এতে আধ্যাত্মিক কোন নিরঙ্কুশ শক্তির স্থান নেই। হিউম, মিল,

২৪. মরিয়ম জামিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৫।

রাসেল প্রমুখরা এরূপ ধারণাকে বলেছেন বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়বাদ। আর বর্তমান বিশ্বে গবেষণা ও প্রচারণার ক্ষেত্রে এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইতালির ম্যাকিয়াভেলী রেনেসাঁর যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্ম ও নৈতিকতা অনুসরণ করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রকে তার উর্ধ্বে থাকতে হবে। ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী নীতির প্রবক্তা ম্যাকিয়াভেলী আরো বলেন, অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছু মাত্র উপকারী হয়, হবে তা করতে কোন বাধা নেই।[২৫] ম্যাকিয়াভেলীর এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেকুলারিজম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ধারণাকে সমর্থন দিয়েছেন ইংরেজ দার্শনিক থমাস হবস্। তাঁর মতে একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনটাই ক্ষমতার বেপরোয়া অনসুন্ধানে ব্যস্ত।

কম্যুউনিজমের প্রবক্তা কার্ল মার্কস ও তার অনুসারীরা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে শুধু আলাদাই নয়; মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার ও ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। তাদের দর্শনের মূল কথা হলো, মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়কে বস্তুবাদী ধারণায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা।

ইউরোপে মধ্যযুগ ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার টানাপোড়নের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো। চার্চের কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিপরীতে 'সেকুলারিজম' ও নাস্তিকতাবাদ এর বিকাশ ঘটেছে ঠিকই; তাই বলে খ্রিস্ট ধর্মের ইতিবাচক নীতির আলোকে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন উদ্যোগই ছিল না এমনটি নয়। সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০), সেন্ট থমাস একুইনাস (১২২৭-১২৭৪), মার্সিলিও অব পাডুয়া (১২৭০-১৩৪০) গ্রীক দর্শনের সাথে ধর্ম ও নৈকিতার সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠনের ধারণা প্রচার করেন। অবশ্য তা সমকালীন ইউরোপে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।

যাহোক, জাতি ও গোত্রগত বিবাদে বিধ্বস্ত ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তাদের একমাত্র বন্ধন সৃষ্ট ধর্ম অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। একে একে অসংখ্য ধর্মীয় গ্রুপের উদ্ভব হয়। এর ফলে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থানকে সংহত করতে সক্ষম হয়। তবে ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে জাতীয়তাবাদী

২৫. দি ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপেডিয়া, খন্ড ১৩, ১৯৯২ সংস্করণ, পৃ. ৯।

চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটে এবং অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্রের (Nation states) উদ্ভব হয়।

৩.৭.৯ মুসলিম বিশ্বে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক
Relation between Religion and State in Muslim World

যে পরিবেশে ইউরোপের জনগণ চার্চের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র থেকে তাকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল মুসলিম বিশ্বে সেরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব কখনো ঘটেনি। বিজ্ঞানের কোন তথ্য ও তত্ত্বের সাথে ইসলামের কোন সংঘাত দেখা দেয়নি। (মরিস বুকাইলী) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতাও দেখা দেয়নি। মুসলিম জনগণের মাঝে ইসলামের কোন নীতি বা অনুশাসন তাদের জন্য শোষণ, নিপীড়ন ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে দেখা দেয়নি। কোন কোন শাসকের বা শাসকগোষ্ঠীর উচ্চাভিলাষ, কৌশল বা সিদ্ধান্ত নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলেও ধর্ম হিসেবে ইসলামের ও ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি কোন ক্ষোভ বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি। আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান বৈজ্ঞানিকের মনে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়নি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কখনো কোন যুদ্ধ বাঁধেনি। অথবা কোন মুসলিম শাসনকর্তা বা ধর্মীয় নেতা কোন বিজ্ঞানীকে পুড়িয়ে মারেনি বা অত্যাচার করেনি।

৩.৭.১০ ধর্মনিরপেক্ষতার ফলশ্রুতি
Result of Secularism

ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মহীনতা পাশ্চাত্য জগতে হাজারো সমস্যার জন্ম দিয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহেও রাষ্ট্র শাসকদের বেলেল্লাপনার কারণে ধর্ম ও নৈতিকতা বর্জিত রাজনীতি-সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা হওয়ার কারণে দেশে দেশে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. চিন্তাধারায় সংশয়বাদ (Confusion in thought) : ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান পরিণতি হলো চিন্তাধারায় সংশয়বাদ। ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক হবার কারণে মানুষের চিন্তা ও চেতনায় সংশয়বাদ আসন করে নিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে সন্দেহ সংশয়। সরকার জনগণকে বিশ্বাস করেন না। কি জানি কখন জনতার উত্তাল তরঙ্গ তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে উৎখাত করে ফেলে। অন্যদিকে জনগণও সরকারকে আপনজন হিসেবে ভাবতে পারেন না, ফলে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার কারণে সন্দেহ সংশয় ছড়িয়ে পড়ে, সরকার ও জনগণের মধ্যে

কোন স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক গড়ে উঠে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতাদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয় না। চিন্তাধারায় ও বিশ্বাসে সংশয়বাদ সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন না।

২. মূল্যবোধে বিভ্রান্তি (Confusion in values and morality) : নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করার কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূল্যবোধের ব্যাপক বিভ্রান্তি ও অবক্ষয় ঘটে। ব্যাপক দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্রমবর্ধমান প্রয়াস যখন শুরু হয় তখন সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। ন্যায় ও মানবীয় গুণাবলী লুপ্ত হতে থাকে। লোভ লালসা, সুবিধাবাদ, দুর্নীতি, ব্যাভিচার, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ, পাশবিকতা, নির্লজ্জতা মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণে অনেকের কাছেই অন্যায় বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়প্রীতি ও কোটারী স্বার্থ শাসকগোষ্ঠীকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সুস্থতা হারিয়ে অশান্তি ও দুর্যোগে নিপতিত হয়।

৩. জীবনযাত্রায় বিলাসিতা (Luxery in life style) : এরূপ সমাজে শাসকগোষ্ঠী ও ধনিকগোষ্ঠী বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার বিলাস দ্রব্য আমদানী করা হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে অনুৎপাদনশীল খাতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়াতে ব্যাপক জনগণ উন্নয়নের স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিন দিন দরিদ্র হতে থাকে। সমস্যা দিন দিন বেড়েই যায়। আর এটা জানা কথা যে বিলাসভিত্তিক জীবনের রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা একবার শুরু হলে তা আর দূর করা যায় না।

৪. আচরণের অশিষ্টতা (Bad manner) : আচরণের অশিষ্টতা কর্মক্ষেত্রে নীতি থেকে আলাদা করার কারণে শাসকগোষ্ঠী ও ডমিনেন্ট এলিটরা আচার আচরণ ও ব্যবহারের অশিষ্টতা প্রদর্শন করেন। ব্যাপক জনগণ এ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয় বলে তাদের মধ্যেও এ আচরণগত দিক সম্প্রসারিত হয়। সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার নামে বেহায়াপনা ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ব্যাপকতা লাভ করে। পুরো সমাজ ব্যবস্থা অনৈতিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবে যায়। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করে না, বড়রাও ছোটদের স্নেহ করে না। ক্ষমতার দাপটে একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান।

৫. বিভক্তকর ও শাসনকর নীতি (Divide and rule policy) : নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করার কারণে রাজনীতিতে শাসকগোষ্ঠী বিভক্তকর ও শাসনকর নীতি অনুসরণ করেন। একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে দেন। সাম্রাজ্যবাদীদের শিখিয়ে যাওয়া এ নীতি মুসলিম দেশের পাশ্চাত্যমনা শাসকগণ প্রয়োগ করে নিজেদের দেশের মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের বীজ বপন করেন।

এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী আলেমকে তারা হাত করতে সক্ষম হন। কলমবাজী, ফতোয়াবাজীর মাধ্যমে দেশের ইসলামপন্থীদেরকেও বিভক্ত করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের লড়াই লাগিয়ে দিয়ে বিশৃঙ্খলতার অভিযোগ এনে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ব্যক্ত করে নিজেদের অন্যায় শাসনকে আরো পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পান।

৬. ডিপ্লোমেসিতে সুবিধাবাদ (Hypocracy in Diplomacy) : নৈতিকতা বিসর্জিত ডিপ্লোমেসিকে কপটতা বা মুনাফিকী বলে চিহ্নিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থই প্রাধান্য পায়। তাদের স্বার্থই জাতীয় স্বার্থ বলে বিবেচিত হয়।

৩.৭.১১ ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
Islam and Secularism

ইসলাম কিছু বিশ্বাস, তার মৌখিক স্বীকৃতি ও সেই অনুযায়ী নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্র পরিচালনার নাম। সুতরাং ইসলাম একটি ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মীয় জীবনব্যবস্থা। ধর্মহীনতা বা Secularism-এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কতো নেই-ই বরং এ মতবাদ ইসলামের বিপরীত মতবাদ। আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে ইসলাম তো বটেই বরং কোন ধর্মই এ মতবাদে বিশ্বাস করে না। সুতরাং এ মতবাদ শুধু ইসলামের বিপরীতমুখী মতবাদ নয় সকল ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক মতবাদ। যা হোক, ইসলামের সাথে এ মতবাদের সম্পর্ক হচ্ছে বৈপরীত্যের সম্পর্ক। পানি আর আগুনের সম্পর্ক। সাপ ও নেউলের সম্পর্ক। পানি ও আগুনের সহঅবস্থান যেমন অসম্ভব, তেমনি এ ধর্মহীন মতবাদ ও ইসলামের সহঅবস্থান একেবারেই অবাস্তব। আমি বাংলাদেশী তবে বাংলাদেশের সংবিধান মানি না এ বাজে কথাটি যেমন মূল্যহীন, বেমানান ও অবাস্তব, তেমনি আমি মুসলমান তবে আমি সেকুলার এ কথাটিও পরস্পর সাংঘর্ষিক, বেমানান ও অবাস্তব। ধর্মহীন হয়ে মুসলমান থাকা বামুনের চাঁদ ধরার মতো বাস্তবতাবর্জিত ও

ডুমুরের ফুল দেখার মতই অসম্ভব। সুতরাং আমি মুসলমান তবে আমি ধর্মনিরপেক্ষবাদী, আমি সেক্যুলার এ অবাস্তব চিন্তা যারা করে তারা মূলত বোকার স্বর্গেই বাস করছে। তুমি সেক্যুলার তার অর্থ তুমি ধর্মহীন, তুমি মুসলমান নও। ইসলামের সাথে তোমার সম্পর্ক নেই। মুসলমান দাবি করারও তোমার অধিকার নেই। ফলে যারা সেক্যুলার বলে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলেন তাদেরকে এ বাস্তব সত্যকে মেনে নিতেই হবে।

যারা মনে করেন সেকুলারিজমের অর্থ ধর্মহীনতা নয় বরং ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ করা, ধর্মকে জীবনের কিছু ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে একই সময়ে মুসলমান ও সেকুলার থাকার পথ খোঁজেন, সেটা মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আসলে কিন্তু ইসলাম অবিভাজ্য একটি জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় ইসলামের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামকে মানলেই ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানা হয়। আর জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিলে ইসলামের আংশিক পালন করলাম বলে মনে করলেও আসলে ইসলামই পালন হয় না। কেননা ইসলামের মূল রূপ হচ্ছে আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রদর্শন। আংশিক আনুগত্য করা আর অন্যান্য ক্ষেত্রে আনুগত্যহীনতা মূলত: আনুগত্যহীনতাকেই প্রমাণ করে। যেমন : একজন চাকরিজীবি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দু'একটি পলিসির বিরোধিতা করলে তার চাকরি নিয়ে টান পড়াটাই স্বাভাবিক। সেজন্য সেকুলারিজমের প্রবক্তরা ব্যক্তিজীবনে ইসলাম মানার কথা বললেও তারা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম মেনে চলার কারণে তাদের ইসলাম নিয়ে দোটানায় পড়াটাই স্বাভাবিক। তাহলে ব্যক্তিজীবনে মুসলিম, আর অন্য জীবনে অমুসলিম থাকাকে অনিবার্য করে জীবনের দু'একটি ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর আনুগত্য দেখান আর অন্য ক্ষেত্রে আনুগত্যহীন হওয়া মূলত তাদের পূর্ণ আনুগত্যহীন হওয়ারই শামিল। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, "পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না।" এর অর্থ হচ্ছে মুসলমান হতে হলে পূর্ণভাবে হতে হবে। সুতরাং সেকুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে যারা জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে ধর্মকে অনুশীলন করে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে যারা মুসলমান থাকতে চায়– তাদের এ চাওয়াই একেবারেই অবান্তর। কথায় আছে, "আল্লাহ ভী খোশ রাহে ভগবান ভী নারাজ না হো যায়ে"– মূলত: কোন মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না। অতএব, সেকুলারিজমের যে কোন ব্যাখ্যাই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক; এতে কোন সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্য একটি রূপ। এ আলোকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশীলনকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপ্রবেশ শক্তভাবে নিষিদ্ধ। এ ছদ্মাবরণে ইসলাম বিদ্বেষী এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে অন্য কিছু না বুঝিয়ে এ দ্বারা ধর্মহীন রাজনীতি ও রাষ্ট্র এত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, এখন মুসলিমরা অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মমুক্ত রাজনীতি ও ধর্মহীন রাষ্ট্র বুঝে থাকে। এ ব্যাখ্যার আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ারও ঢের কারণ রয়েছে। সুবিধাবাদী মুসলিম রাজনীতিকরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করেছে। রাজনীতি ও রাষ্ট্র ইসলামী অনুশাসনের আওতায় পরিচালিত হলে সেখানে যেমন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ারও সুযোগ থাকে না তেমনি ভেজালপূর্ণ লোকদের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই এ সকল লোকদের নিকট ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সাংঘাতিক গ্রহণযোগ্য বাজার পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার এ ব্যাখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিন্তু আত্মতৃপ্তির ভাগটাও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাগুলোর চেয়ে বেশি। সেখানে শুধু ব্যক্তিজীবনে ধর্মকে অনুশীলনের সুযোগ ছিল। পক্ষান্তরে, এখানে শুধুমাত্র রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে মেনে চলার সুবিধা রয়েছে। ফলে মনে করা হয় সেজন্যও মুসলমানেরা অনেকটা ধর্মীয় আত্মতৃপ্তি ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে লালন করছে, পালন করছে। তাদের দৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রেতো ইসলামী অনুশীলন পালন করছি, শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে এটা উপেক্ষা করলে আর কিই বা হবে? এমনি ধরনের এক অবান্তর চিন্তা তাদেরকে এ পথ অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সেজন্য মুসলিম হতে হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো রাজনৈতিক অঙ্গন এবং রাষ্ট্রীয় আঙিনাও ইসলামী ধাঁচে পরিচালিত হওয়া অনিবার্য। শরীরের কোন অঙ্গে ক্যান্সার হলে যেমন অন্য অঙ্গ একেবারে ভাল থাকলেও রোগী বাঁচানো যায় না, ঠিক তেমনি জীবনের কোন এক ক্ষেত্রে ইসলাম বিমুখতা চর্চার জন্য উন্মুক্ত থাকলে অন্য ক্ষেত্রে যতই ইসলাম পালন হোক না কেন সেখানে মুসলমান থাকার সুযোগ থাকে না। আল্লাহ পাক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে?' যারা এটি করে

তারা দুনিয়ার জীবনে, লাঞ্ছিত হয়, কিয়ামতের কঠিন দিনে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'[২৬]

কুরআনের কিছু অংশ পালন ও কিছু অংশ বর্জন করে মুসলমান থাকার সুযোগ থাকলে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই এই কঠোর সাজার কথা বলা হত না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক বৈপরীত্যের সম্পর্ক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হয়ে মুসলমান থাকার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এই মতবাদ কুফরী মতবাদ। এ মতবাদ আল্লাহদ্রোহী মতবাদ। এ আদর্শ অমুসলিমদের আদর্শ।

৩.৭.১২ মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
Secularism in Muslim World

মুসলিম বিশ্ব বা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সবচেয়ে সরব ও মুখ্য প্রবক্তা হচ্ছেন শেখ আলী আবদ আল রাজিক (১৮৮৮–১৯৬৬)। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন এবং কিছুদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও অর্থনীতির উপর পড়াশুনা করেছিলেন। ই.আই.জে. রোজেনথালের মতে, আল রাজিক প্রণীত গ্রন্থ 'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম' ইসলাম ও সরকারের নীতি রাষ্ট্রের জাগতিক কর্মকান্ড হতে.....ধর্মকে চূড়ান্তভাবে পৃথক করার তাত্ত্বিক ভিত রচনা করে।[২৭] আবদ আল রাজিক রাজনীতি ও রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সবকিছু বর্জন করে ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসেবে পেশ করেন। তিনি যুক্তি উত্থাপন করেন যে, নবী করীম (স) ছিলেন একজন রাসূল (Messanger), যার শাসন করার বা রাষ্ট্র গঠনের কোন উদ্দেশ্য ছিলো না।[২৮] ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং মহানবী (স) ছিলেন অবিসংবাদিত ধর্মীয় (Religious), বা আধ্যাত্মিক (Spiritual) নেতা, যাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন এবং ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংহতিকরণ ছিল নিছক ঘটনাচক্র মাত্র এবং এর সাথে তাঁর নবুয়তী মিশনের কোন সম্পর্ক ছিল না।[২৯] সংক্ষেপে আবদ আল রাজিকের মতে ইসলাম

---

২৬. ২ : সূরা আল বাকারা : ৮৫)

২৭. ই.আই.জে. রোজেনথাল, Islam in the Modern National State, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ক্যামব্রিজ, ১৯৬৫, পৃ. ৮।

২৮. আলী আবদ আল রাজিক, আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম, আল হায়াত লাইব্রেরী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৬৬, পৃ. ৮৩।

২৯. আলী আবদ আল রাজিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

ও রাজনীতির মধ্যে রয়েছে যোজনব্যাপী ব্যবধান এবং উভয়কে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে। আল রাজিকের গ্রন্থ 'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম' প্রবল প্রতিবাদের সৃষ্টি করে এবং আল আজহারের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ড কাউন্সিল এ গ্রন্থের তীব্র নিন্দা করে। কাউন্সিল গ্রন্থকারের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপ্লোমা বাতিল করে। আল রাজিককে যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এতে ভুল নেই যে, আল রাজিক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে নবুয়তী মিশন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঘোষণা করেছিলেন, যে মিশনের লক্ষ্য শুধুমাত্র একটি ন্যায়পরায়ন সমাজ গঠনই নয় বরং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনও ছিল। তবে আরব বিশ্বে ফারাহ্ আনতুয়ান (১৮৭৪-১৯২২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কোন কোন মুসলিম দেশে শাসন পদ্ধতির মানদন্ডরূপে পরিবর্তন করার প্রয়াস চলছে। বস্তুতপক্ষে ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতাদর্শকে জোড়ালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামী বিশ্বাস ও সংস্কৃতি তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিদ্বেষ প্রসূত আক্রমণ ইসলামী মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিমন্ডলে অবক্ষয়ী ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আমদানী-রফতানীর রমরমা বাণিজ্যের উৎসব চলছে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর মুসলিম সর্বত্র ইসলামকেও পাদ্রীদের ধর্মের ন্যায় উন্নতি ও প্রগতি বিরোধী মনে করছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায় :

১। মুসলিম বিশ্বে যারা জ্ঞান চর্চা করছেন তাদের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক অমুসলিম চিন্তানায়কের চেয়েও কম জানেন। তারা অনেক মোটা মোটা বই মুখস্থ করেছেন কিন্তু কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করার সুযোগ পাননি, হয়ত বা প্রয়োজনও বোধ করেননি। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে যারা কুরআন ও হাদীসের গবেষণা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন না করার ফলে এবং পার্থিব জীবনকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার সুযোগের অভাবে গোটা মুসলিম সমাজকে যোগ্য নেতৃত্ব দান করতে অক্ষম। দীর্ঘকাল অনৈসলামী শাসনের ফলে ইসলামী মন মগজ ও চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্ব জীবনের সকল দিক থেকেই উৎখাত হওয়া স্বাভাবিক ছিলো।

ফলে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ অথচ ইসলামী মন মস্তিষ্কশূন্য মুসলমানদের নেতৃত্বই মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এ নেতৃত্বের পক্ষে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা এবং যে কোন পন্থায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া মোটেই বিস্ময়কর নয়।

২। মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান, চিন্তাগবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এ বিরাট গাড়িখানাকে টেনে নিয়ে চলছে। চিন্তানায়ক সাধকরাই উক্ত ইঞ্জিনের পরিচালক। তাদের মর্জি অনুযায়ী গোটা গাড়ির সকল যাত্রীকেই চলতে হয়। যতদিন মুসলমান জাতি চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল ততদিন ইসলামী চিন্তাধারাই মানব জাতিকে প্রভাবান্বিত করেছিল। সত্য ও মিথ্যা, সুন্দর ও অসুন্দর, ভালো ও মন্দের ইসলামী মাপকাঠিই তখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য ছিলো। ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের ফলে বর্তমান খোদাহীন চিন্তাধারার বন্যার মুখে ইসলামী জ্ঞান বঞ্চিত মুসলিমদের ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে আধুনিক জ্ঞান সাধনার যে ইঞ্জিন দুর্বার গতিতে মানব জাতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতে মুসলিম নামধারীদের এমনকি ধার্মিক বলে পরিচিত বহু মুসলমানেরও প্রভাবান্বিত হওয়া বিস্ময়কর নয়।

চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ দাসত্ব মুসলমান নেতৃত্বকে পঙ্গু করে রেখেছে। তারা ইউরোপের ওস্তাদদের নিকট নৈতিক ও মানসিক আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে বিশ্বস্ত শাগরিদের ন্যায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করে চলেছে। তাদের স্বাধীন মন মগজ বা চক্ষু আছে বলে মনে হয় না। তারা পাশ্চাত্যের চক্ষু দ্বারা সুন্দর-অসুন্দরের সিদ্ধান্ত নেন; ইউরোপের মগজ দিয়ে উন্নতি-অবনতির হিসাব করেন এবং ওস্তাদদের মন দিয়েই ভালো-মন্দের বিচার করেন।

ইউরোপের এসব মানস সন্তানগণ যদি মানসিক দাসত্ব ত্যাগ না করে তাহলে একদিন রাজনৈতিক দাসত্বই এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর উপর নেমে আসবে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো আজ এ কারণেই বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামে পরিণত হয়েছে।

৩.৭.১৩ মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণের ফলাফল
Effects of adaptation of Secularism in Muslim World

মুসলিম বিশ্বে সেকুলার রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণের ফলাফল মোটেই শুভ

হয়নি। সেকুলারিজমের প্রসারের ফলে যে সমস্ত সংকট দেখা দিয়েছে, তা প্রধানত নিম্নরূপ :

১। জাতিসত্তা সঙ্কট (Nationality Crisis) : মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশ্বের যে দেশেই বাস করুক না কেন, জাতিসত্তার প্রাথমিক ভিত হচ্ছে তার মুসলিম চেতনাবোধ। অবশ্য ইসলাম ভাষা, অঞ্চল, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত পরিচয়কে কখনোই ইসলামের উপর প্রাধান্য দেয়ার অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলাম নিরপেক্ষ, ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন কোন জাতিসত্তার ধারণা ইসলাম অনুমোদন করে না। অথচ মুসলিম বিশ্বের সেকুলারপন্থীরা ইসলামী জাতিবোধকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে নিছক ভাষা, নৃতত্ত্ব বা ভৌগোলিক পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং এসবের ভিত্তিতেই জাতিসত্তা নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত মনন চিন্তাচেতনা কখনোই এটি মেনে নিতে পারে না। ফলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেক্যুলার ভাবধারার ভিত্তিতে জাতিগঠন প্রক্রিয়া (Nation Building process) সবসময় সংকটের জন্ম দিয়েছে। জাতিসত্তার ভিত্তি সর্বদা থেকে গেছে দুর্বল, অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিকর। যেমন : বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে জাতিসত্তার ব্যাখ্যা করে, তাতে যেমন একদিকে মুসলিম পরিচয়কে অস্বীকার করা হয়, অন্যদিকে আমাদের ইতিহাস ও ভূগোলের সাথেও তা অসংগতিপূর্ণ। বস্তুত: মুসলিম পরিচয় পরিহার করে সেক্যুলার ভাবধারা ভিত্তিক কোন জাতি গঠন প্রক্রিয়া দুর্বল ও সংঘাতপূর্ণ হতে বাধ্য।

২। মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সাথে সংঘাত (Clash with Muslim solidarity and brotherhood) : তত্ত্বগতভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির কোন সুযোগ নেই। সেক্যুলারিজম মেনে নিলে অন্য কোন দেশের বা অন্য ভাষাভাষি মুসলমানদের সাথে একাত্মতার সুযোগ কোথায়? মুসলিম উম্মাহর ধারণা নীতিগতভাবে সেক্যুলার দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। কাজেই সেক্যুলারিজম মানে মুসলিম উম্মাহর ধারণাকে, মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধকে নস্যাৎ করে দেয়া। মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজমের যত প্রসার ঘটবে মুসলিম উম্মাহর ধারণা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ততই দুর্বল হবে। সুকৌশলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। ইসলামের উপর আঘাত ও হস্তক্ষেপ (Hit and Interference

against Islam) : মুসলিম কোন দেশে সেকুলারিজম কায়েম করাই সম্ভব হবে না ইসলামের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত ও হস্তক্ষেপ না করে, ইসলামী নীতি ও আইন-কানুনকে বাতিল বা প্রত্যাখ্যান না করে, কোন সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন অবাস্তব। তাই দেখা গেছে, যেখানেই সরাসরি সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেখানেই ইসলামের উপর, ইসলামী শিক্ষার উপর, সংস্কৃতির উপর এমনকি ব্যক্তিগত আইনের উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তুরস্কের কথা বলা যায়। তুরস্ককে সেক্যুলার রাষ্ট্র বানাতে গিয়ে শুধু যে খিলাফত বিলুপ্ত করা হয়েছে তা নয়, বরং ইসলামকে নির্মূল করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে আরবিতে আযান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আরবির বদলে তুর্কি ভাষায় কুরআন পড়তে বা আবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আল্লাহ্ শব্দের বদলে তুর্কি তানরী শব্দ চালু করা হয়েছিল। আযানের সময় আল্লাহ আকবার এর বদলে তানরি উলুদর (সৃষ্টিকর্তা মহান) চালু করা হয়েছিল। জোর করে মহিলাদের হিজাব খুলতে, এমনকি ভিন দেশের পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নাচতে বাধ্য করা হয়েছিল। পুরুষদের ফেজটুপি বাতিল করে পশ্চিমা হ্যাট চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। সমস্ত সূফী দরবার বা খানকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ইসলামী পারিবারিক আইন বাতিল করা হয়েছিল। শাসনতান্ত্রিকভাবে সমস্ত ইসলামী রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আজও তুরস্কে সে ব্যবস্থা বহাল রয়েছে।

তিউনিশিয়ার উন্নয়ন ও সেকুলার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের নামে প্রেসিডেন্ট হাবিব বারগুইবা (১৯০২-   ) প্রকাশ্যে পবিত্র রমযান মাসের রোযা রাখতে নিরুৎসাহিত করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রকাশ্যে রমযান মাসে পানাহার করতেন এবং তা ফলাও করে প্রচার করা হত। তিনি মুসলিম মহিলাদেরকে পর্দা পরিধান করতে নিষেধ করেন। পশ্চাদপতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুবিধার্থে ১৯৬১ সালে তিনি তিউনিসিয়ানদেরকে রমযানে রোযা না রাখতে আহ্বান জানান।

সিরিয়া-ইরাকেও সেক্যুলারপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর ইসলাম এবং ইসলামপন্থীদের সাথে খুবই জঘন্য আচরণ করেছে।

বাংলাদেশেও সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার নামে ইসলামের অবমাননামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল এবং আজও হচ্ছে। মোটকথা, ইসলামকে দুর্বল না করে কোন সেকুলার রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়।

৪। ইসলামপন্থীদের উপর যুলুম নির্যাতন (Oppression against the Islamic State) : একটি মুসলিম দেশে ইসলাম অনুযায়ী দেশ গঠন ও পরিচালনা করার আন্দোলন থাকবেই। কিন্তু সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রবক্তা ও বাহকরা এ সুযোগ দিতে নারাজ। কোথাও আইন করে ইসলামভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হয়। যেমন : তুরস্কে হয়েছে। আবার কোথাও সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়। যেমন : আলজিরিয়া, তিউনিশিয়া, মিসর ইত্যাদি রাষ্ট্রে চলছে। বাংলাদেশেও ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আন্দোলন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মোটকথা, সেকুলার সরকার ও ইসলামপন্থীদের সংঘাত অনিবার্য। আর এর ফলশ্রুতিতে ইসলামপন্থীদের উপর চলে অমানুষিক আচরণ ও নির্যাতন।

৫। সেক্যুলার রাষ্ট্র একটি অত্যাচারী-স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা Secular state is an autocratic state system : মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার সরকার মানে স্বৈরাচারী-অত্যাচারী সরকার। কেননা একটি মুসলিম দেশকে সেক্যুলার বানাতে হলে ইসলামের উপর হস্তক্ষেপ করতে হয়। ইসলামী আইনকে প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে হয়। সমাজকে অনৈসলামী ও পাশ্চাত্যকরণ করার ব্যবস্থা করতে হয়। ইসলামপন্থীদের প্রতিরোধ করতে হয়, মুসলিম পরিচয়কে দুর্বল করে দিতে হয়, ইসলামী ভাবধারার প্রসার বন্ধ বা হ্রাস করতে হয়। আর এসব কাজ যুলুম, নির্যাতন ও জোরজবরদস্তি ছাড়া সম্ভব হয় না।

তদুপরি সেক্যুলার সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন আদর্শ, মতবাদ ও রাজনীতি গ্রহণ করতে হয় যা কোন না কোনভাবে ইসলামবিরোধী বা ইসলামের সাথে অসংগতিশীল হবে। তা সমাজতন্ত্র, উগ্রজাতীয়তাবাদ বা পশ্চিমা গণতন্ত্র যাই হোক না কেন। আর ইসলামবিরোধী এসব আদর্শ জনগণের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে তো নয়ই। ফলশ্রুতিতে যুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার অনিবার্য হয়ে উঠে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার সরকারগুলো পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্রও অনুসরণ করে না। তারা অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের আরেক দর্শন। একনায়কত্ব, ফ্যাসিবাদ, নৎসীবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ যা অনিবার্যভাবে সরকারকে যুলুমবাজ, স্বৈরতান্ত্রিক করে তোলে। জনগণের মতামত নিয়ে দেশ পরিচালনা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি বলে স্বীকৃত হলেও মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার সরকারগুলো সে নীতিও মানছে না। কেননা সে নীতি মানলে

কোন দেশে সরাসরি সেক্যুলার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই কার্যত সেক্যুলার সরকারগুলো একনায়কে পরিণত হয়েছে। আরব বিশ্বের প্রায় সবকটি বড় বড় সেক্যুলার রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মিসর, তুরস্ক[৩০], আলজিরিয়া, তিউনিশিয়ার সেকুলার সরকারগুলো তাদের পৃষ্ঠপোষক পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যূনতম অনুসরণও করছে না। কারণ জনগণকে অবাধ পছন্দ ও বাছাইয়ের সুযোগ দিলে জনগণ কখনোই সেক্যুলার গোষ্ঠীকে সমর্থন দেবে না। কাজেই সেক্যুলার সরকারকে স্বৈরাচারী, যুলুমবাজ হতেই হবে। মুসলিম বিশ্বে কোন সেক্যুলার সরকার গণতান্ত্রিক হতে পারে না, হওয়ার কোন সুযোগও নেই।

৬। সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা নস্যাৎ Destruction of cultural identity and Liberty : মুসলিম বিশ্বে সেকুলার ব্যবস্থা কায়েমের অর্থই হলো পশ্চিমা অনুকরণে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। মুসলিম চিন্তা, চেতনা ও ঐতিহ্যকে পরিহার করা। এর ফলে মুসলিম সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য নস্যাৎ হতে বাধ্য। সেক্যুলার রাষ্ট্রে বাস করে আমাদের পক্ষে প্রতিকূল ও ক্ষতিকর পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। বরং সেকুলারিজম মানেই হচ্ছে বস্তুবাদী, ভোগবাদী, ধর্মহীন সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো। কাজেই মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পথে সেকুলারিজম এক প্রচণ্ড বাধা। সেকুলারিজম হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পৃষ্ঠপোষক শক্তি।

৭। বিদেশনির্ভরতা (Foreign dependency) : সেক্যুলার সরকারগুলো যতই নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করুন না কেন, তারা মূলত বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিনির্ভর। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও টিকে থাকার জন্য বিদেশি শক্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য।

কোন আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করা সেকুলার সরকারগুলোর দ্বারা সম্ভব নয়। কাজেই এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মুসলিম বিশ্বে সেকুলার সরকার মানেই যুলুমবাজ, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, বিদেশী শক্তির লেজুড়, গণবিরোধী ও ধর্মবিরোধী সরকার। সেক্যুলার সরকারগুলোর মাধ্যমে মুসলিম জাতির অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব নয়।

---

৩০. তুরস্কে বর্তমানে জাস্টিস এন্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি ক্ষমতাসীন হয়েছে। এ দলটি ইসলামপন্থী। এ দলের প্রধান রিসেফ তয়েফ এরাদাগান বর্তমানে তুরস্কে প্রধানমন্ত্রী। এ দলের ডঃ আবদুল্লাহ গুল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। এ দল তুরস্কের রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির মোকাবিলায় কৌশলগত ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

৩.৭.১৪ উপসংহার
Conclusion

সেকুলারিজম মুসলিম বিশ্বের জন্য এক ক্ষতিকর মতবাদ। এ হচ্ছে এক অভিশাপ। এ মতবাদের প্রসার মানে ইসলামের ক্ষতি, মুসলিম ঐক্য নস্যাৎ হওয়া। সেক্যুলার মতবাদ মুসলিম বিশ্বের স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তার এমনকি স্বাধীনতার জন্যও হুমকি। সেক্যুলার ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। অতএব, সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, লড়াই করা জনগণের আশু কর্তব্য।

৩.৮ মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্র (Muslim State and Non-Muslim State)

মুসলিম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : যে এলাকা মুসলিম শাসকের শাসনাধীন এবং যেখানে প্রকাশ্যে ও স্বাধীনভাবে ইসলামের বিধান পালন করা যায়, তথাকার অধিবাসী মুসলিম হোক বা না হোক, সে এলাকাকে মুসলিম রাষ্ট্র বলে।[৩১]

মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক

মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন :

১। মুসলিম ২। অমুসলিম-যিম্মী

১। **মুসলিম :** দীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনয়নকারী জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিগণ মুসলিম হিসেবে স্বীকৃত।

২। **অমুসলিম-যিম্মী :** মুসলিম রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক দীন ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মের অনুসারী কিন্তু জন্মসূত্রে বা অন্য কোনভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েছে তারা যিম্মী হিসেবে গণ্য।

অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক : অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকগণও দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন :

১। মুসলিম; ২। অমুসলিম

অমুসলিম রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ[৩২]

মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের বিবেচনায় অমুসলিম রাষ্ট্র ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন :

---

৩১. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, তৃতীয় ভাগ, গবেষণা বিভাগ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০১, পৃ. ৫৯।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

১। মুসলিম রাষ্ট্রকে কর প্রদানকারী অনুগত অমুসলিম রাষ্ট্র : যে অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রকে কর প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের শাসনব্যবস্থা বহাল রাখার অধিকার লাভ করেছে।

২। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র : যে অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের চুক্তি বহাল আছে।

৩। বিদ্রোহী রাষ্ট্র : মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ যে অমুসলিম রাষ্ট্র চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে শত্রুতামূলক আচরণ করে।

৪। চুক্তিহীন রাষ্ট্র : মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যে অমুসলিম রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে চুক্তিবদ্ধ নয় কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ হতে বিরত।

৫। যুদ্ধরত রাষ্ট্র : মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যে অমুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধাবস্থা বা শত্রুভাবাপন্ন অবস্থা বিরাজমান।

৩.৯ দারুল ইসলাম, দারুল আহাদ, দারুল হারব, আল আমান ও আল জিম্মাহ (Darul Islam, Darul Ahad, Darul Harab, Al Aman and Al Zimmah)

দারুল ইসলাম : দারুল ইসলাম ঐ সমস্ত এলাকাকে বলা হয় যেখানে মুসলিমগণ স্বাধীন ও নিরাপদ।[৩৩] আল্লামা সারাখসী বলেন, দারুল ইসলাম হচ্ছে এমন এক ভূখণ্ডের নাম যা মুসলমানদের অধিকারে আছে। সাইয়েদ কুতুব শহীদ (১৯০৬-১৯৬৬) এর মতে, ইসলামী বিধান ও আইন দ্বারা শাসিত দেশকে বলা হয় দারুল ইসলাম। এর সব অধিবাসী মুসলিম না হলেও এ নামেই দেশটিকে আখ্যায়িত করা হয়। অন্যকথায় দারুল ইসলাম অর্থ ইসলামের আবাসভূমি, সেখানে সার্বভৌম মুসলিম শাসক রয়েছেন এবং ইসলামী আইন-কানুন বলবৎ রয়েছে। দারুল ইসলামের বাসিন্দা মুসলিম ও অমুসলিম দুইই হতে পারে। তবে মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিমদের জানমালের দায়-দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করে। আবদুল রশিদ মতিনের মতে, দারুল ইসলাম হচ্ছে 'শান্তির আবাসস্থল' এমন ভূখন্ড যেখানে শরীয়াহর অনুশাসন জারী রয়েছে। (Daral Islam `the abode of Islam'; territory in which the Shariah Prevails)

দারুল আহাদ : দারুল আহাদকে দারুল সুলহও বলা হয়। এ নামটি দিয়েছেন ইমাম শাফেঈ (রহ)। এ পরিভাষা দ্বারা তিনি ঐ সমস্ত অমুসলিম ভূখণ্ডকে বুঝাতে চেয়েছেন যেগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে সন্ধি সূত্রে

৩৩. দেখুন এম. হামিদুল্লাহ, মুসলিম কনডাক্ট অব স্টেট, পৃ. ৮৫, ১২৯-১৩১।

আবদ্ধ হয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখেছে। এ সমস্ত চুক্তির মাধ্যমে ঐ এলাকাগুলোতে বৈধ মুসলিম কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়েছে। এর সাথে ঐ এলাকাগুলো করদ রাজ্য হিসেবে মুসলিম রাষ্ট্রকে 'খারাজ' নামক ভূমি কর প্রদান করে। এ কর দ্বারা জিযিয়া চুক্তির শর্তসমূহ পূরণ করা হয়।[৩৪]

দারুল হারব : দারুল হারব দারুল ইসলামের বিপরীত। এটি অমুসলিম ভূখণ্ড। দারুল হারব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। সাইয়েদ কুতুব শহীদের মতে, যে দেশ ইসলামী বিধান ও আইন দ্বারা শাসিত নয়, তাকে বলা হয় দারুল হরব। দারুল হরবকে দারুল ইসলামে পরিণত করাই ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আবদুল রশিদ মতিনের মতে, দারুল হরব– 'যুদ্ধের আবাসস্থল', এমন ভূখন্ড যা ইসলামের শত্রুদের অধীন রয়েছে। (Dar al harb 'the abode of war'; territory under the juriodication of the enenies of Islam.)

আল আমান : অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ বিরতি, শান্তি এবং শাসনতান্ত্রিক চুক্তির রাজনৈতিক বিষয়াদি ন্যস্ত ছিল রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের উপর। অপর পক্ষে পেশা, অর্থনীতি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি ব্যক্তিগতভাবে আমান এর মাধ্যমে মুসলিম নর-নারীকে দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ জুরীর মতে এটি প্রত্যেক বয়স্ক মুসলিমের অধিকার।

আল জিম্মাহ : ক্ল্যাসিক্যাল আইন বিজ্ঞানে এ পরিভাষাটির দ্বারা বুঝায় মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং অমুসলিম নাগরিকবৃন্দের মধ্যকার একটি চুক্তিকে। এ চুক্তি মুসলিমদের নিরাপত্তা বিধান এবং অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সংরক্ষণ করেছিল। অমুসলিমগণ ইসলামী শাসন গ্রহণ করে জিযিয়া প্রদান করেছিল সেনাবাহিনীতে যাওয়ার বিকল্প হিসেবে। মুসলিম জুরীগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন যে, মুসলিম রাষ্ট্র কেবল অমুসলিমদের বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং নিয়ম-কানুনের প্রতিই সহনশীল ছিলেন না বরং তাদের জীবন ও সম্পদের সংরক্ষণের জন্যও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্বশীল ছিলেন। তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ন্যায়ই এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতোই।[৩৫]

---

৩৪. ইবন আল কাইয়্যিম, আহকাম আহল আল জিম্মা, খ. ২, পৃ. ৪৭৫-৪৯০ এবং আল শাফী, আল উম্ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩-১০৪।

৩৫. ইবন কুদামাহ, আলমুগনী, কায়রো, মাকতাবাত আল আসিন্নাহ, খ. ৯, পৃ. ২৭১-২৭২।

প্রশ্নাবলী

১। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝ? ইসলামী রাষ্ট্র ও আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (What do you mean by Islamic state? Differentiate between an Islamic state and modern state.)

২। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝ? ইসলামী রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা করো। (What do you mean by an Islamic State? Differentiate between an Islamic State and a Western Democratic State.)

৩। ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্মীয় রাষ্ট্র কি? ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্মীয় রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্ণয় কর। (What is Islamic State and Theocratic State? Differentiate Islamic State and Theocratic State.)

৪। ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র কি? ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র ও ইসলামিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (What is Fascist State? Differentiate between Fascist State and Islamic State.)

৫। মুসলিম রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কি? (What is meant by Muslim State? Differentiate between Muslim State and Non- Muslim State.)

৬। রাজতন্ত্র কি? রাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। (What is Monarchy. Differentiate Islam and Monarchy)

৭। একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। একনায়তন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (What is dictatorship. Differentiate dictatorship and Islam.)

৮। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কি? ধর্মনিরাপক্ষতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করো। (What is Secularism. Discuss about the Secularism.)

৯। সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দাও। সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথাগুলো কি কি? (Define secularism. Discuss the fundamental ideas of secularism/Secular political thought.)

১০। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Discuss the origin and development of Secularism.)

১১। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে পার্থক্যসমূহ লিখ। (Differentiate Islam and Secularism.)

১২। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণের ফলাফল আলোচনা করো। (Discuss the effects of Secularsim in Muslim world.)

১৩। সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শন কি? সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনের ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম রাষ্ট্রে এই রাষ্ট্রদর্শন গ্রহণের ফলাফল বর্ণনা করো। (What is Secular political thought? Describe the historical development of Secular political thought and the impact of its adoption in Muslim state.)

১৪। টীকা লিখ (Write short notes on) :

ক. দারুল ইসলাম Darul Islam

খ. দারুল আহাদ Darul Ahad

গ. দারুল হারব Darul Harb

ঘ. আল আমান Al Aman

ঙ. আল জিম্মাহ Al Zimmah

৪

ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান

Elements of Islamic State

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

রাষ্ট্র একটি বাস্তব রাজনৈতিক সংগঠন। আমরা সকলেই রাষ্ট্রের সদস্য। কোন মানুষই রাষ্ট্র ব্যতীত বাস করতে পারে না। এরিস্টটল যথার্থই বলেছেন যে, 'মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিত পালিত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। রাষ্ট্র বলতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যা স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকারের দ্বারা সংগঠিত। এক একটি নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ছোট ছোট রাষ্ট্র থেকে শুরু করে বড় আকারে ও জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাষ্ট্র ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটেছে।

৪.২ ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ (Elements of Islamic State)

রাষ্ট্রের গতানুগতিক সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর চারটি মৌলিক উপাদান মূর্ত হয়ে উঠে। যেমন :

১। জনসমষ্টি (Population)।

২। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Definite Territory)।

৩। সরকার (Government)।

৪। সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)।

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. আবদুল করিম জায়দান[১] রাষ্ট্রের ৫টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১। সুসংবদ্ধ জনসমাজ।

২। একটি ব্যাপক ব্যবস্থার আনুগত্য।

৩। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী।

---

১. ড. আবদুল করিম জায়দান, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৭৯, পৃ. ১২।

৪। সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন।

৬। ভাবগত স্বাতন্ত্র্য।

মহানবী (সা) মদীনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে রাষ্ট্রের উপরিউক্ত সবক'টি উপাদানই (Elements) বিদ্যমান ছিল।

জনসমষ্টি (Population) বলতে মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক ছিল মুসলিম এবং অমুসলিম অধিবাসী তথা ইহুদী-খ্রিস্টান-প্রতিমাপূজারী। তারা সকলে ইসলামী শরীয়ার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। মদীনা ছিল এ রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড (Territory)। সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল একমাত্র আল্লাহর। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মহানবী (সা) সে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের কল্যাণে ব্যবহার ও প্রয়োগে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে মহানবী (সা) যেসব চুক্তি সম্পাদন করতেন তা পরিপালন ও রক্ষা করে চলা নাগরিকদের অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। মদীনার সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ছিল সুস্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত।

৪.২.১। **জনসমষ্টি** (Population) : জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। মানুষ নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। সকল রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রেরও জনসমষ্টি একটি অপরিহার্য উপাদান। জনসমষ্টিই যদি না থাকে তবে রাষ্ট্রের প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া জনগণ হতে হবে সুসংবদ্ধ, নচেৎ কোন বিশাল সমবেত জনগণ মিলে রাষ্ট্র হয় না। যেমন : হজ্জের সময় সমবেত জনতা। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে জনসমষ্টি নেই; তাই সেখানে রাষ্ট্রও নেই, অথচ সেখানে ভূখণ্ড আছে। জনসংখ্যা কত হবে তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ এবং আদর্শের পূর্ণ অনুসারী ও ইসলামে আস্থাশীল হতে হবে। অমুসলিম জনগণও ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম শৃঙ্খলা না মেনে এর নাগরিক হতে পারে।

৪.২.২। **ভূখণ্ড** (Territory) : রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উপাদান ভূখণ্ড। ভূখণ্ড রাষ্ট্রের দেহতুল্য। কারণ রাষ্ট্রের অনুগত জনসমষ্টি পানি ও হাওয়ায় বাস করতে পারে না। সুসংবদ্ধ জনসমষ্টিই রাষ্ট্রের জন্য যথেষ্ট নয়। ভূখণ্ড না হলে রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। তবে ভূখণ্ড নির্দিষ্ট হতে হবে। যে কোন স্থানে যে কোন রাষ্ট্র হতে পারে না। আবার ভূখণ্ড স্থায়ী হতে হবে। যাযাবরেরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় বলে তাদের রাষ্ট্র ও সরকার নেই। ভূখণ্ড বলতে স্থল ভাগকে বুঝায়। ভূখণ্ড স্থলভাগ

হলেও স্থলভাগ সংলগ্ন সামগ্রিক মহীসোপান ও আকাশ সীমা ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। জনসমষ্টির সাথে সাথে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ইসলামের রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন। ভূখণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, ক্ষুদ্র হতে পারে আবার বিশাল বিস্তৃতও হতে পারে, তবে ভৌগোলিক সীমারেখা থাকতে হবে।" মোটকথা, রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান।

৪.২.৩। সরকার (Government) : রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে সরকার। সরকারের মাধ্যমেই দেশের জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। সরকার যেন রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা সংগঠিত হয়, প্রকাশিত হয় ও কার্যকরী হয়। সরকারই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। আবার জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দরকার। আর সে প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সরকার। সরকারই রাষ্ট্রের ভেতরে বাইরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। সরকার ব্যতীত আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের জন্য একটি সরকার থাকা অপরিহার্য। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে শুধু মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য হলেই ইসলামী সরকার কায়েম হয় না। সরকার মুসলমানদের দ্বারাই নির্বাচিত ও গঠিত হতে হবে। রাষ্ট্রের নেতৃত্বে তথা সরকার গঠন করতে হবে খাঁটি ঈমানদার, সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু লোকদের সমন্বয়ে। সরকার হবেন মুসলমানদের জন্য "উলিল আমরি মিনকুম," আর জনগণের এ প্রকার সরকারের প্রতি আনুগত্য করা ফরয, একটি অপরিহার্য ইবাদত।[২]

ইসলামী সরকারের আদেশ লঙ্ঘন কঠিন গুনাহ্ এবং এজন্য আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক অর্থে সরকার বলতে জনগণকে বুঝায়। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার বলতে বুঝায় আল্লাহর বিধিবিধান চালুর যন্ত্র এবং যা আল্লাহর খিলাফতের প্রতীক।

৪.২.৪। রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য
Difference between State and Government

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

---

২. ইসলামী রাষ্ট্রে দীন বিজয়ী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার দীনকে বিজয়ী রাখার কাজে নিরন্তর সক্রিয় থাকে। এজন্য এ সরকারের আনুগত্য ফরজ।

রাষ্ট্র	সরকার
১. রাষ্ট্র ৪টি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়।	১. সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান মাত্র।
২. রাষ্ট্র গঠিত হয় সকল জনসমষ্টি নিয়ে।	২. জনসমষ্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে সরকার গঠিত হয়।
৩. রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে।	৩. সরকারের ভূখণ্ড নেই।
৪. রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে।	৪. সরকারের তা নেই।
৫. রাষ্ট্র কমবেশী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।	৫. সরকার সদা পরিবর্তনশীল।
৬. রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে কেবল অনুভব করা যায়।	৬. সরকার একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান। সরকারের কার্যক্রম চর্মচোখে প্রত্যক্ষ করা যায়।
৭. প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি সংবিধান আছে, যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনা বিধৃত থাকে।	৭. সরকার রাষ্ট্রের সংবিধানের আলোকে পরিচালিত।
৮. সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ এক।	৮. বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকার লক্ষ্য করা যায়।
৯. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেয়া যায় না, দিলে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।	৯. সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ যৌক্তিক কারণে অনাস্থা জ্ঞাপন করতে পারে।
১০. রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সাথে তুলনা করা হয়।	১০. সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।
১১. রাষ্ট্র সকল নাগরিক অধিকারের উৎস।	১১. সরকার নাগরিক অধিকারের রক্ষক।

৪.৩ সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌম ক্ষমতা ছাড়া কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। অনৈসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি, গোত্র, শ্রেণী অথবা বিশেষ জনসংখ্যা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার দু'টো দিক আছে। একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব, অপরটি হচ্ছে বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের কারণে রাষ্ট্র তার অধীনস্থ জনসংখ্যা ও সংগঠনগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের কারণে একটি রাষ্ট্র অন্য সকল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে। অতএব, সার্বভৌমত্ব হচ্ছে অবিভাজ্য, হস্তান্তর অযোগ্য ও চরম ক্ষমতা। ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের উক্ত ব্যাখ্যা অচল। ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সরকার ইসলামী আইনকানুন অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবেন। সরকার স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন আইন রচনার অধিকারী নন। এ মর্মে আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা–

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ

(আলা লাহুল খালকু ওয়ালআমরু।)

অর্থ : "সতর্ক হও, তার সৃষ্টিতে তারই হুকুম চলবে।"[৩]

ইসলামী রাজনীতিতে সার্বভৌম প্রভুত্ব (Sovereignty) একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর প্রভুত্ব, একচ্ছত্র মালিকানা এবং নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা– এ উভয় দিক দিয়েই অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং অংশহীন। বিশ্ব নিখিলের প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্বের অধীন ও তাঁর অনুগত হয়ে আছে।

وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ـ

(ওয়া লাহু আসলামা মান ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়ালআরদি।)

অর্থ : "আল্লাহর এ সৃষ্টি রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই, এ ব্যাপারে কেউই তাঁর শরীক নয়।"[৪]

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ـ

(ওয়া হুয়াল কাহিরু ফাওকা ইবাদিহি।)

অর্থ : "তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।"[৫]

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ

(আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাইয়িও ওয়া হুয়াল ওয়াহিদুল কাহহারু।)

---

৩. ৭ : সূরা আল আ'রাফ : ৫৪

৪. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ৮৩

৫. ৬ : সূরা আল আন'আম : ১৮

অর্থ : "যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী।"[৬]

لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ -

(লাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিলমুলকি।)

অর্থ : "আর শাসন ক্ষমতা ও আইন রচনা এবং প্রভুত্বে নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। কোন ব্যক্তি মানুষ, পার্লামেন্ট বা কোন রাজশক্তিও এদিক দিয়ে তার অংশীদার হতে পারে না।"[৭]

কারণ কুরআনের ঘোষণা : اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ -

(ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ।)

অর্থ : প্রভুত্ব ও আইন রচনার মৌলিক এবং চূড়ান্ত অধিকার একমাত্র আল্লাহর।[৮]

لاَ يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهِ اَحَدً - (লা ইউশরিক ফী হুকমিহি আহাদুন।)

অর্থ : "আল্লাহর এ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকার নিরঙ্কুশ, অন্য কেউই তাঁর অংশীদার হতে পারে না। কাউকে তিনি এ কাজে তার শরীক করেন না।"[৯]

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লেণ্ডলী বলেন, "সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের মধ্যেই নিহিত।"

কুরআন বহু শতক পূর্বেই ঘোষণা করেছে–

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ - (ফা'আলু ললিমা ইউরীদ।)

অর্থ : "সার্বভৌম নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগে পূর্ণ স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ, যা ইচ্ছে তাই করার অধিকারী।"[১০]

তার এ স্বাধীনতাকে কেউ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। তাঁর উপরও কোনরূপ বাধ্যবাধকতা কেউই আরোপ করতে পারে না। কুরআনের ঘোষণা–

لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ -

(লা ইউসআলু আম্মা ইয়াফ'আলু ওয়াহুম ইউসআলূন।)

---

৬. ১৩ : সূরা আর রাদ : ১৬

৭. ১৭ : সূরা বনী ইসরাঈল : ১১১

৮. ৬ : সূরা আল আন'আম : ৫৭; ১২ : সূরা ইউসুফ : ৪০

৯. ১৮ : সূরা আল কাহাফ : ২৬

১০. ৮৫ সূরা আল বুরূজ : ২৬

অর্থ : "সার্বভৌম সত্তা যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে না। তিনি কারো নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। বরং সকলেই একমাত্র তাঁর সমীপেই জবাবদিহি করতে বাধ্য।"[১১]

সার্বভৌম সর্বোতভাবে–

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ - (আলমালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামু।)

অর্থ : তিনি মালিক-বাদশা। অতীব মহান পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি-নিরাপত্তাদাতা।[১২]

তিনি মহৎ মহান। মহানত্ব তাঁর একটি বিশেষ গুণ। এ গুণ বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। বস্তুত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সর্বাত্মক ও অবিভাজ্য। এটাই হচ্ছে তাওহীদের মূল কথা। একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগের জন্য এক একজনকে সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করা পরিষ্কার শিরক।

৪.৪ কুরআন মজীদে ব্যবহৃত সার্বভৌমত্ব বিষয়ক পরিভাষা

সার্বভৌমত্ব শব্দটির অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রকাশের জন্য কুরআন মজীদে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

১। **মালাকূত :** ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের নিরঙ্কুশ অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এর কারণে কুরআন মজীদে মালাকূত শব্দটি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে :

مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ - (মান বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িন।)

অর্থ : সমগ্র জিনিসের সার্বভৌমত্ব কার হাতে?[১৩]

এর জবাবে বলা হয়েছে :

فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ -

(ফা সুবহাল্লাযী বিইয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িন।)

অর্থ : মহান পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর হাতে সবকিছুরই সার্বভৌমত্ব নিহিত।"[১৪]

---

১১. ২১ : সূরা আল আম্বিয়া : ২৩
১২. ৫৯ : সূরা আল হাশর : ২৩
১৩. ২৩ : সূরা আল মুমিনুন : ৮৮
১৪. ৩৬ : সূরা ইয়াসিন : ৮৩

كَذَالِكَ نُرِىَ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ـ

(কাযালিকা নুরিয়া ইবরাহীমা মালাকূতাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি।)

অর্থ : "এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশ রাজ্য ও ভূমণ্ডলের উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌমত্বের বিস্ময়কর দৃশ্যসহ দেখিয়েছি।"[১৫]

এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা মেলে।

২। **সুলতান :** ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'মালাকূত' এর পরিবর্তে 'সুলতান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কুরআনের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে আধিপত্য আর সঠিক তাৎপর্য সার্বভৌমত্ব। ইমাম রাগিব ইসফাহানী এর ব্যাখ্যায় বলেছেন –

اَلتَّمَكُّنُ مِنَ الْقَهْرِ ـ (আত্‌তামাক্‌কুনু মিনাল কাহরি।)

অর্থ : "প্রবল পরাক্রমসহকারে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।"

অন্যত্র লিখেছেন : هُوَ التَّصْرِيْفُ بِالْاَمْرِ وَالنَّهْىِ فِى الْجُمْهُوْرِ ـ

(হুয়াত্ তাছরীফু বিলআমরি ওয়ান্‌নাহয়ি ফিলজুমহূর।)

অর্থ : "জনগণের মধ্যে আদেশ ও নিষেধের বিধান প্রয়োগ করার প্রশাসনিক ক্ষমতা পরিচালনা করা।"[১৬]

আল্লামা আলূসীর মতে, সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সত্তাই সার্বভৌম। আর 'মালাকূত' অর্থ– سُلْطَانٌ قَاهِرٌ ـ (সুলতানুন কাহির।) অর্থাৎ : "স্বীয় পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত শক্তি।"

তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নবীগণের মাধ্যমে প্রয়োগ হত। বর্তমানে কোন নবী আর আসবে না। এজন্য এ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হচ্ছেন নবীর ওয়ারিশ খলীফাগণ অর্থাৎ খিলাফতের অধিকারী শাসকবর্গ। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ থাকবে। কিন্তু এ বিভাগগুলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বহনকারী আল কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরীয়াতের বাইরে কোন কাজ করতে পারবে না।

তাই খলীফা ও শাসকবর্গ যদি ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত কোন আইন প্রণয়ন করে বা তার বিপরীত কোন আইন বা অর্ডিনেন্স জারি করে অথবা জাতির

---

১৫. ৬ : সূরা আল আন'আম : ৭৫

১৬. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী, আল মুফরাদাত।

প্রতিনিধিরা তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে এ উভয় অবস্থায়ই সে কাজটি শরীয়াতের সনদবিহীন বলে গণ্য হবে এবং সার্বভৌমত্বের অধিকারী নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা জাতির প্রতিনিধিদের বা শাসকের সার্বভৌমত্ব হলো বাস্তবায়নের সার্বভৌমত্ব (Execution Sovereignty)। তাদের আইন রচনা করে তা জারি করার মূলগতভাবেই কোন অধিকার নেই। এটিই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব।

৪.৫ ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty in the light of Islam)

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। রাষ্ট্র যে ক'টি উপাদান নিয়ে গঠিত সার্বভৌমত্ব তাদের অন্যতম। রাষ্ট্রের অসীম এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে (Supreme power) সার্বভৌমত্ব বলা হয়। সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র গঠন হতে পারে না। এছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সার্বভৌম ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে অপরাপর সামাজিক সংগঠন হতে পৃথক করেছে। সার্বভৌমত্বের বলে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োজনবোধে ক্ষমতা প্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগ (Coercive power) দ্বারা আইন প্রবর্তনের চরম অধিকারপ্রাপ্ত হয় এবং বহির্দেশীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা ছিন্ন করতে পারে। অধ্যাপক গেটেল মনে করেন যে, সার্বভৌমত্বের ধারণাটি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। এটি সকল আইনকে অনুমোদন দান করে এবং সকল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।" (The concept of Sovereignty is the basis of modern political science. It underlines the validity of all laws and determines all international relations.) সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকারের মাধ্যমে এর প্রকাশ ও প্রয়োগ ঘটে মাত্র। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছার যে প্রকাশ ও প্রয়োগ ঘটে থাকে তা-ই আইনের মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করে। অতএব, রাষ্ট্রশক্তির স্বাধীন সত্তা, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের পূর্ণ ক্ষমতাকেই সার্বভৌমত্ব বলা হয়।

৪.৬ সার্বভৌমত্বের ইতিহাস (History of Sovereignty)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব শব্দটিকে অত্যাধুনিক বলে ধরা হলেও এ শব্দটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকগণ 'চরম ক্ষমতা' অর্থে শব্দটি সবসময় ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল (৩৬৭-৩২২ খৃঃ পূ.) সার্বভৌমত্বকে

একটি চরম ক্ষমতাসীন শক্তিরূপে বর্ণনা করেন। তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা (Supreme power of the state) বলতে সার্বভৌমত্বকেই বুঝিয়েছেন। রোমান ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। লাতিন শব্দ Superanus (যার ইংরেজি প্রতিশব্দ sovereignty) হতে শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ হলো চরম ক্ষমতা।

সর্বপ্রথম আল কুরআনই সার্বভৌমত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে একে রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে চিত্রিত করে। আয়াতুল কুরসী,[১৭] সূরা আল হাশরের শেষ তিন আয়াতসহ[১৮] কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটি ছিল দুনিয়ার ইতিহাসের প্রথম গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র। প্রকৃত অর্থে তখন থেকেই সার্বভৌমত্বের যথার্থ ধারণার প্রসার ঘটতে থাকে। মধ্যযুগে ইসলামিক অর্থে অথবা আধুনিক অর্থে কেবল রাষ্ট্র ছিল না। তখনকার সামন্ত ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভুরাই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন এবং প্রজারাও তাদের নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে চলতেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসের এ অধ্যায়ে ইউরোপ ছিল হাজারো সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত। আবার প্রায়ই তা ছিল শাসক ও পোপের কর্তৃত্ব দ্বন্দ্বের ধূলিঝড়ে অশান্ত। খ্রিস্টিয় নীতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা ছিল মূলত চার্চ ও শাসকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী চলেছে এ অন্তর্দ্বন্দ্ব– কখনও ধীরগতিতে আবার তীব্রগতিতে কিন্তু অবিরত এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায়।

৪.৭ সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা (Various Definitions of sovereignty)

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি লেখক জীন বদিন (Jean Bodin, ১৫৩০-১৫৯৬) এর মতে, "সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায় নাগরিক ও প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের আইনের বন্ধনমুক্ত চরম ক্ষমতা।" (The supreme power of the state over citizens and subjects unrestrained by law.)[১৯] তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, বিধিসঙ্গত সার্বভৌম সত্তা মাত্রই প্রকৃতির বিধান (Law of

১৭. ২ : সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৫৫। এ আয়াতটিই আয়াতুল কুরসী বা কুরসীর আয়াত নামে সুপরিচিত এবং ব্যাপকভাবে পঠিত।

১৮. ৫৯ : সূরা আল হাশর, আয়াত নং ২২-২৪

১৯. Quoted in J.W. Garner. Political Science and Government. পৃ. ১৪৬।

Nature) ও স্রষ্টা প্রদত্ত বিধানের (Revealed law) অধীন। তাঁর সংজ্ঞা অনুসারে সার্বভৌমত্ব এক অথবা বহু হাতেই অবস্থান করুক না কেন এটা অসীম ক্ষমতা যা নাগরিক ও অধীনস্থ সকলের উপরই প্রযোজ্য, তা কোন প্রকার আইনের বন্ধনে শৃঙ্খলিত নয়।

হল্যান্ডের হুগো গ্রোসিয়াস বলেন যে, "সে সত্তাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব যার কার্যাবলী অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং অন্য কারো ইচ্ছা যার কাজকে নাকচ করে দিতে পারে না।" রুশোর (১৭৪২-১৮৩২) মতে, "সার্বভৌম শক্তি সর্বোচ্চ এবং অবারিত ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু বিশেষ কোন ব্যক্তি বা শাসকের হাতে তা সীমিত থাকতে পারে না।" রুশো সার্বভৌমত্বকে অবিভাজ্য একক এবং অসীম বলেছেন। এইচ.জে. টোজার (H.J.Tozer) রুশোর সার্বভৌমত্বকে 'অদূষণীয়, অবিচ্ছেদ্য, প্রতিনিধিত্বের অযোগ্য, অবিভাজ্য ও অবিনশ্বর' (Incorruptible, inalienable, Unrepresentable, indivisible and indestrvectible) বলে বর্ণনা করেছেন।[২০]

উপযোগীবাদী বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) বলেন যে, সার্বভৌম শক্তি আইন দ্বারা সীমিত না হলেও নীতি ধর্ম দ্বারা সীমিত। সমাজে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যখন সার্বভৌম শাসনের প্রতিরোধ করা নীতি বিরুদ্ধ হবে না। রাষ্ট্র ব্যাপক গণমানুষের কল্যাণে শাসনকার্য পরিচালনা না করলে নাগরিকগণ ন্যায়ের স্বার্থেই একে প্রতিরোধ করতে পারে। একদিকে সার্বভৌম শক্তি যেমন সকলের নিয়মিত আনুগত্য লাভের অধিকারী, অপরদিকে এর যাবতীয় নির্দেশ ও আদেশ আইনরূপে বিবেচ্য।

অস্টিনের মতে, "সার্বভৌম শক্তি অসীম এবং তা অন্য কারো আদেশমত কাজ করে না।" ব্লাকস্টোন (Blackstone) সার্বভৌমত্বকে সর্বোচ্চ, অপ্রতিরোধ্য, চূড়ান্ত ও অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন। (Supreme power means the supreme, irresistible, absolute and uncontrolled authority.)[২১] অধ্যাপক সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong) মনে করেন যে, "শব্দগত অর্থে সার্বভৌমিকতা বলতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝালেও রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে এ শব্দের ব্যবহারে বিশেষ এক শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ আইন বলবৎ করার ক্ষমতাকে বুঝায়।" আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠাতা গ্রোটিয়াস (Grotius)

২০. উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আয়েন উদ্দীন, রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, মৌসুমী পাবলিকেশন্স, সিপাইপাড়া, রাজশাহী, জুন ২০০৫, পৃ. ৪৪২।

২১. Blackstone. Commentaries on the Laws of England. পৃ. ১৪।

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, "এটি ঐ সত্তার হাতে ন্যস্ত চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, যার কোন কার্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং যার ইচ্ছা কারোর মতের অপেক্ষা রাখে না।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডব্লিউ. এফ. উইলোবী (W. F. Willoughby)-এর মতে, "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব।"

অধ্যাপক বার্জেস (Burgess)-এর মতে, "সার্বভৌমত্ব হচ্ছে ব্যক্তি, প্রজা ও প্রজাদের অন্যান্য সংঘের উপর মৌলিক চূড়ান্ত ও অপরিসীম ক্ষমতা।" (Sovereignty is the original, absolute power over the individual subject and over all associations of subjects.)[২২] জেলিনেক (Jellineck) লিখেছেন, "সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সে গুণ যার মাধ্যমে রাষ্ট্র স্বীয় ইচ্ছা ব্যতীত আইনগতভাবে বাধ্য থাকতে পারে না বা নিজ ব্যতীত অপর কোন শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।" ফরাসি লেখক ডুগুইট (Duguit)-এর মতে, "ফরাসি মতবাদ অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের আদেশ দানের ক্ষমতা; এটা রাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত জাতির ইচ্ছাস্বরূপ; এটা রাষ্ট্রাভ্যন্তরে সকল ব্যক্তিকে নিঃশর্ত আদেশ প্রদানের অধিকার।" (The commanding power of the state. It is the will of the nation organised in the state; it is the right to give unconditional orders to all individuals in the territory of the state.)[২৩]

৪.৮ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty)

সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. সার্বজনীনতা (Universality) : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন কোন ব্যক্তি বা সংঘ থাকতে পারে না, যা সার্বভৌম শক্তির অধীন নহে। সার্বজনীনতা সার্বভৌমত্বের সীমাহীনতার লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি বা সংঘের উপর সার্বভৌমিকতার ইখতিয়ার থাকলেও তা আইনের গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনগত পদ্ধতি ছাড়া সার্বভৌম শক্তি অন্যভাবে কোন ব্যক্তি বা সংঘের উপর নিজস্ব অবাধ ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে না।

---

২২. Burges, Political Science and Constitutional Law. Vol. 1. পৃ. ৫২।

২৩. Quoted in J. W. Garner. Political Science and Government. পৃ. ১৪৭।

২. পূর্ণতা বা চরমতা বা পরমতা (Absoluteness) : রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা পূর্ণ, মৌলিক, চরম, নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সার্বভৌম শক্তির চরম ক্ষমতা। ইহা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সার্বভৌমিকতার ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইনানুগ আর কোন শক্তি থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের আইন অমান্য করলে রাষ্ট্র অপরাধীর শাস্তি বিধান করে। এমনকি গুরুতর অপরাধের কারণে রাষ্ট্র অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। স্যার হেনরী মেইনের মতে, নৈতিক প্রভাব প্রতিনিয়তই সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করছে। ব্লুন্টসলি বলেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বাহ্যিক দিক দিয়ে অপরাপর রাষ্ট্রের অধিকার এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে এর নিজস্ব প্রকৃতি ও ব্যক্তিসমূহের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্রষ্টার চিরন্তন বিধান এবং ইতিহাসের ঘটনার নিকট রাষ্ট্র চিরদিনই দায়িত্বশীল থাকবে। বার্কারের মতে, সার্বভৌমিকতা হল, 'আইনসঙ্গতভাবে প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করার আইনানুমোদিত ক্ষমতা' (A legal power of setting finally legal questions in a legal way.) তাই ইহা আইনের গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ। আবার অনেকের মতে সার্বভৌমিকতা ব্যবহারিক জীবনেও সীমাবদ্ধ।

৩. অবিভাজ্যতা (Indivisibility) : সার্বভৌমিকতাকে কোন সময় বিভক্ত করা যায় না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিভাজন করে বিভিন্ন সংগঠনের বা ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা যায় না। তাতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একক ও অবিভাজ্য। একমাত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী কর্তৃপক্ষের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। দু' বা ততোধিক কর্তৃপক্ষের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকার পরিণতি অনিবার্য সংঘাত। গেটেল বলেছেন, সার্বভৌমত্বের বিভাজনের ধারণাই স্ববিরোধী। তার মতে, সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন সম্ভবপর সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রে কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্র এবং তার সার্বভৌম ক্ষমতা একক, সেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা ন্যস্ত হতে পারে না।[২৪] সার্বভৌমত্বের অবিভাজ্যতা সম্পর্কে ক্যালহোন বলেছেন, সার্বভৌমত্ব একটি পূর্ণ জিনিস। তাকে ধ্বংস না করে বিভক্ত করা যায় না। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ বিভিন্ন সরকারী শাখার মাধ্যমে সাধিত হতে পারে এবং এতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব খর্ব হয় না।

৪. স্থায়িত্ব বা চিরন্তনতা (Permanence) : সার্বভৌমত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর স্থায়িত্ব বা চিরন্তনতা। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা চিরন্তন ও স্থায়ী।

---

২৪. R.G. Gettell, Political Science, পৃ. ১২১।

সার্বভৌমিকতার অনুপস্থিতির অর্থ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাহীনতা। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সাথে সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব বিদ্যমান। সার্বভৌম শক্তি পরিচালকগণের পরিবর্তন ঘটতে পারে; কিন্তু তাতে সার্বভৌমিকতা বিলুপ্ত হয় না। এক সরকারের পরিবর্তে আর এক সরকার নির্বাচিত হলে তারা সার্বভৌম ক্ষমতা চর্চা করবে। তাই সার্বভৌম ক্ষমতা চিরন্তন ও স্থায়ী।

৫. হস্তান্তর অযোগ্যতা অবিচ্ছেদ্যতা (Inalienability) : সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় না। এ ক্ষমতা হস্তান্তরের অযোগ্য। অন্য কথায় সার্বভৌম ক্ষমতা অন্য কারো হাতে দেয়া যায় না। এর উপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কোন মানুষের জীবন প্রাণ যেমন অন্যকে দান করা যায় না, তেমনি রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ সার্বভৌমত্বকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির হাতে হস্তান্তর করা যায় না। সার্বভৌম শক্তি প্রাণীর অন্তর্নিহিত শক্তির মতো আপন গতিধারায় বিকশিত। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌমত্বের বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটে। রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকাই হলো রাষ্ট্রের স্থিতি। যুদ্ধ বিগ্রহ বা সন্ধি চুক্তির কারণে রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডের কোন অংশের মালিকানা ত্যাগ করলে সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ বা হস্তান্তর করতে পারে। সার্বভৌম ক্ষমতার অনুপস্থিতির অর্থ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের হৃৎস্পন্দন।

৬. এককত্ব (Exclusiveness) : সার্বভৌম ক্ষমতার অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এককত্ব। এ ক্ষমতার সাথে কোন প্রতিযোগিতা চলে না। যৌক্তিক উপায়ে জনগণের আনুগত্য লাভকারী একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রে বিদ্যমান থাকে। এই ক্ষমতাই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিকের আনুগত্য দাবী করে। একটি রাষ্ট্রে একাধিক সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্বের অর্থ রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিনষ্ট হওয়া। তাই একই রাষ্ট্রে একাধিক সার্বভৌম ক্ষমতা বাঞ্ছনীয় নহে। একক সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে রাষ্ট্রের সংহতি, ঐক্য ও স্থায়িত্ব বিনষ্ট হয়।

৭. ব্যাপকতা (Comprehensiveness) : সার্বভৌমত্বের আর একট বৈশিষ্ট্য হল সর্বব্যাপকতা। ব্যাপকতার অর্থ হচ্ছে, সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের সর্বত্রই বিরাজমান। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। সার্বভৌম শক্তি কেবল স্থলেই তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে না, জলে অর্থাৎ সমুদ্র সীমা, আকাশ সীমা সর্বত্রই এই ক্ষমতার ব্যাপকতা বিরাজমান।

সার্বভৌমত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ রাষ্ট্রকে অনন্য রূপ দান করেছে। সার্বভৌমিকতার অর্থই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা। স্বাধীন রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের অনন্য দীপ্তি বিরাজ করে। এই দীপ্তি রাষ্ট্রকে অন্দরে-বাইরে মহীয়ান ও বলীয়ান করে তোলে।

৪.৯ সার্বভৌমত্বের অবস্থান নির্ণয় (Determine Location of Sovereignty)

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের কোথায় অথবা কাদের হাতে অবস্থান করে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া যায় না। কারণ শব্দটি বিশেষভাবে ভাবাত্মক (Abstract)। তবে সাধারণত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে রাজা, অভিজাততন্ত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠী, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনসাধারণ, সমাজতন্ত্রে কমিউনিস্ট পার্টির গুটিকতক কর্তা ব্যক্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী।

৪.১০ সার্বভৌমত্বের ইসলামী সংজ্ঞা (Islamic Definition of Sovereignty)

ইসলাম কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না। গতানুগতিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি, গোত্র, শ্রেণী অথবা বিশেষ জনসংখ্যা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের সকল নাগরিককেই বিনা দ্বিধায় সার্বভৌম শক্তির আদেশ পালন করতে হয়, তার সিদ্ধান্তকে চরম সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে হয়। এহেন অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কোন ব্যক্তির হাতে এলে তা দ্বারা বৃহত্তর মানব সমাজের যথার্থ কল্যাণ হতে পারে না। কেননা মানুষ একদিকে যেমন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নয় অন্যদিকে তেমনি সে স্বার্থপরতা, অর্থলোভ, ক্ষমতা ও প্রাধান্য লিপ্সা ইত্যাদি মানবীয় দুর্বলতার অধীন। এমতাবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত হলে সে তার সীমাবদ্ধতার দরুন বা অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের মানসে স্বার্থসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি প্রবর্তন করবে। যদিও কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীকে সার্বভৌম শক্তি বলে মেনে নেয়া হয় তথাপিও তার বা তাদের মধ্যে সার্বভৌম শক্তির গুণাবলী থাকতে পারে না, কারণ জন্মগতভাবে সে/তারা এসব গুণ থেকে বঞ্চিত। অমরত্ব, চিরঞ্জীবতা, চিরস্থায়িত্ব, ব্যাপকতা, অবিভাজ্যতা, নিখুঁত জ্ঞানের অধিকার, ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে অবস্থান ইত্যাদি গুণ মানুষের নেই, থাকতে পারে না। আর নেই বলেই তার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হলে তা মানব সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বিপরীতে ক্ষুদ্র স্বার্থে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রধান মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। মানুষের উপর হুকুমত, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করার অধিকার বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব উৎখাতের মধ্যেই রয়েছে গণমানুষের চরম আযাদী। মানুষ একমাত্র আল্লাহর অধীন। কোন ব্যক্তি মানুষের উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করার অধিকারী নয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব

একমাত্র আল্লাহরই। আইন রচনা করার অধিকারও তাঁরই। আর কুরআন বলছে, বস্তুত সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যই নয়। তাঁর নির্দেশ এই যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করা যাবে না।[২৫] আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্বে কাউকেও অংশীদাররূপে গ্রহণ করেন না।[২৬] আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহর আর তিনি ভিন্ন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী আর কেউ নেই।[২৭]

কাজেই দেখা যায় যে, ইসলামী বিধানানুযায়ী আল্লাহ সার্বভৌম শক্তির মালিক। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায় আল্লাহর চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে আল্লাহ তো মানুষের ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে; কাজেই পার্থিব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কার শরণাপন্ন হওয়া যাবে? এর জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য সকল আইন বিধান আল কুরআনের মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন, সেই জীবন বিধানকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জীবন ও যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই আল কুরআনের অনুশাসন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য লোকায়ত শাসনের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার অর্থ হবে যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব থাকবে তারা হবেন আল্লাহর বিধানের অধীন এবং সেই সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহর রাসূলগণ এসেছেন।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। রাসূল (সা) ছিলেন সে আইনের বাস্তবায়নকারী। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : হে নবী, আমার বান্দাহদের উপর আপনার কোন আধিপত্য নেই, আপনার রবের আধিপত্যই যথেষ্ট।[২৮] মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনে মহানবী (সা) আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রয়োগকারী ছিলেন মাত্র। আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তিনি ছিলেন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। বস্তুত মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহ ছিলেন আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) অধিকারী আর মহানবী (সা) ছিলেন কার্যত সার্বভৌমত্বের (Real Sovereignty) বা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের (Political Sovereignty)

---

২৫. ১২ : সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪০

২৬. ১৮ : সূরা আল কাহাফ, আয়াত : ২৬

২৭. ২ : সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১০৭

২৮. ১৭ : সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৬৫

অধিকারী। গতানুগতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং কার্যত সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য মাঝে মাঝে দেখান হয়। তবে এটা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের এ দু'দিক বা রূপ দু'টি ভিন্ন বস্তু নয়। এটি যেন ছবির দু'টি দিক, যেন এপিঠ ওপিঠ এবং এ দু'য়ের সমন্বয়েই ইসলামী সার্বভৌমত্বের আসল রূপ ফুটে উঠে।

ইসলামে আইনগত সার্বভৌম (Legal Sovereignty) হচ্ছেন আল্লাহ এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান যা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত নির্দেশ বা আইনের আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত আইন দেশের বিচারালয়ে স্বীকৃত হয়ে কার্যকর হয়। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানসহ প্রশাসনের সবাই আল্লাহর আইনের অধীন। রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর আইনের বরখেলাফ কিছু করলে বিচারালয় তাকে যে কোন শাস্তি দিতে পারে। বিচারক আল্লাহর আইনের প্রতিনিধি (খলীফা) হিসেবেই বিচার করবেন। বস্তুতঃ এটাই আইনের শাসন, যা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। কার্যত সার্বভৌম (Political Sovereignty) মূলত আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়নের কার্যই সম্পাদন করবেন। আইনগত সার্বভৌমের প্রদত্ত আইনকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করে রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনকল্যাণকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মহানবী (সা)-এর অবর্তমানে সৎ ও ঈমানদার লোকদের প্রতিনিধিত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিলে রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হবে তাঁরই বিধানসমূহ বাস্তবে কার্যকর করা। অন্য কথায়, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র হবে আল্লাহর বিধানকে কার্যকরকরণের যন্ত্র মাত্র। এ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হবে আল্লাহর। আল্লাহর এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা ইসলামী শরীয়াহর প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই বিমূর্ত হয়ে উঠে।

৪.১১ ইসলামী সার্বভৌমত্ব (Islamic Sovereignty)

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম মৌলনীতি হচ্ছে মালিকিয়াত ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। ইসলামী সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায় আল্লাহর নিরঙ্কুশ, চূড়ান্ত, চরম, অসম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখলে দৃশ্যত ইসলাম বিবৃত সার্বভৌমত্বের সাথে বর্তমান পাশ্চাত্য প্রচলিত সার্বভৌমত্বের ধারণার কোন মিল নেই। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ সার্বভৌমত্বের দাবীদার বা অংশীদার হতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র মানুষের অন্যায় আধিপত্যের বিরোধী।

খ্যাতনামা পাশ্চাত্য আইনবিশারদ ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জন অস্টিন (John Austin) সার্বভৌমত্বের যে বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সে অনুসারে সার্বভৌম

ক্ষমতা এমন একটি উচ্চ কর্তৃপক্ষ যা সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকাংশ সদস্যের কাছ থেকে স্বভাবগত আনুগত্য লাভ করে এবং যার নির্দেশই আইন। তিনি বলেন, "যদি কোন সমাজে কোন নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি অপর কোন উর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে কিন্তু সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে আসতে থাকে, তবে সে সমাজে ঐ নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই সার্বভৌম এবং এরূপ সমাজ একাধারে রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।" (If a determinate human superior, not in a habit of obedience to like superior receives habitual obedience from the bulk of given society, that determinate superior is the sovereign in that society and the society including the determinate suporior is a society, political and independent.)

অস্টিন প্রদত্ত উপরিউক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে সার্বভৌমত্বের কতিপয় বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়ে উঠে। যেমন :

প্রথমত. প্রত্যেক স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে পরিচালিত হয়; যিনি বা যারা সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

দ্বিতীয়ত. অস্টিনের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ স্বভাবতই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এ ব্যক্তিবর্গ কারো আনুগত্য স্বীকার করে না এবং কারো ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হন না। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও অসীম।

তৃতীয়ত. সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ জনসাধারণের মতো অনির্দিষ্ট বা সাধারণের ইচ্ছার মতো নৈর্ব্যক্তিক নন।

চতুর্থত. অস্টিনের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য। রাষ্ট্রের অধীন সকল ব্যক্তি বা বিষয়ের উপর এর ইখতিয়ার বিরাজমান। এ ইখতিয়ার আবার অবিভাজ্য অর্থাৎ একে বিভক্ত করা যায় না। এটাকে বিভক্ত করলে সার্বভৌমত্ব আর সর্বোপরি ব্যাপ্ত থাকে না।

পঞ্চমত. জনগণের সহজাত আনুগত্যই সার্বভৌমত্বের মানদণ্ড। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রতি অধিকাংশ জনগণই সহজাত আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি বা তারাই সার্বভৌম। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, সার্বভৌম শক্তির প্রতি জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আনুগত্য স্বীকার করবে, সাময়িকভাবে নয়।

অস্টিনের সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত মতবাদ মূলত রাষ্ট্রের চরম, চূড়ান্ত, অবিভাজ্য এবং

অপ্রতিহত ক্ষমতারই পরিচায়ক। তাঁর মতে, কোন নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত আধার। অস্টিন কথিত এ সার্বভৌম (Sovereign) স্পষ্টতই একটি মানবীয় সংগঠন এবং এর অস্তিত্ব ও ক্ষমতাও মানবিক খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে, ইসলামের তত্ত্বানুসারে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ এবং ফলত সকল আইনই আল্লাহ্র নির্দেশিত কাঠামোর রচিত হওয়া বাধ্যতামূলক। ইসলামী রাষ্ট্রে গণনির্বাচিত প্রতিনিধি তথা রাষ্ট্রপ্রধানের (খলীফা) হাতে শাসনভার থাকে এবং রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের নীতি অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশিত পন্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অন্য কথায়, রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োগ করে থাকেন। বস্তুত সার্বভৌমত্বকে আল্লাহ্র কর্তৃত্বে ন্যস্ত ঘোষণা করে ইসলাম মানবিক উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র তাই প্রচলিত গতানুগতিক অর্থে সার্বভৌম নয়, ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব বলে অভিহিত। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মূলমন্ত্র হিসেবেই প্রতিনিধিত্বের নীতি কাজ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন পরিচালক শুধুমাত্র আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবেই রাষ্ট্র শাসনের অধিকার লাভ করে এবং তা গণমানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক এ মহান উদ্দেশ্য সাধনে প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান করে।

৪.১২ ইসলামী সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic Sovereignty)

কুরআনের বর্ণনানুযায়ী[২৯] সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃতি ও স্বরূপ আলোচনা করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। নিচে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১। **স্থায়িত্ব (Permanence) :** ইসলামী সার্বভৌমত্বের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর স্থায়িত্ব। আয়াতুল কুরসীতে এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে 'আল হাইয়্যু'–'চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ চিরঞ্জীব যার জীবনের শুরুও নেই শেষও নেই। তিনি চিরন্তন, অনাদি এবং চিরস্থায়ী। কোন ব্যক্তি বা লোকায়ত কোন শাসক এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে না। কারণ এ

২৯. আয়াতুল কুরসী বা কুরসীর আয়াতে সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। ২ : সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৫৫

ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অযোগ্য, অক্ষম। কাজেই সে সার্বভৌমত্বের দাবীদার হতেই পারে না।

২। **চির প্রতিষ্ঠিত (Al Quayum-Endlessly Established) :** এ প্রসঙ্গে আয়াতুল কুরসীতে 'আল কাইয়্যুম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ শুধু চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তাই নন তিনি ক্ষমতায় চির প্রতিষ্ঠিত। মুহূর্তের জন্যও তিনি সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রয়োগ কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন না। এ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও মানুষ একেবারেই অযোগ্য।

৩। **সর্বব্যাপকতা/সার্বজনীনতা (Universality) :** ইসলামী সার্বভৌমত্বের অপর বৈশিষ্ট্য হলো এর সর্বব্যাপকতা বা সার্বজনীনতা। সার্বজনীনতা ইসলামী সার্বভৌমত্বের অসীমতার পরিচায়ক। সৃষ্টিজগতের এমন একটি প্রাণীও নেই, থাকতে পারে না যারা তার সার্বভৌম শক্তির অধীন নয়। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও মাবুদ আল্লাহ্। তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি প্রাণী আল্লাহ্র এ সার্বভৌম শক্তির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। এর গতি সৃষ্টি জগতের সর্বস্তরে অবাধ ও অপ্রতিহত। একথা বুঝানোর জন্যই আয়াতুল কুরসীতে বলা হয়েছে–

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -

উচ্চারণ : লাহূ মা ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ।

অর্থ : আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সবকিছুই তার। অন্য কথায়, সবকিছুর উপর তাঁরই সর্বময় ক্ষমতা বিরাজমান। তাঁর ক্ষমতা কোন পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।[৩০]

৪। **মৌলিকতা, চরমতা ও সীমাহীনতা (Original, Absolute and Unlimited) :** আয়াতুল কুরসীর বর্ণনা হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতা মৌলিক, চরম ও সীমাহীন। বিধান দেয়ার ক্ষমতা সার্বভৌম শক্তির চরম ক্ষমতা। এ ক্ষমতা কোন কিছুর দ্বারা সীমিত নয়। সৃষ্টি জগতে এর সমকক্ষ বা এর উর্ধ্বে কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না। সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ্ চূড়ান্ত ক্ষমতার আধার। তিনি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ নিরঙ্কুশভাবে আসমান ও যমীনের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে সক্রিয় রয়েছে। অন্য কথায়, আইনগত ও বিধিগত সার্বভৌম সত্তা হচ্ছেন আল্লাহ্।

---

৩০. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৫; ২২ : সূরা আল হজ্জ : ৬৪

৫। অবিভাজ্যতা ও একত্ব (**Indivisibility and Unity**) : ইসলামী সার্বভৌমত্ব একক ও অবিভাজ্য। এ সার্বভৌমত্বকে বিভক্ত করা যায় না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর চূড়ান্ত ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রেই কেন্দ্রীভূত এবং এর কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছেন আল্লাহ। যদি দু' বা ততোধিক ক্ষেত্রে তা ন্যস্ত হত তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধ ঘটত। চরম ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হত। এজন্যই আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সম্পূর্ণ বলা হয়। এর বিভাজনের চিন্তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নাফরমানির শামিল। আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা কোন ফেরেশতাকে বা কোন নবীকে বা কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে কিংবা কোন পীর, সূফী, দরবেশকেও ভাগ করে দেননি। একথাই কুরআনে বলা হয়েছে–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ -

উচ্চারণ : মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী।

অর্থ : কে আছে এমন (স্বীয় ক্ষমতা, অধিকার বলে) আল্লাহর নিকট কোন সুপারিশ করতে পারে তার অনুমতি ছাড়া।[৩১]

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ -

উচ্চারণ : ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস[৩২] সামাওয়াতি ওয়াল আরদি।

অর্থ : তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার আসন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত।[৩৩] তাঁর এ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ ও সংরক্ষণের তিনি হিমশিম খান না, ক্লান্ত শ্রান্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না–

وَلَا يَؤُدُهٗ حِفْظُهُمَا -

উচ্চারণ : 'ওয়া লা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা'।

অর্থ : আসমান ও যমীনের প্রতিটি বিষয়কে সংরক্ষণ, ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি দানে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন না, বা এসব তাকে ক্লান্ত করতে পারে না।[৩৪] কারণ তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।

---

৩১. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৫

৩২. মূল শব্দ কুরসী। এ শব্দ সাধারণত রাষ্ট্রশক্তি ও ক্ষমতার রূপক বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩৩. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৫

৩৪. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৫

وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظِيمِ -

উচ্চারণ : ওয়া হুয়াল আলীয়্যুল 'আযীম।

অর্থ : তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদবান।[৩৫]

৬। **অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতা (Unlimited Knowledge and farsightedness) :** ইসলামী সার্বভৌমত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ সার্বভৌমত্বের দাবীদার অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী। সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক বিধায় তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞানীও। বিশ্বের প্রশাসন পরিচালনা কার্যে খবরাখবর পাবার জন্য তিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ -

উচ্চারণ : 'ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম।'

অর্থ : "তিনি স্বয়ং সৃষ্টি জগতের সবার অগ্রপশ্চাতের বা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় খবরাখবর সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।"[৩৬]

বলা হচ্ছে–

وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ -

উচ্চারণ : 'ওয়া লা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শায়া।'

অর্থ : "তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কিছুই মানুষের জ্ঞান সীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না। তবে আল্লাহ্ তাঁর অসীম জ্ঞান থেকে মানুষকে যা কিছু দান করেছেন, মানুষ শুধু তাই জানে এর বেশি নয়।"[৩৭]

৭। **হস্তান্তর অযোগ্যতা (Inalienability) :** সার্বভৌম ক্ষমতাকে হস্তান্তর করা যায় না। এটা হস্তান্তর অযোগ্য। সার্বভৌমত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ এবং এর উপরই ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। মানুষ যেমন তার প্রাণ অপরকে দান করে বেঁচে থাকতে পারে না, বৃক্ষ যেমন তার পল্লব জন্মাবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করে টিকতে পারে না, নদী যেমন তার উচ্ছল পানি রাশির গতি বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করে তার যথার্থ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না। এ সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করার অর্থই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। সুতরাং আল্লাহর সার্বভৌমত; ইসলামী রাষ্ট্রের চিৎশক্তি।

---

৩৫. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৫

৩৬. ২১ : সূরা আল আম্বিয়া : ২৮; ২২ : সূরা আল হজ্জ : ৭৬

৩৭. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৫

প্রশ্নাবলী

১। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদানগুলো আলোচনা করো। (What is meant by Islamic state? Discuss the elements of Islamic state.)

২। সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দাও। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো। (Define Sovereignty. Discuss its characteristics.)

৩। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো এবং সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ইসলামী মতবাদ পর্যালোচনা করো। (Describe the characteristies of Sovereignty and make a review of the Islamic theory of Sovereignty.)

৪। সার্বভৌমত্ব কি? ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। (What is sovereignty? Explain the scope of sovereignty in the light of Islam.)

৫। ইসলামী সার্বভৌমত্ব কি? ইসলামী সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। (What is Islamic sovereignty? Discuss the characteristics of Islamic sovereignty.)

৬। সংক্ষেপে টীকা লিখ (Write short notes on) :

ক. জনসমষ্টি (Population)

খ. সরকার (Government)

গ. রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য (Difference between State and Government)

ঘ. সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

ঙ. আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty)

চ. রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty)

৫

ইসলামী রাষ্ট্রের সংগঠন ও বিভাগ

Organisation and Departments of Islamic State

৫.১ ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী (Formation of Islamic State)

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই গঠন প্রণালী রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী নিম্নরূপ :

১। শাসন বিভাগ (The Executive)

২। আইন বিভাগ বা মজলিসে শূরা (The Legislature/ Majlis-E-Shura)

৩। বিচার বিভাগ (The Judiciary)

আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হলো সরকার। সরকার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সরকার তার কার্যাবলী বাস্তবায়ন করে থাকে উপরোক্ত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে।

৫.২ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ (The Executive of Islamic State)

যে বিভাগ ইসলামী শরীয়া আইনকে বলবৎ করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। ব্যাপক অর্থে ইসলামী আইন বলবৎকরণে নিযুক্ত রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী বা রাষ্ট্রপ্রধান (Chief Executive/Chief of Islamic State) থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপরই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। বস্তুত ইসলামী সরকারের নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ হচ্ছে 'কর্তৃত্বের নিউক্লিয়াস' এবং সরকারের সক্রিয় শক্তি (The Executive branch is the nucleus of authority and the active force in the government)[১] অন্য কথায় আইন বলবৎকরণে নিযুক্ত রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী (Chief Executive) থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. আবদুর রহমান আবদুল কাদির কুর্দী, 'The Islamic State : A study based on the Islamic Holy Constitution.', লন্ডন, ম্যানসেল, ১৯৮৪, পৃ. ৯০।

৫.৩ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান (Chief/Heads of Islamic State)

মুসলিম সমাজের সামষ্টিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য একজন শাসক নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর একজন রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা শরীয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের আলম ফরয প্রমাণ করছে। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাকে 'উলিল আমর' ও 'উমারা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তিনি হবেন নির্বাহী বিভাগের প্রধান বা আমীর, তিনি হবেন সর্বাধিক সম্মানিত এবং সর্বাধিক তাকওয়াবান ও যোগ্য। তিনি ন্যায়বান ব্যক্তিদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানে ৩১ জন প্রখ্যাত উলামার সমবায়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান নির্বাহী হবেন, 'সর্বসময়ে একজন পুরুষ, যার ধর্মপরায়ণতা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং স্বচ্ছ ও সার্বিক বিচার ক্ষমতার বিষয়ে জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের গভীর আস্থা থাকবে।[২]

মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর সর্বপ্রথম কাজ হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)কে খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করে, রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন। আল্লামা জুররানী বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের পূর্ণতম ব্যবস্থা এবং দীন ইসলামের সর্বোচ্চ লক্ষ্যের সর্বাধিক মাত্রার বাস্তবায়ন। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় খাদেম। জনগণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ ও মঙ্গলসাধনই তার বড় দায়িত্ব। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য যার মধ্যে বিভিন্ন জরুরি গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হতে পারেন। কিছু বিশেষ গুণাবলি থাকা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য জরুরি শর্ত। সে শর্তানুরূপ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান না হলে জাতীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিপথগামী হবে, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা অনিবার্যভাবে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।

৫.৩.১ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের বৈশিষ্ট্য/গুণাবলী
Characteristics of Head of Islamic State

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের বৈশিষ্ট্য/গুণাবলি নিচে আলোচনা করা হলো :

১। **ঈমান** : দীন ইসলামের প্রতি দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান হচ্ছে সর্বপ্রথম জরুরি বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ তাঁর দীন মানুষের সার্বিক জীবনের জন্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে নাযিল সম্পন্ন করেছেন। আর ইসলামই হচ্ছে

২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, The Islamic Law and Constitution, পৃ. ৩৩৪।

মানুষের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। আর রাষ্ট্রপ্রধানকে তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে এ বিধানকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। দীন ইসলামকেই সর্বোত্তম নির্ভুল, মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধানকারী ও কল্যাণদানকারী বিধানরূপে ঐকান্তিক ঈমান থাকতে হবে। এ শর্তের কারণে কোন কাফের বা খোদাদ্রোহী ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ লাভ করতে পারে না। বিবেক বুদ্ধির দিক দিয়েও রাষ্টপ্রধানের ঈমানদার হওয়ার শর্ত অত্যন্ত জরুরি। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শবাদী, আদর্শভিত্তিক ও আদর্শ অনুসারী রাষ্ট্র। যে লোক সে আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী নয়, তার দ্বারা সে আদর্শের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। এজন্য ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসী নয় এমন কোন ব্যক্তির মুসলিম জনগণের শাসক হওয়ার যোগ্যতা নেই, অধিকার নেই। কুরআন বলছে আল্লাহ তা'আলা মুমিন লোকদের উপর কাফের লোকদের কর্তৃত্ব করার কোন পথ রাখেননি। (৪ : সূরা আন নিসা : ১৪১) আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ বলেন, এটি সুস্পষ্ট যে কেবলমাত্র একজন মানুষ, যিনি ঐশী উৎসে বিশ্বাসী তথা একজন ঈদানদার মুসলিম শুধু তাঁকেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান করা যেতে পরে। (It is obvious that only a person who believes in the divine origin of that law in a word, a Muslim- may be entrusted with the office of head of the State.)[৩]

২। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ উত্তমভাবে পালনের যোগ্যতা ও প্রতিভা : রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ উত্তমরূপে পালনের যোগ্যতা ও প্রতিভা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের স্বভাবগত যোগ্যতা একান্তই অপরিহার্য। মহানবী (সা) এই শর্তের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন–

اَلاَ تَصْلُحُ الْاَمَامَةَ اِلاَّ لِرَجُلٍ.

(লা তাসলিহুল আমামাতা ইল্লা লিরাজুলিন)

"সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্বদান কেবলমাত্র পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব।" হযরত আলী (রা) বলেছেন : "লোকদের উপর নেতৃত্বদানের অধিকারী হবে সে ব্যক্তি যে তাদের সকলের তুলনায় অধিক দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অধিক শক্তিশালী হবে।"

৩. মুহাম্মদ আসাদ, ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি, পৃ. ৪০।

৩. **প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী ও দক্ষ প্রশাসক** : রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী (Knowledgeable) এবং দক্ষ প্রশাসক (Capable Administrator) হতে হবে। সাইয়েদ কুতুবের ভাষায়, শরীয়ার আইন বাস্তবায়ন ও উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণে দক্ষতার উপর রাষ্ট্রপ্রধানের/খলীফার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল। (The Ummah's acceptance of the caliph is contingent upon his enforcement of the shariah as well as his pursuit of the common interest.)[8]

৪। **রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে** : রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁকে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক, অসুস্থ, শারীরিক দিক থেকে অক্ষম, বিবেকহীন, পাগল, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে কখনও রাষ্ট্রপ্রধান পদে নির্বাচিত করা যাবে না।

৫। **রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী** : রাষ্ট্রপ্রধান পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থীকে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হতে হবে। ভিনদেশীয় কাউকে এ দায়িত্বে নিয়োগ করা যাবে না। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ের সাথে গভীর সম্পর্ক ও সকলের বিষয় সম্পর্কে প্রচুর জানাজানি না থাকলে দেশ ও জনগণের যথাযথ সেবা ও প্রতিনিধিত্ব করা কখনও সম্ভবপর নয়।

৬। **রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তায় সর্বাগ্রসর** : রাষ্ট্রপ্রধানকে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তায় অন্য সকলের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই তার পক্ষে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে অধিক বেশি জ্ঞানী হয়ে কাজ করা সম্ভব হবে। ফলে কোন জাতীয় বিষয়ে তার মত ভুল হবে না, কোন সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ হবে না। এ ধরনের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষেই মুসলিম জনগণকে সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হয় এবং কালের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে জনগণকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া সহজতর হবে। রাষ্ট্রপ্রধানকে সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক অবস্থা ও উত্থান-পতন পর্যায়ে উন্নততর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাহলেই তার পক্ষে নিজ জাতিকে আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সম্ভবপর হবে।

৭। **ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার** : রাষ্ট্রপ্রধানকে সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। সর্বপ্রকার গুনাহ ও নাফরমানী থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার উচ্চতর

৪. সাইয়েদ কুতুব, Ma'rakat al Islam wa al. Ra'smaliyah, P. 73-74.

মহত্ত্বর গুণের অধিকারী না হলে তাঁর পক্ষে স্বীয় দায়িত্ব পূর্ণ সততার সাথে পালন করা সম্ভব নয়। সুবিচার ও ন্যায়পরতা এক মানসিক অবস্থা বিশেষ। তা রাষ্ট্রপ্রধানকে সর্বপ্রকারের গুনাহ থেকে যেমন দূরে রাখবে, তেমনি জাতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে খেয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা, প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ ও যুলুম-শোষণ, নির্যাতনমূলক কার্যক্রম থেকেও মুক্ত ও পবিত্র থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে সবচেয়ে বেশি ন্যায়বাদী, নিরপেক্ষ, সুবিচারক ও ইসলামী আদর্শের অবিচল অনুসারী হওয়া তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৮। **পুরুষ হওয়া** : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। ইসলামী জীবন বিধানে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ এক জরুরি বৈশিষ্ট্য। নারীর স্বভাবগত যোগ্যতা, ভাবধারা ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানকে যেসব কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়, দুরূহ সামষ্টিক সমস্যাবলির সমাধান করতে হয়, তা করার জন্য যে স্বভাবগত দক্ষতা, যোগ্যতা ও সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন তা নারীর নিকট কখনই আশা করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই তা নারীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

৯। **আইন জ্ঞানে দক্ষতা ও পারদর্শিতা** : ইসলামী রাষ্ট্র যেহেতু আল্লাহর আইন বিধানভিত্তিক, জনগণের উপর আল্লাহর আইন কার্যকরকরণেরই অপর নাম, তাই রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই ইসলামী আইন বিধানে যথেষ্ট মাত্রায় পারদর্শী হতে হবে। সমাজের অন্যান্য সাধারণ নাগরিকের মতো রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীও সমভাবে আইনের আওতার অধীন। তাঁর ব্যাপারে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। অভিযুক্ত হলে তিনি কোনরূপ বিশেষ মর্যাদা বা সুযোগ পাবেন না এবং শরীয়ার অনুশাসনের গুরুতর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাকে অপসারিত করা যাবে। ফলে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে লাগামবদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান নিজস্ব কোন ক্ষমতার কারণে ঐ উচ্চপদে আসীন নন অথবা বিশেষ কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেও নয় বরং উম্মাহর বিবিধ বিষয়াবলির (affairs of the Ummah) দায়িত্ব ও শরীয়ার সংরক্ষক ও অভিভাবক (as a trustee of the Shariah) হিসেবে ঐ মর্যাদার আসনে রাষ্ট্রপ্রধান সমাসীন থাকেন।

১০। **জন্মসূত্রের পবিত্রতা** : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই 'হালাল জাদাহ' পবিত্রজাত হতে হবে। ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার জন্য এরূপ শর্ত করা হয়েছে। ব্যভিচারপ্রসূত ব্যক্তিকে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের উচ্চতর নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে তা গোটা জাতির জন্যই লজ্জার কারণ হয়ে

দাঁড়াবে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সে জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হবে না।

১১। মানবিক ও উন্নতমানের চরিত্র : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই উন্নতমানের মানবিক ও ইসলামী চারিত্রিক গুণে ভূষিত হতে হবে। কুরআন মজীদে এ গুণসমূহের সমন্বিত গুণ তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াসম্পন্ন।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার উপযুক্ত। অন্য কথায়, এসব গুণ বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে পাওয়া যাবে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তাকেই বানানো যেতে পারে। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান না হলে জাতীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিপথগামী হওয়া; ইনসাফ ও ন্যায়পরতার সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। আর তারই পরিণতি গোটা উম্মাতের জন্য চরম গুমরাহী, ব্যাপক অকল্যাণ ও মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হওয়া অবধারিত হয়ে পড়বে।

৫.৩.২ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য
Duties and Responsibilities of Head of Islamic State

রাষ্ট্রপ্রধান বা খিলাফতের মর্যাদায় যাকে অধিষ্ঠিত করা হবে তার কাজ সাধারণ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের থেকে অনেক ব্যাপক ও ভিন্নতর। এ মর্যাদা হচ্ছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়াহ প্রদত্ত একটি মর্যাদা। শরীয়াহ তার অসংখ্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য মর্যাদাটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই খলীফা বা আমীর তথা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হবে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। এ উদ্দেশ্যকে এক কথায় ব্যক্ত করতে গেলে বলা যায়, আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা। আল-কুরআন ও মহানবীর (সা) বাণী থেকে এক কথাই সুস্পষ্ট হয়।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ ۢبَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ـ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا.

উচ্চারণ ঃ ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আ'মানূ ওয়ামিলুস্‌সালিহাতি লাইয়াস-

তাখলিফান্নাহুম ফিল আরদি কামাসতাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম ওয়ালাইউমাক্কিনান্না লাহুম দীনাহুমুল্লাযীরতাদা লাহুম ওয়া লাইউবাদ্দিলান্নাহুম মিম বা'দি খাওফিহীম আমনান। ইয়া'বুদূনানী লা ইউশরিকূনা বী শাইয়ান।

অর্থ : "তোমাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে ও ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করবে, তাদের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে খলীফা, রাষ্ট্র পরিচালক বানাবেন। যেমন করে তাদের পূর্ববর্তীদের তিনি খলীফা বানিয়েছিলেন এবং যেন তাদের জন্য তার পছন্দ করা দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাদের ভয়ভীতি আশঙ্কার পর পূর্ণ নির্ভীকতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। এ লোকেরা কেবল মাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে। তাঁর সাথে একবিন্দু জিনিসকেও শরীক করবে না।"[৫]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর খিলাফত ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দীন ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, দীনকে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করা, দীনের মান মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং সেখানকার জনগণের জীবনকে সকল প্রকারের ভয়ভীতি ও বিপদ আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে স্বাধীন নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের নির্ভরযোগ্য সুযোগ করে দেয়া। আর এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানই এসব কাজ করার জন্য দায়িত্বশীল।

মহানবী (সা) বলেন,

اِنْ اُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْا -

উচ্চারণ : ইন্ উমিরা আলাইকুম আবদুম মুজাদ্দাউন ইয়্যাকুদুকুম বি কিতাবিল্লাহি ফাসমাউল্লাহু ওয়াআতিউ।

অর্থ : "যদি এমন কোন ক্রীতদাসকে তোমাদের আমীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, যার অঙ্গ কেটে দেয়া হয়েছে; কিন্তু সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী তোমাদের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে তার কথা শ্রবণ করো ও তাঁর আনুগত্য করো।"[৬]

মূলত খিলাফতের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

هِىَ خِلاَفَةُ الرَّسُوْلِ فِىْ اِقَامَةِ الدِّيْنِ -

উচ্চারণ : হিয়া খিলাফাতুর রাসূলি ফী ইকামাতিদ দীন)

---

৫. ২৪ : সূরা আন্ নূর : ৫৫

৬. মুসলিম, কিতাবুল ইমরাত

অর্থ : "ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) হলো দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) উত্তরাধিকারী।"[৭]

আর দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ দীনের ন্যায়-ই ব্যাপক ও সর্বজনীন। তাই দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো মুসলিম সমাজকে দীনের সামগ্রিক বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা। এ সমস্ত আলোচনা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফার দায়িত্ব কর্তব্যের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেছেন তা নিম্নরূপ :

১। আদর্শিক ও তত্ত্বগত দিক থেকে দীন ইসলাম সংবিধান, দীনের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচার এবং মুসলমানদের মধ্যে দীনের প্রতি বিশ্বাসের স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন।

২। দীন ইসলামের বাস্তব ভিত্তিসমূহ [সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ] প্রতিষ্ঠিত রাখা ও সমাজে তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার গাফলতি সৃষ্টির সুযোগ না দেয়া।

৩। ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তথা ব্যবহারিক চিন্তা বিষয়াবলির মীমাংসা ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা।

৪। বিবাদমান পক্ষসমূহের উপর আল্লাহর আইন কার্যকরকরণ, ঝগড়া বিবাদ ইসলামী আইন অনুযায়ী মীমাংসা করার ব্যবস্থাকরণ।

৫। প্রত্যেকটি নাগরিকের বৈধ দখলী স্বত্ব জবরদখল বা বেআইনি দখল থেকে বিমুক্ত করা, উদ্ধার করা, যেন প্রত্যেকে নিজ দখলের উপর স্বীয় বেআইনি বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয় এবং নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন যাপন সকলের পক্ষেই সম্ভব হয়। এক কথায় শান্তি-শৃঙ্খলা (Law and Order) স্থাপন ও সংরক্ষণ।

৬। অপরাধীদের শাস্তি বিধান– তথা শরীয়াতের ঘোষিত 'হাদ্দ ও কিসাস' কার্যকরকরণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা, যেন আল্লাহর হারাম ঘোষিত কোন কাজ হতে না পারে, সকলের অধিকার আঘাত ও লুটতরাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেতে পারে। কোন লোকই স্বীয় ন্যায্য অধিকার থেকে যেন বঞ্চিত না হয়, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, দুর্বলকে শক্তিশালী করা ও সবলদেরকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

৭। সমাজের ব্যক্তিবর্গের ধন-প্রাণ, ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

৮। দুর্বল ও অভাবীদের সাহায্য দান।

৯। সমাজের ভেতরে বাইরে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার পূর্ণ ব্যবস্থা করা।

---

৭. কিতাবুল মাওয়াকিফ

১০। সকল প্রকার বহিরাক্রমণ থেকে তথা দেশের প্রতিটি ইঞ্চি পরিমাণ স্থানও রক্ষা করা। সেজন্য প্রবল প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা যেন কোন শক্তিই সে যত বড় শক্তিশালী এবং ও অস্ত্রবলে যত বলীয়ানই হোক দেশের প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও সাহস না পায়। এক কথায় বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে ও দেশের জনগণ এবং তাদের মাল-সম্পদ, জান-প্রাণ ও মান-ইজ্জত রক্ষা করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন ও সামর্থ্য সংগ্রহ করা।

১১। ইসলাম ও ইসলামী মিল্লাতের শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করা। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের যাবতীয় কর্তব্য পালন করা।

১২। কর, খাজনা ও অন্যান্য সরকারি পাওনা সঠিকরূপে আদায় করার ব্যবস্থা করা, তা শরীয়াতের স্থায়ী নীতি অনুযায়ী হতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ নির্দয়তার প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।

১৩। বায়তুল মাল সংরক্ষণ। তা থেকে যাকে যা দেয়ার তার পরিমাণ নির্ধারণ ও যথাযথ দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। তাতে বাড়াবাড়ি না করা, অপচয় না করা, আর পাওনার পরিমাণেও হ্রাসবৃদ্ধি না করা, যথাসময়ে দিয়ে দেয়া ও বিলম্ব না করা।

১৪। দায়িত্বশীল কর্মচারী নিয়োগ করা। তাদের কাজের সুযোগ করে দেয়া, তাদের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেয়া তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা।

১৫। সমস্ত জাতীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া, পরিস্থিতি অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, যেন সার্বিকভাবে গোটা উম্মাহ রক্ষা পায় এবং মিল্লাত সংরক্ষিত থাকে।

৫.৩.৩ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার
Rights of Head of Islamic State

ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যত ব্যাপক ও সর্বজনীন তার অধিকারও তত বিরাট। তার ন্যায় বিপুল অধিকার দুনিয়ার অন্য কোন সরকার ও শাসকের নেই। তার অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

১। আনুগত্য : তার সর্বপ্রথম অধিকার হলো এই যে, তার নির্দেশ সবাইকে শুনতে হবে ও পালন করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

উচ্চারণ : ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ আতিউল্লাহা ওয়াতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।

অর্থ : "হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য এবং নিজেদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের আনুগত্য করো।"[৮]

মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন,

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ يَّعْصِنِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ -

উচ্চারণ : মান আত্বাআ'নি ফাক্বাদ আত্বাআল্লাহা ওয়া মাইয়্যাসিনী ফাক্বাদ আসাল্লাহা ওয়া মাইয়্যু তিয়িল আমিরা ফাক্বাদ আত্বাআ'নী ওয়া মাইয়্যাসিল আমিরা ফাক্বাদ আসানি।

অর্থ : "যে আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করে, যে আমার নাফরমানি করে সে আসলে আল্লাহর নাফরমানি করে। আর যে নিজের আমীরের আনুগত্য করে, সে আসলের আমার আনুগত্য করে এবং যে আমীরের নাফরমানি করে সে আসলে আমার নাফরমানি করে।"[৯]

এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা প্রতিটি নাগরিকের জন্য ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য।

২। ভালোবাসা : আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানকে ভালোবাসাও রাষ্ট্রপ্রধানের একটি অধিকার। বাইরে যেমন তাঁর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়, তেমনি অন্তরেও তাঁর প্রতি ভালোবাসাও থাকতে হবে। মহানবী (সা) বলেন,

خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيَبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ -

উচ্চারণ ঃ খিয়ারু আ'ইম্মাতুমুল্লাযীনা ইউহিব্বুনাহুম ওয়া ইউহিব্বুনাকুম ওয়া তুছাল্লুনা 'আলাইহিম ওয়া ইউছাল্লুনা 'আলাইকুম ওয়া শিরারু আ'ইয়াম্মা-

---

৮. ৪ : সূরা আন নিসা : ৫০

৯. মুসলিম শরীফ : ২য় খণ্ড

তুকুমুল্লাযীনা তুবগিদূনাহুম ওয়া ইউবগিদূনাকুম ওয়া তাল'আনুনাহুম ওয়া ইয়াল'আনুনাকুম।

অর্থ : "তারাই তোমাদের ভালো খলীফা যাদেরকে তোমরা ভালোবাস ও তোমাদেরকেও তারা ভালোবাসে এবং যাদের জন্য তোমরা রহমতের দু'আ করো ও তোমাদের জন্য তারা দু'আ করে। অনুরূপভাবে তারাই তোমাদের মন্দ খলীফা যাদের প্রতি তোমরা বিদ্বেষ পোষণ করো ও তারাও তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যাদের প্রতি তোমরা অভিশাপ বর্ষণ করো ও তোমাদের প্রতিও তারা অভিশাপ বর্ষণ করে।"[১০]

এ থেকে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে এমনই হতে হবে। মানুষ তাঁর জন্য সদিচ্ছা পোষণ করবে। অন্তর থেকে তাঁর মঙ্গল কামনা করবে। মানুষের দৃষ্টি থেকে তাঁর জন্য ভক্তি ভালোবাসা উপচে পড়বে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হাতে 'বাই'আত' বা আনুগত্যের শপথ কেবল একটি আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের প্রকাশ বলা হয়নি বরং আন্তরিকতা ও ভালোবাসারও শপথ।

৩। দীন ও আখিরাতের জন্য বাই'আত : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের তৃতীয় অধিকার হলো এই যে, তাকে দুনিয়ার নয় বরং দীনের প্রয়োজন মনে করতে হবে এবং রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে যে বাই'আত করা হবে তার পেছনে আসলে প্রেরণা হবে কেবল আখিরাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। মহানবী (সা) বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ الدُّنْيَا -

উচ্চারণ : সালাসাতুন লা ইউকাল্লিমুহুমুল্লাহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি... ওয়া রাজুলুন বাইয়া'আ ইমামান ইউবাই-হু ইল্লাদ্দুনিয়া।

অর্থ : "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না।... এক ব্যক্তি যে, কেবল মাত্র দুনিয়ার স্বার্থে খলীফার হাতে বাই'আত করে।"[১১]

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, কেবল মুসলমানদের খলীফার বাই'আত ও আনুগত্য কেবল দুনিয়ার জন্যই নয়; বরং দীন ও আখিরাতের জন্য হতে হবে।

---

১০. মুসলিম শরীফ ঃ কিতাবুল ইমারত

১১. বুখারী শরীফ : ২য় খণ্ড, কিতাবুল আহকাম

৫.৩.৪ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুতি

Dismissal of Head of Islamic State

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আইনগত মর্যাদা হলো তিনি হচ্ছেন জাতির উকিল-জাতির সামগ্রিক কার্যাবলীসম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বশীল। কাজেই রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর দায়িত্ব বিরোধী কোন কাজ করলে বা অক্ষমতা অথবা উপেক্ষার দরুন তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তাঁকে পদচ্যুত করার অধিকার জাতির রয়েছে। যেহেতু জাতির জনগণই রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করে, কাজেই তাঁকে পদবিচ্যুত করার অধিকারও জাতিরই থাকতে হবে। ইসলামী শরীয়াতে এ অধিকার স্বীকৃত। যে রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য না করে এবং তাঁর বিধান অনুসরণ না করে, তবে তাঁর আনুগত্য করা কিছুতেই জায়েয হবে না। বরং তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা ঈমানদার নাগরিকদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ্ স্পষ্ট বলেছেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ـ

উচ্চারণ : ওয়া লা তুত্বি' মান আগফালনা আনযিকরিনা ওয়াত্‌ত্বাবআ' হাওয়ানাহু ওয়া কানা আমরূহু ফুরুত্বা।

অর্থ : "যার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ শূন্য, নিজের নফসের অনুসরণ করাই যার অভ্যাস এবং যে ব্যক্তি যাবতীয় কাজকর্মে সীমালঙ্ঘন করে তার আনুগত্য করো না।"[১২]

আল্লাহ্ আরও বলেছেন,

وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُوْنَ ـ

উচ্চারণ : ওয়া লা তুতীয়্যু আমরাল মুসরিফীনাল্লাযীনা ইউফসিদূনা ফিল আরদি ওয়া লা ইউছলিহূন।

অর্থ : "যেসব লোক সীমালঙ্ঘন করে, দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে– শান্তি, শৃঙ্খলা এবং কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে না, তাদের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব একেবারেই স্বীকার করো না, তাদের আনুগত্য মোটেই করো না।"[১৩]

---

১২. ১৮ : সূরা আল কাহাফ : ২৮

১৩. ২৬ : সূরা আশ্ শু'আরা : ১৫১-১৫২

আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلاً - فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا -

উচ্চারণ ঃ ইন্না নাহ্নু নায্যালনা 'আলাইকাল কুরআনা তান্যীলা। ফাছবির লিহুকমি রব্বিকা ওয়ালা তুত্বি মিনহুম আছিমান আও কাফূরা।

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি। অতএব ধৈর্যধারণ করে কেবল আল্লাহর হুকুম পালন করতে থাক, সমাজের কোন পাপী ফাসিক কিংবা কাফির লোকের আনুগত্য করো না।"[১৪]

ইসলামী রাজনীতিবিদ ও ফিকহবিদগণ শরীয়াতের বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন যে, যে রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে নিম্নলিখিত বিকৃতিগুলো পরিদৃষ্ট হবে তাকে পদচ্যুত করা মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। সেগুলো হচ্ছে :

১। রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রজা সাধারণের অধিকার আদায় না করেন এবং তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালান।

২। তিনি যদি জনপদকে আল্লাহর নাফরমানী করার নির্দেশ দেন।

৩। তিনি যদি অসচ্চরিত্র হন, প্রকাশ্যে শরীয়াতের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং অন্যায় ও গর্হিত কার্যাবলি সম্পাদন করতে থাকেন।

৪। তিনি যদি দীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভিত্তিসমূহ ও প্রয়োজনীয় চিহ্নসমূহ অর্থাৎ ইসলামের আরকান আদায় না করেন।

৫। ইসলাম থেকে তাঁর দূরত্ব যদি এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তিনি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ও আইনের পরিবর্তন সাধন করেন এবং তাতে ইসলাম বিরোধী বিষয়াবলির অনুপ্রবেশ ঘটান।

৬। তিনি যদি ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহও পরিহার করেন এবং কুফরী আকীদা গ্রহণ করেন।

প্রখ্যাত ফিকহ ও রাজনীতিবিদ ইমাম ইবনে হাযাম আন্দালুসী বলেন :

فَهُوَ الْاِمَامُ الْوَاجِبُ طَاعَتُهُ مَا قَادَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبِسُنَّةِ

---

১৪. ৭৬ : সূরা আদ্ দাহর : ২৩-২৪

رَسُوْلِهٖ فَاِنْ زَاغَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُمَا مَنَعَ مِنْ ذٰلِكَ وَاُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْحَقُّ فَاِنْ لَّمْ يُؤْمِنْ اَذَاهُ اِلاَّ بِخَلْعِهٖ خَلَعَهُ وَوَلّٰى غَيْرَهُ ـ

উচ্চারণ ঃ ফাহয়াল ইমামুল ওয়াজিবু ত্ব'য়াতুহু মা ক্বাদানা বিকিতাবিল্লাহি তা'আলা ওয়া বিসুন্নাতি রাসূলিহি ফাইন যাগা আন শাইয়্যিম মিনহুমা মানাআ' মিন যালিকা ওয়া উকিমা আলাইহিল হাদ্দু ওয়াল হাককু ফাইন লাম ইয়্যু মিনি আদাহু ইল্লা বিখালইহি খালআলহু ওয়া ওয়াল্লা গাইরাহ।

অর্থ ঃ রাষ্ট্রপ্রধানকে মেনে চলা ওয়াজিব ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সে জনগণকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত করে। সে যদি তা থেকে একবিন্দু ভিন্ন পথে ধাবিত হয়, তাহলে তাকে সে পথ থেকে বিরত রাখা হবে এবং তার উপর শরীয়াতের অনুশাসন কার্যকর করা হবে। আর তাকে পদচ্যুত না করা হলে তার দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকা যাবে না মনে করা হলে তাকে পদচ্যুত করা হবে এবং তার স্থানে অপর একজনকে নিয়োগ করা হবে।

৫.৪ ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাহীদের গুণাবলি (Qualities of Executives of Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিয়োজিত কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের মৌলিক দায়িত্ব হলো জনগণের সেবা করার জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনগণের ধনসম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করা।

৫.৪.১ হযরত আলী (রা)-র দৃষ্টিতে সুপ্রশাসকের গুণাবলি
Qualities of Good Ruler according to Hazrat Ali (R)

"আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ প্রদান করছি, জীবনের সর্ববিধ কাজে আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থাকে সবার উপরে স্থান প্রদান করবে। তাঁর স্মরণ ও ইবাদতে অগ্রাধিকার দান করবে। কুরআনের নির্দেশ ও নবীর শিক্ষাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসরণ করবে। এ সমস্ত নির্দেশ প্রতিপালনের উপর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নির্ভরশীল। যারা এসব অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে চিরকালীন অভিশাপ। আল্লাহর নির্দেশ পালনে অপারগতার পরিণতি, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনেই চরম ব্যর্থতা হয়ে দেখা দিবে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই আল্লাহর প্রদত্ত মূলনীতিগুলোকে মেনে চলতে হবে। আল্লাহর উদ্দেশ্যকে

সমর্থন দিতে হবে এবং তাঁর নির্দেশমালাকে সম্মান করতে হবে। কেবলমাত্র এভাবেই তুমি আল্লাহর সাহায্য, অনুগ্রহ এবং রহমতের যোগ্য হতে পার।" এটিই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ হতে মিসরের ভাবী গভর্ণর (ওয়ালী-Wali) মালিক ইবনে হারিস আল আশতার আন নুখাই (Malik Ibn Haris al Ashtar an Nukhai) প্রতি লেখা একটি প্রশাসনিক উপদেশমূলক চিঠির প্রারম্ভিক বক্তব্য।[১৫] এ কথাগুলোতে ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় একজন সুপ্রশাসক কি দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হবেন তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। হযরত আলী (রা)-এর দৃষ্টিতে একজন সুপ্রশাসকের গুণাবলি কি কি হওয়া উচিত তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১। **খোদাভীরুতা :** হযরত আলী (রা)-এর দৃষ্টিতে একজন সুপ্রশাসক হবেন খোদাভীরু। খোদাভীতি না থাকলে তাঁর মনে ঔদ্ধত্য স্থান পাবে। হযরত আলী (রা) মিসরের ভাবী গভর্নর মালিক আশতারকে বলেছেন, "তোমার পদটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলী নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এবং তাতে সফল হবার পরও সামান্য ভুলত্রুটির জন্য তোমাকে ক্ষমা করা হবে না।[১৬] তাই একজন সুপ্রশাসক অবশ্যই খোদাভীতি তথা সকল কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার মাসনিকতা নিয়ে কাজ করবেন। তিনি আরও বলেছেন, "তোমার শাসিত জনগণের প্রতি এমন আচরণ সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পার।"[১৭] প্রশাসক জবাবদিহির মনোভাবাপন্ন হলেই তাঁর দ্বারা প্রকৃত জনকল্যাণ আশা করা যায়। তাই হযরত আলী (রা)-এর দৃষ্টিতে একজন সুপ্রশাসককে অবশ্যই হতে হবে 'মুত্তাকী' বা খোদাভীরু।

২। **ন্যায়পরায়ণতা :** একজন সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ। তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে থাকবেন সতত সচেষ্ট। ন্যায়বিচারের দাবি অনুযায়ী একজন সুপ্রশাসক স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে সকল জনগণের মধ্যে সমতার বিধান করবেন। অন্যথায় তিনি অত্যাচারী ও নিপীড়ক বলে বিবেচিত হবেন। হযরত আলী (রা)-এর মতে, একজন প্রশাসক ন্যায়পরায়ণ না হলে আল্লাহর সৃষ্ট জনগণের প্রতি অবিচার করলে আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে চলে যান। তাই একজন সুপ্রশাসককে হতে হবে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ।

---

১৫. হযরত আলী (রা) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি, মনজুর আহসান অনূদিত, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ১।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৩। সৎ ও সৎ কর্মের প্রতি আস্থাশীলতা : একজন সুপ্রশাসক হবেন সৎ ও সৎ কর্মের প্রতি আস্থাশীল। হযরত আলী (রা) বলেছেন, "অতএব, তোমার মনকে মহৎ চিন্তা, সদুদ্দেশ্য, সদিচ্ছা ও সৎ কর্মের ঝর্ণাধারার উৎসমূল করে তোল। সৎ কাজের হিসেবে জমা বাড়িয়ে তোলাই যেন হয় সবচেয়ে বড় চিন্তা। এতে তুমি সফল হতে পারো। তোমার কামনা বাসনাকে লাগাম ছাড়া হতে না দিয়ে নিষিদ্ধ সকল কাজ হতে বিরত থেকো।[১৮] তাঁর মতে, নিজের প্রতি সুবিচার করার এবং ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অসৎ বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রশাসক নিজে সৎ এবং সৎ কর্মের প্রতি আস্থাশীল না হলে জনকল্যাণ সম্ভব নয়। তাই তাঁর মতে, একজন সুপ্রশাসক অবশ্যই সৎ ও সৎ কর্মের প্রতি আস্থাশীল হবেন।

৪। ক্ষমাশীলতা : সুপ্রশাসককে হতে হবে অবশ্যই ক্ষমাশীল। ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতে কখনও সংকোচ কিংবা বেদনাবোধ তাঁদের মনে স্থান পাবে না। হযরত আলী (রা)-এর মতে, প্রশাসনে ক্রোধ কিংবা প্রতিশোধের ইচ্ছা শুধু কুফলই বয়ে আনে। তাই অধীনস্থ কিংবা শাসিতের ব্যর্থতায় ক্রোধান্বিত না হয়ে তাদের প্রতি সহনশীল হওয়া সুপ্রশাসকের কর্তব্য।

৫। সুবিচার ও ইনসাফকারী : একজন সুপ্রশাসক হবেন ন্যায়বান, সুবিচার ও ইনসাফকারী। শাসকের উচিত তাঁর শাসিত জনগণ যা সঙ্গতভাবে আশা করে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূরণ করার ব্যবস্থা করা। নতুবা জনগণ তাঁর শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। সুপ্রশাসক অবশ্যই নিজ দেশে সুবিচার ও ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েমে সচেষ্ট হবেন। হযরত আলী (রা)-এর মতে, একজন শাসকের জন্য এটাই সবচাইতে বড় এবং একমাত্র আনন্দের বিষয় যে, তাঁর নেতৃত্বাধীনে রাষ্ট্র ন্যায়নীতি সুবিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং শাসকের প্রতি নাগরিকদের মনে আস্থা ও ভালোবাসার মনোভাব বিরাজ করছে।[১৯]

৬। জনগণের অভিযোগ শ্রবণকারী : হযরত আলী (রা)-এর মতে, একজন সুশাসক হবেন অবশ্যই জনগণের অভিযোগ শ্রবণকারী। এজন্য জনগণের সাথে তাঁর থাকতে হবে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। একজন সুপ্রশাসক তাঁর অন্যান্য কাজের ফাঁকে অবশ্যই কিছু সময় দেশের জনগণের জন্য তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা শোনার জন্য বরাদ্দ রাখবেন। অতঃপর সেই সকল অভিযোগ সাধ্যমত সমাধান

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

করার চেষ্টা করবেন। শাসিতের অভাব অভিযোগ মিটানোর ব্যবস্থা করতে না পারা একজন শাসকের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। হযরত আলী (রা) বলেছেন, "একজন শাসকের জন্য সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হলো জনগণকে তাঁদের শঙ্কটের সময় সাহায্য করা।"[২০]

৭। **জনগণের আস্থাভাজন :** একজন সুপ্রশাসককে হতে হবে জনগণের আস্থাভাজন। জনগণের আস্থাভাজন হতে না পারলে তাঁর পক্ষে প্রশাসন কার্য চালানো কষ্টকর হয়ে পড়বে। এজন্য তিনি সর্বদা জনকল্যাণের নিমিত্তে হবেন নিবেদিতপ্রাণ। হযরত আলী (রা) বলেছেন, "যদি তোমার (প্রশাসকের) কড়া পদক্ষেপের কারণে তোমার নাগরিকেরা ভুল করে তোমার উপর ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ আনে তাহলে তুমি তাদেরকে কালবিলম্ব না করে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহকারে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করবে, যেন তারা প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।[২১] তাঁর মতে, এতে একজন প্রশাসক জনগণের কাছে আরও আস্থাভাজন হয়ে উঠবে। আস্থাভাজন প্রশাসক হচ্ছে প্রশাসক শ্রেণীর আদর্শ।

৮। **আত্মনিয়ন্ত্রণকারী :** একজন সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই আত্মনিয়ন্ত্রণকারী। যেটাতে সবার সমান অধিকার আছে সেটাকে তিনি কখনও নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখবেন না। তিনি হবেন অহংকার, ক্রোধ ও ঔদ্ধত্যপ্রবণতার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপকারী। হযরত আলী (রা)-এর মতে, একজন প্রশাসক যদি তাঁর স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারবোধের রশি টেনে ধরতে না পারেন, তাহলে তা দেশে বিশৃঙ্খলা ও অধঃপতন ডেকে আনবে। তাই তিনি বলেছেন, একজন সুপ্রশাসক হবেন তিনি যাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সর্বাধিক।

৯। **ইবাদতকারী ও আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী :** সর্বোপরি, একজন সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই নিয়মিতভাবে আল্লাহর ইবাদতকারী এবং সকল প্রকার পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী। দিবা ও রাত্রিকালীন ইবাদতের জন্য সুপ্রশাসক অবশ্যই একটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখবেন। সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থ হলো আল্লাহর কালাম থেকে নির্দেশনা ও উপদেশ মতে এবং হাদিসের অনুসরণে পরিস্থিতি সামাল দেয়া। হযরত আলী (রা)-এর মতে, জনগণের জন্য সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিরাই হবেন সুপ্রশাসক। এ জাতীয় সুপ্রশাসকদের মাধ্যমে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

করেছেন যে, “আমরা যেন ন্যায়ানুগ ইনসাফভিত্তিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটা সুখি ও সমৃদ্ধশালী জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি যা সারা দুনিয়ার মানুষের অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়।[২২]

খলীফা হযরত আলী (রা) মিশরের গভর্ণরকে আরো উপদেশ প্রদান করেন যে,

১. মিশরের শাসন ব্যবস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মিশরে বসবাসকারী সকল নাগরিকের কাছে একটি উত্তম আদর্শ হতে।

২. তাঁর প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ, সত্যবাদী ও খোদাভীরু-তাকওয়াবান লোক বাছাই করতে।

৩. নিরপেক্ষ হতে ও ন্যায়বিচার করতে এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে।

৪. গিবতকারী ও অপবাদ প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক হতে।

৫. তাঁর সচিব ও সহায়তা প্রদানকারীদের কার্যাবলী তদারক করতে এবং সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার যাতে সর্বদা রক্ষিত হয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে।

৬. কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে এবং কর্তৃত্ববাদী নির্দেশ প্রদান না করতে, যা তাঁকে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে তৈরি করবে।

৭. দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার ও জনগণের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

৮. তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের যে কোন ভুলভ্রান্তির জন্য দায়িত্বশীল হতে, যাতে তিনি এ ব্যাপারে অবহিত থাকেন এবং ক্ষমা করেন।

৯. আমিল ও কমিশনারদের সাথে নিয়মিত ও স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা করতে।

১০. আত্মপ্রশংসা ও আত্মোপলব্ধির বৈশিষ্ট্য যাতে জাগ্রত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।

১১. যে সম্পদ সাধারণ জনগণের বা যাতে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে (যেমন পানি, শক্তি, বাতাস) তা নিজের জন্য বা তার আত্মীয়দের জন্য সংরক্ষণ করে না রাখতে।[২৩]

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২৩. মুহাম্মদ আল ব্যুরে, প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, বি আই আই টি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২৬৪-২৬৫।

মিশরের নবনিযুক্ত গভর্নরের প্রতি হযরত আলী (রা) চিঠিটি একটি অনবদ্য প্রশাসনিক উপদেশ ও নির্দেশনা। চিঠিটিতে ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রশাসনের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে হযরত আলী (রা) এর দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। সুতরাং ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশাসন ও ন্যায়বিচারের মূলনীতির একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবেই উক্ত চিঠিটি সংরক্ষিত ও বিবেচিত। মুসলিম গবেষক আবদুল হাদি[২৪] হযরত আলী (রা) এর চিঠিকে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশাসনিক নেতৃত্বের জন্য ইসলামের ইতিহাসের অধিক গ্রহণযোগ্য দলিল বলে চিহ্নিত করেছেন। খলীফা হযরত আলী (রা) এর চিন্তাধারা ও কাজগুলোর সম্পাদনাকারী শেখ হাসসান সায়ীদ এর মতে, হযরত আলী (রা) এর চিঠিটি শাসক ও প্রশাসনের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে আলোচনা করে; তাদের প্রধান প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী; সচিব ও অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে তাদের সম্পর্ক, প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্টন; তাদের একের সাথে অন্যের সমন্বয় সাধন ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা ইত্যাদি। চিঠিটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে উপদেশ দেয়, প্রশাসনিক ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে, কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতাকে উৎসাহিত করে এবং প্রধান গভর্ণরকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেকার বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলে; যাতে করে মুনাফাখোরী, মজুদদারী, পণ্যের একচেটিয়া কারবার ও কালোবাজারীর গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটি সম্পদ ও সুযোগের সমবন্টন নীতির উপর; এতিমদের লালন-পালন, বিকলাঙ্গ-অক্ষম, কাজ করতে ও পঙ্গু লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শাসক-শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে।[২৫]

প্রখ্যাত আরব খ্রিস্টান বিচারক, কবি ও দার্শনিক আবদুল মাসিহ আনতাকীর মতে, হযরত আলী (রা) এর চিঠি মূসা ও হাম্মোরাবি প্রদত্ত নীতিমালার চেয়ে অধিকতর উত্তম ও উৎকৃষ্ট বিধান; এটি মানুষের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করে ও ব্যাখ্যা করে তা কিভাবে পরিচালিত হবে এবং এটি মুসলিমদের দাবির প্রতিও সোচ্চার যে, ইসলাম একটি খোদায়ী প্রশাসনের কথা বলে যা জনগণের মাধ্যমে, জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা সৃষ্ট এবং এটি এমন প্রশাসক চায়, যে শুধু নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় বরং সকল শাসিতের সন্তুষ্টি বিধান

২৪. এইচ এ আবদুল হাদি,Public Administration in the Arab States, ১৯৭৩, পৃ. ২০২।

২৫. উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আল ব্যুরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩।

করতে চায় এবং ইসলামের পূর্বে কোন ধর্মই তা অর্জন করতে চেষ্টা করেনি।[২৬]

এভাবে দেখা যায় যে মিশরের গভর্ণরের প্রতি হযরত আলী (রা) এর লেখা চিঠি ইসলামী রাজনীতি, প্রশাসন, ন্যায়বিচার, সরকারী কর্ম এবং আরও অনেক বিষয়ে তাঁর দর্শনকেই প্রতিফলিত করে।

৫.৪.২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল ফারাবীর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনির্বাহীদের গুণাবলী

Qualities of Executive of State according to Al-Farabi

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল ফারাবীর (৮৭০-৯৫০) মতে, রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত নির্বাহীদের যেসব গুণাবলী আবশ্যক তা হলো ঃ

১। বুদ্ধিমত্তা ২। উত্তম স্মৃতিশক্তি ৩। বাগ্মিতা ৪। দৃঢ়তা ৫। ন্যায়বিচার প্রীতি ৬। উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও সপ্রতিভ ভাবভঙ্গি এবং ৭। সত্যবাদিতা।

১। বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) : যে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন উত্তমমানের বুদ্ধিমত্তা। উত্তমমানের বুদ্ধিমত্তা থাকলে যে কোন পরিস্থিতিতে অবস্থা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। উত্তমমানের বুদ্ধিমত্তা একজন প্রশাসক ও ব্যবস্থাপককে লক্ষ্য অর্জনের কৌশল প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। প্রশিক্ষণ, অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং কর্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তা অর্জন ও প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিমত্তার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট পদে কর্ম অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

২। উত্তমমানের স্মৃতিশক্তি (Sharp Memory) : একজন প্রশাসক ও ব্যবস্থাপককে অনেক আইন-কানুন, ঘটনাপ্রবাহ ও কাজকর্ম মনে রাখতে হয়। অনেক কিছু মনে রাখতে হয় সময়মত দায়িত্ব পালনের জন্য। ভোলা মনের ব্যক্তি প্রশাসক/ব্যবস্থাপক হলে অনেক কাজ সময়মত সম্পন্ন হবে না। ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে স্মৃতিশক্তি চাঙ্গা করতে হবে।

৩। বাগ্মিতা (Oratory) : যিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন এবং সরকারি কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবেন তার বাকপটুতা আবশ্যক। বাকপটুতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্ল্যান প্রোগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে অন্যান্যদের মটিভেট করতে হয়। এ গুণের মাধ্যমে অন্যদের দিয়ে কাজ করে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাগ্মিতা কৌশল অর্জন করতে হয়।

৪। দৃঢ়তা (Firmness) : একজন প্রশাসক নড়বড়ে হলে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলার

২৬. উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আল ব্যুরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪।

সৃষ্টি হয়। তাই ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার কথায় ও কাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃঢ়তা আবশ্যক থাকতে হবে। ধীরস্থির হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ়তা সাফল্য অর্জনের পূর্বশর্ত।

৫। ন্যায়পরায়ণতা (Equity and Justice) : একজন সরকারী কর্মকর্তাকে ন্যায়পরায়ণ হয়ে সুবিচার করার ইচ্ছা বা সংকল্প ব্যক্ত করতে হবে। ন্যায়বিচার করার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রীতি প্রদর্শন করতে হবে। ন্যায়পরায়ণ হতে হলে কর্মকর্তাকে প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ থাকতে হবে।

৬। উজ্জ্বল প্রাণবন্ত (Lively and Smartness) : নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যবস্থাপক ও প্রশাসককে সপ্রতিভ, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হতে হবে। তাকে সকলের সাথে হাসি মুখে কথা বলতে এবং মিলেমিশে ও যোগাযোগ রক্ষা করে দায়িত্ব পালন করতে হবে। একজন প্রশাসককে নিরামিষ হলে চলে না।

৫.৪.৩ ইমাম গাজ্জালীর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নির্বাহীদের গুণাবলী

Qualities of Executives of State according to Imam Gazzali

প্রখ্যাত দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১) উল্লিখিত গুণ ছাড়াও একজন সার্থক প্রশাসকের ধৈর্য ও বিনয় থাকা এবং হিংসা ও সংকীর্ণতা পরিহার করার বিষয় উল্লেখ করেছেন।

ক. ধৈর্য (Patience) : একজন প্রশাসকের সাফল্যের পূর্বশর্ত ধৈর্য। কোন অস্থির চিত্তের লোক দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি নীতি ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে সক্ষম থাকতে পারে না। একজন প্রশাসককে সকলের কথা ধৈর্যসহকারে মনোযোগ দিয়ে শুনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং ধৈর্যশীল হয়ে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়।

খ. বিনয় (Modesty) : বিনয় ও ভদ্রতা মানুষের মহৎ গুণ। বিনয়ী না হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদেশ গ্রহণ, অধস্তনদের আদেশ প্রদান এবং শিষ্টাচার রক্ষা করা যায় না। বিনয়ী লোক অধিকাংশ লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। ফলে তিনি সহযোগিতা পান। কোন প্রশাসক যদি এ এ গুণ বিবর্জিত হয় তাহলে তিনি হবেন দাম্ভিক, অভদ্র ও স্বৈরাচারী। ফলে তিনি জনগণের আস্থাভাজন হতে পারেন না।

গ. হিংসা (Jealousy) : আগুন যেমন অন্য সবকিছু দাহ্য করে তেমনি হিংসা মানুষকে পুড়ে ছারখার করে। প্রশাসকের মনের মধ্যে হিংসার আগুন ছড়ালে তিনি

প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রতিপক্ষের উপর যুলুম ও নির্যাতন করেন, যার ফলাফল সব সময় হয় নেতিবাচক। ফলে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা হারাবেন। সুতরাং একজন প্রশাসককে হিংসা ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে সংযমী ও সহনশীল হতে হবে।

ঘ. সংকীর্ণতা (Narrowness) : সংকীর্ণতা উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ভালো কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটি মানুষকে অন্তর্মুখী করে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে নিরুৎসাহিত করে। সংকীর্ণতা নেতিবাচক বিধায় এটি প্রগতির অন্তরায়। একজন প্রশাসসকে সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে।

৫.৪.৪ সুলতান সোলজারের মতে প্রশাসকের সাফল্যের উৎস
Sources of Success of Executives according to Sultan Solzer

১। আল্লাহকে ভয় করা : যিনি আন্তরিকভাবে আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস ও ভয় করেন এবং পরকালের বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী তিনি অন্যের উপর অবিচার ও সকল অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। তিনি অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তার সকল কাজ প্রত্যক্ষ করছেন এবং পরকালে সকল কাজের জন্য তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

২। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা : বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞান ও তথ্যে সমৃদ্ধ। তাই যিনি সর্বদা বিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেন, তিনি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উত্তমমানের পথ নির্দেশনা পান। ফলে তার ভুলভ্রান্তি কম হয়।

৩। ন্যায়পরায়ণ হওয়া : ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক সকলের উপর সুবিচার করার চেষ্টা করেন। ফলে জনগণ যন্ত্রণামুক্ত ও স্বস্তিতে থাকার সুযোগ পায়। ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা জনগণের সমর্থন ও আশির্বাদ পান। ফলে তার সুনাম ও ইমেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্য : জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সাহচর্যে থাকলে সৎ বুদ্ধি ও উত্তম পরামর্শ পাওয়া যায় যা প্রশাসন পরিচালনায় সহায়ক। সৎ বুদ্ধি ও পরামর্শ সমস্যা মোকাবিলা করার প্রধান সহায়ক শক্তি। সুতরাং জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সাহচর্য আবশ্যক।

৫। সমালোচনার প্রতি সহনশীল হওয়া : সমালোচনার মাধ্যমে নিজের ভুল ও দোষত্রুটি সহজে চিহ্নিত হয়। ফলে যথাসময় তা সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া যায়। সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু হলে লোকে সমালোচনা করে ভুলত্রুটি চিহ্নিত

করতে সাহসী হয় না। ফলে সংশোধন করার সুযোগ থাকে না। যিনি নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে কাজ করেন তিনি বেশি সময় টিকে থাকেন।

৬। অস্থিরতা পরিহার করা : অস্থিরতা চিন্তাভাবনা করে কাজ করার পথে প্রতিবন্ধক। অস্থির হয়ে কাজ করলে কাজে ভুল হয়। যার পরিণতি খুব মারাত্মক হতে পারে। অস্থিরতা স্থিতিশীলতার পরিপন্থী। সুতরাং সাফল্য অর্জন করতে হলে অস্থিরতা পরিত্যাগ করে ধীরস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হবে।

৫.৪.৫ সারণি-১

Table-1

হযরত আলী (রা), আল ফারাবী, ইমাম গাজ্জালীর দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাহীদের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী :

রাষ্ট্র নির্বাহীদের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী

হযরত আলী (রা)	আল ফারাবী	ইমাম গাজ্জালী
১। খোদাভীরুতা ২। ন্যায়পরায়ণতা ৩। সৎ ও সৎকর্মের প্রতি আস্থাশীলতা ৪। ক্ষমাশীলতা ৫। সুবিচার ও ইনসাফকারী ৬। জনগণের অভিযোগ শ্রবণকারী ৭। জনগণের আস্থাভাজন ৮। আত্মনিয়ন্ত্রণকারী ৯। ইবাদতকারী ও আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী।	১। বুদ্ধিমত্তা ২। উত্তম স্মৃতিশক্তি ৩। বাগ্মিতা ৪। দৃঢ়তা ৫। ন্যায়বিচার প্রীতি ৬। উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও সপ্রতিভ ভাবভঙ্গি ৭। সত্যবাদিতা।	১। বুদ্ধিমত্তা ২। স্মৃতিশক্তি ৩। বাগ্মিতা ৪। দৃঢ়তা ৫। ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি অনুরাগ ৬। প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব ৭। সত্যবাদিতা ৮। ধৈর্য ৯। বিনয় ও ভদ্রতা ১০। হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা পরিহার করা ১১। সংকীর্ণতা পরিহার করা।

উৎস : হযরত আলীর (রা) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি, মনজুর আহসান অনূদিত (ঢাকা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩; আল ফারাবী, আল মাদিনাতুল ফামিলাহ (১৯৫৮) পৃঃ ১৫৭; আল গাজ্জালী, আল মুসতাসফা (১৯৩৭) পৃঃ ১৩৯।)

৫.৪.৬ পল. এইচ. এপ্‌লবি'র দৃষ্টিতে সুপ্রশাসকের গুণাবলী

Qualities of a good administrator according to Paul H. Appleby

বিশিষ্ট লোক প্রশাসনবিদ পল. এইচ. এপল্‌বি তাঁর বিখ্যাত Public Administration for A Welfare State গ্রন্থে রাষ্ট্র নির্বাহীদের জন্য কতগুলো সাধারণ গুণাবলী নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের অনেকগুলো গুণাবলীর মধ্যে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সুপ্রশাসকের সাধারণত নিম্নলিখিত নয়টি অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলির অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।

১। চারিত্রিক দৃঢ়তা

পল. এইচ. এপ্‌লবি'র মতে, একজন সুপ্রশাসকের সর্বপ্রথমে দরকার চারিত্রিক দৃঢ়তা। এটি ব্যতিরেকে অন্যান্য গুণাবলি যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের মূল সুর হল, চরিত্রহীন ব্যক্তির অন্যান্য যতই গুণাবলী থাকুক না কেন, তিনি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রশাসক হবার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। অতএব, সুপ্রশাসককে অবশ্যই হতে হবে সচ্চরিত্রবান।

২। আনুগত্য

স্বীয় প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রতি সুপ্রশাসকের এমন আনুগত্য থাকা প্রয়োজন যদ্বারা তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠানগত শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অর্থ উপার্জনের আত্মস্বার্থের দিক ছাড়াও প্রশাসন কার্যে আত্মোৎসর্গ এবং আদর্শবাদেরও সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পেশা বা বিশেষ কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্য। কখনও দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্বের প্রতি কারুধর্মী মনের একটি সহজাত আকর্ষণ গড়ে উঠে।

৩। দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহ ও জবাবদিহিতার মনোভাব

দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা সুপ্রশাসকের একটি অনন্য গুণাবলি। তিনি স্বীয় কর্মের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করবেন। জবাবদিহিমূলক মনোভাব না থাকলে তিনি সুপ্রশাসক হবেন না। জনসাধারণের মাঝে জনস্বার্থে কাজ করার নিমিত্তে তাঁর মাঝে থাকতে হবে বিশেষ স্পৃহা। তা না হলে দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। দায়িত্ব পালনে আগ্রহের সাথে সুপ্রশাসকের থাকতে হবে সাহস ও গতিশীল মনোভাব। এপ্‌লবি আরও বলেন, যারা দায়িত্ব দেখে পালিয়ে

যায় না তাঁরাই দায়িত্ব পালনে সক্ষম। "এঁরা জানেন প্রশাসনের কাজে হাজারো ঝামেলা, তবু কাজকে তাঁরা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করে থাকেন।"[২৭]

৪। সমস্যার সমাধানকারী

একজন সুপ্রশাসক হবেন উত্তম শ্রোতা। তিনি আগ্রহভরে জনগণের সমস্যাবলী শ্রবণ করেন এবং সন্ধানী প্রশ্নের সাহায্যে সমস্যার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হবেন। অতঃপর যোগ্যতম অধঃস্তন বা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হবেন। শুধু অধঃস্তনের উপর নির্ভর করা সুপ্রশাসকের কাজ নয়। আবার অধঃস্তন যা বলেননি কিন্তু যা প্রশাসকের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব দিকেও তাঁকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে হবে।

৫। সংবেদনশীলতা

একজন সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই সংবেদনশীল মনের অধিকারী। তিনিই সুপ্রশাসক যিনি জানেন কি করে সাধারণ জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে হয়। তিনি তাঁর প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে অবশ্যই সকলের সহানুভূতির মনোভাব প্রদর্শন করবেন।

৬। সাংগঠনিক শক্তির উপর আস্থাশীলতা

একজন সুপ্রশাসক নিজের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে তিনি তাঁর সংগঠনের শক্তিকেই অধিক মাত্রায় ব্যবহার করবেন। সংগঠন থেকেই জন্মলাভ করে একাধিক ধারণা, বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা। সামগ্রিকভাবে সংগঠন যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সরবরাহ করে থাকে সুপ্রশাসক সেসব তথ্য যথাযথভাবে কাজে গালাবেন।

৭। হুকুমকারী প্রভু নন বরং সুপারিশকারী

একজন সুপ্রশাসক হুকুমকারী কিংবা প্রভুরূপী হবেন না। তিনি হুকুমদানের পরিবর্তে অধঃস্তনদের সুপারিশ বা প্রস্তাবের ভিত্তিতে নিজস্ব সুপারিশ দেয়ার পদ্ধতিকে অধিক শ্রেয় বলে মনে করেন। সুপ্রশাসক শুধু ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তবে দায়িত্ব পালনের জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই তিনি কর্তৃত্বের অধিকার প্রয়োগ করবেন। কিন্তু সচরাচর বিশেষ পরিস্থিতির জন্যই তাঁকে ক্ষমতার দণ্ড হাতে রাখতে হবে।

---

২৭. Paul H. Appleby, Public Administration for A Welfare State. এ. টি. এম. শামসুদ্দীন (অনূদিত), গণকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও জনশাসন, (ঢাকা : NILG, ১৯৬৪), পৃ. ৫১।

৮। উত্তম সহযোগী

একজন সুপ্রশাসক হবেন উত্তম সহযোগী। তিনি উপরওয়ালাদের যে সম্মান দিয়ে থাকেন অধঃস্তনদেরও তেমনি শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য। সুপ্রশাসক অবশ্যই শাসিতদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নজর রাখবেন। তাই বলে তিনি 'নরম' নহেন। পরিচালক হিসেবে তিনি হবেন দৃঢ়চিত্তের, কিন্তু ন্যায়বিচারক।

৯। অন্যের মতামত গ্রহণ

একজন সুপ্রশাসক শাসন প্রণালীকে উন্নততর করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সকল মহলের মতামত আহ্বান করে থাকেন। বস্তুত কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি স্বীয় উদ্যোগেই প্রশ্নের অবতারণা করবেন। যদিও প্রচলিত নিময়-কানুন কার্যকর করা একজন সুপ্রশাসকের অন্যতম কাজ, তবুও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে অর্থবহ প্রশাসন গড়ে তোলার স্বার্থে তিনি একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন।

৫.৪.৭ জাতিসংঘের দৃষ্টিতে সুপ্রশাসকের গুণাবলী
Qualities of a good administrator according of UNO

জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাগ কর্তৃক ১৯৬১ সালে প্রকাশিত, A Handbook of Public Administration গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে সরকারের দায়-দায়িত্ব এতই জটিল আকার ধারণ করেছে যে, কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই তা অদক্ষ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা সম্ভবপর হয় না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ, শিল্পোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও আবাসিক প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা- কৃষি বিষয়ক জটিল ও উচ্চ পর্যায়ের বিশেষায়িত ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার জন্য সুযোগ্য ও প্রশিক্ষিত কর্মচারী একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও প্রশিক্ষিত ও সুযোগ্য প্রশাসক হওয়ার আরও বহুবিধ কারণ আমরা দেখতে পাই। অধ্যাপক বরসন (Prof. Robson) এর ভাষায়, আমরা আজ এক প্রশাসনিক যুগে বাস করছি। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আমাদের জীবনে প্রশাসনের স্পর্শ রয়েছে। যেমন সরকারী মাতৃসদনে জন্ম হওয়া শিশু একটু বড় হয়ে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে এবং কর্ম জীবনেও সরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে নতুবা সরকারী সাহায্যপুষ্ট বা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। আবার অবসরকালীন জীবনেও সরকারী পেনশন ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগের উপর অনেককে নির্ভর করতে হয়।

এখানে সর্বক্ষেত্রেই লোক বা সরকারী প্রশাসক থাকে গাইড (Guide) স্বরূপ। অতএব, তিনি যদি সুদক্ষ সৎ ও ন্যায়বান না হন, তাহলে মানুষ সরকারের কাছ থেকে তাঁর ন্যায্য সেবা পাবে না। এজন্য প্রশাসককে হতে হবে উৎকৃষ্ট সকল গুণে গুণান্বিত।

জাতিসংঘের মতে, উন্নয়নশীল দেশের একজন সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই– 'সৎ ও নিঃস্বার্থপর' 'মেধাবী', 'কর্মঠ ও সুদক্ষ', 'বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ', 'নিরপেক্ষ' এবং 'কর্তব্যপরায়ণ'।[২৮] নিম্নে জাতিসংঘের দৃষ্টিতে সুপ্রশাসকের এ সকল গুণাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। সততা ও নিঃস্বার্থপরতা

একজন সুপ্রশাসককে অবশ্যই হতে হবে সৎ এবং নিঃস্বার্থপর। কেননা একজন স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার তথা প্রশাসক দ্বারা জনস্বার্থ সংরক্ষণ বা সেবা প্রদানকারী প্রশাসন চালানো কোন মতেই সম্ভব নয়। একজন অসৎ প্রশাসকের কাছে জাতীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া "বিড়ালকে ভাজি করা মাছের পাহারাদার" নিয়োগের সামিল। কেননা তিনি সবসময়ই নিজের স্বার্থ চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। তাই একজন সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই নিঃস্বার্থপর। তিনি সবসময় শাসিত জনগণের ব্যাপক কল্যাণের চিন্তায় মশগুল থাকবেন। কিভাবে ব্যাপক হারে জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়– এ চিন্তা সবসময়ই তাঁর মাথায় থাকবে। তিনি যদি নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তবে শাসিত জনগণের মধ্যে ব্যাপক হারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। তাই বিভিন্ন দেশে প্রশাসকদের নিয়োগের ক্ষেত্র সচ্চরিত্রের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২। মেধা

একজন সুপ্রশাসককে অবশ্যই মেধাবী হতে হবে। জাতিসংঘের মতে, "বস্তুত মেধা ও যোগ্যতাভিত্তিক জীবনবৃত্তি চাকরি আধুনিক লোক প্রশাসকের প্রাণস্বরূপ"।[২৯] এজন্য প্রশাসনে নিয়োগের সময় বিভিন্ন দেশে মেধাভিত্তিক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। বিষয়ভিত্তিক ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যাঁরা নিজেদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা প্রমাণ করতে পারবেন, কেবল তাঁদেরই প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ ও ঊর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি লাভের অধিকার থাকা

---

২৮. মোহাম্মদ শামসুর রহমান অনূদিত, লোক প্রশাসন সার (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ১৮।
২৯. মোহাম্মদ শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

উচিত। একজন মেধাবী প্রশাসকের স্থলে অযোগ্য প্রশাসক আসলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জড়তা আসতে বাধ্য। তাই সুপ্রশাসককে হতে হবে অবশ্যই মেধাসম্পন্ন।

৩। কর্মঠ ও সুদক্ষ

একজন সুপ্রশাসক হবেন সুদক্ষ ও কর্মঠ। প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকলে যে কোন কর্মই ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু কাগুজে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে কোনকর্ম বাস্তবায়ন করা যায় না। এজন্য প্রশাসককে অবশ্যই কর্মঠ তথা কাজের প্রতি আগ্রহী এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে।

৪। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ

সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। সরকারী নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বহুক্ষেত্রে প্রশাসকদের নিতে হয় সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত। অতএব, যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা একজন সুপ্রশাসকের থাকা একান্তই প্রয়োজন। তাই সুপ্রশাসক হবেন মেধাসম্পন্ন। নতুবা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে।

৫। নিরপেক্ষতা

নিরপেক্ষতা সুপ্রশাসকের অনন্য একটি গুণ। প্রশাসক নিরপেক্ষ না হলে ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। কেননা স্বজনপ্রীতি তাঁকে অন্ধের ন্যায় অন্যায়-অবিচারের প্রতি আকৃষ্ট করবে। তাই জাতিসংঘের দৃষ্টিতে একজন সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন। ন্যায়বিচার তথা সাম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন একজন সুপ্রশাসক।

৬। কর্তব্যপরায়ণতা

সর্বোপরি, একজন সুপ্রশাসক হবেন অবশ্যই নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ। স্বীয় কর্তব্য কর্ম সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে পালন করা একজন সুপ্রশাসকের বৈশিষ্ট্য। স্বীয় কর্তব্যের প্রতি উদাসীন হলে শাসিত জনগণের জন্য ঐ প্রশাসক অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ প্রশাসকই সমাজে উন্নতি ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারেন। তাই জাতিসংঘের দৃষ্টিতে একজন সুপ্রশাসককে অবশ্যই অন্যান্য গুণাবলির পাশাপাশি একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে।

৫.৪.৮ পল. এইচ. এপ্‌লবি, জাতিসংঘ এবং হযরত আলী (রা)-এর দৃষ্টিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সুপ্রশাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী

সারণি-২

Table-2

সুপ্রশাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী

পল এইচ এপলবি	জাতিসংঘ	হযরত আলী (রা)
১। চারিত্রিক দৃঢ়তা	১। সৎ ও নিঃস্বার্থপর	১। খোদাভীরুতা
২। স্বীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যবোধ	২। মেধাবী	২। ন্যায়পরায়ণতা
৩। দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ ও জবাবদিহিতার মনোভাব	৩। কর্মঠ ও সুদক্ষ	৩। সৎ ও সৎকর্মের প্রতি আস্থাশীলতা
৪। উত্তম শ্রোতা ও সমস্যার সমাধানকারী	৪। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ	৪। ক্ষমাশীলতা
৫। সংবেদনশীলতা	৫। নিরপেক্ষতা এবং	৫। সুবিচার ও ইনসাফকারী
৬। সাংগঠনিক শক্তির উপর আস্থাশীলতা	৬। কর্তব্যপরায়ণতা।	৬। জনগণের অভিযোগ শ্রবণকারী
৭। হুকুমকারী প্রভুরূপী নন এবং সুপারিশকারী		৭। জনগণের আস্থাভাজন
৮। উত্তম সহযোগী এবং		৮। আত্মনিয়ন্ত্রণকারী এবং
৯। অন্যের মতামত গ্রহণ।		৯। ইবাদতকারী ও আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী।

উৎস : Paul H. Appleby, Public Administration for A Welfare State, এ. টি. এম. শামসুদ্দীন অনূদিত, গণকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও জনশাসন (ঢাকা : NILG, ১৯৬৪); মোহাম্মদ শামসুর রহমান, লোক প্রশাসন সার (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯) এবং হযরত আলী (রা), একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি, মনজুর আহসান অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩)।

৫.৪.৯ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, জাতিসংঘ, পল. এইচ. এপ্লবি, আল ফারাবী, ইমাম আল গাজ্জালী (১০৫৮–১১১১) এবং হযরত আলী (রা) পাঁচজনেরই দৃষ্টিতে সুপ্রশাসকের গুণাবলী প্রায় একই ধরনের। প্রত্যেকের আলোচনায় এটি এসেছে যে একজন সুপ্রশাসক অবশ্যই সচ্চরিত্রের অধিকারী, গণতন্ত্রমনা এবং ন্যায় ও কল্যাণমূলক কর্মের প্রতি আগ্রহশীল হবেন। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে এগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী। এছাড়াও একজন সুপ্রশাসক হবেন স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল। এভাবে পুরো আলোচনায় দেখা যায় যে, সুপ্রশাসকের গুণাবলী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের চিন্তাধারার মধ্যে একটা সুন্দর সাদৃশ্য রয়েছে। তবে হযরত আলী (রা)-এর মতে, ইসলামী রাষ্ট্রে একজন সুপ্রশাসককে অন্যান্য সাধারণ গুণাবলীর সাথে সাথে, অবশ্যই হতে হবে খোদাভীরু ও নিয়মিত ইবাদতকারী। তাঁর মধ্যে থাকবে একই সাথে জনগণ ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চেতনা। এছাড়াও তিনি হবেন প্রতিটি পরিস্থিতিতে আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী।

এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে ইসলামী জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সুপ্রশাসকের জন্য নিম্নোক্ত সাধারণ গুণাবলী চিহ্নিত করা যেতে পারে–

১। সচ্চরিত্রবান;

২। কর্তব্যপরায়ণ ও বিচক্ষণ;

৩। ন্যায়বিচার ও ইনসাফকারী;

৪। অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব, সংবেদনশীলতা ও জবাবদিহিতার মানসিকতা এবং

৫। সর্বোপরি জনগণের আস্থাভাজন।

একটি দেশের প্রশাসকগণ যদি এসকল সাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন হন, তবে বিশিষ্ট দার্শনিক এরিস্টটল (Aristotle) এর ভাষায়, ঐ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়বিচার এবং জনজীবন হবে সুখি ও আনন্দময়। আধুনিক অর্থেও এটি পরিণত হবে প্রকৃত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে।

প্রশ্নাবলী

১. ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী আলোচনা করো।
(Define Islamic State. Discuss the formation of Islamic State.)

২. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কে হতে পারেন? ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের গুণাবলিসমূহ বর্ণনা করো।
(Describe the qualities of Head of Islamic State.)

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করো।
(Describe the duties and responsibilities of Head of Islamic State.)

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকারসমূহ বর্ণনা করো।
(Discuss the rights of Head of Islamic State.)

৫. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুতির প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।
(Discuss the process of dismissal of Head of Islamic State.)

৬. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের গঠন প্রণালী বর্ণনা করো। ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাহীদের গুণাবলী আলোচনা করো।
(Explain the formation of executive of Islamic State. Discuss the qualities of executives of Islamic State.)

৭. হযরত আলী (রা)-এর দৃষ্টিতে সুপ্রশাসকের গুণাবলিসমূহ কি কি? ব্যাখ্যা করো।
(What are the qualities of good rulers according to Hazrat Ali (R). Explain.)

৮. আল ফারাবীর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনির্বাহীদের গুণাবলীসমূহ বর্ণনা করো।
(Discuss the qualities of executives of State according to Al Farabi.)

৯. সুলতান সোলজারের মতে প্রশাসকের সাফল্যের উৎসসমূহ কি কি?
(What are the sources of success of executives according to Sultan Solzer.)

১০. পল. এইচ. এপলবি'র দৃষ্টিতে সুপ্রশাসকের গুণাবলিসমূহ বর্ণনা করো।
(Discuss the qualities of a good administrator according to Paul. H. Appleby.)

১১. জাতিসংঘের দৃষ্টিতে সুপ্রশাসকের গুণাবলিসমূহ বর্ণনা করো।
(Discuss the qualities of a good administmtor according to United Nations Organisation-UNO.)

৬

মহানবী (সা)-এর সচিবালয়

Secretariat of Prophet (Sm)

৬.১ ভূমিকা (Introduction)

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মদীনার এ রাষ্ট্রটি ছিল মানব জাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনা, কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষতাকে সুসংবদ্ধকরণ ও সমন্বয় সাধন এবং কার্যকরীভাবে সকল পর্যায়ে তদারকি নিশ্চিত করার জন্য এ রাষ্ট্রের ছিল এক মজবুত প্রশাসনিক কাঠামো, রাষ্ট্র ও তার কর্মনীতি ছিল বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, ছিল একটি শক্তিশালী সচিবালয়। মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো রচিত হয় ইসলামী সমাজের প্রকৃতি, কর্মসূচী, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে। মদীনা রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো একদিনে গড়ে উঠেনি। রাসূল (সা) পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিকাশমান পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো ও সচিবালয় সংগঠন সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সচিবালয়ে ছিল বিভিন্ন দফতর ও বিভাগ। বিভাগীয়[১] কার্যাবলি ছিল বিভিন্ন সাহাবীর উপর ন্যস্ত। মদীনা রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা ছিলেন নিরন্তর কর্মরত। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দক্ষতা, সততা, দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা,

---

১. বর্তমানে, রাষ্ট্রসমূহে সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলি কতকগুলো মন্ত্রণালয়ে বিভক্ত থাকে। মন্ত্রণালয়ে থাকে এক বা একাধিক বিভাগ। কাজের সুবিধার জন্য একটি বিভাগ (Division), কয়েকটি উপ-বিভাগ ও শাখায় (Section) বিভক্ত থাকে। মন্ত্রণালয় হল সচিবালয়ের এক একটি সাংগঠনিক একক (Unit)। এর সর্বোচ্চ স্তরে থাকেন রাজনৈতিক প্রধান (Political Head)। কোন কোন মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি, আর কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি হলেন মন্ত্রী। কোন কোন মন্ত্রী এক বা একাধিক প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীর সহায়তা লাভ করেন। দ্বিতীয় স্তরে থাকেন সচিব (Secretary)। তিনি প্রশাসনিক প্রধান (Administrative head)। তৃতীয় স্তরে থাকেন পরিচালক, মহাপরিচালক, ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রমুখ কর্মকর্তাগণ।

ঐকান্তিকতা ও জবাবদিহিতার অনুভূতি[২] নিয়ে শৃঙ্খলা ও কঠোরতার সাথে সুযোগ্য সাহাবীগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে উত্তরসূরিদের জন্য রেখে গেছেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সবকিছুর উপর তাঁরা স্থান দিয়েছিলেন আদর্শিক স্বার্থকে। তাদের ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, যোগ্যতা, কর্তব্যবোধ, কর্মমুখরতা, আন্তরিকতা, দায়িত্বানুভূতি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ ইসলামের সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। উম্মতে মুসলিমা পৌঁছেছিল তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। মদীনা রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিতদের সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার দৃষ্টান্ত দেখে তখনকার মুসলিম জনগণ ন্যায় ও কল্যাণের পথে অনুপ্রাণিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল। সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের সুন্দর-সুষ্ঠু পরিকল্পনা, জবাবদিহির একটি সর্বাত্মক ব্যবস্থা, কর্তব্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপর থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন তখনকার গোটা সমাজদেহকে কর্মচঞ্চল করে তুলেছিল। তাই তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা ও কার্যক্রম আজ মুসলিম মিল্লাতের গর্বের বিষয়, অনুকরণ ও অনুসরণীয় মডেল। তাদের কার্যক্রমই এখানকার আলোচ্য বিষয়।

৬.২ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সচিবালয়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Secretariat of Prophet [Sm])

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সচিবালয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। যেমন−

১। সমগ্র সচিবালয় ব্যবস্থাটি ছিল স্তর ভিত্তিতে (Hierarchically) সংগঠিত। উদাহরণস্বরূপ, সবিচালয়ের শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)। তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীলগণ কর্মরত থাকতেন। তবে সচিবালয় স্তর ভিত্তিতে সংগঠিত হলেও এর কার্যক্রম আনুভূমিক (Horizontal) পর্যায়েও বিস্তৃত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীর কর্মপরিধি ছিল বিশেষ আওতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

২। মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোয় যেসব সাহাবীগণ নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা কর্মসম্পাদন বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছিলেন বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন তাদের প্রশিক্ষক। তাঁর কাছ থেকে সবাই বিভাগীয় কর্মে প্রশিক্ষণ লাভ করতেন।

---

২. এ জবাবদিহির অনুভূতিই মদীনা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তদারক করত। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা ছিল মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর সামনে একদিন দায়িত্বপূর্ণ পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও কাজের হিসাব দিতে হবে এ একান্ত অনুভূতি।

৩। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সচিবালয় ছিল মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ। প্রশাসনের প্রতিটি দফতর ও বিভাগ ছিল একাধিক কর্মসম্পাদনের উপযোগী (Multifunctional)। প্রশাসনিক কাজ মুখ্য হলেও প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব ছিল ইসলামী রাষ্ট্র নামক নেয়ামতের আওতায় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকেরও অগ্রগতি সাধন। উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যেক এলাকায় মসজিদ ছিল। বিভিন্ন গোত্রেরও স্ব স্ব মসজিদ ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত ওয়ালী (গভর্ণর)-গণ এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও বড় বড় গোত্রে নিযুক্ত আমিলগণ সেখানকার প্রধান মসজিদে নামাজের ইমাম ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য মসজিদসমূহের এলাকায় যিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকতেন তিনি উক্ত মসজিদে ইমামতি করতেন। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার কার্যসম্পাদনও তাদেরই দায়িত্ব ছিল। তবে কয়েকটি স্থানে শাসনকর্তা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বিচার বিভাগীয় দায়িত্বও পালন করতেন। কতকক্ষেত্রে শানকর্তা ও বিচারপতি পৃথক পৃথক ব্যক্তি হতেন।

৪। সচিবালয়ের প্রতিটি একক রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতিমালা অনুসরণ করত। নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নির্দেশ ও পারস্পরিক পরামর্শের[৩] উপর নির্ভর করতেন।

৫। সচিবালয় প্রশাসনের ছিল দু'টি প্রধান দিক। একটি হলো নীতিনির্ধারণ কেন্দ্র (Policy making center)। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এবং জ্ঞানী ও প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামদের (রা) নিয়ে গঠিত 'মজলিসে শূরা' ছিল এর প্রাণকেন্দ্র। অন্যটি হলো সরেজমিনে প্রশাসন (Field administration)। ওয়ালী শাসিত প্রদেশ ও আমিল শাসিত অঞ্চল ও বড় বড় গোত্রগুলো ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

৬। মদীনা রাষ্ট্রে সরকারি কার্যক্রমের বণ্টন বিভিন্ন ভিত্তিতে সংগঠিত হত।

---

৩. আল্লাহ বলেন-

شَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ (শা-উইরহুম ফিল আমরি)

"সকল ক্রিয়াকর্মে তাদেরকে পরামর্শ দিবে।" (৩ : সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

وَأَمْرُهُمْ شُوْرى بَيْنَهُمْ (ওয়া আমরুহুম শূরা বাইনাহুম)

"তারা তাদের ক্রিয়াকর্ম নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতেই পরিচালনা করে থাকে।" (৪২ : সূরা আশ শূরা : ৩৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) এত বড় সম্মান মর্যাদা ও অহী পাওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও সাহাবাদের সাথে খুব বেশি পরামর্শ করতেন। খ্যাতনামা জ্ঞানী ও প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরামর্শ অত্যন্ত সুবিদিত। হাদিস ও সীরাত গ্রন্থসমূহ এ ধরনের ঘটনাবলিতে পূর্ণ।

প্রথমত কার্যক্রম বা লক্ষ্যের ভিত্তিতে (Purpose) : লক্ষ্যের ভিত্তিতে সর্বত্রই কার্যক্রম বণ্টিত হত। যেমন– মদীনা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে বিভাগ তা ছিল প্রতিরক্ষা বিভাগ। দ্বিতীয়ত কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে (Work process) : পদ্ধতিগতভাবে যে বিভাগ জনস্বাস্থ্যের কার্যক্রমে রত ছিল তা হলো জনস্বাস্থ্য বিভাগ। তৃতীয়ত যে জনগোষ্ঠী সচিবালয়ের কার্যক্রমে উপকৃত হবেন তার ভিত্তিতে (Clientele) : দাওয়া বিভাগ, যাকাত, খারাজ ও সাদাকাহ তহবিল বিভাগ এ ভিত্তিতে গড়ে উঠে। চতুর্থত ভৌগোলিক কারণ বা প্রশাসনিক সুবিধার ভিত্তিতে (Geography or administrative convenience) স্থানীয় সরকার বিভাগ এ ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

৭। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য লোক সংগ্রহ (Recruitment) নীতির ভিত্তি ছিল অর্জন (Achievement) নীতি। মদীনা রাষ্ট্রের গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামো পরিচালিত হত এ অর্জন নীতির ভিত্তিতে। পারিবারিক সুনাম, গোত্রীয় প্রতাপ, বিত্ত-সম্পদ রাসূলুল্লাহ (সা) কে দায়িত্বশীল নিয়োগে উৎসাহিত করত না। তাকওয়াই ছিল লোক বাছাইয়ের মাপকাঠি। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য, তাকওয়া, আদর্শের সঠিক জ্ঞানের পরিসর, প্রশাসনিক প্রজ্ঞা, যোগাযোগ দক্ষতা, আমানতদারি, কর্মের দৃঢ়তা, সাহস ও ন্যায়পরায়ণতা (Courage, Equity and Justice) পদের প্রতি লোভহীনতা ইত্যাদির দিকে নজর রেখেই কাউকে কোন দায়িত্বে নিয়োজিত করা হতো।

৮। মদীনা রাষ্ট্রের সচিবালয় কাঠামোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণ প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার (Accountability) এক অত্যুজ্জ্বল নজীর স্থাপন করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনে নাগরিকদের প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতার নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। তারা একাধারে দায়ী ছিলেন–

(১) আল্লাহর কাছে, (২) আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কাছে, (৩) নাগরিকদের কাছে। দায়িত্বশীলতার নীতির আওতায় তাদের ক্ষমতা ছিল একটি ন্যাসী ক্ষমতা (Trust) আর তা তারা প্রয়োগ করতেন জনসমক্ষে। বস্তুত যে ক্ষমতা জনসমক্ষে প্রয়োগ করা হয় তা হয় ন্যায়ভিত্তিক ও জনকল্যাণমূলক। আজকের দিনে রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসনিক এলিটরা যেভাবে নীতিনির্ধারক ও নীতি বাস্তবায়নকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন আর নিজেদের কার্যাবলিকে অভ্রান্ত মনে করে, জনগণের জানবার অধিকারকে অস্বীকার করে ও নিজেদের অধিকার আর বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে বিধিবিধানের আড়ালে সযত্নে সংরক্ষণ করে এক

রুদ্ধদ্বার কর্মব্যবস্থা (A sheltered working system) গড়ে তুলেছেন মদীনার ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সচিবালয় সংগঠন ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বে সেখানে হয়েছিল মানবতার সুষ্ঠু বিকাশ ও স্ফুরণ। দক্ষতা ও সুষ্ঠু কার্যক্রমের আওতায় নির্দিষ্ট সময়সূচি, নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী সেখানে সঠিক কার্যসম্পাদন সম্ভব হয়েছিল।

৬.৩ সচিবালয়ের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগসমূহ (Various Ministry and Divisions of the Secretariat)

১। **রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ :** মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান। হযরত হানযালা বিন আল রবী ইবনে আসদি (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একান্ত সচিব।[৪] তাঁর আর একজন সচিব ছিলেন হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসান (রা)।[৫] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ও হযরত বেলাল (রা)।[৬] মসজিদে নববীতে আযান দেয়া ছাড়াও হযরত বেলাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতেন।[৭]

২। **সীলমোহর সংরক্ষণ বিভাগ :** প্রতিনিধিদের মারফত রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করতেন, তখন সেসব পত্রের সত্যতা যাচাই করার জন্য পত্রের উপর তাঁর সীলমোহর প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতদুদ্দেশ্যেই তিনি একটি মোহরাঙ্কিত আংটি তৈরি করিয়ে নেন। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে–

أَرَادَ النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَكْتُبَ اِلٰى كِسْرٰى وَقَيْسَرَ وَالنَّجَاشِيَ
فَقِيْلَ اِنَّهُمْ لَايَقْبَلُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)

(আরাদান নাবী (সা) আইয়্যাকতুবা ইলা কিছরা ওয়া ক্বাইছারা ওয়ান্নাজাশিয়া

---

৪. আল-জাহশিয়ারী, কিতাব আল-উযারা ওয়া আলকুতবাত, কায়রো, ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ১২।

৫. মেজর জেনারেল আকবর খান, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১১৩।

৬. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, গাওছিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৫।

৭. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, ঐ, পৃষ্ঠা ৫৫।

ফাকীলা ইননাহুম লা ইয়াকবালূনা কিতাবান ইল্লা বিখাতামিন কাছাআ' রাসূলুল্লাহ (সা)।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) রোম ও পারস্য সম্রাট, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর নিকট পত্র পাঠাতে ইচ্ছুক হলে তাঁকে বলা হলো অনারব কোন সম্রাট কিংবা বাদশাহ সীলমোহরাঙ্কিত পত্র ছাড়া অন্য কোন প্রকার চিঠিপত্র গ্রহণ করেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি মোহরাঙ্কিত আংটি তৈরি করিয়ে নেন।[৮] সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে–

كَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةُ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللهُ سَطْرٌ.

(কানা নাকসুল খাতামি ছালাছাতুন আসতুরিন মুহাম্মাদুন সাতরুন ওয়ারাসূলু সাতরুন ওয়াল্লাহু সাতরুন)

অর্থাৎ মোহরাঙ্কিত আংটিতে তিনটি লাইন ছিল। প্রথম লাইন 'মুহাম্মাদ', দ্বিতীয় লাইনে 'রাসূল' এবং তৃতীয় লাইনে 'আবদুল্লাহ' শব্দটি ছিল।[৯] এ মোহর সংরক্ষণ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুকার ইবনে আবি ফাতিমা (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আংটিটি তার নিকট সংরক্ষিত থাকত। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তিনি এ সীলমোহর ব্যবহার করতেন।[১০] পরবর্তীতে তার অনুপস্থিতিতে হযরত হানজালাহ বিন আল রাবী (রা)ও এ বিভাগে দায়িত্ব পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যে সীলমোহর ব্যবহার করতেন তার একটি নমুনা এখনও অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। একটি স্বর্ণ মুদ্রার উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ সীলমোহর বহুকাল ধরে তুরস্ক সরকার সংরক্ষণ করছেন। স্বর্ণ মুদ্রাটির একদিকে এ খোদিত সীলমোহর বিদ্যমান। তুরস্কের ইপকাপি প্যালেস মিউজিয়ামের ধর্মীয় স্মারক বিভাগে সীলমোহরটি জনসাধারণকে দেখানোর জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।[১১]

৩। **অহী লিখন বিভাগ :** কুরআন পাকের হেফাজতের প্রকৃত পন্থা ছিল যদিও

---

৮. সহীহ মুসলিম, দ্র. মাওলানা মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ. এস. এম. ওমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১০০।

৯. সহীহ আল বুখারী। দ্র. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০০।

১০. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, ইসলাম; রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুলাই ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৪৩। দ্র. আল জাহশিয়ারী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২। সিরাজুম মুনীরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৭।

১১. সাপ্তাহিক মিজান, ১০ অক্টোবর ১৯৮২ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত।

কণ্ঠস্থ করা, তবুও রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমেও তার হেফাজতের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্টদের কাতিব বলা হত। অহী লিখন বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক জড়িত ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)। তিনিই অধিকাংশ কাজ করতেন। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ অহী লিপিবদ্ধ করতাম। তাঁর উপর যখন অহী নাযিল হত তখন তিনি দেহে খুব তাপ অনুভব করতেন এবং তাতে তাঁর দেহ মোবারকে মুক্তার ন্যায় ঘামের ফোটা পরিলক্ষিত হত। অতঃপর এ অবস্থা শেষ হলে আমি হাড় বা অন্য কোন বস্তুর অংশের উপর তা লিপিবদ্ধ করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলতে থাকতেন, আমি লিখতে থাকতাম। লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন পাঠ করো, আমি পাঠ করতাম, যদি আমার লেখায় কোন ভুলভ্রান্তি হত তিনি সংশোধন করে দিতেন।"[১২] অহী লিপিবদ্ধ করার কাজ শুধু যায়েদ (রা)-ই করতন না, এ মহান দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের সংখ্যা প্রায় বিয়াল্লিশ জন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।[১৩] অহী লিপিবদ্ধকরণের কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন– হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত ওসমান গণী জিননুরাইন (রা), হযরত আলী মুর্তজা (রা), হযরত উবাই ইবনে কাব (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন সারাহ (রা), হযরত জোবায়ের বিন আল আওয়াম (রা), হযরত খালেদ বিন সাইদ (রা), হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা), হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রা), হযরত মুগীরা বিন শোবা (রা), হযরত মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা), হযরত হানযালা ইবনে রাবি (রা), হযরত মুআইকাব ইবনে আবি ফাতিমা (রা) প্রমুখ সাহাবী।[১৪]

৪। রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি সম্পর্কীয় বিভাগ : হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত হলে ৭ম হিজরীর গোড়ার দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী আরব-বহিরারবের বিভিন্ন

---

১২. সহীহ আল বুখারী, দ্রঃ তাফসীরে নূরুল কুরআন, ১ম খণ্ড, মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৭। আরো দেখুন, ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআন পরিচিতি, নুবালা পাবলিকেশন্স, মে ১৯৯২, পৃ. ১২।

১৩ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭।

১৪ মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭-১৮। দ্র. যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫; আল জাহশিয়ারী, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১১।

অমুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের কাছে দীনের দাওয়াত ও আহ্বান পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আলাদাভাবেই এ বিভাগের পত্তন করেন। এ দাওয়াতনামা ছিল লিখিত এবং যা অষ্টম হিজরীর কিছুকাল পর্যন্ত পেশ করা চালু থাকে। এ বিভাগের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতদের প্রধান কাজ ছিল দীন ইসলামের সঠিক আহ্বান পৌছানো। কোন কোন সময় রাজনৈতিক অন্যান্য উদ্দেশ্য ও প্রতিনিধিদের মারফত ব্যক্ত করা হত। রাষ্ট্র দূতরা রাসূল (সা)-এর পত্র বহন করে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে পৌছে দিতেন। নিচে কয়েকজন রাষ্ট্রনায়ক ও পত্রবাহকের নাম উল্লেখ করা হলো :

ক্রঃ নং	রাষ্ট্রপ্রধানের নাম	দেশের নাম	নবী (সা)-এর দূত, (পত্রবাহক)
১।	সম্রাট হিরাক্লিয়াস (কাইসার)	রোম সাম্রাজ্য	হযরত দেহইয়া ইবনে কালবী (রা)[১৫]
২।	সম্রাট নওশেরাওয়াঁ কিসরা (খসরু পারভেজ)	পারস্য সাম্রাজ্য	হযরত আবদুল্লাহ বিন হোজাইফা শাহ্মী (রা)[১৬]
৩।	বাদশাহ নাজ্জাসী	হাবশা (আবিসিনিয়া)	হযরত আমর বিন উমাইয়াতুজ জামিরী (রা)[১৭]
৪।	বাদশাহ জুরায়য ইবনে মাত্তা মকুকাশ (কিবতী নেতা)	মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার রোমক শাসনকর্তা	হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতায়া (রা)[১৮]
৫।	হাওয়া বিন আলী	ইয়ামামার শাসক	হযরত সোলাইত বিন আমর আমেরী (রা)[১৯]
৬।	হারিস বিন আবু শিমার গাস্সানী	হাওরান এলাকায় (বসরা) হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি	হযরত সুজা বিন ওয়াহাব আসদী (রা)[২০]
৭।	সুহরাবিল	সিরিয়ার দামেশকের গাস্সান বংশীয় খৃস্টান রাজা	ঐ[২১]
৮।	জুলুন্দির পুত্রদ্বয় জায়ফর ও আবদ	আম্মানের শাসনকর্তা	হযরত আমর ইবনে আস (রা)[২২]
৯।	মুনজের বিন ছাওয়া আবদি	বাহরাইনের বাদশাহ	আলা ইবনে হাজরামী (রা)[২৩]

১৫. Arabia, The Islamic World Review. February, letter from Prophet to an Emperor. পৃষ্ঠা ৬৫। রোম সম্রাটের কাছে দেয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিঠিটি বর্তমানে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে হলি রেলিক (Hely Relic) বিল্ডিং এ জনসাধারণের দেখার সুবিধার্থে সংরক্ষিত ও উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে। জর্ডানের হাশেমী রাজবংশ

উত্তরাধিকার সূত্রে পত্রটি সংরক্ষণ করে আসছে। পত্রটির একাংশ নিম্নরূপ, "I arge you to heed the call to adopt Islam. Accept Islam and you will be in peace and security. You will be doubly rewarded by Allah. But if you should turn away. You shall bear the sin of all people. O people of the Holy scriptures. come to the true word of God that will make us one community. (He commands us) not to worship any other God but Allah, and not to associate him with any other partners whosoever, let us not have people from among to us and make them Lords and masters besided God. And when you entrust yourselves to God they say : Bear withness that we are Muslims." এখানে উল্লেখ্য যে, রোম সম্রাট ইসলাম কবুল করেননি। মুতার যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন (মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল) দ্র: মোস্তফা হারুন, হযরতের পত্রাবলি, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৩৪।

১৬. মোস্তফা হারুন, হযরতের পত্রাবলি, সৌখিন প্রকাশী, ঢাকা ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৩৬। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত হযরত আবদুল্লাহ বিন হোজাইফা শাহমী (রা) এ পত্র বাহরাইনে পারস্য সম্রাটের শাসনকর্তাকে দিলে তিনি সম্রাট কিসরা অবধি তা পৌছিয়ে দেন। কিসরা পত্র পড়ে ক্রোধে তা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে দেন।

১৭. মোস্তফা হারুন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬। আরো দেখুন, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৩৭৬। এ পত্রের একাংশের অনুবাদ নিম্নরূপ : আমি আপনাকে এবং আপনার শাসনাধীন হাবশী জনতাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি। আমি আল্লাহর আদেশ আপনার কাছে পৌছে দিলাম, আপনি তা মেনে নিন। যিনি সঠিক রাস্তা অনুসরণ করবেন তাঁর উপরই শান্তি বর্ষিত হবে। উল্লেখ্য, বাদশাহ নাজ্জাসী মুসলমান হয়েছিলেন কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে এ পত্রের জবাবে নাজ্জাসী যে পত্র লিখেছিলেন ইবনে ইসহাক তা নকল করেছেন। তাতে ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি আনুগত্যের উল্লেখ রয়েছে।

১৮. মোস্তফা হারুন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭। মকুকাশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রের জবাবে লিখেছিলেন, আমি আপনার পত্র পড়েছি, আপনি এতে যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমি জানতাম এখনও একজন নবী অবশিষ্ট রয়েছেন কিন্তু আমার ধারণা ছিল তাঁর আবির্ভাব হবে সিরিয়া থেকে। আমি আপনার দূতের সম্মান করেছি। কিতাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি রয়েছে এমন দু'জন দাসী, কিছু কাপড় ও ১টি ঘোড়া উপঢৌকন দিলাম। উল্লেখ্য, দাসীদের নাম হচ্ছে মারিয়ায়ে কিতবীয়া ও শিরীন, ঘোড়াটির নাম দুলদুল। ঘোড়াটি হযরত মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকাল অবধি জীবিত ছিল।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮। পত্রের উত্তরে হাওজা বিন আলী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লিখেন, "যেদিকে আপনি আহ্বান করেছেন, তা সত্যেই ভালো ও সুন্দর বিষয়।" তিনি পত্র বাহক হযরত সোলাইত বিন আমর (রা)-কে যথেষ্ট সম্মান করে পত্রের উত্তরসহ বিদায় করেন।

৫। **পত্র এবং নির্দেশাবলী লিখন ও অনুবাদ বিভাগ :** রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশাবলী, বিভিন্ন লিখিত ফরমান, প্রবর্তিত আইন-কানুন, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র লিখন, সন্ধি চুক্তি তৈরি এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলী, গোপন পত্রাদি[২৪] ও অন্যান্য চিঠিপত্র অনুবাদ এ বিভাগের দায়িত্বে ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রা)[২৫] ও আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম (রা) এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২৬]

৬। **অভ্যর্থনা বিভাগ :** রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশাসনিক দফতরে সবসময় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় লেগে থাকত। তাই শৃঙ্খলার স্বার্থে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ও হযরত বারাহ (রা) অভ্যর্থনা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২৭] তারা অভ্যাগতদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিতেন। একদিকে সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাচ্ছন্দ্য সাক্ষাৎ, অন্যদিকে কোন কুমতলব হাসিলকারী যাতে তার ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করতে না পারে, সেজন্য সংগঠিত হয়েছিল এ বিভাগ।[২৮]

৭। **দাওয়া বিভাগ :** এ বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে দায়ী (প্রচারক), মুবাল্লিগ ও উস্তাদদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের নিকট প্রেরণ করতেন। দায়ীদের দায়িত্ব ছিল ত্রিবিধ- (১) দীনের

---

২০. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯।

২১. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা ৪০, দ্রঃ সিরাজুম মুনীরা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৪৫।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৫, দ্রঃ সিরাজুম মুনীরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫, কৌতূহলী পাঠককে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) রচিত যে ফুলের খুশবুতে সারাজাহান মাতোয়ারা', বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

২৪. হযরত যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বললেন, "আমার কাছে এমন ধরনের চিঠিপত্রও আসে যা সর্বসাধারণের জানা সঙ্গত নয়। কাজেই তুমি কি হিব্রু ভাষা লিখতে পারবে।" আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি লিখতে পারব। দ্রঃ সিরাজুম মুনীরা, জমাদিউস সানী, ১৪০৪ হিজরী সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৫।

২৫. আল জাহশিয়ারী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১ দ্র. ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩।

২৬. ডঃ মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেসুর রহমান ও শেখ মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, বুকস প্যাভিলিয়ন, রাজশাহী, ১৯৮১। দ্র. সীরাতুন্নবী স্মরণিকা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৪০৫ হিজরী সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪০।

২৭. সীরাতুন্নবী স্মরণিকা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০।

২৮. সিরাজুম মুনীরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫।

পরিপূর্ণ আহ্বান পৌছানো, (২) দাওয়াত কবুলকারী নও-মুসলিমদেরকে দীনের বিধিবিধান শিক্ষা দেয়া এবং (৩) তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে তোলা।[২৯]

সাহাবীগণ এ দায়িত্ব পালন করতেন। তবে এর মধ্যে আবার কুরআনে হাফেজ ও ক্বারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হত।[৩০]

৮। জাতি ও গোত্রসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বিভাগ : বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত মুগীরা ইবনে সুবা (রা) এবং হযরত হাসান বিন নুসীরা (রা) এ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।[৩১]

৯। প্রতিরক্ষা বিভাগ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সচিবালয়ের বিভিন্ন দফতরের মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগ ছিল অন্যতম। এ বিভাগটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বে মদীনায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর পরই তদানীন্তন বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী খোদাদ্রোহী শক্তি পায়তারা শুরু করেছিল সে রাষ্ট্রটিকে বাস্তবতা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তাই রাষ্ট্রের সার্বিক প্রতিরক্ষার স্বার্থে ইসলামী বিপ্লবের সংঘাতময় পর্বের উত্তরণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক নাগরিককে সুদক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলে ছিলেন। মদীনা রাষ্ট্রে কোন বেতনভোগী নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানই মুজাহিদ হিসেবে রণাঙ্গনে হাজির হতেন। ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপর আগ্রাসী শক্তির ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় উৎসাহী ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতেন। সমগ্র মুসলিম মিল্লাতই যেন ছিল একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী। যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাতেন, আর তারা জান মাল বাজি রেখে এতে অংশ নিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। যোদ্ধাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রে সজ্জিতকরণ এবং সমস্ত মুসলিম সৈন্যদের নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি মহানবী (সা) এর নিজের হাতে ছিল। সাধারণত তিনি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী সর্বাধিনায়ক। কোন কোন ক্ষেত্রে এর জন্য তিনি উপনেতা নির্বাচিত করতেন। সৈন্যগণ ছিলেন পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও বর্শাধারী। রাসূল

২৯. ডঃ মুহাম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬১।

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা ১৬২।

৩১. আল জাহশিয়ারী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২। দ্রঃ শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩। সিরাতুন্নবী স্মরণিকা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০।

(সা)-এর শাসনামলে মুজাহিদদেরকে বহু সংখ্যক অভিযানে গমন করতে হয়। তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং ২৭টি যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেন। প্রয়োজনের সময় তিনি বিভিন্ন সাহাবীগণকেও সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। বিভিন্ন সময়ে মনোনীত কয়েকজন সেনাপতির নাম নিম্নরূপ :

১। হযরত আবু বকর সিদ্দীক বিন আবু কোহাফা (রা)।

২। হযরত ওমর ফারুক বিন আল খাত্তাব (রা)।

৩। হযরত আলী মুর্তজা বিন আবু তালেব (রা)।

৪। হযরত যোবায়ের বিন আল আওয়াম (রা)।

৫। হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা)।[৩২]

৬। হযরত উবায়দা ইবনে সামেত (রা)।

৭। হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)।

৮। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা (রা)।

৯। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)।

১০। হযরত আমর ইবনুল আস (রা)।

সেনাবাহিনী প্রধানত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত থাকত। আল কুরআনের ৬১ নং সূরা, সূরা সাফের ৪ নং আয়াতের[৩৩] নির্দেশ অনুসারে কাতারবন্দী বা সফ করে সৈন্য

---

৩২. প্রথোমক্ত ৫ জন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন আশারায়ে মুবাশশেরার সদস্য। এসব বিখ্যাত সাহাবী সেনাপতিরা দুনিয়াতেই মুমিনদের চূড়ান্ত নিবাস জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। দ্রঃ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইলমুল হাদিস, নূর প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৩৬।

৩৩. সূরা আস সাফের ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-

(ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল্লাযিনা ইউকাতিলুনা ফী সাবীলিহী ছাফফান কাআন্নাহুম বুনইয়ানুম মারছুছ)

"আল্লাহ্ তো ভালোবাসেন সে লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে, যেন তারা ইস্পাত নির্মিত প্রাচীর।" এ আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সে সেনাদলকে পছন্দ করেন– যাদের মধ্যে ৩টি গুণ পাওয়া যায়– (১) তারা খুব বুঝেসুঝে আল্লাহর পথে লড়াই করে, এমন কোন পথে লড়াই করে না যা আল্লাহর পথ নয়। (২) তারা বিচ্ছিন্নতায়, বিশৃঙ্খলতায় লিপ্ত হয় না বরং দৃঢ় শৃঙ্খলার সাথে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। (৩) শত্রুর মোকাবিলায় তারা লৌহ প্রাচীরবৎ হয়ে থাকে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেনাবাহিনী ছিল এ আয়াতেরই বাস্তব নমুনা।

সমাবেশ করা হত। প্রথম সফে (Line) বর্শাধারীগণ বাম হাঁটুতে ভর দিয়ে সামনে ঢাল ধরে শত্রু নিকটবর্তী হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকতেন। বর্শাধারী সৈন্যগণ সাধারণত পদাতিক ছিলেন এবং তারা অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতেন। দ্বিতীয় সফে তীরন্দাজগণ পরিমাণগত দূরত্বে ব্যূহ রচনা করতেন। তৃতীয় সফে অশ্বারোহী বাহিনী সামগ্রিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা) সৈন্যগণকে সফবন্দী করে সাজিয়ে স্বয়ং প্রতি সারিতে প্রবেশ করে সফ বা লাইন সোজা করেছিলেন।

সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে সে যুগের রীতি অনুসারে উভয়পক্ষের বাছাই করা সৈন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হত। অতঃপর শত্রু সৈন্য নিকটবর্তী হলে বর্মধারীগণ আক্রমণ চালাতেন এবং অবস্থার দাবি অনুযায়ী অশ্বারোহী সৈন্যগণ আক্রমণ করে শত্রুদের বিপর্যস্ত ও বিতাড়িত করে বিজয় সুনিশ্চিত করতেন।

মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তলোয়ার চালনা, তীর চালনা, বল্লম চালনা ও অশ্ব চালনা শিখতেন। যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশলও তাদের শিখানো হত।[৩৪]

১০। নিরাপত্তা (আশশুরতাহ) বিভাগ ঃ মদীনা রাষ্ট্রে নিয়মিত সেনাবাহিনীর ন্যায় নিয়মিত কোন পুলিশ বাহিনীও ছিল না।[৩৫] তবে স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক সাহাবী নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তবে এদের মধ্যে যারা আর্থিক দিক

---

৩৪. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৬।

৩৫. সিরাজুম মুনীরা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৬।

তখন আসলে এর প্রয়োজনই ছিল না। তখনকার অবস্থা এ ছিল যে, জনৈক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং দৌড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে এসে উপস্থিত হয়ে আরজ জানায়, হে আল্লাহর রাসূল (সা)

اَقِمْ عَلَى حَدُّ اللهِ-

(আকিম 'আলা হাদ্দুল্লাহ) 'আমাকে আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাস্তি দিন, আমি অত্যন্ত কঠিন পাপ করেছি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে ইসলামী বিধান بَابُ حَدُّ الزِّنَا (বাবু হাদ্দে-যিনা) শীর্ষক অধ্যায় পড়লে সাহাবীদের তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সম্পর্কে চমৎকৃ হতে হয়। হযরত মায়েজ (রা), যিনি একজন অত্যন্ত সাধারণ স্তরের সাহাবা ছিলেন, গোনাহতে লিপ্ত হন। পরে অনুতপ্ত হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাস্তি দানের আবেদন জানান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ফেরত পাঠাবার বহু চেষ্টা করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে প্রাপ্য শাস্তি কার্যকরী করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর সে বান্দাহ অপরিসীম ধৈর্য ও সবরের সাথে ভয়াবহ শাস্তি বরদাশত করতে থাকেন এবং অবশেষে নিজের জীবন দিয়ে কৃত পাপের কাফফারা আদায় করেন। দুনিয়ার ইতিহাসে এর নজীর বিরল।

থেকে নিঃস্ব ছিলেন, বায়তুলমাল হতে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হত। নিরাপত্তা বিভাগকে আশশুরতা বলা হত। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন হযরত কায়েস ইবনে সায়াদ (রা)।[৩৬] বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, এ শক্তিশালী আনসারী সাহাবী সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে থাকতেন। প্রয়োজনবোধে অপরাধীদেরকে তিনি বন্দী করতেন।[৩৭] মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন– হযরত যুবাইর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত মিককাদ ইবনে আসওয়াদ (রা), হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা), হযরত আসিম ইবনে সাবিত (রা) ও হযরত যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কিলাবী (রা)[৩৮]। সুস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়া মদীনা রাষ্ট্রে কাউকে গ্রেফতার করা যেত না। মদীনায় একবার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে এ কথা জানায়। নিরাপত্তা বিভাগের গ্রেফতারকারী কোন সুস্পষ্ট কারণ দেখাতে ব্যর্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তখনই বন্দীকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেন।[৩৯] অপরাধ দমন, বাজার পরিদর্শন, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ এ বিভাগের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪০] একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বাজারে গমন করে দোকানদারদের দ্রব্যসামগ্রীর অনুসন্ধান শুরু করলেন। এক ব্যক্তির খাদ্যদ্রব্যের ভেতরে হাত দিয়ে ভেতরের দ্রব্য ভিজা অনুভব করে সে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ অবস্থা কেন? দোকানদার জবাব দিলেন 'বৃষ্টির পানি পড়ে ভিজে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, "তাহলে এসব ভেজা দ্রব্যগুলো উপরে কেন রাখলে না?" তাতে ক্রেতারা দেখতে পেত। অতঃপর ইরশাদ করলেন, "যারা কোন প্রকার ধোঁকাবাজি করবে তারা আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪১]

১১। সমরাস্ত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণ বিভাগ : খোদাদ্রোহীদের সাথে মোকাবিলার জন্য তরবারি, তীর-ধনুক, ঢাল, বল্লম, মানজানিক বা ক্ষেপণাস্ত্র[৪২] দাব্বাবাহ[৪৩] (লুকায়িত অগ্নিকুণ্ড) ইত্যাদি জরুরি যুদ্ধাস্ত্র তৈরি ও সংরক্ষণ কার্যাদি এ বিভাগ

---

৩৬. এ. কে. এম নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬।

৩৭. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মহান রাষ্ট্রনায়ক : হযরত রাসূলে করীম (সা), আলবালাগ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৩।

৩৮. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬।

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১৯।

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা ২৬।

৪১. সহীহ মুসলিম, দ্র. মাসিক আলবালাগ, জানুয়ারি ১৯৮৫, সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২২।

৪২. কোন দুর্গ আক্রমণ করা হলে মানজানিক বা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হত।

৪৩. দুর্গাবরোধ ভেঙ্গে ফেলার জন্য দাব্বাবাহ বা লুকায়িত অগ্নিকুণ্ড ব্যবহৃত হত।

কর্তৃক সম্পন্ন হত।[৪৪] যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর এবং সাধারণভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের উপর অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ্ বলেন–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ.

(ওয়া আইদ্দু লাহুম মাসতাত্বা'তুম মিন কুওয়াতিন ওয়া মিররিবাতি খাইলা তুরহিবূনা বিহী আদুওয়াল্লাহি ওয়া আদুওয়াকুম)

"তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখবে এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।[৪৫] উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের উপর সব রকমের বস্তুগত প্রস্তুতি, অস্ত্র সংগ্রহ ও অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে ফরয করে দিয়েছেন। এমন প্রস্তুতি গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে দুশমন খোদাদ্রোহী শক্তি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তাদের বুক যাতে কেঁপে উঠে।[৪৬] বস্তুত কুরআনের এ আয়াতে কারীমার নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্যই গড়ে উঠেছিল সমরাস্ত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণ বিভাগ।

১২। বিচার বিভাগ : রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন বিচার বিভাগেরও প্রধান। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতিতে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আসনে তিনি ছাড়া অন্য কারো আসীন হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তিনি ছিলেন মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। প্রাদেশিক ও স্থানীয়ভাবে বিচারপতিদের নিয়োগ তিনি নিজেই করতেন। মসজিদে নববী ছিল একাধারে রাষ্ট্রপতি ভবন ও সুপ্রীম কোর্ট। যেখানে বসে তিনি প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ বিচার কার্যও সম্পাদন করতেন। বিভিন্ন মোকদ্দমার শুনানি ও মীমাংসা তিনি নিজেই করতেন। প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিস্তৃতির ফলে পরবর্তীকালে বিচার কার্যের সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বহু সংখ্যক সাহাবীকেও নিয়োগ করেন। বাদী-বিবাদীর বিবৃতি ও সাক্ষ্যদানের পর মোকদ্দমার মীমাংসা হত। মদীনা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের ও অবিচারের মূলোৎপাটন

---

৪৪. সিরাজুম মুনীরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬।

৪৫. আল কুরআন, ৮ : সূরা আল আনফাল, আয়াত ৬০।

৪৬. মাওলানা মুশহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৬।

সরকারি দায়িত্ব হিসেবে গণ্য ছিল। এজন্য কোন 'ফি' বা অন্যান্য ব্যয়ভারও ধার্য ছিল না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক বিন কোহাফা (রা), হযরত ওমর ফারুক বিন খাত্তাব (রা)[৪৭], হযরত ওসমান জিননুরাইন বিন আফফান (রা), হযরত আলী মুর্তজা বিন আবু তালেব (রা)[৪৮], হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা)[৪৯], হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা) ও হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার গৌরব ও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। প্রাদেশিক সদর দফতরে প্রাদেশিক শাসনকর্তা (ওয়ালী) প্রধান বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। এছাড়াও সেখানে কাজী (Judges) নিয়োগ করা হত। প্রাদেশিক কাজী রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কাজী পদে নিয়োগদানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়ালীদের হুকুম দিতেন। কাজীগণ ওয়ালী বা প্রাদেশিক গভর্ণর থেকে স্বাধীন ছিলেন এবং সরাসরি মহানবী (সা) এর নিকট রিপোর্ট করতেন। কাজী নিযুক্ত করার সময় সাহাবীদের মধ্যে যারা ফকীহ[৫০] ছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি আনুগত্য, তাকওয়া, প্রজ্ঞা, কুরআন ও হাদিসে বিশেষজ্ঞ, শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা, মানসিক ভারসাম্য, উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি, কর্মের দৃঢ়তা, অনড় মনোবল, মনোরম ব্যক্তিত্ব (Pleasant personality), আমানতদারি ও উন্নত আমল আখলাকে যারা সর্বোত্তম ছিলেন তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হত।[৫১] বিচারকদের কাজ ছিল ত্রিবিধ- (১) বিচারকার্য সম্পাদন, (২) ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান এবং (৩) নাবালকের বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান।[৫২]

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেকের বিচার পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত ছিল। যে

---

৪৭. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২।

৪৮. মাসিক আলবালাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১।

৪৯. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩।

৫০. ফকীহ সাহাবগণ চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী আইন বিধানের মূল রহস্য উদ্ভাবন করতে পারতেন এবং কঠিন ও জটিল বিষয়াদিও ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে মীমাংসা করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁরা ছিলেন উদ্ভাবনীশক্তি ও গভীর দীনী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। দ্রঃ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলাম : অর্থ ও বৈশিষ্ট্য, নূর প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৩,পৃষ্ঠা ২২।

৫১. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩।

৫২. P. K. Hitti, History of the Arabs. P-225.) দ্রঃ শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪।

কোন নারী বা পুরুষ তার প্রতি কৃত জুলুমের প্রতিকার লাভের জন্য অবাধে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে পারতেন।[৫৩]

১৩। **হিসাব সংরক্ষণ বিভাগ :** সরকারি আয়ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) হিসাব সংরক্ষণ বিভাগ সৃষ্টি করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এ বিভাগের কাজ তদারক করতেন।[৫৪] মুয়ানকী বিন আবি ফাতিমা (রা)ও এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৫৫]

১৪। **অর্থ বিভাগ-বায়তুলমাল :** বায়তুলমাল ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সরকারি অর্থভাণ্ডারের অস্তিত্ব অপরিহার্য। উক্ত অর্থভাণ্ডারের নিরাপত্তা ও সংরক্ষিত স্থানকেই ইসলামী পরিভাষায় 'বায়তুলমাল' বলা হয়।[৫৬] রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের প্রাদেশিক ও জেলাওয়ারী শাখা স্থাপিত হয়।[৫৭] বায়তুলমাল ছিল মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সেসব আয়ের বাহক যা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী অর্থভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক অনুরূপভাবে বায়তুলমাল ঐ সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জামিনদার যা ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য ছিল অপরিহার্য।

বায়তুলমালের আয়ের উৎস প্রধানত ৫টি। যথা : (১) মালে গানীমাহ[৫৮],

---

৫৩. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯।

৫৪. বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলে নিয়োগকৃত শাসনকর্তাদের সম্পদের হিসাব রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই গ্রহণ করতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বনু আবেদের ইবনে লাইছ নামক জনৈক সাহাবীকে বনু সলীমের রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ইবনে লাইছ দায়িত্ব পালন শেষে ফিরে এসে রিপোর্ট পেশ করার সময় বললেন, হে আল্লাহর নবী, এ মাল রাজস্ব বাবদ আর এগুলো লোকে আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তুমি তোমার পিতার ঘরে বসে থাক। দেখি, তোমার কাছে কি পরিমাণ হাদিয়া আসে।

৫৫. আল জাহশিয়ারী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২।

৫৬. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭।

৫৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১০৮।

৫৮. গানীমাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ধন বা মাল। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মালকে গানীমাহ বলা হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু পরিত্যক্ত যে সমস্ত সম্পদ হস্তগত হত সেগুলো একত্রিত করে ১/৫ অংশ বায়তুলমালের জন্য রেখে ৪/৫ অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত। গানীমাহ'র ১/৫ অংশ, যা আল খুমুস নামেও পরিচিত তার ১/৩ অংশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবারবর্গের জন্য নির্দিষ্ট থাকত, বাকী ১/৩

(২) ফাই[৫৯], (৩) যাকাত[৬০], (৪) জিযিয়া[৬১], (৫) খারাজ[৬২]। কোন সম্পদ বায়তুলমালে জমা হলেই রাসূলুল্লাহ (সা) অস্থির হয়ে উঠতেন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সে সম্পদ অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন।[৬৩] বায়তুলমাল থেকেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হত[৬৪]। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

مَنْ اسْتَعْمَلَ عَلٰى عَمَلٍ لِرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ-

(মান ইসতা'মালা আ'লা আ'মালিন লা রাযাকনাহু রিযকান ফামা আখাযা বাদা যালিকা ফাহুওয়া গুলূলুন।)

অংশ অনাথ দীন দরিদ্র মুসাফির ও রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয়িত হত। মহানবী (সা)-এর অংশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যয়িত হত।

৫৯. বিজিত অঞ্চলের আবাদযোগ্য ভূমির বিরাট অংশ, সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হত- এ ভূসম্পত্তিকেই 'আল-ফাই' বলা হত। আল-ফাই সম্পত্তির আয় প্রশাসনিক ও সামরিক খাতে ব্যয় করার পর উদ্বৃত অংশ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত।

৬০. যাকাত বিত্তবানদের কাছ থেকে আদায় করে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করা হত। বস্তুত যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হত। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় যারা হেরে যেত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় তাদের অস্থির হতে হত না।

৬১. অমুসলিমদের জান মাল ও নিরাপত্তার জন্য যে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট পণ গ্রহণ করা হত তাকেই জিযিয়া বলা হয়। সামরিক বাহিনীতে মুসলিম নাগরিকদের যোগদান ছিল অপরিহার্য। এ দায়িত্ব থেকে অমুসলিমদের অব্যাহতি দেয়া হয় এর বিনিময়ে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য হয়। অমুসলিম শিশু, মহিলা ও ধর্মপ্রচারকগণ এর আওতাধীন ছিলেন না। জিযিয়া হিসেবে আদায়কৃত অর্থ সৈন্যবাহিনীর বেতন, খাদ্য, অস্ত্র ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে ব্যয় করা হত।

৬২. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে অমুসলিমদের চাষাবাদ করার জন্য যে জমি দেয়া হত ইসলামী রাষ্ট্র তার মালিক হিসেবে ঐ জমির উৎপাদিত শস্যের অংশবিশেষ গ্রহণ করত। ইসলামী রাষ্ট্রের অংশকেই বলা হয় খারাজ। এ অংশের পরিমাণ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হত। খায়বর বিজয়ের পর রাসূল (সা) সর্বপ্রথম সেখানকার ইহুদিদের উপর খারাজ ধার্য করেন। ইহুদিগণ ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে ও খারাজ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে কৃষিভূমি চাষাবাদের অধিকার লাভ করে।

৬৩. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬।

৬৪. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩।

অর্থাৎ কাউকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কোন দায়িত্ব দেয়া হলে আমি অবশ্যই তাকে গ্রাসাচ্ছাদন দেব। অতিরিক্ত কিংবা এর বাইরে কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে খেয়ানত।[৬৫]

১৫। যাকাত ও সাদাকাহ তহবিল বিভাগ : যাকাত[৬৬] ও সাদাকাহ[৬৭] বাবদ যে অর্থ বা মাল সংগৃহীত হত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে তার হিসাব কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন হযরত জোবায়ের বিন আল আওয়াম (রা) ও যুহাহির বিন আল সালাত (রা)।[৬৮] যাকাত আদায় ত্বরান্বিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ৯ম হিজরী সনের ১লা মুহাররম প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র আদায়কারী নিযুক্ত করেন।[৬৯] এ আদায়কারীদের মধ্যে ছিলেন ঃ

ক্রমিক নং	অঞ্চল বা গোত্র	আদায়কারীর নাম
১।	মদীনা মোনাওয়ারা	হযরত ওমর ফারুক (রা)
২।	নাজরান	হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা)
৩।	বনু ফাজারা	হযরত আমর বিন আস (রা)
৪।	বনু তয় ও বনু আসাদ	হযরত আদী বিন হাতেম তাঈ (রা)
৫।	বনু জাবয়ান	হযরত আবদুল্লাহ বিন লাই তাই (রা)
৬।	বনু সুলাইম ও বনু মজায়না	হযরত উব্বাদ বিন বিশর (রা)
৭।	বনু কিলাব	হযরত দাহহাক বিন সুফিয়ান (রা)
৮।	বনু লাইস	হযরত আবু জাহম বিন হোজায়ফা (রা)
৯।	বনু গেফার ও বনু আসলাম	হযরত বোরায়দা বিন হোসাইন (রা)
১০।	বনু কাব	হযরত বুসর বিন সুফিয়ান (রা)

৬৫. জবাবদিহি ও কর্মচারীদের তদারকি প্রসঙ্গ, মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩ থেকে উদ্ধৃত।

৬৬. যাকাত দেয়ার সঙ্গতি সম্পন্ন ঈমানদারদের (সাহিবই নেসাব) জন্য ফরয-অবশ্যই কর্তব্য। বিত্তবানগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে যাকাত জমা দিতেন, যাকাত আদায় ও বণ্টন ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তাই মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্বের অন্যতম উৎস ছিল যাকাত। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগেই সুষ্ঠু যাকাতব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। মালের রকমারী হিসেবে যাকাতের জন্য নির্দিষ্ট মালগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত। (১) খাদ্যশস্য, (২) গৃহপালিত জন্তু, (৩) স্বর্ণরোপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু, (৪) বাণিজ্য দ্রব্য, (৫) খনিজ সম্পদ। আল কুরআনের নির্দেশানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) যাকাত থেকে অর্জিত অর্থ ৮টি নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতেন।

যাকাত আদায়কারীর মধ্যে আরো কয়েকজন হচ্ছেন– হযরত সাফওয়ান ইবনে সাফওয়ান (রা), হযরত মালিক ইবনে উয়াইনা (রা), হযরত বারিদা ইবনে হাসিব (রা), হযরত রাফে ইবনে মুকাইল (রা), হযরত কায়েস ইবনে আসিম (রা), হযরত যারকান ইবনে বদর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল্লাহিত (রা) প্রমুখ সাহাবী।[৭০] এসব আদায়কারী সাময়িকভাবে নিযুক্ত হতেন। প্রয়োজনে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হত।[৭১] রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ পরিবার-পরিজন এবং বংশীয় যে কোন ব্যক্তির জন্য যাকাত, ফেৎরা গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছিলেন। আর এজন্যই তিনি বংশীয় কোন ব্যক্তিকে যাকাত, ফেৎরা আদায় করার দায়িত্ব প্রদান করেননি।[৭২]

যাকাত ও সাদাকাহ আদায়কারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে এ সম্পর্কীয় নিয়মাবলির এক লিখিত নির্দেশনামা প্রদান করেন। আদায়কারীদেরকে তাদের নিতান্তই আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটে এরূপ পরিমাণ বিনিময় প্রদান করা হত। জনগণের নিকট হতে উপহার গ্রহণ ছিল তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৭৩]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু জাবয়ানের আদায়কারী হযরত আবদুল্লাহ বিন লাইতাই (রা) কিছু উপহার গ্রহণ করেছিলেন। মদীনা মোনাওয়ারা ফিরে আদায়কৃত যাকাত সামগ্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে জমা দেয়ার সময় তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) এ হলো আদায়কৃত যাকাত সামগ্রী, আর এগুলো লোকেরা আমাকে উপহার দিয়েছে। একথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন : তুমি তোমার বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে লোকেরা তোমাকে এসব উপহার দেয়নি কেন? এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ (সা) সমস্ত উপহার যাকাতের সাথে

---

৬৭. সাদাকাহও যাকাতের ন্যায় দেয় সাহায্য। তবে যাকাত হলো অপরিহার্য এবং সাদাকাহ হলো ঐচ্ছিক। সাদাকাহ প্রদান ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিমিত্তই সাদাকা প্রদেয়।

৬৮. আল-কালকাশান্দী, সুবহু আল আ'শা, কায়রো, ১৯১৩, ১৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১/৯১, দ্র. ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩।

৬৯. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মহান রাষ্ট্রনায়ক : রাসূলে করীম (সা), মাসিক আলবালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২০।

৭০. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮।

৭১. ঐ, পৃষ্ঠা ৯।

৭২. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০।

৭৩. ঐ, পৃষ্ঠা ২০।

বায়তুলমালে জমা দিয়ে দেন এবং এক সমাবেশ ডেকে এমনিভাবে উপহার গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে দেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বললেন, যাকে আমরা কোন কাজের জন্য নিযুক্ত করি, তার জন্য আমরা তাকে সম্মানী, রসদ তথা বেতন-ভাতা দেব। এর বাইরে সে যদি অন্য কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা অবশ্যই হবে বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ।[৭৪] এছাড়াও যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কোনরূপ কঠোরতা না করতে নির্দেশ দান করেন।[৭৫]

১৬। খেজুর বৃক্ষের কর আদায় বিভাগ ঃ মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল খেজুর। মৌসুমে খেজুর বৃক্ষের কর আদায়ের হিসাব রাখতেন হযরত হুযাইফা বিন আল ইয়ামীন (রা)।[৭৬]

১৭। জনস্বাস্থ্য বিভাগ : দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত হলো সুস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে ইবাদতও করা যায় না। সুস্বাস্থ্য আল্লাহর মহাদান। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সব দায়িত্বই পালন করা সম্ভব হয়। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্বাস্থ্যবিধি দান করেছেন। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই তদানীন্তন আরবে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধার প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্বারোপ করে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রবর্তন করেন। এসময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন হারিস ইবনে সালাহ ও ইবনে আবি রাদা প্রমুখ।[৭৭] চিকিৎসকগণ বায়তুলমাল হতে ভাতা পেতেন এবং রাষ্ট্রের নাগরিকগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতেন।[৭৮] স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন আজকের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা তা পড়ে অবাক না হয়ে পারেন না। মদীনা রাষ্ট্রে গণস্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। রোগীদের দেখাশোনা, সেবা-শুশ্রূষা এবং মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ ও এসব কাজ সম্পাদন করাকে রাসূলুল্লাহ (সা) ঈমানী দায়িত্বে পরিণত করেছেন।

১৮। শিক্ষা বিভাগ : মহানবী (সা)-এর সচিবালয়ের অন্যতম একটি বিভাগ ছিল

---

৭৪. আবু দাউদ শরীফ, ১৯৬৩, পৃ. ৬২৬, উদ্বৃত মুহাম্মদ আল ব্যুরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩।

৭৫. ঐ, পৃষ্ঠা ২১।

৭৬. আল কালকাশান্দী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯১। ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩।

৭৭. সিরাজুম মুনীরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩।

৭৮. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬।

শিক্ষা বিভাগ। এ বিভাগটি ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। তিনি শিক্ষা প্রসারের জন্য সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।[৭৯] প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট সাহাবী (রা)গণকে এ বিভাগের বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তদানীন্তন আরবভূমিতে শিক্ষাদীক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষালাভ ও জ্ঞানার্জনকে জিহাদতুল্য ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটি জনগোষ্ঠী তৈরি করতে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন যারা মানব জাতির নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে। আর এটি যে শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন ছাড়া সম্ভব নয় তা ছিল বোধগম্য। নবুয়তপ্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার লোকদের নিকট ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছাতে থাকেন। একজন দু'জন করে সত্য সন্ধানী মানুষেরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হতে থাকে। ইসলাম গ্রহণকারী এসব ব্যক্তিদেরকে ইসলামের যাবতীয় জ্ঞান দেয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজন পূরণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত হযরত আকরাম ইবনে আবুল আকরাম (রা) গৃহটি বেছে নেন। এটিই ছিল মুসলিম উম্মার প্রথম শিক্ষা নিকেতন।[৮০]

মদীনায় একদল লোক ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুসয়াব বিন উমাইর (রা)-কে মদীনায় পাঠান।[৮১] লোকদের ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি ইসলামের জ্ঞান বিতরণ করতেন।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মসজিদ, মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির নির্মাণ সুসম্পন্ন হলে সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদে নববীর গা ঘেঁষেই ছিল এ শিক্ষা কেন্দ্র- সুফফাহ রাজধানীতে মুসলমানদের প্রধান শিক্ষা নিকেতন। বেশ কিছু সাহাবী এখানে সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানচর্চা করতেন। তাদের কাছে যারাই আগমন করতেন তাদেরকেও তারা জ্ঞানদান করতেন। স্থানীয় ছাত্র ব্যতীত দূর

---

৭৯. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করা যেতে পারে– (১) প্রতিটি মুসলমান নরনারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয, (২) দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর, (৩) ইলম হাসিলের জন্য যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথকে সুগম করে দেন, (৪) রাতে কিছুক্ষণ জ্ঞানচর্চা সারারাত নফল ইবাদত থেকে উত্তম, (৫) এক মুহূর্তের জ্ঞান চিন্তা সহস্র রজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়।

৮০. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫।

৮১. ঐ, পৃষ্ঠা ১৮।

দূরান্ত থেকেও অনেকে এসে এ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করতেন। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের প্রশাসকদের অনুরোধক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মোনাওয়ারা থেকে শিক্ষক প্রেরণ করতেন। মদীনায় শিক্ষা ও স্বাক্ষর জ্ঞানদানের জন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ইবনুল আস (রা)-কে নিয়োগ করা হয়েছিল।[৮২] রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য ভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।[৮৩] মদীনা রাষ্ট্রের অন্তর্গত মসজিদগুলো শুধু নামাযের জন্যই ব্যবহৃত হত না, সেগুলো শিক্ষা কেন্দ্রও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। উম্মাহাতুল মোমেনীনরা বিশেষ করে হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রা) শিক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ডে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে উম্মাহাতুল মোমেনীনদের গৃহগুলো ছিল নারী শিক্ষার কেন্দ্র।

মসজিদের মতো সাহাবীদের গৃহগুলোও শিক্ষালয়ের মতোই ছিল। দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসুরা এসে তাদের মজলিসে বসে শিক্ষা লাভ করত। এক কথায় মদীনা রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ সর্বস্তরের গণমানুষের নিকট জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার যে আন্দোলন চালিয়েছিল তা মূল্যায়ন করতে গেলে অবাক হতে হয়। বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অল্পদিনের মধ্যেই মুসলিম জাতি তদানীন্তন বিশ্বের শিক্ষকরূপে পরিগণিত হলো।

১৯। পরিসংখ্যান বিভাগ : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে পরিসংখ্যান বিভাগের অস্তিত্ব লক্ষণীয়, মূলত তার ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়েই রচিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবদ্দশায় দু'বার আদমশুমারী করেছিলেন এবং রেজিষ্টার বইতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের নামে তালিকা প্রণয়ন করেন।[৮৪] মূলত এ তালিকা প্রণয়নের আসল ও প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মদীনা রাষ্ট্রের আনাচে কানাচে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে যত বেকার, দরিদ্র, অক্ষম, চিররোগী ও অভাবী নাগরিক আছে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা এবং তাদের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা।[৮৫] মদীনা রাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্যও এ বিভাগ সংগ্রহ করত।

---

৮২. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৬।

৮৩. রাসূলুল্লাহ (সা) অহী লেখক হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা)-কে ইব্রানী ভাষা শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত যায়েদ (রা) নিজেই বলেছেন, আমি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এ ভাষা শিক্ষালাভ করি। দ্রঃ মাসিক আলবালাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

৮৪. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

৮৫. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৪।

২০। **কৃষি ও বন বিভাগ :** কৃষির উন্নতি বিধানে তৎপর হওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের উপর ফরয। কারণ কৃষির উন্নতি ছাড়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের হেফাজত অসম্ভব। আরবভূমির বিস্তৃত এলাকা তথা অধিকাংশ এলাকাই বালুকাময় মরুভূমি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) নাগরিকদেরকে বহু অনাবাদী জমি চাষাবাদের জন্য দান করেন এবং অধিক ফসল ফলানোর জন্য তাদেরকে উৎসাহ দান করেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "যার নিকট চাষাবাদযোগ্য জমি থাকবে অবশ্যই তাতে তার চাষাবাদ করা উচিত অন্যথায় তা অন্য ব্যক্তিকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করা উচিত।[৮৬] অন্য কথায়, আবাদযোগ্য জমি যেন অনাবাদী না থাকে।"

বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ.

(মা মিন মুসলিমিন ইয়ুগরিসু গারছাম আও ইয়াযরাউ যারআন ফাইয়াকুলু মিনহু ইনসানুন আওত্বাইরুন আও বাহীমাতুন ইল্লা কানা লাহূ বিহী)

"কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে অথবা কোন খাদ্যশস্যের চাষ করে তবে ঐ বৃক্ষের ফল বা উৎপাদিত হতে শস্য মানুষ, পশুপাখি অথবা অন্যান্য জীবজন্তু আহার গ্রহণ করে, আর তাতে ঐ ব্যক্তির সদকার নেকী লাভ হয়।[৮৭]

অধিক শস্য ফলানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সেচব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

২১। **মসজিদ বিভাগ :** এ বিভাগটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। সে সময়ে মসজিদ ছিল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। মদীনা রাষ্ট্রের আওতাধীন মসজিদসমূহ শুধু ইবাদতগৃহই ছিল না তা ছিল একাধারে মুসলিম জাতির শক্তিশালী দুর্গ, জিহাদী কুচকাওয়াজের ট্রেনিংস্থল, আইন-কানুন রচনার পার্লামেন্ট

---

৮৬. সহীহ আল বুখারী, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস। দ্র. আলবালাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

৮৭. সহীহ আল বুখারী, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত হাদীস। দ্র. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পৃষ্ঠা ১৭০।

ভবন, বিদেশাগত প্রতিনিধিমণ্ডলীর অভ্যর্থনা গৃহ, তালীম-তরবীয়তের দারুল উলুম, তা ছিল দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কেন্দ্রস্থল, রুগ্ন ও অসুস্থ মানুষের আদর্শ হাসপাতাল।[৮৮] এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আল ব্যুরে লিখেছেন, মদীনা রাষ্ট্রে মসজিদ ছিল সব ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র স্থল। এতেই মহানবী (সা) বসবাস করতেন, নামায পড়তেন, নসিহত ও উপদেশ প্রদান করতেন, পরিদর্শক ও বিদেশী কুটনৈতিকদের সাথে আলোচনায় বসতেন, তাঁর বন্ধু ও সাহাবীদের সাথে ইসলামী উম্মাহর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সমসাময়িক রাজা, সম্রাট ও অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য চিঠি লিখতেন ও তা প্রেরণ করতেন। 'দিওয়ান' এর অধিকাংশ কার্যাবলী মসজিদে বসেই সম্পাদিত হতো।[৮৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের ইমাম সরকারিভাবেই নিয়োগ করতেন। বেতন ভাতা বায়তুলমাল থেকে দেয়া হত। ইমাম নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি কয়েকটি মূলনীতি নিরূপণ করেছিলেন। (১) কুরআন পাক সম্পর্কে যে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী, এ বিষয়ে কয়েকজন সমপর্যায়ের হলে, (২) যিনি সর্বাধিক সুন্নাতের পাবন্দ, এতে একাধিক ব্যক্তি সমপর্যায়ের হলে, (৩) যিনি সর্বপ্রথম হিজরত করেছেন এ ক্ষেত্রেও যদি প্রাধান্য দেয়া সম্ভব না হত তবে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে ইমাম নির্বাচন করা হত।[৯০] প্রধান প্রধান মসজিদসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়াজ্জিনের পদও নির্দিষ্ট করেছিলেন। হযরত বেলাল (রা) ও হযরত ইবনে উম্মে কুলসুম (রা) মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। হযরত সাদ আল বারাত (রা) মসজিদে কোবা ও হযরত আবু মাহজুমা (রা) কাবা শরীফের মুয়াজ্জিন ছিলেন।[৯১]

মসজিদ নির্মাণের জন্যও রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا–

---

৮৮. মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, বাণী, মুসলিম জাতির প্রাণকেন্দ্র মসজিদ, ১ম খণ্ড, অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক সম্পাদিত, মসজিদ মিশন পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ১।

৮৯. মুহাম্মদ আল ব্যুরে, প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, বিআইআইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২৪১।

৯০. সহীহ মুসলিম, দ্র. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১।

৯১. ঐ, পৃষ্ঠা ২১।

(উহিব্বুল বিলাদি ইলাল্লাহি মাসাজিদুহা)

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়স্থান মসজিদ।[৯২]

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنَى اللّٰهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ-

(মান বানা মাসজিদান লিল্লাহি বানাল্লাহু লাহু ফিল জান্নাতি মিছলুহূ)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে কোন মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে অনুরূপ ঘর নির্মাণ করবেন।[৯৩]

২২। নগর প্রশাসন বিভাগ : রাসূলুল্লাহ (সা) শহর নগর ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। নগর প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব ছিল শহরে-নগরে যাতে করে কোন প্রকার অবৈধ প্রবঞ্চনামূলক ক্রয় বিক্রয় না হয় তা নিশ্চিত করা। হযরত ওমর ফারুক (রা) এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[৯৪]

২৩। নগর উন্নয়ন ও প্রকৌশল বিভাগ : গণপূর্ত ও নগর উন্নয়নের ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় স্থাপিত হয়। ঘরবাড়ি তৈরির নকশা ও প্লেন তখনো তৈরি হত। ইবনে সাদাত তাঁর 'তাবকাতে' লিখেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ওসমান জিননুরাইন বিন আফফান (রা) এর বাড়ি নির্মাণের জন্য জমির যে চিহ্ন নির্ধারণ ও প্লেন নির্দেশ করেছিলেন অদ্যাবধি হযরত ওসমান (রা)-এর বাড়ি সে স্থানেই বিদ্যমান রয়েছে।[৯৫]

২৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ : প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য মদীনা রাষ্ট্রের সকল অধীনস্থ অঞ্চলকে কতকগুলো প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে ওয়ালী প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মদীনা মোনাওয়ারা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী। মদীনা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে।[৯৬] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে মদীনা রাষ্ট্র ছিল ১০টি ওয়ালী শাসিত প্রদেশ।

---

৯২. সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম, দ্রঃ মুসলিম জাতির প্রাণকেন্দ্র মসজিদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪।

৯৩. সহীহ মুসলিম, ঐ, পৃষ্ঠা ২১।

৯৪. সিরাজুম মুনীরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬।

৯৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬।

৯৬. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪। মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০।

প্রদেশের নাম ও প্রাদেশিক শাসক (ওয়ালী) বৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রদেশের নাম	প্রাদেশিক শাসকদের নাম
১।	মদীনা মোনাওয়ারা	রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং[৯৭]
২।	মক্কা মুকাররমা	হযরত ইত্তাব ইবনে উসাইদ (রা)[৯৮]
৩।	নাজরান	হযরত আমর ইবনে হাজাম (রা) ও হযরত আলী (রা), হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব (রা)[৯৯]
৪।	ইয়েমেন	হযরত বায়ান ইবনে সামান (রা)[১০০]
৫।	হাজরা মাউত	হযরত যিয়াদ ইবনে লবীদুল আনসারী (রা)[১০১]
৬।	ওমান	হযরত আমর ইবনুল আস (রা)[১০২]
৭।	বাহরাইন	হযরত আল আলা ইবনে আল হাযরামী (রা)[১০৩]
৮।	তায়মা	হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)[১০৪]
৯।	জুন্দে আলজানাদ	হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা)[১০৫]
১০।	ওয়াদী আর কুরা[১০৬]	হযরত আমর বিন সাঈদ (রা)[১০৭]

---

৯৭. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০।

৯৮. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫।

৯৯. এ তিনজন সম্মানিত সাহাবী পর পর নাজরানে ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেছেন, দ্র. সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৯৬৫. দ্র. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫।

১০০. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২। প্রসঙ্গত বাযান ইবনে সামান ছিলেন পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিযুক্ত ইয়েমেনে শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন বাহরাম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সম্রাটের মৃত্যুর পরে আজমবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা হিসেবে বহাল রাখেন। এরপর তদীয়পুত্র শহর বিন বাযান শাসনভার লাভ করে। শহর আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর ইয়েমেনকে কয়েকটি প্রদেশ ও অঞ্চলে ভাগ করা হয় এবং আলাদা আলাদাভাবে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। দ্র. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬ এবং হাফিয ইবনুল কাইয়্যেম, যাদুল মাআদ।

১০১. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫।

১০২. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২।

১০৩. ঐ, পৃষ্ঠা ২২।

১০৪. ঐ, পৃষ্ঠা ২২।

১০৫. ঐ, পৃষ্ঠা ২২।

১০৬. ওয়াদী আল কুরা সিরীয় অঞ্চলভুক্ত ছিল। আরো জানার জন্য দেখুন, ওয়াকিদী, কিতাব আল মাগাজি, সম্পাদনা মারসডেন জোনস; লন্ডন ১৯৬৬, পৃ. ৭১১।

১০৭. তিনি উমাইয়া গোত্রের সাঈদী পরিবারের সন্তান। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে বিশাল এক এলাকা

ইয়েমেন প্রথমে একটি প্রদেশ ছিল। পরবর্তীতে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তাকে দশটি প্রদেশ ও প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। যেমন ঃ সানা, হাজাদান, আক্ব ও আশআ, আলা সাকাসিক ওআল সাকূন, সুনতা, হাজরামাউত, জুনদ, কুনদাহ-অসদক, যোবায়েদ এবং অডেন ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা।[১০৮]

বলাবাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রাদেশিক প্রশাসনে নিয়োজিত ওয়ালীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একান্ত বিশ্বস্ত সহচর সাহাবী ছিলেন এবং তারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বাধীনে সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। তারা জ্ঞান, চরিত্র, আদর্শ ও প্রশাসনিক বিষয়ে তথা সর্ববিষয়েই অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। ওয়ালীগণ কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা নির্দেশিত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। যেসব ব্যাপারে তারা অপারগ হতেন সেসব ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট হতে নির্দেশ গ্রহণ করার তাগিদ ছিল। হযরত মা'আজ বিন জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনের জুন্দে আলজানাদ প্রদেশের ওয়ালী নির্বাচন করে কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দেশবাসীর সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে? মোকদ্দমার ফায়সালা করবে কিরূপে? হযরত মা'আজ (রা) জবাব দিলেন, আল্লাহ পাকের কুরআনের নির্দেশ অনুসারে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, যদি এ বিষয়ে কুরআনের নির্দেশ খুঁজে না পাও। হযরত মা'আজ (রা) উত্তর দিলেন, "তাহলে আমি আমার বিবেচনা দ্বারা ইজতিহাদ করব।" এ জবাব শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ইরশাদ করলেন, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের সাহাবীকে এমন একটি কাজের তাওফীক দান করেছেন যে কাজটি তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে পছন্দ করেন।[১০৯]

ওয়ালীদেরকে সাহায্য করার জন্য কোন কোন সময়ে দু'একজন সাহায্যকারী নিয়োগ করা হত। তারা বিভিন্ন মোকদ্দমার মীমাংসা, যাকাত আদায় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর আদায়ে ওয়ালীদেরকে সাহায্য করতেন।[১১০] যদি কোন ওয়ালী মোহাজের সাহাবী হতেন তবে তার সহযোগীরূপে একজন আনসারী সাহাবীকেও রাসূলুল্লাহ (সা) নিয়োগ করতেন।[১১১]

শাসনের জন্য তিনি ওয়ালী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং মহানবী (সা)-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় পদে আসীন ছিলেন।

১০৮. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০।

১০৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১৯।

১১০. ঐ, পৃষ্ঠা ২০।

১১১. ঐ, পৃষ্ঠা ২০।

প্রাদেশিক প্রশাসন ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ও বড় বড় গোত্রের উপর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন 'আমিল'। মদীনা রাষ্ট্রের অধীনে ছিল এরূপে ২৬টি আমিল শাসিত অঞ্চল ও গোত্র।

অঞ্চল ও গোত্রের নাম এবং আমিলদের নাম :

ক্রমিক নং	অঞ্চল বা গোত্র	আমিলদের নাম
১।	বানু কিন্দা ও সাদাক অঞ্চল	হযরত মুহাজির ইবনে উমাইয়া (রা)[১১২]
২।	যুবায়দ	হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা)[১১৩]
৩।	সানআ	হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আস (রা)[১১৪]
৪।	তায়েফ	হযরত উসমান বিন আবুল আস (রা)[১১৫]
৫।	নাসা অঞ্চল	হযরত শাহর বিন বাযম (রা)[১১৬]
৬।	হামাদান অঞ্চল	হযরত আমিন বিন শাহর আল হামদানী (রা)[১১৭]
৭।	হিমায়ের গোত্র	হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রা)[১১৮]
৮।	আসাদ গোত্র	হযরত কুযায়িব বিন আমর (রা)[১১৯]
৯।	বনু তামীম গোত্র	হযরত উয়াইনা বিন হিশন (রা)[১২০]
১০।	আক্ক ও আশয়ার	হযরত তাহির বিন আবু হালা (রা)[১২১]
১১।	সাকাসিফ ও সকুন	হযরত উক্কাশাহ বিন মাউর আল গানয়াসী (রা)[১২২]
১২।	মুসতালিক গোত্র	হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা)[১২৩]
১৩।	তাই গোত্র	হযরত আদী বিন হাতীম (রা)[১২৪]
১৪।	বনু হানযালা গোত্র	হযরত মালিক বিন নুয়ায়রা (রা)[১২৫]

১১২. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২।

১১১৩. ঐ. পৃষ্ঠা ২২।

১১৪. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬, দ্রঃ হাফিয ইবনুল কাইয়েম, যাদুল মা'আদ।

১১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৫।

১১৬. সিরাজুম মুনীরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩।

১১৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩।

১১৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, সম্পাদনা : F. Wuestenfeld. 2 vols (Gottingen. 1858-60) পৃষ্ঠা ১৪/৯৫৬।

১১৯. M. Watt, Muhammad at Medina (Oxford. 1962) পৃষ্ঠা ৩৫৭, দ্র. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬।

১২০. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬।

১২১. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫।

১২২. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬।

১২৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৩৫।

১২৪. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পৃষ্ঠা ৪৫।

১২৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৫।

ক্রমিক নং	অঞ্চল বা গোত্র	আমিলদের নাম
১৫।	বনু সাদ গোত্র (প্রথম অর্ধাংশ)	হযরত যিবরিকান বিন বদর (রা)[১২৬]
১৬।	বনু সাদ গোত্র (দ্বিতীয় অর্ধাংশ)	হযরত কায়িস বিন আসিম (রা)[১২৭]
১৭।	বনু আসলাম ও বনু গিফার গোত্র	হযরত বুরায়দা বিন হুসায়িব (রা)[১২৮]
১৮।	বনু সুলাইম ও বনু মুযাইনা গোত্র	হযরত আব্বাদ বিন বিসর (রা)[১২৯]
১৯।	জুহাইনা গোত্র	হযরত রাফি বিন মাকিস (রা)[১৩০]
২০।	বনু ফাজারা গোত্র	হযরত আমর বিন আলআস (রা)[১৩১]
২১।	বনু কিলাব গোত্র	হযরত যুহাক বিন সুফিয়ান (রা)[১৩২]
২২।	কাব গোত্র	হযরত বুশর বিন সুফিয়ান (রা)[১৩৩]
২৩।	খায়বর	হযরত সাওয়াদ বিন গাযীয়াহ (রা)[১৩৪]
২৪।	জেদ্দা	হযরত অলি হারিস বিন নওফাল (রা)[১৩৫]
২৫।	দাবা অঞ্চল	হযরত হুযায়ফা বিন আল ইয়ামান (রা)[১৩৬]
২৬।	কুরআ আরাবিয়াহ	হযরত আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (রা)[১৩৭]

আমিলগণ স্ব স্ব এলাকায় প্রশাসন পরিচালনা, বিচার কার্যসম্পাদন ও রাষ্ট্রীয় করসমূহ সুষ্ঠুভাবে আদায় করতেন।[১৩৮] উন্নত চরিত্র ও কর্মের দৃঢ়তার অধিকারী তাকওয়াবান সাহাবীদের মধ্য হতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমিল নিযুক্ত করা হত। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং আমিলদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তালিম দিয়ে ন্যায়নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে প্রেরণ করতেন।[১৩৯]

---

১২৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, পূর্বোক্ত, ৯৬৫।
১২৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬৫।
১২৮. আল ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, সম্পাদনা (J. Wellhausen (Berlin, 1882) পৃষ্ঠা ৩৮৫।
১২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৩৮৭।
১৩০. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৫।
১৩১. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৫।
১৩২. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৫।
১৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৩২৬।
১৩৪. উসদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪; কাত্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।
১৩৫. উসদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০; কাত্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১।
১৩৬. ইবনে সাদ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৫২৭।
১৩৮. জুবায়রী, পৃ. ১৭৪।
১৩৮. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪।
১৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬।

শুধু আমিল কেন ওয়ালী ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বিভিন্ন দায়িত্বে সর্বদিক দিয়ে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিদেরকেই নিয়োগ করা হত। যারা কোন পদের জন্য প্রার্থী হত তাদেরকে অযোগ্য ঘোষণা করা হত। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর শপথ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে আমি সে সমস্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করব না, যারা নিজ থেকে প্রার্থী ও লোভী হবে।"

ওয়ালী ও আমিল নিয়োগের সময় তিনি এরূপ হেদায়েত দিতেন যে, মানুষের সাথে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করবে, সহজ পন্থা উদ্ভাবন করবে, কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি করবে না, উৎসাহ ও সুসংবাদ দিবে, ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলবে না। মানুষের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখবে, কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করবে না। এতদ্ব্যতীত তাদেরকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কেও হেদায়েত দিতেন।

ওয়ালী, আমিল ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিজেদের শাসনাধীন এলাকায় প্রশাসন পরিচালনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করা, আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তাদের দায়িত্ব ছিল বিচার ফায়সালা করা, মসজিদে ইমামতী করা, জুমা, দুই ঈদ ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে খুতবা দেয়া, দীনের প্রচার ও প্রসার এবং নাগরিকদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা।

৬.৪ উপসংহার
Conclusion

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় যে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল নিয়মিত সরকার ব্যবস্থা। প্রশাসনিক বিষয়গুলি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আনজাম দেয়ার জন্যই ছিল উপরিউক্ত দফতর ও বিভাগ সম্বলিত সচিবালয়। সকল বিভাগই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনাধীনে। তাঁর সুষ্ঠু তদারকির আওতায় বিভিন্ন বিভাগ নিরন্তর কর্মতৎপর ছিল।

প্রশ্নাবলী

১। মহানবী (সা)-এর সচিবালয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো। (Discuss about the characteristics of prophets (Sm) Secretariat.)

২। মহানবী (সা)-এর সচিবালয়ের বিভিন্ন দফতর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। (Discuss shortly about the various divisions, departments of Prophets (Sm) Secretariat.)

৭

মহানবী (সা)-এর অর্থ-প্রশাসন

Financial Administration of Prophet (Sm)

৭.১ প্রসঙ্গের উত্থাপন (Introduction)

মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটি ছিল মানব জাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ছিল স্বতন্ত্র ও সুসংহত এক সিস্টেম। এ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো রচিত হয় মহানবী (সা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত ইসলামী সমাজের প্রকৃতি, কর্মসূচী, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে। এ প্রশাসনের কাঠামো এক দিনে গড়ে ওঠেনি। মহানবী (সা) পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিকাশমান পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা সাহাবী (রা) গণ জনবিচ্ছিন্ন বা দায়িত্বানুভূতিহীন বিশেষ সুবিধাভোগী কোন গোষ্ঠী ছিলেন না। তাঁরা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দায়িত্বশীলতার (Accountability) এক অত্যুজ্জ্বল নজীর স্থাপন করেছিলেন। ফলে মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনে নাগরিকদের প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতার নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা একাধারে দায়ী (Accountable) ছিলেন- এক. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে, দুই. মহানবী (সা)-এর কাছে, তিন. নাগরিকদের কাছে। এ ত্রিবিধ জবাবদিহিতার কারণ হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, শাসনক্ষমতা একটি আমানত। মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তারা আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহির অনুভূতির পাশাপাশি জনগণের কাছেও জবাবদিহির ব্যাপারে ছিলেন সতর্ক।

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসন ছিল সবচাইতে সুসংহত এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সক্রিয় অংশীদার। মদীনা রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিদর্শন, বাস্তবায়ন এ সবই ছিল অর্থ-প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ। মহানবী (সা) বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যেমে অর্থ-প্রশাসনকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্থাপন, শিক্ষা ও সভ্যতার সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন ও এর সাথে জড়িত সুযোগ্য সাহাবীগণ দক্ষতা, সততা, দূরদর্শিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও

জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে শৃঙ্খলা ও কঠোরতার মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্পষ্ট ও স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এবং প্রশাসনিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তা অনন্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে চিরদিন অম্লান থাকবে। তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা, কার্যক্রম ও দৃষ্টান্ত আজকের ইসলামী উম্মাহর গর্বের বিষয় অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মডেল।

৭.২ মহানবীর অর্থ-প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Financial Administartion of Prophet [Sm])

এক.

মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে এমন একটি অর্থ-প্রশাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা ছিল কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। এ প্রশাসনের ভিত্তি ছিল তাওহীদ[১] ও রবুবিয়াত[২], খিলাফত[৩] ও রিসালাত[৪] এবং আখিরাত[৫]

---

১. তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর একত্ব। তাওহীদের মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহ এক, একক ও অদ্বিতীয়; তিনিই সৃষ্টিকূলের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু। বিশেষ পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা থেকে নিয়ে সকল সৃষ্টিকূল মহান আল্লাহর সৃষ্টি। জগতের সবকিছুর উপরই আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। সবকিছুর পরিচালনায় তিনি সদা সংশ্লিষ্ট ও সদাতৎপর (১০ : সূরা ইউনুস : ৩, ৩২ : সূরা আস সিজদাহ : ৫) এবং অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রতর বিষয়েও তিনি অবহিত, সবকিছুর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত (৩১ : সূরা লোকমান : ১৬; ৬৭ : সূরা আল মুলক : ১৪)

২. রবুবিয়াতের অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ একমাত্র প্রতিপালনকারী। প্রকৃতপক্ষে মানুষসহ সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তথা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জীবিকার ঐশী ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে রবুবিয়াতের মর্মকথা। আল্লাহ পাক এ বিশ্বজাহানে অসংখ্য অফুরন্ত-অগণিত সম্পদরাজির এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে বিভিন্ন সময়কালে মানুষ স্বীয় যোগ্যতা-প্রতিভা নিয়োজিত করে এ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ আহরণ, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ করতে পারে এবং পার্থিব জীবনে সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে।

৩. খিলাফতের অর্থ হচ্ছে- মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি, খলীফা (Viceroy)। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলীফা হিসেবে। খিলাফত শব্দটি স্বত: একথা প্রমাণ করে যে, উহা আসল নয়, আসলের প্রতীকমাত্র, মূলদাতার প্রতিনিধিত্ব করার নামই খিলাফত। মানুষ হল পৃথিবীর শাসক ও পরিচালক। তবে এ শাসন কর্তৃত্ব মৌলিক নয় বরং আল্লাহ হতে অর্পিত (Delegated)। মানুষ এ অর্পিত ক্ষমতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই ব্যবহার করে বলে তাকে খলীফা (Vicegerent) বলা হয়েছে। অন্যকথায় মানুষ প্রকৃত মালিক আল্লাহর প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে নিজের খলীফা বানিয়ে একদিকে যেমন অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে

জবাবদিহিতার[৬] তীব্র অনুভূতি। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনুভূতিই মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে যাবতীয় অন্যায়, জুলুম, শোষণ তথা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রেখেছিল এবং আল্লাহর বিধানের অনুগত বানিয়ে দিয়েছিল।

দুই.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ প্রশাসনের যে দর্শন ছিল তার মৌলিক দিক হল, এ জগতের যাবতীয় সম্পদের পূর্ণ মালিকানা হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। মানুষ সেসব সম্পদের আমানতদার তত্ত্বাবধায়ক। অন্য কথায় মাল সম্পদের আসল মালিক আল্লাহ, মানুষ তাঁরই খলীফা হিসেবে এ মাল সম্পদের আমানতদার, অছি (Trustee)।[৭] মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে এ

প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে ট্রাস্ট সম্পদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিরাট দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদরাজি হতে তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পদ আহরণ করা, তাঁরই বিধান অনুসারে সম্পদ বিনিয়োগ ও উৎপাদন করা, সম্পদ বিনিময় ও বন্টন করা এবং সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করা। আল্লাহর খলীফা হিসেবে তার অন্যথা করার অধিকার মানুষের নেই।

৪. রিসালাত হচ্ছে– মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনয়ন করে তাঁর মাধ্যমে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও বিধান পাঠানোর খোদায়ী ব্যবস্থা। বস্তুত পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর খলীফা নিয়োগ করার পর খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের আইন বিধান অনুসারে পৃথিবীর প্রশাসন পরিচালনা করা। এজন্য প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছ থেকে বিধি-বিধান পাওয়া জরুরি। আল্লাহ পাক রিসালাতের মাধ্যমে যাবতীয় বিধি-বিধান মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন।

৫. আখিরাতের মূল কথা হচ্ছে এ পৃথিবীর জীবনই মানুষের জীবনের শেষ নয়, মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ আরেক জগতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল ধরে সেখানে অবস্থান করবে। সে জীবনে মানুষের পার্থিব সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব নেয়া হবে, পার্থিব জীবনে মানুষ তার উপর অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কিনা তার চুলচেরা হিসাব হবে। আর এরই ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হবে।

৬. আখিরাতে বিশ্বাসই মানুষকে দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতন করে। এ জবাবদিহিতা নিজের ব্যাপারে, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের সামগ্রিক বিষয়ে। এ জবাবদিহিতা সমাজে শান্তি স্থাপন, অন্যায়, অনাচার ও জুলুমের প্রতিরোধ, পারস্পরিক লেনদেনসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, একে অপরের হক আদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। এ পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মুহূর্তের জীবন যেমন দায়িত্বের সাথে জড়িত ও উদ্দেশ্যমুখী, তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাবদিহিতার শর্তের সাথেও অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট।

৭. সূরা আল হাদীদের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে : তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন। আর ওই মাল সম্পদ থেকে খরচ কর, যার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতদার বা অছি বানিয়েছেন।

সম্পদের উপার্জন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব পালন করে। সম্পদের উপর শর্ত সাপেক্ষে মানুষের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

প্রথমত এ সম্পদরাজি কতিপয় ব্যক্তির জন্যে নয় বরং সকল মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত, ব্যয়িত হতে হবে। (২ : সূরা আল বাকারা : ২৯)

দ্বিতীয়ত ধন-সম্পদ উপার্জন করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত বৈধ পথ ও উপায়ে। ভিন্ন পথে করা হলে তাতে খিলাফতের শর্ত লঙ্ঘিত হবে। (২ : সূরা আল বাকারা : ১৮৮)

তৃতীয়ত বৈধ পথে অর্জিত সম্পদে আমানতের শর্ত-নির্ধারিত উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শুধু নিজ স্বার্থ, নিজ পরিবার পরিজনই নয়– সমাজের অন্য সবার কল্যাণেও ব্যবহার করতে হবে। (২৮ : সূরা আল কাসাস : ৭৭)

চতুর্থত স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সম্পদ ধ্বংস ও অপচয় করা যাবে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ আচরণকে কুরআনে ফাসাদ বা বিপর্যয় এবং অনাচার সৃষ্টির সাথে তুলনা করে এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। (২ : সূরা আল বাকারা : ২০৫)

তিন.

তাওহীদ, রিসালাত, খিলাফাত ও আখিরাতের ভিত্তির উপর মদীনা রাষ্ট্রের যে অর্থ-প্রশাসন সংগঠিত হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল ১. সকল নাগরিকের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করা ২. সুবিচার প্রতিষ্ঠা ৩. ক্ষতি, বিপর্যয় ও জুলুমের সকল পথ বন্ধ করা ৪. রাষ্ট্রে বসবাসকারী সর্বস্তরের জনগণের মৌলিক প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করা ৫. আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ৬. ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক স্থায়িত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করা ৭. আল্লাহর সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুকম্পা এবং সকল সৃষ্টি ও মানুষের জন্য নির্মল ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা।

চার.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-আদল ও ইহসান। তা ছিল জাহিলিয়াতের যুগের সব অন্যায়, অত্যাচার ও বে-ইনসাফী হতে মুক্ত। আদল মানে সুবিচার, ন্যায়বিচার। দুটি স্বতন্ত্র সত্যের সমন্বয়ে আদল গঠিত। এক. মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা। দুই. প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার অধিকার প্রদান করা। কোন পক্ষপাতিত্ব না

করা যার যা প্রাপ্য তাতে তা দেয়ার নাম আদল। প্রকৃতপক্ষে আদলের দাবি হচ্ছে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য। প্রত্যেক নাগরিককে তার নৈতিক, সম্পর্কগত, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে যথাযথভাবে প্রদান করা। ন্যায় বিচারের অন্য অর্থ সমাজ হতে অন্যায় ও জুলুমের উচ্ছেদ এবং সবল প্রতিরোধ। ইসলামী শরীয়ার ব্যত্যয় জুলুমকেই ডেকে আনে। জুলুমের সময়োচিত প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ না হলে দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতারিত, নিগৃহীত, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্যই মহানবী (সা)-এর অর্থ-প্রশাসনে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। আদল বা সুবিচারের স্বার্থে আইনের তাৎক্ষণিক ও যথাযথ প্রয়োগ মদীনা রাষ্ট্রে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। একই সাথে ইহসান বা কল্যাণের প্রসঙ্গটি মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছিল। ইহসান মানে সুন্দর ব্যবহার, হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ, অপরকে তার অধিকারের চেয়ে বেশি দেয়া এবং নিজের অধিকারের চেয়ে কম পেয়েও সন্তুষ্ট থাকা। ইহসান আদলের চেয়ে বেশি কিছু। কোন সমাজ কেবল আদলের নীতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যেখানে সমাজের প্রত্যেক সদস্য হরহামেশা মেপে মেপে নিজের অধিকার নির্ণয় ও আদায় করে; আর অপরের অধিকার কতটা রয়েছে তা খতিয়ে নির্ধারণ করে এবং কেবল ততটুকুই দিয়ে দেয়। এ ধরনের একটি সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটবে না বটে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সে সমাজে প্রেম ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, মাহাত্ম্য, উদারতা, ত্যাগ ও কুরবানী, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং অপরের কল্যাণ কামনার মতো মহত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে বঞ্চিত থেকে যায়। অথচ এ গুণগুলো তথা ইহসান হচ্ছে ব্যক্তি জীবনে সজীবতা ও মাধুর্য সৃষ্টির এবং সমাজ জীবনে সৌন্দর্য ও সুষমা বিকাশের উপাদান। ইহসানের সাথে আর্থ-সামাজিক সুবিচার এবং কার্যক্রমের যে আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন এজন্যই তা বাস্তবায়নকে মদীনা রাষ্ট্র ফরয হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[৮] মদীনার অর্থনীতিতে

৮. আল্লাহ বলেন : তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, মারূফের সুপ্রতিষ্ঠা ও মুনকারের উৎখাতের কথা বলেছেন। আদল ও ইহসান কায়েম করতে হলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে মারূফ বা সুনীতি প্রতিষ্ঠা এবং মুনকার বা দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করতে হবে, মূলোৎপাটিত করতে হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমর বিল মারূফের অর্থ হবে সর্ববিধ উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠা করা এবং নাহি আনিল মুনকারের অর্থ হবে অর্থনৈতিক জুলুমের সব উপায় ও পন্থাকে বন্ধ করে দেয়া। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা', শাহ আবদুল হান্নান (শতদল প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৬)।

কড়া নজর রাখা হত যাতে আদল ও ইনসাফ কায়েম থাকে এবং কোন জুলুম হতে না পারে।

পাঁচ.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার। যাবতীয় বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার মদীনা রাষ্ট্রে নিশ্চিত করা হয়েছিল। মানব কল্যাণের লক্ষ্য হাসিলের জন্যই মহানবী (সা) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সসীম সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ ও ব্যবহার করেছিলেন। মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তি এবং ত্যাগ উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে বলেই মনে করা হত। সম্পদের ব্যবহার ও ভোগ শুধুমাত্র ইহজাগতিক সুখের জন্য নয়। এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণও নিশ্চিত করতে হবে।[৯]

ছয়.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো ও তাদের মানবিক মর্যাদার যথাযথ প্রতিষ্ঠা। মদীনা রাষ্ট্রে ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈধ পন্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদে অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। বিশেষত আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজে যারা মন্দভাগ্য তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া প্রতিটি বিত্তবান নাগরিকের ঈমানী দায়িত্ব। কুরআনের আদর্শ অনুসারে নাগরিকগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত তারা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সামজের বঞ্চিত ভাগ্যাহত লোকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করত। সমাজের বিত্তহীন ও অভাবগ্রস্ত নাগরিকদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য দেয় কুরআনিক নির্দেশনা মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

সাত.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনে যে অর্থব্যবস্থা কায়েম করেছিল তাতে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন করে জীবিকা অর্জন করার অধিকার ছিল। অন্য কথায় জীবিকা অর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এ পৃথিবীতে আল্লাহর যে নিয়ামতসমূহ

৯. সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে পরকালিন শান্তির আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তদ্দারা পরকালের ঘর বানানোর চিন্তা কর, অবশ্য দুনিয়া হতেও তোমার অংশ ভুলে যেও না।' (২৮ : সূরা আল কাসাস : ৭৭)

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যে অফুরন্ত সম্পদ ভাণ্ডার পৃথিবীতে রয়েছে তা খুঁজে বের করে যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা যায়।[১০] মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিক স্বাধীনভাবে ব্যবসা, চাষাবাদ, কৃষি, পশুপালন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। উৎপাদন কার্য চলত স্বাধীনভাবে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সাহাবীরা নিজেরাও অংশগ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজন বোধে মজুরও নিয়োগ করতেন।[১১] এককথায় মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসন ইসলামী শিক্ষার আওতাধীন এক স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এতে বেকার এবং অভাবগ্রস্তদের কর্মসংস্থান অথবা ভাতার ব্যবস্থা ছিল।[১২]

আট.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনীতি স্বাধীন অর্থনীতি হলেও তা অবাধ ছিল না। কারণ ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন, উপার্জন, ব্যয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর আইনের নিয়ন্ত্রণ পর্যাপ্ত। ফলে সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এতে নিশ্চিত।

নয়.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ ছিলেন রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের রক্ষক। তারা ভক্ষক ছিলেন না। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অত্যন্ত সাদা-সিধে জীবন যাপন করতেন। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছিলেন। বায়তুলমাল থেকে একজন সাধারণ নাগরিকের জীবন ধারণোপযোগী সমতুল্য অর্থই তারা পেতেন। কোন অবস্থাতেই তারা বেশি অর্থ নিতে রাজি হতেন না।

---

১০. পেশার স্বাধীনতার কথা আল কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : 'তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে' (২ : সূরা আল বাকারা : ২৭৫) 'নামায শেষ করার পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফজল অর্থাৎ রিযিক অন্বেষণ কর।' (৬২ : সূরা আল জুমুআ : ১০)

১১. ইতিহাসে অনেক সাহাবীর মজুরির বিনিময়ে কাজ করার উদাহরণ রয়েছে।

১২. রাষ্ট্রে এমন কিছু লোক থাকতে পারে যারা শারীরিকভাবে কর্ম-অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ, নাবালক। তারা কাজ করতে পারে না কিংবা তাদের ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা নেই বলে তারা অভুক্ত থাকবে কিংবা ধুকে ধুকে মরবে তা ইসলামী সমাজে ঘটতে পারে না। এজন্য মহানবী (সা)-এর অর্থ ব্যবস্থায় এদের ভরণ-পোষণ ও সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণের বিধান ছিল।

অর্থ-প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত কর্তা ব্যক্তিগণ যাতে আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করেন মহানবী (সা) সেদিকে কড়া নজর রাখতেন। প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিকগণ যাতে আরামপ্রিয় না হয়ে পড়ে সেজন্য আরাম আয়েশের উপাদানগুলোর উপর ইসলামের নৈতিক ও চারিত্রিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং সহজ সরল ও সাদা-সিধে জীবন যাপনের উপর সকলকে উৎসাহিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র-এর রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারকে সমান চোখে দেখে।[১৩]

দশ.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থপ্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা। মদীনা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যেকোন প্রকার জুলুম ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ সংখ্যালঘুরা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের আমানত।

এগার.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি আল কুরআন হচ্ছে এমন এক ঐশী গ্রন্থ যেখানে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব এবং ব্যয়ের খাত সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মুসলমানদের কাছ থেকে সংগৃহীত যাকাত অমুসলিমদের কল্যাণার্থে ব্যয়েরও নির্দেশ রয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। সম্পদ উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত করার জন্য বিভিন্ন ম্যাকানিজমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়, ধন বৈষম্য কমে সামাজিক বৈষম্য নির্মূল হয় এবং শ্রেণী সংঘাতের অবসান ঘটে। ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন ও আয়ের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পৃক্ত থাকে। ইসলামে- নিষিদ্ধ উৎপাদন ও আয় হারাম বলে গণ্য হয়। একদিকে ইসরাফ[১৪] ও তাবজীর[১৫] সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে অন্যদিকে

---

১৩. সাইয়েদ হাসান মুসান্না নদভী, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামিক; ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

১৪. ইসরাফ (Overuse) হলো অপচয়, অপরিমিত ব্যয়, অতিরিক্ত পানাহার করা, বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু ব্যয় করা, নষ্ট করা (Wastage)। ইসরাফ হলো হালাল খাতে এমন ব্যয় যা প্রয়োজনাতিরিক্ত। হালাল সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা। যদি কোন বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত করা হয়; তখন সেটা ইসরাফ হয়। অন্য কথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই সেটা ইসরাফে পরিণত হয়। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় 'ইসরাফ' অর্থ সীমালঙ্ঘন করা বা অপচয় করা। মানুষ

ইহতিকার বা মজুদদারী সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার আইনও সম্পদ বন্টনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসন কুরআনের এসব নির্দেশকেই বাস্তবায়িত করেছে।

বার

মদীনা রাষ্ট্রে সুদহীন অর্থনীতি চালু করা হয়েছিল। কুরআন মজীদে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১৬] মহানবী (সা)-এর অর্থনীতিতে সুদের লেনদেন

প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই অপচয় করছে। কাজ না করে সময়ের অপচয় করছে, জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার না করে অপচয় করছে। পানাহারে বা ভোগবিলাসে অতিরিক্ত ব্যয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থবাদী ভোগবাদী জীবনধারার অনুসরণ ফুটে উঠে। হালাল জিনিসের ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপব্যয় এবং বাহুল্য ব্যয় এক প্রকার সীমালঙ্ঘন। এ ধরনের ব্যয়ই ইসরাফ। বৈধ কাজে খরচ করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা, চাই তা সামর্থ্যের চেয়ে অধিক খরচ করা হোক কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সম্পদই ব্যয় করা হোক। এ ধরনের অপচয়ের কোন স্থান নেই ইসলামে। আল্লাহ্ বলেন : 'খাও ও পান কর। অপচয় করো না। আল্লাহ্ অপচয়কারীকে পছন্দ করে না।' (৭ : সূরা আল আরাফ : ৩১)

ইসরাফ না করার নীতির ব্যাপক ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের তাৎপর্য রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি একটি নৈতিক নীতি হিসেবে কাজ করবে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভোক্তাগণ তাদের নিজ নিজ মাসয়ালা অনুসরণ করার অজুহাতে ইসরাফের কবলে পড়ে যেতে পারে। অন্য কথায় নিজেদের ভোগবিলাস আর উদর পূর্তি করতে গিয়ে গরীব ও অসহায় প্রতিবেশীর কথা ভুলে যেতে পারে। সামাজিক পর্যায়ে ইসরাফ সংক্রান্ত নীতি আরো ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে। সরকারের পরিকল্পনা, আমদানী-রফতানী, উৎপাদন, বন্টননীতি এমনভাবে তৈরি হবে, যা সে সময়ের প্রেক্ষিতে সে দেশে ইসরাফ উৎসাহিত না হয় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসরাফ করার সুযোগ কমে যায়। সরকার নিজেও ইসরাফ পরিহার করবে। ব্যয়ের ইসলামী নীতিতে তাই আদর্শও কাম্য।

১৫. তাবজীর (Misuse) হলো হারাম খাতে কোন বিনিয়োগ বা খরচ। ইসলাম তাবজীরকে নিষিদ্ধ করেছে। সমাজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখা এবং স্বীয় বদান্যতা ও ধনদৌলতের ডঙ্কা বাজানো তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নয় বরঞ্চ লোক দেখানো ও আত্মপ্রচারের জন্য ব্যয় করা এ পর্যায়ে পড়ে। ইসরাফের তুলনায় তাবজীরের ক্ষতি ব্যাপক। এজন্যই তাবজীরকারীদের শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন : 'নিশ্চয়ই যারা তাবজীর করে তারা শয়তানের ভাই'। (১৭ : সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭)

অবৈধ উপার্জন হতে অবৈধ খাতে ব্যয়ই শুধু নিষিদ্ধ নয়; হালাল উপার্জন হতেও অবৈধ খাতে ব্যয় নিষিদ্ধ। এজন্যই ইসলামে তাবজীরকারী বা অপব্যয়কারীকে পছন্দ করা হয় না। অপব্যয়ের ছিদ্র পথেই সংসারে আসে অভাব অনটন। সমাজে আসে অশান্তি। রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। এজন্য অপব্যয় বা তাবজীর ইসলামে অপরাধ।

১৬. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৭৫।

সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা হয়। কুরআন সুদকে নিষিদ্ধ করেই থামেনি, সুদের কারবারীদের প্রতি জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে।[১৭] মদীনার ব্যবসায়ীরা নিজের অর্থে ব্যবসা করতেন অথবা অন্যের নিকট থেকে লাভ লোকসানে অংশী হওয়ার ভিত্তিতে বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধনের ব্যবস্থা করতেন। লাভের অংশ বিনিয়োগকারীকে দিয়ে দিতেন। শরীকানা ভিত্তিতেও ব্যবসা করা হত। শরীকানা ব্যবসায়ে হয় দু'জনের পুঁজিই খাটান হত অথবা একজনের পুঁজি, অন্যজনের শ্রম সংযুক্ত হত এবং নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী লাভ-লোকসান ভাগ করা হত। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিনাসুদে একজন অন্যজনের নিকট হতে কর্জ (ঋণ) গ্রহণ করতেন। মদীনার অর্থনীতিতে আধুনিক ধরনের ব্যাংক কায়েম ছিল না। এ কারণে আধুনিক অর্থনীতিতে সুদের যেসব খারাপ প্রভাব রয়েছে তা মদীনার ইসলামী অর্থনীতিতে দেখা দেয়নি। মদীনার অর্থ প্রশাসন সুদের মতো সব ধরনের শোষণের উপায় উপকরণকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শোষণের হাতিয়ারের কোন স্থান নেই। ইসলামী অর্থনীতিতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে আয় ও উৎপাদনের পথ ও প্রক্রিয়া হবে হালাল, হারাম পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ। এজন্য মদীনার অর্থনীতিতে ঘুষ, ফটকা কারবার, চোরাচালান, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এসবের কোন সুযোগ ছিল না।

তের.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধন। হাতের কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের বিস্তার ঘটানো হয়। একই সাথে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়।

চৌদ্দ.

মদীনার রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় ধনবানদের সম্পদ পবিত্রকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এ পবিত্রকরণের মাধ্যমে সম্পদের আবর্তন সৃষ্টি হয়, ধনীদের হাত থেকে সম্পদ নেমে আসে গরীবদের নিকট। ইসলামে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ধনবানদের সম্পদ শুধুমাত্র ধনবানদের নয়, এর উপর দরিদ্রদেরও হক রয়েছে। কুরআন বলছে : "আল্লাহর রাহে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে তোমরা ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করো না"[১৮] "এবং তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক

১৭. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৭৯।

১৮. ২ : সূরা আল বাকারা : ১৯৫।

রয়েছে।"[১৯] "আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে।"[২০] মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসন আল্লাহর এসব নির্দেশকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল।

পনর.

মদীনা রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসনের আওতায় অমুসলিমদের উপর করারোপ বস্তুত: তাদের প্রতি কর্তব্যবোধেরই পরিচায়ক। মুসলিম নাগরিকদের মতো অমুসলিমদের জান ও মালের হেফাজত রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। কাজেই মুসলিমদের জন্য যাকাত অত্যাবশ্যক ধরে অমুসলিমদের জিযিয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী।

বায়তুলমাল (Public Treasury)

বায়তুলমাল-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। মদীনা রাষ্ট্রে যে অর্থ-প্রশাসন ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু হল বায়তুলমাল- রাষ্ট্রীয় কোষ। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারী অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকেই বায়তুলমাল বলা হয়। অবশ্য কোন কোন সময় ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা অর্থব্যবস্থাকেও বায়তুলমাল বলা হয়ে থাকে। তবে পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ স্থানটিকে বায়তুলমাল বলা হয়।[২১] মদীনা রাষ্ট্রের বায়তুলমাল জনকল্যাণ এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য গঠিত হয়েছিল।[২২] বায়তুলমাল ছিল মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। এজন্যেই বলা হয়েছে–

"বায়তুলমাল সম্পদ মুসলমানদের (মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকদের) সম্মিলিত সম্পদ।"

বায়তুলমালে সঞ্চিত রাষ্ট্রের সম্পদে রাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার স্বীকৃত। কি রাষ্ট্রপ্রধান, কি সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সাধারণ মানুষ বায়তুলমালের উপর কারোরই একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হতে পারে না। এ কথাই ঘোষিত হয়েছে মহানবী (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে–

---

১৯. ৫১ : সূরা আয-যারিয়াত : ১৯।

২০. ৩০ : সূরা আর-রূম : ৩৮।

২১. মাওলানা মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ. এস. এম. ওমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২২. সাইয়্যেদ হাসান মুসান্না নদভী, পূর্বোক্ত।

"আমি তোমাদের দানও করি না, নিষেধও করি না, আমি তো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে, আমি সেভাবেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টন করে থাকি।"

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল-ধনভাণ্ডার সহায় সম্পদ সবই জনগণের আমানত। শরীআত মুতাবিক ও জনগণের কল্যাণের নিমিত্তেই ন্যায়সঙ্গত পন্থায় রাষ্ট্রের আয় করতে হবে, ব্যয়ও করতে হবে। কোন প্রকার অপচয়, অন্যায় ব্যয়, বেইনসাফী করা চলবে না।

বস্তুত ইসলামে বায়তুলমালের ধারণা অতি ব্যাপক। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা এবং মানুষের খিলাফতের মৌলিক বিশ্বাসের উপরই বায়তুলমালের ধারণা ভিত্তিশীল। বায়তুলমাল ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকস্বরূপ। তদানীন্তন সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন বায়তুলমালই পূরণ করত। তবে অবশ্য আধুনিক কালের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় ব্যাপক ও বিস্তর কাজ এর ছিল না। তাছাড়া আধুনিক অর্থে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অস্তিত্ব মদীনা রাষ্ট্রে ছিল না। ফলে জনগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

মদীনা মুনাওয়ারায় যেদিন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের শুভ সূচনা হয়েছিল মূলত সেদিন হতেই বায়তুলমালের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে বায়তুলমালে কোনরূপ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা হত না, তার অবকাশও তখন ছিল না। বায়তুলমালে যে অর্থ সম্পদ জমা হত, মহানবী (সা) তা তৎক্ষণাৎ স্বীয় সাহাবীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। কারণ তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় আয়ের অবস্থা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। মহানবী (সা)-এর যুগে বায়তুলমালের সম্পদ সঞ্চিত করে রাখার সুযোগই যেহেতু ছিল না, তাই এর জন্য পৃথক কোন ঘর নির্মাণ করা হয়নি বরং বায়তুলমালের সকল প্রকারের যাবতীয় ধন মসজিদের নববীতে জমা করে, পরবর্তীতে তা সঠিক প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত।[২৩]

মহানবী (সা) স্বয়ং বায়তুলমালের কেন্দ্রীয় কর্মকাণ্ড ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের অঞ্চলওয়ারী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] কেন্দ্রের নির্দেশ বা বিধান অনুযায়ী বায়তুলমালের অঞ্চল ও গোত্রভিত্তিক শাখা স্থানীয়

---

২৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯৪, পৃ. ৫৯৫।
২৪. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত।

অর্থকরী প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব বহন করত।[২৫] বায়তুলমাল ছিল মদীনা রাষ্ট্রের সেসব আয়ের বাহক যা ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী অর্থভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। অন্য কথায় ইসলামী বিধানানুযায়ী মদীনা রাষ্ট্রের শাসনাধীন সমগ্র এলাকার যেসব আয় সরকারী অর্থভাণ্ডারে আসা উচিত সেসব সংগ্রহ ও জমা রাখার দায়িত্ব ছিল বায়তুলমালের। অনুরূপভাবে বায়তুলমাল এ সমস্ত ব্যয় নির্বাহেরও জামিনদার, যা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য অপরিহার্য। এজন্যই মহানবী (সা) ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বায়তুলমালের আয়-ব্যয়ের নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোন সম্পদ বায়তুলমালে জমা হলেই মহানবী (সা) অস্থির হয়ে উঠতেন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সে সম্পদ অভাবগ্রস্তদের ও অন্যান্য পাওনাদারদের মধ্যে বিতরণ করে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেরতেন।[২৬] বায়তুলমাল থেকেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান করা হত।[২৭] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) বলেন : কাউকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কোন দায়িত্ব দেয়া হলে আমি অবশ্যই তাকে গ্রাসাচ্ছাদন দেব। অতিরিক্ত কিংবা এর বাইরে কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে খেয়ানত।[২৮]

মহানবী (সা) বিভিন্ন উৎস থেকে বায়তুলমালের প্রাপ্ত আয় পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন, কারণ এর প্রতিটি উৎসের প্রকৃত ও বৈশিষ্ট্য ছিল আলাদা এবং তার ব্যয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

বায়তুলমালের আয় (Sources of Income of Baitulmal)

মহানবী (সা)-এর সময়ে বায়তুলমালের আয়ের উৎসসমূহ ছিল[২৯] : ১. যাকাত, ২. উশর, ৩. উশুর, ৪. সাদাকাতুল ফিতর, ৫. আওকাফ, ৬. আমওয়াল আল ফাদিল, ৭. নাওয়াইব, ৮. দান, ৯. মালে গানীমাহ, ১০. খুমুস, ১১. ফাই, ১২. মুক্তিপণ (Ransom), ১৩. কর্জ, ১৪. উপহার সামগ্রী, ১৫. জিযিয়া, ১৬. খারাজ।

---

২৫. মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মাওলানা আবদুল আউয়াল অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

২৬. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, ঢাকা ১৯৮৪।

২৭. মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত।

২৮. জবাবদিহিতা ও কর্মচারীদের তদারকী প্রসঙ্গ, মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত।

২৯. এস. এ. সাবজওয়ারী, ইকনমিক এণ্ড ফিসক্যাল সিস্টেম ডিউরিং দি লাইফ অব মুহাম্মদ (সা), দি জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এণ্ড ফিন্যান্স, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ২২।

১. যাকাত (Zakat)

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ক্রমবৃদ্ধি, পরিবর্ধন, আধিক্য, পবিত্রতা, পরিশোধন ও প্রশংসা। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে যে কোন প্রকারের বহনযোগ্য বা স্থানান্তর যোগ্য সম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছলে তার উপর বাধ্যতামূলকভাবে দেয় অর্থকে যাকাত বলে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, যাকাত প্রদানকারীর মন ও আত্মা পবিত্র হয়। তার ধন-মাল বৃদ্ধি পায় ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা পরিমাণে বেশি হয়। যাকাত হচ্ছে ধনীদের ধনমালে আল্লাহর নির্ধারিত সে ফরয অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর রহমতের আশায় দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করার জন্য দেয়া হয়।

যাকাত হচ্ছে আল্লাহর হুকুম এবং অন্যতম মৌলিক ফরয। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধান উৎস। ইসলামে নামাযের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অংগ, অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক মুয়ামিলাতের দিক নিদের্শক, হাককুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের মধ্যে সমন্বয়কারী সংস্থা।

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বহুবার নামাযের সাথেই যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে হলে মুসলমানদের অবশ্যই রীতিমত নামায ও যাকাত আদায় করতে হয়। দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর ইচ্ছার সামনে নিজেকে সমর্পিত করার মনোবৃত্তিই যাকাত প্রদানের প্রধান কারণ।

শরীআতের লক্ষ্য অর্জনে যাকাতের ভূমিকার মূল্যায়নেও এর গুরুত্ব প্রতিভাত হয়। শরীআতের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কল্যাণ সাধন, যাবতীয় ক্ষতি, বিপর্যয় থেকে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে রক্ষা করা। যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে শরীআতের এ লক্ষ্যগুলোই অর্জিত হয়। কারণ যাকাত দানকারী সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও দরদী 'খলীফা সত্তা' হিসেবে গড়ে উঠে। যাকাতদাতার চরিত্রকে দানশীলতার গুণে বিভূষিত করে, কার্পণ্য ও হীন লোভ লালসা থেকে মনকে মুক্ত করে। বদান্যতা ও মহানুভবতার গুণে গুণান্বিত করে। যাবতীয় নিয়ামত, ধনসম্পদ লাভের জন্য যাকাতদাতা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। যাকাত আদায়ের মধ্যদিয়ে ধনী ও বিত্তবানরা অহঙ্কার থেকে রেহাই পায়। অর্জন করে বিনয় ঔদার্যের গুণ। একই সাথে যাকাত বিত্তহীনকেও প্রবৃদ্ধি দান করে, তাদেরকে বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্মানের অধিকারী শক্তিশালী সামাজিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ করে দেয়। ফলে তারা

আল্লাহর সম্মানিত খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করে। এতে পারস্পরিক সহযোগিতার সমাজ গড়ে উঠে; যৌথ উদ্যোগ-প্রচেষ্টার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সমাজ জীবনে কায়েম হয় সংহতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা। শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়ের সকল প্রক্রিয়া থেকে সমাজ ও সমাজের মানুষ মুক্তি পায়।

যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে দেয়। যাকাত মুসলমানদের উপর তাদের সঞ্চয় ও সম্পত্তির জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিলে দেয় একটি বাধ্যতামূলক ট্যাক্সস্বরূপ। যাকাত ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক দান খয়রাত ধরনের কিছু নয়। যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত প্রদান করা না হলে ঐ সম্পদের মালিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। তবে আধুনিক ট্যাক্সের মতো যাকাতে ঈর্ষাপরায়ণতা নেই।

যাকাত ব্যবস্থাকে আল্লাহ সম্পদাধিকারীদের সম্পদের পবিত্রতা এবং তাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের এক মহামাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : আপনি এদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে এদের পবিত্র করুন, এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিস্বরূপ।[৩০]

এ আয়াতে যাকাত আদায়ের একটা নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে। সে নিয়মটা হচ্ছে মুসলমানদের যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে জমা দিতে হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে যাকাত সংগ্রহ ও বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য একটি বিশেষ সংস্থা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় কোষে-বায়তুলমালে একটি আলাদা খাত নির্দিষ্ট করতে হবে।

যাকাতের নির্দেশ যদিও মক্কা শরীফেই নাযিল হয়,[৩১] কিন্তু তার বিস্তারিত বিধান ও ব্যবস্থা নাযিল হয় মদীনায়। প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কী জীবনে সাহাবায়ে কেরাম ব্যক্তিগতভাবেই যাকাত দিয়ে দিতেন। কিন্তু উত্তরকালে মদীনা রাষ্ট্রে সূরা আত তাওবার উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তা সংগ্রহ ও বিলি বণ্টন করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

---

৩০. ৯ : সূরা আত-তাওবা : ১০৩।

৩১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, যাকাত এর প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের প্রবন্ধ, আল কুরআনে অর্থনীতি-প্রথম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (১৯৯০), পৃ. ৫৬২-৫৭৪।

যাকাতের নির্ধারিত সময়, পরিমাণ, নিসাব, কার কার উপর তা নির্ধারণ করা হবে, এর ব্যয়ের খাতসমূহ কি কি ইত্যাদি সকল বিষয়ে মহানবী (সা)-এর অনুসৃত শরীয়াত এবং ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অত্যন্ত পরিপূর্ণ ও সমন্বিত। এ ক্ষেত্রে যেমন সম্পদাধিকারীদের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তেমনি দরিদ্র ও অভাবীজনদের কল্যাণের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

নগদ অর্থ, মওজুদ সম্পদ, অলঙ্কারাদি, স্বর্ণরৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু, খাদ্যশস্য ও কৃষি পণ্য কিংবা পশু সম্পদ, বাণিজ্য পণ্য, সবকিছুর উপরই যাকাত আরোপিত হয়। যাকাত আয় ও সম্পদ উভয়ের উপরই আরোপিত হয়। তবে বিভিন্ন সম্পদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিম্নতম সীমা (Exemption Limit) নির্ধারিত রয়েছে। একে বলা হয় নিসাব। যাকাত বিত্তবানদের কাছ থেকে আদায় করে শরীয়া নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হয়।

যাকাত প্রত্যেক ধনী মুসলিমের উপর ফরয এবং তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। আদায় করতে হয় ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের মাধ্যমে সামষ্টিকভাবে। মদীনা রাষ্ট্রে এজন্যই একটি সুষ্ঠু যাকাত প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। এতে ছিল একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কাঠামো, নিয়োজিত করা হয়েছিল অসংখ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী। যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীর কাছেই যাকাত সোপর্দ করতে হত। যাকাত প্রশাসন মহানবী (সা)-এর তত্ত্বাবধানে যাকাত সংগ্রহ ও বিলি বণ্টনের জন্য একটি আদর্শ সামষ্টিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সূরা আত তাওবার ১০৩ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী গড়ে উঠে সুনির্দিষ্ট যাকাত প্রশাসন।

যাকাত বাবত যে অর্থ বা মাল গৃহীত হত মহানবী (সা)-এর নির্দেশে তার হিসাব কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা) ও হযরত যুহাহির বিন সালাত (রা)[৩২] যাকাত আদায় ত্বরান্বিত করার জন্য মহানবী (সা) নবম হিজরী সনের ১লা মুহররম প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র আদায়কারী নিযুক্ত করেন।[৩৩] এ আদায়কারীদের মধ্যে ছিলেন :

---

৩২. আল কালকাশান্দী, সুবহু আল আশা, কায়রো ১৯২৩, ১৪শ খণ্ড।

৩৩. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মহান রাষ্ট্রনায়ক রাসূলে করীম (সা), মাসিক আল-বালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

ক্রমিক নং	অঞ্চল বা গোত্র	আদায়কারীর নাম
১।	মদীনা মুনাওয়ারা	হযরত উমর ফারুক (রা)
২।	নাজরান	হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা)
৩।	ওমান	হযরত আমর ইবনুল আস আস সাহমী (রা)
৪।	হাজরামাওত	হযরত ওয়াইল ইবন হুজর আল হাযরামী (রা)
৫।	ইয়েমেন	হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা)
৬।	উজুম হাওয়াযিন	হযরত মালিক ইবনে আওফ আল নাসরী (রা)
৭।	তামীম গোত্র	হযরত উয়ায়নাহ ইবনে হিসন আল ফারাযী (রা)
৮।	আসলাম ও গিফার গোত্র	হযরত বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব (রা)
৯।	সুলায়ম ও মুযায়নাহ গোত্র	হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর আল আশহালী (রা)
১০।	জুহায়নাহ গোত্র	হযরত রাফি ইবনে মাকীস (রা)
১১।	বনু কিলাব	হযরত আজজাহহাক ইবনে সুফিয়ান আল কিলাবী (রা)
১২।	বনু কাব	হযরত বসুর বিন সুফিয়ান (রা)
১৩।	বনু যুবরান	হযরত ইবনুল আযদী (রা)
১৪।	বুন তায়্যি ও বনু আসাদ	হযরত আদী বিন হাতেম তাঈ (রা)
১৫।	বনু লাইস	হযরত আবু জাহম বিন হুজায়ফা (রা)
১৬।	তাইফ ও আহলাফ	হযরত সালিক ইবনে উসমান বিন মুয়াত্তিব সাকাফী (রা)
১৭।	বনু কুশায়র ও জাদাহ গোত্র	হযরত কুররাহ ইবনে হুবায়রাহ আল কুশায়রী (রা)
১৮।	বনু কালব	হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ আযযুহরী (রা)
১৯।	বনু আমির	হযরত আমির ইবনে মালিক বিন জাফর (রা)
২০।	বনু মুররাহ	হযরত আল হারিস ইবনে আওফ (রা)
২১।	বনু দারিম ইবনে মালিক	হযরত আকরা ইবনে হারিস (রা)
২২।	বনু য়্যারবু ইবন হানজালাহ	হযরত মালিক ইবনে নুওয়ায়রাহ (রা)

কুরআনে যাকাত আদায়কারীগণকে বলা হয়েছে আমিল। এ ছাড়াও তাদেরকে মুসাদ্দিক, সুয়াত (একবচন সাঈ), জুবাত (একবচন জাবী) ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়েছে। যাকাত আদায়কারীদের মধ্যে আরো কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। এরা হচ্ছেন– হযরত সাফওয়ান ইবনে সাফওয়ান (রা), হযরত রাফে ইবনে মুকাইল (রা), হযরত কায়েস ইবনে আসিম (রা), হযরত যারকান ইবনে বদর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল্লাতি (রা) প্রমুখ সাহাবী।[৩৪] মহানবী (রা) নিজ পরিবার-পরিজন এবং বংশীয় যে কোন ব্যক্তির জন্য যাকাত, ফিতরা গ্রহণ

৩৪. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পূর্বোক্ত।

সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছিলেন। আর এজন্যই তিনি স্ববংশীয় কোন ব্যক্তিকে যাকাত প্রশাসনের কোন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করেননি।[৩৫]

যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের পূর্বে মহানবী (সা) তাদেরকে এ সম্পর্কীয় নিয়মাবলীর এক লিখিত নির্দেশনামা প্রদান করতেন। আদায়কারীদেরকে তাদের নিতান্তই অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটে এরূপ পরিমাণ বিনিময় প্রদান করা হত। জনগণের কাছ হতে উপহার গ্রহণ ছিল তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৩৬]

মুসলিম শরীফের একটি হাদিস অনুসারে ইবনুল লুতবিয়া আল আযাদীকে বনু সুলায়ম গোত্রের যাকাত ও অন্যান্য কর সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি কিছু উপহার গ্রহণ করেছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আদায়কৃত যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব মহানবী (সা)-এর দরবারে জমা দেয়ার সময় তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) এ হল আদায়কৃত যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব সামগ্রী, আর এগুলো লোকেরা আমাকে উপহার দিয়েছে। এ কথা শ্রবণ করে মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন : তুমি তোমার বাড়ি থাকাকালীন সময়ে লোকেরা তোমাকে এসব উপহার দেয়নি কেন। এ কথা বলে মহানবী (সা) সমস্ত উপহার যাকাতের সঙ্গে বায়তুলমালে জমা দিয়ে দেন এবং এক সমাবেশ ডেকে খুতবা দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহকারীগণকে এবং বস্তুত সকল রাষ্ট্রীয় কর্মচারীগণকেই দায়িত্ব পালনকালে কোন প্রকার উপহার গ্রহণ না করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৩৭] এ ছাড়াও যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কোনরূপ কঠোরতা না করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৩৮] যাকাত বাবদ সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ নিয়ে নেয়ার নীতি তাঁর ছিল না বরং তিনি মাঝামাঝি ধরনের মাল গ্রহণ করতে বলতেন।

যাকাত ব্যয়ের খাত আল্লাহ স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন বলছে : যাকাত ১. ফকীর-দরিদ্র, ছিন্নমূল ও পঙ্গু ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য, ২. মিসকিন, ৩. আমিলুন-যাকাত আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের বেতন প্রদান, ৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব- মন জয় করার জন্য, ইসলামের বিরোধিতা বন্ধ করা বা ইসলামের সহায়তার জন্য কারো মন জয় করার প্রয়োজন হলে এবং নওমুসলিমদের সমস্যা দূর করার জন্য, ৫. গলদেশ মুক্ত করা, ৬. ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ, ৭. ফি

---

৩৫. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত।

৩৬. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত।

৩৭. দ্র. কাত্তানী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।

৩৮. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত।

সাবীলিল্লাহ- দীন কায়েমের কাছে খরচ করা, ৮. পথিক, প্রবাসী, মুসাফিরদের ব্যয় বহন।[৩৯] এখানে লক্ষণীয় যে আটটি খাতের মধ্যে ছয়টিই দারিদ্র্য দূরীকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মহানবী (সা)-এর রীতি ছিল যে অঞ্চলের বিত্তবানদের কাছে থেকে যাকাত সংগ্রহ করা হত সে অঞ্চলের হকদারদের মাঝেই তা বণ্টন করে দেয়া হত। যদি সে অঞ্চলের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হত তবেই তা কেন্দ্রীয় বায়তুলমালে জমা দেয়ার জন্য মহানবী (সা)-এর খিদমতে নিয়ে আসা হত।

২. উশর (Ushr)

উশর আরবি শব্দ, অর্থ দশমাংশ, সর্বসাধারণের সাহায্যার্থে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ নির্ধারণ করা। ইসলামী পরিভাষায় জমির ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। শরীআতের বিধানের দিক থেকে উশর ফরয। মুসলমানদের অধিকারভুক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতই উশর। বৃষ্টি বা ঝর্ণায় সিক্ত ভূমি হতে ফসলের এক দশমাংশ ও যেসব জমিতে অন্যভাবে সেচ দিতে হয় তা থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল উশর হিসেবে নেয়া হত। উশর ফরয হওয়ার দলীল কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা হালালভাবে যা উপার্জন করেছ তা থেকে এবং আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু বের করি, তা থেকে যা ভালো তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো। আর ব্যয় করতে গিয়ে খারাপ জিনিস দিতে পছন্দ করো না। কেননা তোমরা নিজেরাও তা (মন্দ জিনিষ) উপেক্ষা করা ছাড়া গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকো না।[৪০]

জমির সব ধরনের উৎপন্নের উপর উশর ফরয। উশর আদায়ের কারণ হচ্ছে জমির ফসল লাভ। জমি যদি উশরী হয় তাহলে উশর দিতে হবে। জমি যেভাবে উশরী হয় তা নিম্নরূপ :

১. যে জমির মালিক ইসলাম গ্রহণ করে ও তারপরও জমির মালিক থেকে যায় সে জমিই উশরী জমি।

২. কোন দেশ বিজয়ের পর সে দেশের জমি যদি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তবে সে জমি উশরী জমিতে পরিণত হয়।

৩. অনাবাদী জমি, জমি যদি মুসলমানরা আবাদ করে তবে তা উশরী জমি হবে। উশর পণ্যেও আদায় করা হত এবং নগদেও আদায় করা হত। যাকাত প্রশাসনে

৩৯. ৯ : সূরা আত-তাওবা : ৬০।

৪০. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৬৭।

নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ একই সাথে উশরও আদায় করতেন। তবে কোন কোন সময় উশর আদায়ের জন্য পৃথক কর্মকর্তাও নিয়োগ করা হত। এ ধরনের কর্মকর্তাদেরকে সাহিবুল উশর[৪১] বলা হত। হযরত কিলাব ইবনে উমাইয়া লায়সী (রা)-কে সাকীফ গোত্রীয়গণের কাছ থেকে উশর আদায়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল।[৪২] হযরত ইকরামা ইবনে আবূ জেহেল (রা)-কে হাওয়াযিন গোত্রের কাছ থেকে উশর আদায়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল।[৪৩]

মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল খেজুর। মৌসুমে খেজুর বৃক্ষের উৎপন্ন খেজুরের উশর আদায়ের হিসাব কেন্দ্রীয়ভাবে রাখতেন হযরত হুজাইফা বিন আল ইয়ামীন (রা)।[৪৪]

৩. উশুর (Ushur)

উশুর হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বাণিজ্য কর/আমদানী শুল্ক (Import duty)। ২০০ দিরহামের অধিক মালামালের উপর মুসলিম বণিক হলে ২.৫%, জিম্মি বণিক হলে ৫%, যুদ্ধে জড়িত দেশের বণিক হলে ১০% হারে উশুর ধার্য করা হত। এই কর প্রাক ইসলামী যুগেও বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মক্কায় চালু ছিল।[৪৫]

৪. সাদাকাতুল ফিতর (Sadaqatul Fitr)

পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদের দিন বিত্তশালীদের উপর গরীব দুঃখীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। সাদাকাতুল ফিতরের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন : "সাদাকাতুল ফিতর আদায় না করা পর্যন্ত রোযাদার ব্যক্তির রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় বিরাজ করে, আল্লাহর নিকট পৌছায় না।" যাকাতের তুলনায় সাকাদাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। কারণ যাকাতের তুলনায় ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত অনেকাংশে সহজ ও

---

৪১. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ২৭৯।

৪২. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫০।

৪৩. ঐ, প্রথম খণ্ড, ৪।

৪৪. আল কালকাশান্দী, পূর্বোক্ত : পৃ. ৯১। শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুলাই ১৯৭৭, পৃ. ৪৩।

৪৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন এস. এ. সাবজওয়ারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

শিথিল। প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের এবং পরিবারবর্গ ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়। সাদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মদীনা রাষ্ট্রে তা আদায় করে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

৫. আওকাফ (Awqaf)

ওয়াক্বফ-এর বহুবচন আওকাফ। ওয়াক্বফ একটি আরবি শব্দ। কোন সম্পত্তি আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্বফ বলে। ওয়াক্বফ দ্বারা ইসলামে বিশ্বাসী কোন লোক কর্তৃক তার কোন সম্পত্তি ইসলামী আইন (Shariah) দ্বারা স্বীকৃত ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক অথবা দানের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করাকে বুঝায়। সে সময়ে ওয়াক্বফ সম্পত্তি মুসলমানরা নানা প্রকার সৎ কার্যের জন্য দান করত। এসব সম্পত্তির আয় বায়তুলমালে জমা হত। ওয়াক্বফ সম্পত্তির মূল অংশ ব্যয় করা হয় না। ব্যয় করা হয় সেখান থেকে আয়ের বা লাভের অংশ থেকে।

৬. আমওয়াল আল ফাদিলা (Amwal al Fadila)

উত্তরাধিকারীবিহীন কোন মুসলিমের সম্পত্তি বা ওয়ারিশবিহীন সম্পত্তি; মুরতাদ, ধর্মত্যাগী ও পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি হতে প্রচুর অর্থ বায়তুলমালে জমা হত।

৭. নাওয়াইব (Nawaib)

রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিত্তবান মুসলমানদের কাছ হতে যে লেভী/দান গ্রহণ করা হত তাকেই নাওয়াইব বলে। যেমন তাবুক অভিযানের আগে মহানবী (সা) সামর্থ্যবান সাহাবীদের কাছ থেকে এ ধরনের দান গ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা)-এর ঘোষণা শোনা মাত্রই মুসলমানগণ তাদের বাড়িতে ছুটে যান এবং মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মহানবী (সা)-এর সামনে প্রচুর সম্পদ স্তূপীকৃত হয়ে উঠে। হযরত আবু বকর (রা) নিজের সর্বস্ব নিয়ে আসেন, তা ছিল ৪০০০ দিরহাম। হযরত উমর ফারুক (রা) নিজ সম্পদের অর্ধেক দান করেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ৮০০০ দিরহাম, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।[৪৬] বালাযুরী লিখেছেন যে, তাঁর পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ দিরহাম।[৪৭] অন্যান্য যারা এসময় যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ দিয়েছিলেন, তারা হলেন হযরত আব্বাস (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ (রা) প্রমুখ।

---

৪৬. ওয়াকিদী, পৃ. ৯৯১ দ্র.; ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ২৫৮।

৪৭. আনসাবুল আশরাফ, পৃ. ৩৬৮; তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯০২।

৮. দান/সাদাকাত

প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মত দানই ছিল মদীনা রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান আর্থিক উৎস এবং কেবল মাদানী জীবনের গোড়ার দিকের কষ্টের সময়েই নয়, ইসলামী রাষ্ট্র যখন রাজনৈতিক শীর্ষ মর্যাদায় আসীন হয়, তখনও এ আর্থিক প্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেন যে, মহানবী (সা) একবার নওমুসলিম গোত্রের জন্য সাহায্যের কথা বললে সবাই তাদের সাহায্যে ছুটে আসেন। কেউ খাদ্য, কেউ কাপড় নিয়ে আসেন, আর একজন আনসারী বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেন।[৪৮]

সাদাকাহ যাকাতের ন্যায় দেয় সাহায্য, তবে যাকাত হল অপরিহার্য এবং সাদাকাহ হল ঐচ্ছিক। সাদাকাহ প্রদান ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিমিত্তেই সাদাকাহ প্রদেয়। যাকাত ছাড়া মুমিনদের আরও কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দরকার হলে আর্থিক সাহায্য সম্প্রসারিত করার জন্য ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব দায়িত্ব পালন ইসলাম ওয়াজিব করে দিয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বলেছে মুস্তাহাব বা উত্তম কাজ। বস্তুত এ ধরনের সাহায্য সহযোগিতার নামই সাদাকাহ। এ সাদাকাহ বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, এসব বুঝাবার জন্য আরবিতে সাদাকাহ শব্দের বহুবচন সাদাকাত ব্যবহার করা হয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সাদাকাহর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। একে ইসলামের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪৯]

সাদাকাহ দেয়ার জন্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন ১. ব্যক্তিগত, ২. সামাজিক বা সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে সাদাকাহ দানকারী নিজ হাতে তা বণ্টন করে দিবে, সামাজিক পদ্ধতিতে সাদাকাহ দানকারী তা রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা দিয়ে দেবেন। সাদাকাতের অর্থ গ্রহণ ও তা বিলি-বণ্টনের কাজ মহানবী (সা) স্বয়ং করতেন। মহানবী (সা)-এর নির্দেশে সাদাকাহ বাবদ গ্রহীত অর্থ ও মালের হিসাব কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা)।

৯. মালে গানীমাহ (**Mal-e Ghanimah**)

গানীমাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ধন বা মাল। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিনিময় ছাড়া

---

৪৮. মুসলিম শরীফ, বাবুস সাদাকাত।

৪৯. বিস্তারিত অবগতির জন্য দেখুন ২ : সূরা আল বাকারা ১৯৫, ২৫৪, ২৬৭ আয়াত; ৫১ : সূরা আয-যারিয়াত : ১৯; ৩০ : সূরা আর-রূম : ৩৮।

কোন বস্তু গ্রহণ করা। পরিভাষাগত অর্থ-সে সম্পদ যা যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত হয়। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত পরাজিত কাফির শত্রুদের নিকট হতে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ও অস্থাবর আসবাবপত্র হস্তগত করা হয় তা সকলই মালে গানীমাহর অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত মালই গানীমাহ। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণকালে এটি ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উল্লেখযোগ্য উৎস। গানীমাহ বা বিজিত সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ। প্রাক ইসলামী যুগে যুদ্ধে সমস্ত সম্পদই বিজয়ী সেনা বা গোত্র প্রধানগণ ভোগ করতেন। ইসলাম মুজাহিদদের মানসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের চার পঞ্চমাংশ তাদের উন্নয়নকল্পে এবং এক পঞ্চমাংশ সামাজিক কল্যাণে ব্যয়ের রীতি প্রচলন করে। কুরআন বলছে : জেনে রাখ গানীমাহ হিসেবে যে মাল তোমাদের হাতে আসে তার একপঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসূলের, রাসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।[৫০] যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পরিত্যক্ত যে সমস্ত সম্পদ হস্তগত হত সেগুলো একত্রিত করে পাঁচভাগের একভাগ মহানবী (সা) তথা রাষ্ট্রের জন্য রেখে বাকী পাঁচভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে দায়িত্ব ও পদমর্যাদানুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হত। অশ্বারোহী সৈন্যগণ পদাতিক সৈন্যদের দ্বিগুণ পেত। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, অশ্বারোহী সেনা পদাতিক সেনার তিনগুণ পেতেন।[৫১] অমুসলিম যুদ্ধবন্দী নরনারীকে গানীমাহ হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত।[৫২] মহানবী (সা) মালে গানীমাহ বিভাগের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন হযরত মুয়াযকিব বিন আবি ফাতিমা (রা)-কে।[৫৩] মালে গানীমাহকে লুণ্ঠিত দ্রব্য মনে করা ভুল। মুসলিম সেনাবাহিনী প্রধান সুসংগঠিতভাবে এবং পূর্ণ সুবিবেচনার সাথে বিজয়ের পর মুজাহিদদেরকে গণীমতের মাল সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। এতে কোন প্রকার আত্মসাৎ করাকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হয়। যখন সকল মালামাল সংগ্রহ করা সমাপ্ত হয় তখন শত্রুপক্ষের আবেদন ও অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করা হয়। যখন দেখা যায় যে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই তখনই কেবল বিধান মাফিক তা বণ্টন করে দেয়া হয়। মহানবী (সা)-এর সময় মুজাহিদদেরকে কোন প্রকার বেতন বা ভাতা

---

৫০. ৮ : সূরা আল আনফাল : ৪১।

৫১. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, বাব আল গানীমাহ।

৫২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইমাম আবু ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-৩২; আল মাওয়ার্দী আহকাম আল সুলতানিয়া (সম্পাদনা Menezar)।

৫৩. সাইয়েদ হাসান মুসান্না নদভী, পূর্বোক্ত।

প্রদান করা হত না। তাই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মালে গানীমাহর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মালে গানীমাহর অংশ প্রাপ্তি তাদের পরবর্তী প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনে সাহায্য হত। এর মাধ্যমেই মুজাহিদগণ তাদের নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করতেন।

১০. খুমুস (Khumus)

খুমুস বা খুমস অর্থ এক পঞ্চমাংশ। গানীমাহর পাঁচ ভাগের এক ভাগ যা বায়তুলমালে জমা হত তাই 'আল খুমুস'। গানীমাহর পাঁচ ভাগের একভাগ বা খুমুস মহানবী (সা)ও তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ,[৫৪] অনাথ, দীন-দরিদ্র, মুসাফির এবং রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয়িত হত। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, মহানবী (সা) উক্ত খুমুস বা পাঁচ ভাগের একভাগ পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। এ তিন ভাগের একভাগ মহানবী (সা)-এর জন্য, আর একভাগ মহানবী (সা)-এর পরিবারবর্গের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। অবশিষ্ট তিনভাগের একভাগ বায়তুল মালে জমা হয়ে পরবর্তীতে ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যয়িত হত। মহানবী (সা)-এর অংশও রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যয়িত হয়। ইমাম শাফিয়ীর মতে, মহানবী (সা) জীবিত থাকাকালে মালে গানীমাহর যে অংশ গ্রহণ করতেন তা তিনি ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং সাধারণত: তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।[৫৫]

১১. আল-ফাই (Al-Fay)

মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল ফাই বা প্রত্যাবৃত ধন। মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যদি অমুসলিমরা নিজেদের জমিজমা, বাড়িঘর, ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যায় এবং যা কার্যত মুসলমানদের দখলে এসে পড়ে এরূপ পদ্ধতিতে লব্ধ সম্পদকে 'আল-ফাই' বলে। যুদ্ধ ব্যতিত যে সম্পদ লাভ করা হয় তাকেই ফাই বলা হয়। অন্য কথায় বিনা যুদ্ধে যে ধনসম্পদ মুসলমানদের দখলে আসে এবং বিজিত দেশসমূহের যে ভূসম্পত্তি মুসলমানদের দখলে আসে তাকেই বলা হয় ফাই। কুরআন বলছে : "আর যে ধনমাল আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দাসত্ব হতে বের করে তাঁর রাসূলের

---

৫৪. মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের খাত বন্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু কুরআনে বর্ণিত বাকী খাতগুলো রয়েছে। খুমুসের খাতের আয় থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরও দেয়া যেতে পারে।

৫৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ড. এম. এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা ১৯৮৩।

নিকট ফিরিয়ে দিলেন, সেজন্য তোমরা তো আর ঘোড়া দৌড়াওনি, আর না উট হাঁকিয়েছ এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আর প্রত্যেকটি জিনিসের উপর আল্লাহই শক্তিশালী।"[৫৬] এ আয়াতে যে ধনসম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রথমে বনী নজীর গোত্রের অধিকারে ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর তা মদীনা রাষ্ট্রের অধিকারে আসে। সৈন্যবাহিনীর প্রত্যক্ষ বাহুবলে এ সম্পদ মদীনা রাষ্ট্রের অধিকারে আসেনি বরং আল্লাহ তাঁর নবী (সা), তাঁর সঙ্গী-সাথী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যে ক্ষমতা, দাপট ও ইমেজ দান করেছেন এ হচ্ছে তার সমষ্টিগত ফল। তাই এ সম্পদ মালে গানীমাহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সৈন্যদের মধ্যে এ সম্পদ যুদ্ধ সামগ্রীর মতো বন্টন করে দেয়া যায় না, কারণ তা বিনা যুদ্ধেই হস্তগত হয়েছে। ইসলামী শরীআতে তাই ফাই ও গণীমতের হুকুমকে পরস্পর ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধে শত্রু সৈন্যদের কাছ থেকে যে অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাকে গণীমত বলা হয়। এছাড়া শত্রুদের ভূমি, গৃহাদি এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গণীমত নয়; ফাই এর মধ্যে গণ্য।

আল কুরআনে আল ফাই সম্পদকে বায়তুলমালের আয়ের উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পদের ব্যয়ের খাতও কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। কুরআন বলছে : "আল্লাহ এ জনপদবাসীদের (আহলিল কুরা) কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যে ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর।" আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।[৫৭]

১২. মুক্তিপণ (Ransom)

মুক্তিপণ ছিল মদীনা রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস। একটি যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়ার পর মুসলমানদের হাতে প্রায়ই যুদ্ধবন্দী আসত। এদের মধ্যে খুব কম লোককেই দাস বানানো হত। মহানবী (সা) মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা কোন কিছু না নিয়েই এদের মুক্তি দিতেন। যুদ্ধবন্দীদের 'আল মাগানিম' বলা হত। যুদ্ধবন্দীদের দেখাশোনা করতেন এক বা একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা। বদরের

৫৬. ৫৯ : সূরা আল হাশর : ৬।

৫৭. ৫৯ : সূরা আল হাশর : ৭, বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন বালাযুরী, ফতুহ আল বুলদান।

যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়া হয়। আদায়কৃত মুক্তিপণ বায়তুলমালে জমা হয়।

১৩. কর্জ (Loan)

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা) জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কর্জ গ্রহণ করেন। হাওয়াজিন যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা) আবদুল্লাহ বিন রবিয়া থেকে ৩০,০০০ দিরহাম কর্জ গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারীর মতে ২০,০০০ দিরহাম কর্জ গ্রহণ করা হয়েছিল।[৫৮] হুনায়নের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা) সাফওয়ান নামক একজন অবিশ্বাসীর কাছ থেকে ৫০টি বর্ম ধার করেছিলেন। কর্জ মুসলিম ও অমুসলিম উভয় উৎস থেকেই করা হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

১৪. বিদেশী শাসক ও গোত্র প্রধানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রী (Gifts from the foreign rulers and chiefs)

মহানবী (সা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিদেশী শাসক ও গোত্র প্রধানদের কাছ থেকে উপহার সামগ্রী পেতেন। এ উপহার সামগ্রী বায়তুলমালের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল।

১৫. জিযিয়া (Jizya)

মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্বের অন্যতম উৎস ছিল জিযিয়া। অমুসলিমদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হয়েছিল। অমুসলিমদের জীবন ও সম্পদের এবং মান ও ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্য যে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট কর গ্রহণ করা হত তাই জিযিয়া। কারণ তারা ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের আমানত। মূলত জিযিয়া হচ্ছে নিরাপত্তামূলক সামরিক কর। সামরিক বাহিনীতে মুসলিম নাগরিকদের যোগদান ছিল অপরিহার্য। অমুসলিমদের সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে রেহাই দেয়া হত, তাদেরকে যুদ্ধ করতে হত না। তাই তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়। মদীনা রাষ্ট্র তাদের জানমালের নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। বস্তুত মানুষের কল্যাণই ছিল জিযিয়া আরোপের প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়া এটা কোন নিবর্তনমূলক করও ছিল না। জিযিয়া আল কুরআনের ৯ : সূরা আত তাওবার ২৯ নং আয়াতের উপর ভিত্তি করে আরোপিত।[৫৯]

---

৫৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য এস. এ. সাবজওয়ারী, পূর্বোক্ত : পৃ. ২০।

৫৯. ৯ : সূরা আত-তাওবার ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোকে তারা হারাম মনে করে না এবং সত্য দীনকে যারা নিজেদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে না (তাদের সাথে লড়াই করতে থাক) যতক্ষণ না তারা নিজেরা জিযিয়া দিতে প্রস্তুত হয়।'

জিযিয়া ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার কারণে অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত খাজনা নয়। অমুসলিম গরীবদের কাছ থেকে কোনরূপ জিযিয়া নেয়া হত না। মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সন্তান সন্ততি, শিশু, স্ত্রীলোক, পংগু, অসহায়, ধর্মপ্রচারক ও বিকৃত মস্তিষ্ক লোকদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হত না। খাজনা হলে এ থেকে কেউ অব্যাহতি পেত না। প্রতিবছর সামর্থ্যবান পুরুষের কাছ থেকে মাথাপিছু ১ দিনার জিযিয়া আদায় করা হত।

এখানে উল্লেখ্য যে, যেসব অমুসলমান দেশরক্ষা কাজে যোগদান করবে তাদের জন্য জিযিয়া দেয়ার প্রয়োজন নেই।

জিযিয়া হতে যে অর্থ বায়তুলমালে আয় হত তা সামরিক কর্মকাণ্ড ও সৈন্যদের কল্যাণে ব্যয় করা হত।

১৬. খারাজ (Kharaj)

মদীনা রাষ্ট্রের রাজস্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল খারাজ বা ভূমিরাজস্ব (Land Tax)। খারাজ হচ্ছে অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করা ভূমিকর। অমুসলিম কৃষিজীবী নাগরিকদের উপর মহানবী (সা) এ কর ধার্য করেন। বিজিত দেশে যেসব ভূমি মহানবী (সা) বিজিতদেরই অধিকারে থাকতে দিয়েছিলেন, যেসব অমুসলিমদের সাথে আপোস ও সন্ধি হয়েছে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও আশ্রয়ে জিম্মিত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের জমিজমাকে খারাজী ভূমি বলা হয়। শরীআতের দৃষ্টিতে কোন জমি খারাজী হওয়ার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার উপর খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করা জরুরি শর্ত।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে, খারাজ মূলত এক ধরনের ফাই। কেননা মামুলী ধরনের যুদ্ধের পর যদি কাফিররা পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপন করে তাহলে তাদের কাছ থেকে লব্ধ সম্পদ ফাই হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

খায়বর বিজয়ের পর মহানবী (সা) সর্বপ্রথম সেখানকার ইহুদিদের উপর খারাজ ধার্য করেন। ইহুদিগণ ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে ও খারাজ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে কৃষিভূমি চাষাবাদের অধিকার লাভ করে। অমুসলিমদের চাষাবাদ করার জন্য এই যে জমি দান, ইসলামী রাষ্ট্র সে জমির মালিক হিসেবে ঐ জমির উৎপাদিত শস্যের অংশগ্রহণ করত। ইসলামী রাষ্ট্রের অংশই ছিল খারাজ। অংশের পরিমাণ আলোচনার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হত।

খারাজ আদায়ের পদ্ধতি ছিল দু'টি। ১. আনুপাতিক খারাজ : যা ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে আদায় করা হত। ২. নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ : জমির পরিমাণের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হত। সাধারণত আনুপাতিক খারাজ কোন ফসল আসার পরপরই আদায় করা হত। জমির উৎপাদন ক্ষমতা, ফসলের বিভিন্নতা ও সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি উপাদানের উপর ভিত্তি করে খারাজ নির্ধারিত হত। জমির মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেলে উক্ত জমির উপর খারাজ দিতে হত না। খারাজ ফসলের মাধ্যমে বা অর্থের মাধ্যমে গ্রহণ করা হত। খারাজ বছরে একবার আদায় করা হ। খারাজের খাত থেকে যে অর্থ বায়তুলমালে জমা হত তা সামরিক খাতে ব্যয়িত হত। খারাজের যাবতীয় অর্থ মহানবী (সা) সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। একজন বিবাহিত সৈনিক একজন অবিবাহিত সৈনিকের দ্বিগুণ পেতেন।[৬০]

উপসংহার

মহানবী (সা) প্রবর্তিত মদীনা রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে এর স্থিতিস্থাপকতা ও গতিশীলতা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। বস্তুত ইসলামী অর্থ ও রাজস্ব ব্যবস্থা আধুনিক যুগে কার্যকরী করার জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী।

৬০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য আল মাওয়ার্দী, আল আহকামুস সুলতানিয়া, পৃ. ৩৯; ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ।

প্রশ্নাবলী

১. মহানবী (সা)-এর অর্থ-প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করো। (Discuss the Financial administration of Prophet (Sm)

২. মহানবী (সা)-এর অর্থ-প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। (Discuss the chracteristics of financial administration of Prophet (Sm)

৩. মহানবী (সা)-এর অর্থ-প্রশাসনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করো। (Discuss the various aspects of financial administration of Prophet (Sm)

৪. টীকা লিখ Write Short Notes on :

ক. বায়তুলমাল Baitulmal

খ. যাকাত Zakat

গ. উশর Ushr

ঘ. উশুর Ushur

ঙ. সাদাকাতুল ফিতর Sadaqatul Fitor

চ. মালে গানীমাহ Male Ghanimah

ছ. খুমুস Khumus

জ. আল-ফাই Al-Fay

ঝ. মুক্তিপণ Ransom

ঞ. জিযিয়া Jizya

ট. খারাজ Kharaj

ঠ. ইসরাফ Israf

ড. তাবজীর Tabzir

৮

আইন বিভাগ (The Legislature)
মজলিসে শূরা (Majlis-E Shura)

৮.১ ভূমিকা (Introduction)

ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহতে বিধৃত আইনসমূহকে ধারাবদ্ধকরণ (Codification) থেকে শুরু করে তার প্রয়োগ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সকল পর্যায়ে জনমত জানার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে। নামাযের ইমাম নিয়োগ, সময় নির্ধারণ ও মসজিদের ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি কাজ, সংগঠন পরিচালনা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে পরামর্শ করার একটা নীতি অনুসরণের বলিষ্ঠ তাকিদ রয়েছে। আল কুরআনের একটি পূর্ণ সূরার নামই রাখা হয়েছে 'আশ শূরা' অর্থাৎ পরামর্শ। কুরআনী বিধানে মানুষের মতের কি গুরুত্ব তা এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। পরামর্শ গ্রহণ করা শাসকদের উপর জনগণের একটি অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান আইন পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। মহানবী (সা)-এর সময় থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হত প্রতিনিধি স্থানীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে। এই পরামর্শ সভাকে বলা হত 'মজলিসে শূরা', যাকে আধুনিক পরিভাষায় আইন বিভাগ (Legislature) বা পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ বা জাতীয় সংসদ বলা হয়। সমকালীন ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ আইন পরিষদকে শূরা, ইজতিহাদ ও ইজমা (Shura, Ijtihad and Ijma) এর বহিঃপ্রকাশ ও সমার্থক বলে অভিমত করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন ও প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্য নির্বাহীর নির্বাচন, আইন প্রণয়ন, বিচার ও প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজই মুসলমানদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। তাদের এই পরামর্শ সরাসরি হোক কিংবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের মাধ্যমে হোক, তাতে কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন :

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

'এবং তাদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।'[১]

ইসলামী রাষ্ট্রে এই পরিষদ 'শূরা' নামে পরিচিত। শূরা একটি গুরুত্বপুর্ণ শরয়ী বিধান। অন্যসব শরয়ী বিধানের মতো এতেও নিহিত প্রভূত কল্যাণ। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কল্যাণময় করে তোলার জন্য সঠিক মানে শূরার ভূমিকা পালন একান্ত প্রয়োজন।

ড. হাসান তুরাবী পার্লামেন্টেকে 'নির্বাচিত পরামর্শক সংস্থা' (Elected Consultative Institution) বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীকালে এ মহান প্রতিষ্ঠান বংশানুক্রমিক, স্বৈরাচারী ও বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীদের মর্জিমত গঠিত হতে দেখা যায়।[২] নির্বাচিত শূরা বা আইন সভা অবশ্যই পুনর্জীবিত করতে হবে।

ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবালের মতে, আইন পরিষদ বা শূরার আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের (ইজতিহাদের) এখতিয়ার থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে দেশবাসীর ঐকমত্য (ইজমা) স্থাপিত হবে। (It must have the right to interpret and apply the law (Ijtihad) which would then constitute the authoritative consensus of the community (Ijma))। শুধু এভাবেই আইন ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সঞ্চার করা সম্ভব হবে এবং কার্যকরভাবে এর বিবর্তিত অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।[৩]

মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ 'শূরা' ও 'আহল আল হাল ওয়া আল আকদ' (Ahl al hall wa al aqd) এর ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের আইন সভার আঙ্গিকের তাত্ত্বিক রূপদান করেছেন; এই দুটি ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী প্রতিষ্ঠান, যার প্রথমোক্তটি শেষোক্তটির চেয়ে আকৃতিতে বড়। এই দুটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মিলিত হয়ে যৌথভাবে কাজ করে।

অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে আইন সভার অধিকাংশ সদস্যকে নির্বাচিত সদস্য হতে হবে। তবে কিছু সংখ্যক সদস্য মনোনীত হতে পারেন যারা আধুনিক আইন শাস্ত্র ও শরীয়ার অনুশাসন উভয় বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত ও পারদর্শী হবেন। আইন সভা বা মজলিসে শূরা নির্বাহী

---

১. ৪২ : সূরা আশ শূরা : ৩৮

২. ড. হাসান তুরাবী, ইসলামী রাষ্ট্র, সম্পাদনায় জন. এল. এসপোসিটো, ভয়েসেস অব রিসারজেন্ট ইসলাম, নিউইয়র্ক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩, পৃ. ২৪৩।

৩. ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, পৃ. ২৪৩।

বিভাগের কার্যক্রমের নীতিমালা রচনা করবে।[৪] আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দুটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে; একটি হচ্ছে শরীয়াহর অনুশাসনের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় চরিত্র (Permanent and unalterable character) এবং বাকী বিষয়াবলী প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তনশীল ও স্থিতিস্থাপক (Flexible)।

আল কুরআন নির্দেশিত নীতিমালা ও মূল্যবোধ যা ইসলামী শাসনতন্ত্রের মৌলিক উপাদান, তার প্রকৃতি হচ্ছে স্থায়ী; এগুলোর বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না বা তাতে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না বরং হুবহু অনুসরণ করতে হবে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অন্যান্য বিষয়াবলী, যে বিষয়ে কুরআন-হাদীসে কিছু বলা হয়নি, তা হচ্ছে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল অংশ। এ অংশটির পরিধিও বিশাল যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাহিদা ও প্রয়োজনে পরিবর্তনযোগ্য। সংক্ষেপে আইন সভা বা মজলিসে শূরার কাজ হচ্ছে শরীয়ার সুস্পষ্ট বিধানসমূহকে আইনে রূপদান করা এবং যেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে শরীয়াহর সীমারেখার মধ্য থেকে ন্যায়, স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধির ভিত্তিতে আইন ও বিধান রচনা করা।

ইসলামে মজলিসে শূরা বা আইন পরিষদের বিষয়টি কোন কোন মহলে এ ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, শূরা বা আইন সভার ভূমিকা শুধুমাত্র পরামর্শ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং প্রধান নির্বাহীর তা গ্রহণ বা বর্জন করার নিজস্ব এখতিয়ার রয়েছে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণাকে ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও সাধারণ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ড. হাসান তুরাবী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ (১৯০৬-১৯৬৬), শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ (মৃত্যু ১৯৫৫) ও অন্যান্যদের মতে সকল জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য শূরার পরামর্শ অনুসরণ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এ প্রক্রিয়ায় শূরার সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন শাসকের জন্য অবশ্য পালনীয়। এমনকি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) যিনি আইন সভা বা শূরার পরামর্শমূলক ভূমিকার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তিনিও মন্তব্য করেছেন শূরার সিদ্ধান্ত অনুসরণে বর্তমান অনীহার ভাব পরিলক্ষিত হবার ক্ষেত্রে আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত পরিপালনে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।[৫]

---

৪. কুর্দী, দি ইসলামিক স্টেট, পৃ. ৭৭-৭৯।

৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, দি ইসলামিক ল এণ্ড কনস্টিটিউশন, পৃ. ২৩০।

৮.২ মজলিসে শূরার সংজ্ঞা (Definition of Majlish-E-Shura)

শূরা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরামর্শ। আবার পরিভাষা হিসেবে শব্দটি পরামর্শ সভা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মজলিস (مَجْلِس) মানে সভা, সমিতি, পরিষদ, সংস্থা। মজলিসে শূরা মানে পরামর্শ পরিষদ বা পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ। প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হলে আরব শেখগণ গোত্রের গণ্যমান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে উদ্ভূত সমস্যাদি সমাধান করতেন। ইসলাম পরামর্শ আদান-প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পরামর্শ আদান-প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব বিষয়টিকে ছোট করে দেখার কিংবা অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই।[৬] পবিত্র কুরআনেও পরামর্শ করে কার্যাদি করার জন্য নির্দেশ দেয়া আছে। মহানবী (সা) প্রাক ইসলামী নীতি ও কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন। প্রাক ইসলামী যুগের আরব শেখদের পরামর্শ সভাকে 'বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ' বলা হত এবং ইসলামী যুগে অনুরূপ পরামর্শ সভাকে 'মজলিসে শূরা' বলা হত। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মজলিস-ই-শূরা বলা হয় এমন এক নির্বাচিত সংস্থাকে যারা শাসন বিভাগকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। পরামর্শ দেয়া জনগণের অধিকার আর পরামর্শ চাওয়া শাসন বিভাগের কর্তব্য। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করা- শরীয়াহর অন্যতম বিধান।[৭] আল হাসান ইবনে আবিল হাসান (রহ) বলেন, 'আল্লাহর কসম, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ করে কাজ করে তারা সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান পেয়ে যায়।[৮] আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ) বলেন, পরামর্শ করে কাজ করা আল্লাহর পছন্দ। দীনের হোক বা দুনিয়ার মহানবী (সা) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন, সাহাবীগণও নিজেরা যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ করতেন এবং খিলাফতে রাশেদার ভিত্তি ছিল আশ শূরা।[৯] জনগণের পক্ষ থেকে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে তাকওয়াবান, সৎ, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং আইন বিষয়ে যোগ্যতা ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত করতে হবে। মজলিসে

---

৬. প্রফেসর এ. কে. এম. নাজির আহমদ, আশ শূরা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ৫।

৭. ফতহুল বারী, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৯।

৮. আল আদাবুদ মুফরাদ, ইমাম আল বুখারী

৯. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, তাফসীর উসমানী, পৃ. ৬৪৮।

শূরা ছিল দু'প্রকারের। 'মজলিসে আম' বা সাধারণ সভা এবং 'মজলিসে খাস' বা বিশেষ সভা।

১. মজলিসে আম : এটি সাধারণ পরিষদ বা নিম্নপরিষদ। এতে অধিকাংশ জনগণ অংশগ্রহণ করে থাকে।

২. মজলিসে খাস : এটি উচ্চ পরিষদ। এতে জননির্বাচিত জ্ঞানী ও বিজ্ঞজন অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন।

৮.৩ মজলিসে শূরা : প্রাক ইসলামী পটভূমি (Majlish-E-Shura : Background of Pre-Islamic Period)

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের গোত্রীয় প্রধানগণ (শেখ) একটি পরামর্শ পরিষদের মাধ্যমে তাদের শাসন বিষয়ক কার্যাবলি সমাধান করতেন। মক্কার পরামর্শ সভাকে 'আল মালা' বলা হত এবং দারুন নাদওয়াতে এর অধিবেশন বসত।[১০] মদীনার পরামর্শ সভা বসত 'সাকিফা বানু সায়ীদা' নামক স্থানে।[১১] পালমীরার রাজনৈতিক সংগঠনেও অনুরূপ সাহায্যকারী পরিষদের পরিচয় পাওয়া যায়।[১২] গোত্রের অনুরূপ পরিষদকে বলা হত মজলিস।[১৩] প্রাক ইসলামী মক্কায় অনুরূপ তিনটি পরিষদের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। কেন্দ্রীয় নগর পরিষদকে 'আল মালা' বলা হত। মজলিস মক্কায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্রের পরিষদ হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তৃতীয় পরিষদ ছিল সাধারণ পরিষদ বা 'নাদিউ কাউম' যাতে নগরের সমগ্র লোক অংশগ্রহণ করত। 'নাদিউ কাউম' ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং এর অধিবেশন বসত কাবা ঘরের খোলা প্রাঙ্গণে।

৮.৪ মহানবী (সা)-এর সময়ে মজলিসে শূরা (Majlish-E-Shura during the period of Prophet [Sm])

মহানবী (সা) কর্তৃক মদীনায় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পর গোত্রীয় পরিষদ বা মজলিসের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তা স্থানীয় ও গোত্রীয় বিষয়াদির ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে। মহানবী (সা)-এর শাসনামলে বিশেষ সভা ও সাধারণ সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মহানবী (সা) মক্কার সাবেক প্রথা ও কুরআনে সূরা আশ

---

১০. ডঃ এম. হামিদুল্লাহ, দি সিটি স্টেট অব মক্কা, পৃ-১০।

১১. Lammens, 'Mecca' in Encyclopedia of Islam.

১২. Encyclopedia of Islam. Article on 'Palmyra'.

১৩. Hussaini, Constitution of the Arab Empire, p. 103.

শূরার ৩৮ আয়াতের নির্দেশনা মোতাবেক গণ্যমান্য মুহাজির ও আনসার নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পন্ন করতেন। তিনি মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রতিরাতে এশার নামাযের পর হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সাথে কিছুক্ষণ রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ করতেন। মহানবী (সা) এত বড় সম্মান-মর্যাদা ও আসমানী অহী পাওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও তাঁর আসহাবদের সাথে খুব বেশি পরামর্শ করতেন। তিনি মদীনায় হিজরতের পূর্বে আকাবার শপথের সময় মদীনার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাদের মত নিয়েই মদীনায় গিয়েছেন। রাষ্ট্র বা জাতীয় জীবন যখন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হত তখন তিনি সাধারণ সভা আহ্বান করতেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বে তিনি সাধারণ সভা আহ্বান করেন এবং মুহাজির ও আনসার সকলের সাথে আলোচনা করে মদীনা আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করতে এবং মোকাবিলার জন্য বদর নামক স্থানে সমবেত হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রা) পানির স্থানে অবতরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা) সে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধে যেসব কাফের বন্দী হয়েছিল তাদের সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে মহানবী (সা) বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ওহুদের যুদ্ধের পূর্বেও মহানবী (সা) সাধারণ সভা আহ্বান করে যুদ্ধের স্থান ও রণকৌশল নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি নগরের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে আক্রমণকারী খোদাদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আলোচনা চলাকালে অধিকাংশ সাহাবী নগরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার পক্ষে মত প্রকাশ করায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের সম্মান করেন এবং ওহুদ প্রান্তরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেন।[১৪] ওহুদের যুদ্ধের পর সূরা আলে ইমরানের যে অংশ নাযিল হয় তাতে আল্লাহ বলেন, 'এবং সামষ্টিক বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো।

১৪. শূরার সিদ্ধান্তে মহানবী (সা) ওহুদের যুদ্ধে নিজের মতামত বাদ দিয়েছিলেন এবং মদীনার বাইরে কুরাইশদের সাথে লড়াইয়ের মতামত গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী ওহুদ পর্বতের লড়াইয়ে বিপর্যস্ত হয়, তবে কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে যে, মহানবী (সা) এ পরাজয়ের পর শূরার সাথে আলোচনার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। 'আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন; যদি আপনি দৃঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং আপনি তাদের লক্ষ্য করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, (৩ : ১৫৯)

অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনি দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে তা বাস্তবায়নে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নেমে পড়ুন।[১৫] অর্থাৎ সংগঠন বিষয়ে মহানবী (সা) তো শূরার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন, রাষ্ট্র প্রধান হিসেবেও তাই করতেন। এই আয়াতের ভিত্তিতে বিষয়টিকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়। খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি সাধারণভাবে আলোচনা করেই নগরের ভেতর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং নগরের চতুর্দিকে সুরক্ষিত খন্দক বা ট্রেন্সও খনন করেন। ইরানী পদ্ধতিতে পরিখা খনন সংক্রান্ত হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ গৃহীত হয়। খন্দকের যুদ্ধে মদীনার কিছু ফসলের বিনিময়ে শত্রুদের সাথে সন্ধি না করার যেন তারা ফিরে যায়– হযরত সাদ বিন মুয়ায (রা) ও হযরত সাদ বিন উবাদা (রা) এ দু'জন সাহাবী পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ পরামর্শ গৃহীত হয়েছিলো।[১৬] এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তিনি পরামর্শ করে কাজ করেছেন। শূরা বিষয়ে মহানবী (সা)-এর প্রাকটিস সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমিম মহানবী (সা)-এর চেয়ে বেশি পরামর্শ করতে আর কাউকে দেখিনি।[১৭]

৮.৫ মজলিসে শূরার ক্রমোন্নতি (Gradual Improvement of Majlish-E-Shura)

মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর মজলিসে শুরার ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকে এবং আব্বাসীয় শাসক মামুনের আমলে তা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

৮.৫. ১ হযরত আবু বকরের আমল

Majlish-E-Shura during the Period of Hazrat Abu Bakar (R)

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) (শাসনকাল ৬৩২–৬৩৪ খ্রি:) মহানবীর আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তিনি প্রয়োজনীয় সকল কাজে মহানবীর আদর্শ ধরে চলতেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শূরার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু দু'টি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি সকল মত উপেক্ষা করে স্বীয় মত বহাল রাখেন। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, জাতীয় স্বার্থে দু'টি সিদ্ধান্তেই সুফল হয়েছিল। সিদ্ধান্ত দু'টি ছিল :

১. মুতা অভিযানের সেনাপতিত্ব : মহানবী (সা) শেষ জীবনে হযরত যায়েদ বিন

---

১৫. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ১৫৯।

১৬. তাফসীরে ইমাম রাজী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৭। হযরত সাদ বিন মুয়ায ও হযরত সাদ বিন উবাদা ছিলেন যথাক্রমে আওস ও খাজরাজের সরদার।

১৭. জামে আত তিরমিযী, ৩য় খন্ড, হাদীস নং- ১৬৫৯।

হারিসা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে মুতা অভিযানের নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত যায়েদের মৃত্যু হলে তিনি তাঁর যুবক পুত্র হযরত উসামা (রা)কে উক্ত যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর মত প্রবীণ সাহাবীগণও তাঁর সহযাত্রী হতে আদিষ্ট হন। উক্ত সেনাবাহিনী মদীনা ত্যাগের পূর্বেই মহানবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং উক্ত রোগেই ওফাতপ্রাপ্ত হন। সে কারণে মুতা অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতে নির্বাচিত হয়ে হযরত উসামা (রা)-কে মুতা গমনের নির্দেশ প্রদান করেন। সে সময়ে আবার রিদ্দা বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল এবং বিদ্রোহীরা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করেছিল। সে সংকটজনক মুহূর্তে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের পক্ষ থেকে হযরত ওমর ফারুক (রা) খলীফাকে মুতায় অভিযান প্রেরণ করতে নিষেধ করেন। সে অভিযান একান্তই প্রেরণ করলে তিনি সেনাবাহিনীকে একজন অভিজ্ঞ সেনানায়কের নেতৃত্বে প্রেরণের জন্যও পরামর্শ দেন। খলীফা বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের তেজ নিয়ে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "যদি একপাল হিংস্র সিংহ মদীনা ঘিরে ফেলে এবং আমি পরিত্যক্ত হই এবং একাকী থাকি তবুও অভিযান প্রেরিত হবেই।" কারণ এ অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত মহানবী (সা)-ই গ্রহণ করেছিলেন।

২. যাকাত অস্বীকারকারীদের ছাড় দেয়ার প্রসঙ্গ : হযরত ওমর ফারুক (রা) বিদ্রোহীদের যাকাতের ব্যাপারেও ছাড় দেবার প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবে খলীফা অসন্তুষ্ট হন এবং হযরত ওমরের জবাবে গর্জন করে উঠেন এবং যাকাতের ব্যাপারে কোন ছাড় দিতে অস্বীকার করেন। বস্তুত এ দু'টি ক্ষেত্রে হযরত আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। দু'টি সিদ্ধান্তেরই সুফল ফলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৮.৫. ২ খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর আমলে শূরা
Majlish-E-Shura during the Period of Hazrat Omar (R)

খলীফা ওমর (রা) (শাসনকাল ৬৩৪–৬৪৪ খ্রি:) নির্বাচিত হয়েই ঘোষণা করেন যে আলোচনা ও পরামর্শ ছাড়া কোন সরকারি কার্য চলতে পারে না। তাঁর একটি উক্তিতে শূরা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, 'পরামর্শ ছাড়া খিরাফত ব্যবস্থা চলে না'। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবীদের সাথে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। নবীনদের মধ্যে তিনি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে পরামর্শে শামিল করতেন।[১৮] অংশ বস্তুত তাঁর শাসনামলে শূরা গুরুত্বপূর্ণ রূপ লাভ করে। তাঁর শাসনামলে সাধারণ সভা মজলিসে আম দু'বার আহুত হবার বিবরণ জানা যায়। কাদেসিয়ার যুদ্ধের পূর্বে তিনি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করবেন কি না সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য তিনি সাধারণ সভা আহ্বান করেন।[১৯] উক্ত সভা খলীফাকে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করার পক্ষে রায় প্রদান করায় তিনি হযরত আলী (রা)-কে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে সেনাবাহিনীসহ গমন করেন। কিন্তু মদীনার তিন মাইল দূরে সিরার নামক জলাশয়ের নিকট আহ্‌ল আল রায় বা শূরার প্রতিনিধিদের আহ্বান করে উক্ত বিষয়ে তাদের পরামর্শ চান। আহ্‌ল আল রায় এর অধিকাংশ সদস্য তাকে মদীনায় অবস্থান করে অন্য কোন সাহাবীকে সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের পরামর্শ দেন।[২০] তিনি অতঃপর পুনরায় সাধারণ সভা আহ্বান করে সকলকে জানান যে, যে বা যারা সৎ পরামর্শ দেয় তাদের মান্য করা কর্তব্য। তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের জন্য সকল ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মজলিসে শূরার বিজ্ঞ সদস্যদের পরামর্শে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তার রাজধানীতে অবস্থান করে কোন সাহাবীকে সেনাপতিত্ব প্রদান করা মঙ্গলজনক। কেননা স্বয়ং খলীফার পরাজয় হলে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে পারে। বরং তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে পরপর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলে মুসলমানদের মনোবল বাড়বে।[২১] উপস্থিত নাগরিকগণ তাঁর যুক্তি অনুধাবন করেন এবং তিনি হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে সেনাপতি হিসেবে কাদেসিয়ায় প্রেরণ করে স্বয়ং মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর উক্ত অঞ্চলের কৃষিভূমি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন না তা পূর্বতন মালিকদের হাতেই থাকবে এ বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার সাধারণ সভা আহ্বান করেন। খলীফা ওমর ফারুক (রা) ভূমির মূল মালিকদের বঞ্চিত করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি দু'টি কারণে সাবেক অধিবাসীদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ দু'টি হচ্ছে :

---

১৮. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং- ৪৬০১।

১৯. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ. পৃ. ১৪।

২০. বালাযুরী, ফতুহ আল বুলদান, পৃ. ২৫৫।

২১. হযরত তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ (রা) খলীফা কর্তৃক সৈন্য পরিচালনার বিষয়টি সমর্থন করেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) খলীফার মদীনায় অবস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন।

১। রাষ্ট্রের নিয়মিত আয় বৃদ্ধি : তিনি প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের নিয়মিত আয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি বণ্টন করে দিলে রাষ্ট্র খারাজ হতে বঞ্চিত হবে।

২। প্রকৃত কৃষকদের দূরাবস্থা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা : প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে ভূমি কেড়ে নিয়ে আরবদের মধ্যে বণ্টন করার অর্থ তাদেরকে দৈন্যের মধ্যে ঠেলে দেয়া। আর তা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক ছিল না।

৩। আরবদের সাহসী মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা : এ বিষয়ে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর আরও একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল বলে জানা যায়। তিনি আরবদের সামরিক মুজাহিদ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। কৃষিভূমি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তারা আরাম প্রিয় হয়ে পড়ত। তা নিঃসন্দেহে ইসলামী উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর হত।

উপরিউক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে হযরত ওমর ফারুক (রা) সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সিরিয়া ও ইরাকের ভূমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থে সাবেক প্রজাদের হাতেই রাখা হবে কি না এ বিষয়ে কয়েক দিন ধরে আলোচনা চলে। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা), হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা), হযরত তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ (রা) প্রভৃতি সাহাবীগণ খলীফা ওমর ফারুক (রা)-এর মত সমর্থন করেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এবং হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা)সহ কিছু সংখ্যক শূরা সদস্য উক্ত ভূমি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার পক্ষে রায় দেন। তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে উক্ত সম্পত্তিতে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের কোন হক নেই। খলীফা তখন পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাশর হতে আয়াত উদ্ধৃত করে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ পাক মহানবী (সা) এর উপর যা অনুদান হিসেবে অর্পণ করেন তার মালিক যথাক্রমে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, এতিম, দরিদ্র এবং মুসাফিরগণ। তাছাড়া মুহাজির, আনসার এবং যারা পরে হিজরত করেছে তারাও উক্ত বিষয়ের হকদার। তিনি যুক্তি দিয়ে সকলকে বুঝাতে সমর্থ হন যে, 'আল ফাই' এ পরবর্তী বংশধরদের হক আছে। কাজেই উক্ত হক মুষ্টিমেয় সৈনিকদের স্বার্থে জলাঞ্জলি দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁর যুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য হয় এবং বিজিত অঞ্চলের ভূমি সাবেক মালিকদের মধ্যে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২২]

---

২২. বালাযুরী, ফতুহ আল বুলদান, পৃ. ২৬৭-২৬৯; ইমাম আবু ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৮.৫. ৩ খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলে শূরা
Majlish-E-Shura during the Periods of Hazrat Osman (R)

শূরা সম্পর্কে হযরত উসমান (রা) (শাসনকাল ৬৪৪–৬৫৬ খ্রি:)-এর দৃষ্টিভঙ্গি শূরার প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের পর আমি আপনাদের এমন সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী থাকবো যা পরামর্শের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হয়েছে।[২৩]

খলীফা উসমানের শাসনামলে শেষ পর্যন্ত শূরার গুরুত্ব কমে যায়। কারণ তাঁর শাসনামলে দলগত ও গোষ্ঠীগত রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে। উমাইয়া ও মাখযুম পরিবারের সদস্যবর্গ বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং প্রশাসনে একাধিপত্য বিস্তার করে। এ সময়ে হযরত ওমরের আমলের পরামর্শ সভা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তদস্থলে উমাইয়া বংশের লোকজন পরামর্শ সভার সদস্যপদ অর্জন করেন।

৮.৫.৪ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে শূরা
Majlish-E-Shura during Period of Hazrat Ali (R)

হযরত আলী (রা)-এর শাসনকাল পর্যন্ত (৬৫৬–৬৬১) অধিকাংশ সাহাবীই ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয়ত: তিনি প্রথম হতেই গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হন। সে কারণে তাঁর শাসনামলেও শূরার ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়ে।

৮.৫.৫ উমাইয়া আমলে শূরা
Majlish-E-Shura during the period of Umayyads

খলীফা আমীর মুয়াবিয়াও (৬০৬-৬৮১) শূরার প্রতি গুরুত্ব দেননি। উমাইয়া শাসকদের মধ্যে দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত কেউই শূরার প্রতি গুরুত্ব দেননি। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত যে উমাইয়া শাসকগণ শূরা ব্যতিরেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করলেও তারা আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। উক্ত পরিষদের সদস্যবর্গও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাদেরকে 'আহলে আল হাল ওয়া আকদ' (People of loosening and bindings) বলা হয়।

৮.৫.৬ দ্বিতীয় ওমরের শাসনামলে শূরা
Majlish-E-Shura during the period of Second Omar (R)

খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ) (শাসনকাল ৭১৭-৭২০) শূরা

---

২৩. তারীখুল উমাম ওয়াল মুলক, ইবনু জারীর আত তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯।

বিষয়ে উমাইয়া শাসকদের নীতির ব্যতিক্রম করেন। তিনি খলীফা প্রথম উমরের নীতির অনুসরণ করেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞানী, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে শূরা গঠন করেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তিনি যখন মদীনার শাসক ছিলেন তখন মদীনার ১০ জন ইসলামী আইনবিদ ও রাজনীতিবিদকে ডেকে পাঠান। তাঁরা আগমন করলে তিনি তাদেরকে সমাদরের সাথে সামনে বসান ও আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করেন এবং সর্ববিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।[২৪] খিলাফত লাভের পর দ্বিতীয় উমর দামেস্কের জনসাধারণকে ডেকে এক সাধারণ সভা করেন। এভাবে তিনি গোটা শাসনামলেই শূরাকে সক্রিয় করেন এবং বিদ্বান ও তাকওয়াবান ব্যক্তিদের পরামর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

৮.৫.৭ আব্বাসীয় শাসনামলে শূরা
Majlish-E-Shura during the period Abbasids

আব্বাসীয় শাসকগণ স্ববংশের বা তাবেদার বংশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আল মামুন (৭৮৫-৮৩৩) ছিলেন প্রথম আব্বাসীয় শাসক যিনি শূরা বা পরামর্শ সভাকে নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরামর্শ সংস্থা (Council of State) গঠন করেন। উক্ত সংস্থার সদস্যগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন।

৮.৫.৮ পরবর্তীকালের শূরা
Majlish-E-Shura in the later periods

আব্বাসীয় শাসনামলের পর বুওয়াইয়া, সামানীয়া, সেলজুক ও আইয়ুবীর শাসকদের যুগেও নিয়মিত রাষ্ট্রীয় শূরা বা পরামর্শ পরিষদ বর্তমান ছিল। সুলতান গাজী সালাহউদ্দিনের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতাগণ নিয়মিতভাবে অধিবেশনে মিলিত হত। এ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হত।

---

২৪. মজিদ খাদ্দুরী, তারীখু উমামিল ইসলামিয়া পৃ. ২/২৯২-এ দশজন আইনবিদ ছিলেন– উরওয়া বিন যুবায়ের, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উৎবা, আবু বকর বিন আবদুর রহমান, আবু বকর বিন সুলাইমান বিন সায়ছামা, সুলায়মান বিন ইয়াসার, আল কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর, সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীয়া এবং খারিজা বিন যায়েদ।

৮.৬ শূরার সদস্যগণ মনোনীত না নির্বাচিত ছিলেন (The member's of Shura whether are Elected or Selected)

প্রাক-ইসলামী আরবগণ ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সে কারণেই তারা নিজেদের নির্বাচিত ও মনোনীত নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করত। তাদের নির্বাচনের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। তারা একস্থানে মিলিত হলে এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে নেতা নির্বাচিত করতেন। ধ্বনি ভোটে তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করতেন।

মহানবী (সা) বা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও শূরার সদস্যদের নির্বাচনের জন্য কোন নিয়মকানুন প্রণীত হয়নি। মহানবী (সা) জ্ঞান ও গুণের দিক দিয়ে যাদেরকে অগ্রণী মনে করতেন কেবল তাদেরকে ডেকে পরামর্শ করতেন। তবে তাঁর শূরার সদস্যগণ সকল নাগরিক কর্তৃক সমাদৃত ছিলেন। মহানবী (সা)-এর শাসনামলে শূরার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন– হযরত আবু বকর ইবনে কুহাফা (রা), হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা), হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা), হযরত সাদ বিন মুয়ায (রা), হযরত হুবাব বিন আল মুনযির (রা), হযরত সালমান আল ফারসী (রা) প্রমুখ। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও শূরার সদস্যবৃন্দের নির্বাচনের কোন সুষ্ঠু বিধান ছিল না।

হযরত আবু বকর (রা) প্রধানত: যাগের সাথে পরামর্শ করতেন তারা হচ্ছেন– ১. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা), ২. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা), ৩. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা), ৪. হযরত তাহলা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা), ৫. হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), ৬. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), ৭. হযর সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা), ৮. হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা), ৯. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা), ১০. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা), ১১. হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)।[২৫]

খলীফা হযরত উমর (রা) পরামর্শ ব্যতিরেকে শাসনকার্য চালাতেন না। তাঁকে দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যেসব সদস্য পরামর্শ প্রদান করতেন তারা হলেন– হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা), হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), হযরত তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ (রা), হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ। খলীফা উমরের শাসনামলে এরা সকলেই ছিলেন সর্বজনমান্য। কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে

২৫. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, আবু বকর (রা), পৃ. ৩১০।

তাঁদেরকে নির্বাচিত করা হয়নি বরং তাদের ধর্মভীরুতা, সামাজিক প্রভাব, ইসলামের স্বার্থে সেবা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সামরিক কৃতিত্বের বিচারেই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়। সকল দিক দিয়ে তাঁরা সকলেই অগ্রণী ছিলেন। ভোট দ্বারা নির্বাচিত না হলেও সে কারণেই হযরত উমরের শূরার সদস্যদের সিদ্ধান্তকে সাধারণভাবে গণরায় হিসেবেই ধরা হত।

উমাইয়া যুগে শূরার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যে সকল সাহাবী শূরার সদস্য ছিলেন তারা শূরা হতে বাদ পড়ে যান। কেবল উমাইয়া বংশ এবং তাঁদের শক্তিশালী সমর্থক গোত্রের নেতৃবৃন্দই উমাইয়া শাসকদের দরবারের স্থান পেত। কেবল খলীফা দ্বিতীয় উমর নিরপেক্ষ ও তাকওয়াবান ব্যক্তিদের নিয়ে শূরা গঠন করেন। এ ব্যতিক্রম ছাড়া উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে শূরার বদলে কার্যত রাজকীয় পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। আল মামুনই ছিলেন প্রথম শাসক যিনি সর্বদলের ও সর্ব জাতিসত্তার প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সংস্থা গঠন করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে জানা যায় যে, মহানবী (সা) এবং খলীফাদের আমলে রাষ্ট্রীয় সমস্যাদির ব্যাপারে জনসাধারণ পরামর্শ দিতে পারত। মহানবী (সা) ও তাঁর খলীফাগণ বিশেষ পরামর্শ সভা এবং সাধারণ সভা নামক দু'টি পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজে এ সময় কতিপয় শূরার সদস্যের পরামর্শ গ্রহণ করা হত। কিন্তু জটিল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সভা আহুত হত। শূরা বা পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতির বিষয়ে মহানবী (সা)-এর সুন্নাত প্রমাণ করে যে ইসলামী শরীআত শূরার কোন বিশেষ ও নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবস্থা বা কাঠামো পেশ করা হয়নি। এটিই হলো ইসলামী শরীআতের সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্কতার নীতি। কেননা শূরা বা পরামর্শ গ্রহণের কাজটি নানাভাবে সম্পন্ন হতে পারে এবং বিভিন্ন সময়ে তার রূপ বদলে যেতে পারে, বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের কাঠামোও গড়ে তোলা যেতে পারে। এমনকি দেশভেদে তার বাস্তব কাঠামোর তারতম্যও হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান কালের উপযোগী পন্থা এটাই হতে পারে যে, জাতির জনগণ মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট সদস্যদের নির্বাচিত করবে। পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ সদস্যদের নির্বাচনের ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বাছাই করার জন্যে কেবল একটা নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক করাই যথেষ্ট নয় বরং সেজন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার আবশ্যকতা রয়েছে। আর এ পরিবেশ সৃষ্টির

জন্য ইসলামী আদর্শ ও মৌলনীতি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার জাতীয় নৈতিকতার মান উন্নতকরণ এবং আল্লাহর ভয় ও পরকাল বিশ্বাসের প্রেরণায় ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করা একান্তই জরুরী। তা হলেই আশা করা যেতে পারে যে, তারা যোগ্যতম ব্যক্তিদেরই নির্বাচিত করবে, এমন ব্যক্তিদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেবে যারা ইসলামী আদর্শকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করবে।[২৬]

৮.৭ ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে শূরার ভূমিকা (The Role of Majlish-E-Shura in Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা। ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূরা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত স্তর পর্যন্ত শূরায়ী ব্যবস্থা পরিব্যাপ্ত। পরামর্শের ব্যাপারটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রেই নয় বরং মুসলিম সমাজ গঠনের একটা ভিত্তিগত ও মৌল উপকরণ হিসেবে পবিত্র কুরআন পরামর্শ ব্যবস্থাকে উল্লেখ করেছে, 'আর যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাদের কার্যাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং আমরা যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে'।[২৭] কুরআন মজীদে ইসলামী সমাজের পরিচিতিস্বরূপ বলা হয়েছে, সেখানে সব কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে চলে, নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করণে ও নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক পরামর্শকে কুরআন বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট লোকদের মত প্রকাশের সুযোগদান ও উত্তম মতটি গ্রহণের নীতি অনুসরণ জরুরি করে দিয়েছে। জীবন জীবিকার আহরণ ও উৎপাদন এবং জীবনধারা গ্রহণেও তাই করা কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। সামষ্টিক তথা জাতীয় আদর্শ নির্ধারণে ও কার্যসূচি গ্রহণে জনগণের মত অবশ্যই জানতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেও জনমতকে উপেক্ষা করা চলবে না। উন্নয়নমূলক কার্যসূচি, সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা ছাড়াও যাবতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি গ্রহণ ও পলিসি নির্ধারণে জনমত গ্রহণকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। অন্যথায় ভুলভ্রান্তি থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যাবে না, সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাও সম্ভব হবে না।

২৬. ড. আবদুল করিম জায়দান, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯, পৃ. ৫১।
২৭. ৪২ : সূরা আশ-শূরা : ৩৮।

সর্বোপরি, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মারাত্মক কুফল থেকে সমাজকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

মহানবী (সা) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সব ব্যাপারে সরাসরি অহী রাব করেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন এবং হে নবী! আপনি লোকদের (সাহাবীগণের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যে সংকল্প গ্রহণ করবেন, তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেই করে ফেলুন। মনে রাখবেন, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুলকারী লোকদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন।[২৮] মহানবী (সা) যেভাবে এ হুকুমটি আমল করেছেন, তাতে পরামর্শ করার বিধানটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ মহানবী (সা) অহীর মাধ্যমে পথনির্দেশ পেতেন এবং এটা ছিলো তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ গ্রহণের এ রীতিটি অনুসরণ করতেন।

বস্তুত মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্র পরিচালনায় ও নবুয়তের কার্যাবলী সম্পাদনে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর সাথে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ করেছেন। অবশ্য যেসব ব্যাপারে আল্লাহর নিকট থেকে সুস্পষ্ট বিধান পেয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রে কারোর সাথে পরামর্শ করার প্রশ্নই উঠে না, তার প্রয়োজনও পড়ে না। কিন্তু যেসব ব্যাপারে আল্লাহর নিকট থেকে সুস্পষ্ট বিধান বা কার্যপদ্ধতি আসে নি, তাতে তিনি পরামর্শ করেছেন, বদরের যুদ্ধকালে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেছেন। তিনি সাহাবীগণকে একত্রিত করে বলেছিলেন,

اَشِيْرُوْا عَلَىَّ اَيُّهَا النَّاسُ-

(আশী-রূ আ'লা আইয়্যুহাননাস)

'হে লোকেরা (সাহাবীগণ), আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।' তখন সাহাবায়ে কেরাম পূর্ণ স্বাধীনতাসহকারে ও প্রাণ খুলে পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আনসারদের দেয়া মতকেই গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে সৈন্য সমাবেশ করার স্থান নির্ধারণেও সাহাবীগণ যথাযথ মত জানিয়েছিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তিনি নবী করীম (সা)-এর চেয়ে যাবতীয় ব্যাপারে অন্য কাউকে অধিকতর পরামর্শ করতে দেখেননি। (তিরমিযী, বায়হাকী)

---

২৮. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ১৫১।

হযরত উমর ফারুক (রা) বলেছেন, পরামর্শ ছাড়া কোন খেলাফত (ইসলামী রাষ্ট্র) নেই অর্থাৎ হতে পারে না।[২৯]

বায়হাকী বর্ণনা করেছেন যে, খলীফা হযরত আবু বকর (রা) রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন সমস্যার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর কোন সমাধান পেতেন না তখন সমাজের আলেম ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ডেকে অর্থাৎ মজলিসে শূরা ডেকে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। [সুনান আল কুবরা] হযরত উমর ফারুক (রা) ও অন্যান্য খলীফাগণও তাই করতেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পরামর্শ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কেননা আল্লাহ্ নবী করীম (সা)-কে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতো মহান ব্যক্তির প্রতি যখন এ নির্দেশ তখন অন্যদের বেলায় তো আরো অধিক প্রযোজ্য।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূরার পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। পরামর্শ ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যাবলি নিষ্পন্ন হতে পারে না, এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে। পরামর্শ মানে শুধু পরামর্শ করাই বুঝায় না এবং পরামর্শ জানাও বুঝায়। মহানবী (সা) নিজে পরামর্শ করার পর নিজের মতো পরিহার করে অধিকাংশ সাহাবীর মতো অনুযায়ী কাজ করতেন।

৮.৮ মজলিসে শূরার সদস্যদের যোগ্যতা ও গুণাবলী (Qualification and Qualities of Majlish-E-Shura members)

মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের অপরিহার্য বিষয়। মজলিসে শূরা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী গণতন্ত্র কল্পনাই করা যায় না। তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মজলিসে শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও গুণাবলীসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসলামী জীবন বিধান ও আইন কানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মজলিসে শূরার সদস্যদের অবশ্যই ইসলামী জীবন বিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। মজলিসে শূরার কাজ হচ্ছে জাতীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তথা মানব জীবনের সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আইন প্রণয়ন করা। পরিবর্তনশীল সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে,

২৯. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ২৩৫৪।

যে ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর গাইড লাইন, মূলনীতি অনুসরণ করে মজলিসে শূরা জনকল্যাণমূলক নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করবে। এ ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার ক্ষমতা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সীমিত থাকবে। ইসলামী আইনের প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহ, তাই শূরার সদস্যকে কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক গবেষণায় যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা দায়িত্ব পালন করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। মহানবী (সা)-এর মজলিসে শূরার সদস্যগণ ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরা সকলেই উপরোক্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। মহানবী (সা) কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দানের মাধ্যমে এ বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন বিপুল সংখ্যক লোক তৈরি করেছিলেন। ফলে মহানবী (সা)-এর শাসনামলে ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বহু বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহ বিষয়ে গভীর পারদর্শিতা না থাকলে নিত্য পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিত্য নব সংঘটিত ঘটনা ও বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতসম্মত আইন বিধিবদ্ধ করা মজলিসে শূরার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে শূরা কর্তৃক কোন আইন পাশ করলে তা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী বা সাংঘর্ষিক কিনা তা পরীক্ষা করে মতামত প্রদানের জন্য ইসলামী আইনে পারদর্শী একটি সর্বোচ্চ জুডিশিয়াল কাউন্সিল (Highest Judicial Council) থাকতে পারে, যেমন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে আছে, তারা যে মতামত দিবে তা হবে চূড়ান্ত।

২. জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী : মজলিসে শূরার সদস্যদেরকে জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত, আন্তরিক, নিষ্ঠাবান ও কল্যাণকামী হতে হবে।

৩. জবাবদিহির অনুভূতি : মজলিসে শূরার সদস্যদের সকল কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতার ব্যাপারে তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন, আমানতদার ও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। এর অন্যথা হলে ইসলামী আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষুণ্ন হবে সার্বিক কল্যাণ, সৃষ্টি হবে ব্যাপক বিপর্যয়।

৪. যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ হতে হবে : কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মজলিসে শূরার সদস্যকে যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ হতে হবে। কুরআনের দৃষ্টিতে একজন শ্রমজীবী বা কর্মচারীকেও কর্মক্ষম এবং বিশ্বস্ত হতে হয়। কুরআনের সূরা আল কাসাসে শক্তিশালী যোগ্যতাসম্পন্ন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই মজলিসে শূরার সদস্যদেরও যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত হওয়া জরুরি।

৫. জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব : মজলিসে শূরার সদস্যগণ হবেন জনগণের খুবই আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব।

৬. উন্নত চরিত্রের অধিকারী : মজলিসে শূরার সদস্যদের চরিত্র হবে খুবই উন্নত এবং কালিমা মুক্ত। সদস্যদেরকে ইসলামী চারিত্রিক গুণে ভূষিত হতে হবে।

৭. জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : মজলিসে শূরা সদস্য পদে নির্বাচনে ব্যক্তির ঈমানী ও নৈতিক মান ছাড়াও জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে তার প্রতিশ্রুতি বা কমিটমেন্টের দিকটিকেও অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

৮.৯ মজলিসে আমের সদস্যদের গুণাবলী (Qualities of members of Majlish-E-Am)

মজলিসে আমের সদস্যদের গুণাবলীসমূহ নিম্নরূপ :

১. মজলিসে আমের সদস্যগণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হবেন।

২. তারা বালেগ ও আকেল হবেন।

৩. তারা কোন আদালত কর্তৃক নাগরিক হিসেবে অযোগ্য ঘোষিত হবেন না।

৪. তারা আদালত কর্তৃক মজলিস সদস্য হওয়ার অযোগ্য ঘোষিত হবেন না।

৫. তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা, আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা, ইসলামী জীবনাদর্শের বিরোধিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানো এবং সন্ত্রাসবাদী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য অভিযোগ থাকবে না।

৮.১০ উপসংহার (Conclusion)

ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় মজলিসে শূরা ও পরামর্শ অপরিহার্য। রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ, রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই পরামর্শ অপরিহার্য। মূলত পরামর্শ বা শূরা বাদ দিলে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল প্রাণশক্তিই বিনষ্ট হয়ে যাবে। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে মূলত জনগণের রাষ্ট্র। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইন সভা বা শূরা বর্তমানে প্রচলিত আইন সভার অনুরূপ বহুবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করে। তবে শূরা বা পরামর্শকমণ্ডলী কর্তৃক আইন প্রণয়নের কাজটি শরীআহর সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৮.১১ ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎস (Sources of law in Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎসসমূহকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১। প্রধান উৎসসমূহ (Chief sources)।

২. সম্পূরক উৎসসমূহ (Supplementary sources)।

১. প্রধান উৎসসমূহ (Chief sources) : ইসলামী আইনের প্রধান উৎসসমূহ নিচে আলোচনা করো হলো :

ক. আল কুরআন (The Quran) : ইসলামী আইনের সর্বপ্রধান উৎস 'আল কুরআন'। মুসলমানদের জন্য কুরআন সংবিধান, চলার পথ নির্দেশিকা ও জীবন পথের পাথেয়। ইসলামের সকল প্রকার আইনের ভিত্তিই হচ্ছে এ মহান ঐশী কিতাব 'আল কুরআন'। কুরআনই হলো মুসলমানদের যাবতীয় আইনের উৎস। এর ব্যাপ্তি রয়েছে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী থেকে শুরু করে মানব জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে।

কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কিতাব। মূলত এ কুরআন হচ্ছে নভোমণ্ডলের গভীর ও গোপন রহস্যের উদঘাটক, বিশ্বলোকের উপর আল্লাহর নিকট হতে বিচ্ছুরিত নির্মল আলোকধারা। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহকে ভয় করে যারা আল্লাহর বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করতে প্রস্তুত, এ গ্রন্থ তাদেরই জন্য জীবন বিধান, তাদেরই প্রদর্শন করে নির্ভুল সত্য শাশ্বত পথ।

আল্লাহ পাক অহীর মাধ্যমে এ গ্রন্থখানি তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল করেছেন। এর শব্দ-ভাষা-অর্থ-মর্ম সবই আল্লাহর, তাঁরই নিকট থেকে অবতীর্ণ। এ গ্রন্থের ভাষা আরবি যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। এ গ্রন্থখানি যেভাবে মহানবী (সা)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল, ঠিক সেভাবে এখন পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর নিকট বর্তমান আছে।

দলিল বা প্রমাণ হিসেবে আল কুরআন অকাট্য। এ গ্রন্থের প্রতিটি নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। আইন ও শরীআত রচনার বিচারে এ গ্রন্থই হচ্ছে সর্বপ্রথম উৎস। অন্য কোন কারণে বা অন্য কিছুর খাতিরে এ গ্রন্থকে উপেক্ষা করা চলবে না, তা এড়িয়ে যাওয়াও (By pass) যাবে না।

কুরআনে উল্লিখিত বিষয়াবলী মূলত একটি অখণ্ড জিনিসের মতো। যেমন : একটা পূর্ণাঙ্গ দেহ। কুরআনে পেশকৃত শরীয়াহ, শরীয়াহর বিধানাবলি পরস্পরের

পরিপূরক, পরস্পরের সহযোগী, সাহায্যকারী ও শক্তিবর্ধনকারী। শরীয়াহর সে বিধানগুলো মানুষকেও পরস্পর সম্পৃক্ত করে তোলে।

কুরআন মাজীদের যে অংশ মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে তার আয়াতসমূহ খুবই ক্ষুদ্রাকার, সংক্ষিপ্ত। আর মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের আয়াত দীর্ঘাকার, বিস্তৃত ও বেশ লম্বা। এর কারণ হচ্ছে মক্কী পর্যায়ের আয়াতসমূহের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল মানুষের মনে ঈমান সৃষ্টি করা, তাদেরকে কুরআন পাঠে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত করা। এ কারণে তখন যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা যেমন সহজ পাঠ্য, তেমনি সহজ শ্রাব্য। উপরন্তু তার পঠন ঝঙ্কার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী। তা মানুষকে সহজেই তন্ময় করে দেয়। পক্ষান্তরে, মদীনায় অবতীর্ণ কুরআনের প্রধান কাজ ছিল জীবন ব্যবস্থা উপস্থাপন, আইন ও বিধান দান। এ জন্য মদীনায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহ দীর্ঘাকার হয়েছে। কেননা আইন বিধান ও জীবন ব্যবস্থা বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা চেতনার উদ্বোধন করে মানুষের সূক্ষ্মদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্মতা জাগায়। যে আইন বিধানই দেয়া হচ্ছে, সাথে সাথে তার যৌক্তিকতা বলে দেয়ারও প্রয়োজন হয়। তাই এ পর্যায়ের আয়াতসমূহের দীর্ঘতা অনিবার্য, অপরিহার্য। এ পর্যায়ে কুরআন কেবলমাত্র মৌলনীতি বলে দিয়েছে, যেন তা মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন অবস্থায় ব্যাপকতর আইনের উৎস হতে পারে। সর্বকালে সর্বদেশে ও সব রকমের সমাজ পরিবেশেই তা প্রযোজ্য হতে পারে। তার ভিত্তিতে মুজতাহিদগণ প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করে মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ্ পাকের দেয়া ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রয়োজনীয় আইন বের করতে যেন তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। এ কারণে হুকুম আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহ সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষের বিশাল ও সমস্যা সঙ্কুল জীবনের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধান করতে খুবই সক্ষম। কুরআনের আয়াতসমূহের সম্প্রসারণযোগ্যতা (Elasticity) যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অমোঘ অব্যর্থ।

কুরআনের আইন বিধান উপস্থাপন পদ্ধতি বিচিত্র। এর ফলে কুরআনের হৃদয়গ্রাহীতা ও অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা খুবই প্রকট। কোথাও তা আদেশসূচক শব্দে উদ্ধৃত হয়েছে, কোথাও হয়েছে নিষেধসূচক শব্দে। কোথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে এ কাজটি খুবই উত্তম। কিংবা বলা হয়েছে এ কাজটি বেজায় খারাপ। অথবা কল্যাণমূলক কিংবা পুণ্য কাজ নয়। কোথাও কোথাও

বর্ণনার ভঙ্গি এরূপ গ্রহণ করা হয়েছে যে, এ কাজটির ফল অতীব কল্যাণময়; কিংবা এ কাজটির পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। অথবা এ কাজটিতে যথেষ্ট লাভ হয়েছে বা এ কাজটিতে অনেক ক্ষতি নিহিত।

কুরআন, ইসলামী আইনের প্রথম উৎস হিসেবে, কোন আইনের বিস্তৃত সংগ্রহ ধারণ করে না। যদিও কয়েকটি অনমনীয় কার্যাবলী খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যার কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না, কুরআন সাধারণভাবে ইসলামী আইনের বিস্তৃত সীমানা অঙ্কন করে দেয়, যেখানে সব মানবিক কার্যাবলী আবদ্ধ থাকবে। কুরআন মুসলিমদের তথ্যের উৎসের একটি কাঠামো পেশ করে, যার মধ্যেই তাদের আইগত, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলোকে কাঠামোবদ্ধ করতে হবে। যেখানে পরিষ্কারভাবে কোন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয় ছাড়া, কুরআন স্পষ্টভাবে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনাপূর্বক তার বিস্তৃত ও আনুষঙ্গিক প্রশ্নমালা রেখে দিয়েছে, ব্যক্তির সুবিবেচনার উপর, তা নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যেভাবে দরকার হয়। কুরআন নির্দিষ্ট কোন গোত্র, অঞ্চল, ভাষা বা সময় ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য না করে গোটা মানব জাতির জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। ড. এম. হামিদুল্লাহর মতে, কুরআন মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই পথ প্রদর্শনে প্রয়াসী, আধ্যাত্মিক, পার্থিব, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সব ক্ষেত্রেই। এতে রয়েছে, রাষ্ট্র প্রধানের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশনা, পাশাপাশি সাধারণ জনগণের জন্যও রয়েছে প্রয়োজনীয় বিধান, যে গরীব কিংবা ধনী, আরো নির্দেশনা রয়েছে শান্তি স্থাপনের পাশাপাশি যুদ্ধের বিধিবিধান, আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও বস্তুগত কল্যাণের দিক নির্দেশনা।[৩০] যদিও কুরআন মানব আচরণের সবদিক নিয়ে কথা বলে, যেমন- সামাজিক জীবন, বিবাহ, উত্তরাধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, শাস্তির বিধান এবং আন্তর্জাতিক আইন, তা হলো শুধু সাধারণ নীতিমালা, কুরআন কখনও জীবনের এসব আনুসাঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার বিস্তৃত নিয়মাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয় না।

কুরআনের নিষিদ্ধ আইনগুলো এমন সব কার্যাবলী সংক্রান্ত যা মদ্য এবং সেরকম অন্যান্য পানীয় ও মাদকদ্রব্য ভাগ্যের উপর কোন খেলায় মেতে উঠা, খুন করা,

---

৩০. উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আল ব্যুরে, প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, বি.আই.আইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৬০।

চুরি করা, ব্যভিচার করা, সুদের লেনদেনে যুক্ত থাকা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছু বা অন্য কাউকে উপাসনা করার মতো আচরণাদি, নির্দিষ্টভাবে এসব আইনের অধিকাংশই অপরিবর্তনীয় এবং কখনই যাবে না।

কুরআনের চারটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বৈশিষ্ট্য চারটি হচ্ছে :

১. ক্বুরআন মহানবী (সা) এর উপর একত্রে একটি গ্রন্থাকারে নাযিল না হয়ে খণ্ডিত আকারে নাযিল হয়েছিল এবং এসব খণ্ড খণ্ড অংশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্যাবলী ব্যাখ্যা দেবার জন্য, আইন তৈরির জন্য এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের নিরিখে আইন প্রণয়ন করার জন্য নাযিল হয়েছিল;

২. কুরআনে সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের চেয়ে সাধারণ মূলনীতি ও ব্যাপক নির্দেশনা;

৩. কুরআনের আইনের ধারাগুলো আওতার ক্ষেত্রে সীমিত এবং সংখ্যায় খুবই কম, গোটা কুরআনে ৬৬৬৬ আয়াতের মধ্যে প্রায় ৩০০;

৪. প্রাথমিকভাবে এটি হল একটি বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ।

সংক্ষেপে ইসলামী শরীয়াহর ব্যাপক একটি অংশ ধারণ করে কুরআন।

খ. আল হাদিস (The Sunnah) : ইসলামী আইনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস 'হাদিস'। রাসূল (সা) তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজের প্রতি তিনি প্রকাশ্য ও মৌন সম্মতি দান করেছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন মৌলনীতির উপর যেসব বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিবরণ, ব্যবহার ও প্রয়োগ কার্যকরী করেছিলেন তদসমুদয়ই 'হাদিস' নামে অভিহিত।

ইসলামের সবক'টি মাযহাবেই হাদিসের গুরুত্ব স্বীকৃত এবং তা অনুসরণ করা ও মেনে নেয়া একান্তই কর্তব্য বলে ঘোষিত। আল্লাহ্ পাক মহানবী (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার, বাস্তবভাবে তাকে অনুসরণ এবং সব বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে পথ নির্দেশ গ্রহণের জন্য ঈমানদারদেরকে স্পষ্ট আদেশ করেছেন। স্বয়ং নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এ দু'টি থাকা অবস্থায় তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর (নবীর) সুন্নাহ।"

বস্তুত রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর বাস্তব জীবনের সব কাজে যে কেবলমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা দরকার, তা মানুষের বিবেকবুদ্ধি স্বতঃই স্বীকার করবে। কেননা রাসূলের সুন্নাহ ইসলামের হুকুম আহকাম নির্ধারণে একান্তই অকাট্য, স্পষ্ট। কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহর আনুগত্য করেই আল্লাহর আনুগত্য

করা যেতে পারে। শরীয়াহর উৎস বিচারে সুন্নাহর স্থান কুরআনের ঠিক পরে পরে এবং সাথে সাথেই। ফলত সুন্নাহ কুরআনে বর্ণিত আইনের মূলনীতিসমূহ এবং এর সাথে যুক্ত নতুন আইন ও মহানবী (সা) কর্তৃক অনুমোদনকৃত বিষয়াবলী যা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত এর ব্যাখ্যা করে ও খুঁটিনাটি বর্ণনা করে। মুসলিমগণ বিশ্বাস করে যে সুন্নাহ্ ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস, যা পবিত্র কুরআনের পরিপূরক সুন্নাহ্ হল শাসক হিসেবে মহানবী (সা) এর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত; মদীনার সাধারণ ও প্রথানুযায়ী আইন, যা তাঁর জীবনে অনুমোদিত হয়েছিল এবং তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ, মতামত, অভ্যাস, বক্তৃতা এবং সাহাবীদের প্রতি উপদেশাবলীর সংগ্রহ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রচিত জ্ঞানের শাখা। বস্তুত, সুন্নাহ্ হল শ্রেষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী কিছু বাস্তব উপাদানের সমষ্টি, যা এমনকি আজও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা দেড় বিলিয়ন মুসলিমের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

গ. ইজমা (The Ijma) : ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস 'ইজমা'। ইসলামী কোন প্রসঙ্গে ফকীহদের ঐক্যমত, মতামতের ঐক্যমত। ইজমা হচ্ছে, Consensus of opinion. Consensus of Islamic scholars of a point of Islamic law. একটি নির্দিষ্ট সময়ে মুসলিম আইনবিদদের ঐক্যমত। কুরআন ও সুন্নাহর পর ইজমা ইসলামী আইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। মুহাম্মদ আল ব্যুরে বলেন, নির্দিষ্ট বয়স বা বংশধরের একদল মুসলিম মুজতাহিদের কোন নিদিষ্ট বিষয় বা আইনগত সমস্যার ক্ষেত্রে কোন ঐক্যমতকে বলা হয় ইজমা। তাদের ঐক্যমত আইনে রূপ নেয় কিন্তু তা চিরস্থায়ী নয়, কারণ পরবর্তী বংশধর বা অনুসারী মুজতাহিদগণ তা অতিক্রম করতে পারেন।[৩১] ইজমা দ্বারা প্রতি যুগের ইসলামী আইনবিদদের সম্মিলিত মতকে বুঝায়। মহানবী (সা)-এর উম্মতগণের মধ্যে বিভিন্ন যুগের আইনবিদদের সম্মিলিত মতই ইজমা। Ijma is defined as an agreement of the jurists among the followers of Muhammad (Sm) in a particular age on a question of law. আক্ষরিক অর্থ সর্বসম্মত মত। কিন্তু আইনগত অর্থে ইজমা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের মূলনীতিকে নির্দেশ করে। ডঃ তারিক রমাদানের মতে, ইজমা হচ্ছে সর্বসম্মত মতামত, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে গঠিত।[৩২]

---

৩১. মুহাম্মদ আল ব্যুরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

৩২. তারিক রমাদান, মুসলিমের ইউরোপ, বিআইআইটি, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২৩১।

ইজমার সংজ্ঞায় তাই বলা যায়, The Ijma means a consensus of opinion of the companion of the Prophets of Muslim Jurists (Mujtahids) of any particular era on a particular question of law, the solution of which cannot be directly traced into Al-Quran and Hadith.

ইজমা কুরআন ও হাদিসের অনুসিদ্ধান্ত, আইনগত কোন অধিকার এবং কোন দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গি সাহাবীগণ অথবা কোন বিশেষ সময়ের ইসলামী আইনবেত্তাগণ সর্বসম্মতভাবে কোন ঐক্যমতে পৌছে, উপস্থিত সমস্যা সমাধানে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাই ইসলামী আইনে 'ইজমা' বলে পরিচিত। 'ইজমা'কে ইসলামী আইনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোন সমস্যার সরাসরি কোন সমাধান পাওয়া না গেলেই ইজমার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা কোনক্রমেই কুরআন ও হাদিসের সাথে সংঘাতমূলক হবে না। ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে 'ইজমা' সম্পর্কে কোন বিতর্ক ও মতভেদ কখনও দেখা যায়নি। যেসব সমস্যার সমাধানে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তার সঙ্গী সাহাবীগণ ঐক্যমত হয়েছিলেন, ঘটনায় সাদৃশ্যহেতু অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়া ইসলামী আইনে সর্বস্বীকৃত।

ইসলামী আইনের প্রতিটি দলেই ইজমা বা সর্বসম্মত অভিমতের প্রচলন ছিল। কিন্তু, ইজমা বা সর্বসম্মত অভিমত কি এ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে, ইজমা হলো সাহাবীদের ঐক্যমত এবং তাঁদের অনুসারী তাবেয়ীদের ঐক্যমত যাঁদের ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল। অভিজ্ঞ নয়, এমন কিছু লোক একত্রিত হয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসলে তা শরীয়তসম্মত ইজমা বা অভিমত হতে পারে না।

ইমাম মালেক (রহ) ইজমা সম্পর্কে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ) এ বিষয়ে আরও উদার ছিলেন। তাঁরা ইজমা শুধুমাত্র সাহাবী এবং তাবেয়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি।

ইমাম শাফেয়ী ইজমা বলতে সমাজের সকলের সর্বসম্মত অভিমত মনে করেছেন। এটা বড় কঠিন। ইমাম গাযালী বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়ে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে, কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাজের সকলের সর্বসম্মত অভিমতের প্রয়োজন নেই। শিয়াগণ তাদের ইমাম বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সর্বসম্মত অভিমতকেই ইজমা মনে করেন।

ঘ. কিয়াস (The Qiyas) : ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস 'কিয়াস'। কিয়াস মানে তুলনামূলক অনুমান, সাদৃশ্য অনুমান। কোন বিচার্য বিষয়ের উপর সুবিবেচনা প্রসূত রায়। কিয়াস আলাদাভাবে আংশিক বিয়োজন। মুহাম্মদ আল ব্যুরে বলেন, কিয়াস হল কোন বিদ্যমান বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষের সাদৃশ্যপূর্ণ যৌক্তিক তুলনা যে বিষয়ে ইতোমধ্যে কোন নির্দিষ্ট আইন রয়েছে বা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।[৩৩] কুরআন, হাদিস ও ইজমার আলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষাত্মক যুক্তিই কিয়াস। ইংরেজিতে Analogical deduction or reasoning। কোন বস্তুর সাথে তুলনা বা অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা দ্বারা কোন সাদৃশ্য বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নাম কিয়াস। 'কিয়াস' একটি আরবি শব্দ। সাদৃশ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত 'কিয়াসে'র একটি বিশেষ উপাদান। কুরআন-হাদিস এবং ইজমা এ তিনটি উৎসের আলোকে উপস্থাপিত বিষয়টি পর্যালোচনা করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণই কিয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য কথায়, যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদিস বা ইজমায় পাওয়া যায় না, তার সমাধানের জন্যই কিয়াস ব্যবহৃত হয়। কিয়াস হলো কুরআন-হাদিস ও ইজমার ভিত্তিতে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের মাধ্যমে কোন নতুন সমস্যার সমাধান করা।

কিয়াসের আক্ষরিক অর্থ হলো পরিমাপ, সমর্থন প্রদান এবং সমতা। কিয়াসের মাধ্যম হলো ধী-শক্তি এবং বিচার বুদ্ধির ব্যবহার। এটি অবশ্য ব্যক্তিগত রায় কিংবা অভিমতের অনুরূপ। কিন্তু এ রায় যখন কুরআন ও হাদিসের অনুজ্ঞার উপর ভিত্তিমান হয় তখনই তাকে কিয়াস বলে। হানাফী ফকীহগণ কিয়াসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, মূল প্রাধিকারস্বরূপ যেসব আইনের বিধি পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যখন শুধুমাত্র তার উপর কিংবা তার ব্যাখ্যা কিংবা অনুবাদের উপর নির্ভর করে নব উদ্ভূত কোন বিষয়ের বিচার করা সুকঠিন হয়ে পড়ে, তখন উক্ত প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলো হতে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করে 'ফলপ্রসূ যুক্তি' অর্থাৎ ইল্লাত দ্বারা আইনকে সম্প্রসারণ করে সে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োগযোগ্য করার পদ্ধতিকে কিয়াস বলে।

কিয়াস নতুন আইন আবিষ্কার করে এবং আবিষ্কৃত এ নতুন আইন কুরআন-হাদিস এবং ইজমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনসমূহের সাথে সংযোজিত হয় মাত্র। কিয়াস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন বিধি যদি কুরআন, হাদীস এবং ইজমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন আইনের বিরুদ্ধে গমন করে তাহলে তা নাকচ হয়ে যাবে।

---

৩৩. মুহাম্মদ আল জুরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

কিয়াস শব্দের শাব্দিক অর্থ সমান্তরাল বা একই ধরনের বস্তু বা ঘটনা। উপমা এবং অনুসিদ্ধান্তকে কিয়াস মনে করা হয়ে থাকে। যদি কোন বিষয় অতীতে ইজমা করে অনুমোদন অথবা নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে এবং কি কারণে করা হয়েছিল তা জানা থাকে, তবে পরবর্তীকালে অনুরূপ বিষয় অনুমোদন অথবা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। অবশ্য অনুমোদন অথবা নিষিদ্ধতার কারণ জানা থাকতে হবে। এর তাৎপর্য ও হিকমতও জানা থাকতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মাদকতার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে মদ হারাম করা হয়েছে আল কুরআনে। আজকাল মদের অনুরূপ অনেক নেশা জাতীয় পদার্থ বা ড্রাগস্ আবিষ্কৃত হয়েছে যা মদের অনুরূপ এবং আরও বেশি ক্ষতিকর।

যেহেতু মদ আল কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই কিয়াস করে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে– কোকেইন, ফেনসিডিল, হেরোইন, গাজা, ভাঙ, আফিম, তাড়ি, মরফিন, কোডেইন, পেথিড্রিন, ভেলিয়াম, সোনারিল, মেনড্রেকস, সিডাকসিন, পলিটামিন, এল.এস.ডি, মারিজুয়ানা, হাশিশ, চরস, হেম্প, ব্রাউন সুগার, স্মার্ক, ইয়াবা, ঝাক্কি, এক্স এল মুড, আইসপিল, আইস ডব্লিউ ওয়াই, এক্সাইটমেন্ট, এক্সটাসি, মেথামপেটামিন, এলকোহল, ক্যানাবিস, মেসকালিন, সাইলেসাইবিন, এমডিএমএ, ক্যাফিন, মৃতসঞ্জিবিনী সুরা এবং এ সম্পর্কিত দেশী বিদেশী দ্রব্য ইত্যাদিও হারাম।

সিগারেট, সাদা, জর্দা, ইত্যাদির মধ্যে মাদকতা না থাকলেও নেশার প্রভাব আছে। এগুলো হারাম না হলেও কিয়াস করে মাকরূহ গণ্য করা যায়।

কিয়াস এর তিনটি পূর্বশর্ত ডঃ এম মুহসিন উদ্দিন উল্লেখ করেছেন :

১। কিয়াসের বিষয়বস্তু শরীয়াহর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এটা সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ হতে হবে।

২। মূল বিষয়বস্তু এবং উপমাসূচক বিষয়বস্তুর মধ্যে শুধুমাত্র মিল থাকলেই চলবে না; বিষয় দুটি একইরূপ হতে হবে।

৩। পূর্বে যে বিষয়ে কিয়াস করা হয়েছে সে বিষয়টি এমন হতে হবে যে সিদ্ধান্ত সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি মাত্র ঘটনার উপরে কিয়াস করার সিদ্ধান্ত সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তবে, একটি ঘটনার অন্তর্নিহিত চেতনা বা বিষয়বস্তু যদি সাধারণভাবে প্রযোজ্য

হয়ে থাকে এবং কিয়াস ঘটনাটিকে নিয়ে নয় বরং ঘটনার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে হয়ে থাকে, তবেই তা হতে পরবর্তী কিয়াস করা যায়।[৩৪]

কিয়াসের প্রয়োজনও আছে এবং অনেকগুলো সুবিধাও আছে কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ অনেক আছে। তাই কিয়াসকে ইজমার পরে স্থান দেয়া হয়েছে। সাহাবীরা অনেকেই কিয়াস করেছেন। অধিকাংশ সুন্নী ফকীহগণ বিশেষ করে শাফেয়ী এবং মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ কিয়াস করেছেন।

আহমদ ইবনে হাম্বল নীতি হিসেবে কিয়াসকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু একটি দুর্বল হাদীসকেও কিয়াসের উপরে স্থান দিয়েছেন।

শিয়াদের মধ্যে জায়েদী শিয়ারা কিয়াসকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু ইমামী শিয়ারা এটাকে না পছন্দ করে। জাহেরী স্কুল কিয়াস সম্পূর্ণ পরিহার করে। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা দাঊদ ইবনে আলী কিয়াস সংক্রান্ত কারণেই শাফেয়ীদের থেকে আলাদা হয়ে যান।[৩৫]

২। **সম্পূরক উৎসসমূহ (Supplementary sources)** : মৌলিক এবং পরিপূরক উৎসগুলো ছাড়াও আরও কতগুলো সম্পূরক উৎস হতে ইসলামী আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

ক. আল ইসতিহসান (Al-Istihsan) : ইসতিহসান বা ফকীহদের অগ্রাধিকার বা বিধানসঙ্গত ন্যায়পরতা ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎস। ইসতিহসান শব্দের অর্থ কোন জিনিসকে উত্তম ও ভাল মনে করা। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিকোণ (Equity and justice point of view) থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। মুহাম্মদ আল ব্যুরের মতে, বৈধ আইনগত কারণে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত কোন সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে এমন কোন বিচ্যুত সিদ্ধান্ত, যা ঐ বিচ্যুতিকে সমর্থন করে, তাই হচ্ছে আল ইসতিহসান। অন্য কথায়, আইনগত মতামতে স্ববিবেচনা প্রয়োগ, যেখানে দুটি সম্ভাবনার মধ্যে যা অধিক বিবেচ্য তার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। ইসতিহসান হলো ইসলামী ফিকাহবিদদের অভিমত। ইহা ইজমার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ।

---

৩৪. ড. এম মুহসীন উদ্দিন, পূর্বোক্ত, Philosophy of Islamic law and the orientalists, Taj Company, New Delhi, 1986, পৃ. ৬৮, ১৩৫।

৩৫. Dr. M. Sallam Madkour, Nazrat al Islam Ila Tanzimal nasl Dar al Nahda al Arabiyyah, Cairo, 1985, পৃ. ৩৪।

বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ ইমাম ইমাম আবু হানীফা (৬৯৯-৭৬৭) 'ইসতিহসানের উদ্গাতা। তিনি ইসতিহসানকে ইসলামী আইনের একটি উৎস হিসেবে প্রবর্তন করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ) কর নেতৃত্বে ইসলামী আইনের এই উৎসটি খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে, অন্যান্যরা এর খুব কমই ব্যবহার করেছিলেন। এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Istihsan literally means to hold something for good, right or considering a thing to be good.

প্রখ্যাত আইনবিদ ড. সাঈদ রমজান মিশরী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Islamic Law : Its Scope and Equity" তে 'ইসতিহসানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Al Istihsan means the deviation. on a certain issue, from the rule of a precedent to another rule for a more relevant legal reason that requires such deviation." ইসতিহসান আইনের উৎস হিসেবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হানাফী মাযহাবে ব্যবহৃত হয়। যেসব ক্ষেত্রে আইনের বিধির অভাব ঘটে কিংবা যেসব ক্ষেত্রে কিয়াস কর্তৃক বিচারকর্মে সুবিচার সাধন করা কঠিন হয়, সেসব ক্ষেত্রে ইসতিহসান প্রয়োগ দ্বারা ন্যায়বিচার সাধিত হতে পারে। ইসতিহসানের দলিল হচ্ছে মহানবী (সা)-এর এই কথা-

"জেনে রাখ, দীন ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ। অতএব তোমরা তাতে বিশেষ নম্রতা, সহজতাসহকারে প্রবেশ কর। আর আল্লাহর বান্দাহগণকে তোমরা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি বিদ্বেষী বানিয়ে দিও না।"

ইসতিহসান মূলত এমন এক নিয়ম পদ্ধতি যা সব রকমের অসুবিধা ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করে দেয়। এ কারণেই ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন, "ইসতিহসান শরীয়াহ জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ।"

খ. আল ইসতিদলাল (Al Istidlal) : ইসলামী আইনের অন্যতম সম্পূরক উৎস "আল ইসতিদলাল'। ইসলামী আইনে 'ইসতিদলাল' বলতে বুঝায় যুক্তি নির্ণীত সিদ্ধান্তকে। অন্য কথায় , কোন একটি বিষয় হতে যুক্তিতর্কের সাহায্যে অন্য একটি অনুরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই 'ইসতিদলাল' বলে। ইসতিদলাল এর ক্ষেত্রে যুক্তি দ্বারা এক নীতি হতে অন্য নীতির প্রবর্তন করা হয়। তাই যে কোন নীতি বা নিয়ম হতে যুক্তিতর্ক দ্বারা আর এক নতুন নিয়ম বা নীতি প্রবর্তন করাই হলো ইসতিদলাল। অন্য কথায়, এক বিষয় হতে অনুমতি দ্বারা অন্য বিষয়

বিচার করার নীতিকে ইসতিদলাল বলে। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য যা উপকারী বলে মনে করা হয় এমন কিছু উদ্ভাবনই ইসতিদলাল। মালেকী ও শাফেয়ীগণের নিকট এটি ইসলামী আইনের পঞ্চম উৎস।

গ. আল ইসতিসলাহ (Al Istislah) : ইসলামী আইনের অন্যতম সম্পূরক উৎস 'ইসতিসলাহ'। খ্যাতনামা ইসলামী আইন বিশারদ ইমাম মালিক (রহ) ইসতিসলাহ নীতির প্রবক্তা। এটির বাংলা হচ্ছে জনকল্যাণমূলক নীতি বা গণহিত নীতি বা ভাল'র সন্ধান। অর্থাৎ জনস্বার্থ বা জনকল্যাণকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইসতিসলাহর অর্থ হলো যদি কোন বিধি জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামী আইনে ইসতিসলাহকে জনকল্যাণমূলক পদ্ধতি বলা হয়। মুহাম্মদ আল ব্যুরের মতে, প্রতিষ্ঠিত নয় এমন কোন সিদ্ধান্ত যা জনস্বার্থে করা হয় কিন্তু কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই তাই হচ্ছে আল ইসতিসলাহ। অন্য কথায় এমন একটি সিদ্ধান্ত নেয়া, যা জনকল্যাণ সাধিত করবে, যদিও সে সিদ্ধান্ত কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও উল্লিখিত নেই। 'ইসতিসলাহ' এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে প্রখ্যাত আইনবিদ ড. সাঈদ রমজান মিশরী বলেন, Al-Istislah means the unprecedented judgement motivated by public interest to which neither the Quran nor the Sunnah explicitly refer. জনকল্যাণই (Public welfare) ইসতিসলাহের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ডঃ তারিক রমাদান লিখেছেন, ঈমাম মালিক তার আইন বিষয়ক গবেষণায় সাহাবীদের উপর নির্ভর করেছেন। এ সাহাবীগণ সূত্রের কাঠামোর প্রতি সম্মান রেখে জনস্বার্থে অনেক বিধিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ সূত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে শরীয়াহর অংশ ইসতিসলাহ।[৩৬]

ঘ. ইসতিসহাব (Istishab) : ইসতিসহাব হচ্ছে সহ অবস্থানের নীতিমালা, পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের অব্যাহত ধারা বজায় রাখা। অতীতকালে শরীয়াহর যে হুকুমটা যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হুকুমটাকে সেভাবে অপরিবর্তিত রাখাকেই বলা হয় ইসতিসহাব (Presumption arising from accompanying circumstances/ presumption of continuity)। সে হুকুমটিকে কার্যকর ও স্থায়ী বলে গণ্য করতে হবে যতক্ষণ না এমন কোন দলিল পাওয়া যাবে, না সেটিকে বদলে দিবে কিংবা সেটিকে রদ করে দিবে। যেমন : ঋণগ্রস্ত

৩৬. তারিক রমাদান, মুসলিমের ইউরোপ, বিআইআইটি প্রকাশনা, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ৭৬।

ব্যক্তি ঋণ হিসেবে নেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ না তার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সম্ভব হবে। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ফিকাহ্ বিজ্ঞানে বলা হয় ইসতিসহাব।

যা আইনসঙ্গত বলে গৃহীত হয়েছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে তাও নতুন আইনের একটি উৎস হতে পারে। এ ধরনের উৎসকে ইসতিসহাব বলে।

স্বীকৃত ইসলামী আইনের সঙ্গে যা বহুকাল যাবৎ সহঅবস্থান করে এসেছে, তাও ইহতিসহাব নামে অভিহিত। যেমন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়ে একজন পুরুষ ও নারী বসবাস করছে। বিবাহিত না হলে এ ধরনের বসবাস আইনসিদ্ধ নয়। যে পর্যন্ত না বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করা হয়, অথবা তারা বিবাহিত নয় বলে প্রমাণিত না হয়, ততদিন তাদেরকে বিবাহিত বলে ধরে নেয়া হয়।

এর চেয়েও আরও একটু ভালো উদাহরণ হতে পারে। বিয়ে হয়েছে এটা জানা আছে, কিন্তু তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে কিনা তা জানা নেই, এ অবস্থায় যে পর্যন্ত না প্রমাণিত হয় যে তালাক হয়েছে সে পর্যন্ত ধরে নেয়া হবে যে বিবাহ বহাল আছে।

কোন বস্তু বা সম্পত্তি ক্রয়ের পরেও তা বিক্রি হয়ে যেতে পারে। যে পর্যন্ত না প্রমাণিত হয় যে, মালিক উহা বিক্রি করে দিয়েছেন সে পর্যন্ত ধরে নেয়া হবে যে তিনিই উক্ত সম্পত্তির মালিক।[৩৭]

ঙ. মাসলাহা মুরসালা (Maslahah Mursalah) : মাসলাহা অর্থ Considerations of public interest /public good।

ইসলাম মানবতার জন্য আল্লাহর এক নিয়ামত। এ নিয়ামত মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য। এমন কোন ইসলামী আইন হতে পারে না যা মানব কল্যাণের পরিপন্থী। সেজন্য জনকল্যাণকেও ইসলামী আইনের একটি উৎস হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এ বিষয়টি প্রবর্তন করেন ইমাম মালিক (রহ)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। 'ক্লেশ (উসরা) নয়, স্বস্তি' (ইউসরা) ইসলামের মৌলিক নীতি যার উল্লেখ আল কুরআনের রয়েছে। এর উপরে ভিত্তি করেই জনকল্যাণকে ইসলামী আইনের উৎস করা হয়েছে।

বহু ইসলামী আইনজ্ঞ জনকল্যাণকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে ধরতে নারাজ। তাদের মতে ইমাম মালিকের (রহ) ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বের হাতে এ

৩৭. Abdur Rahman Doi, Shariah : The Islamic Law, Taha Publishers, Lebanon, 1984. পৃ. ৮৩-৮৪।

নীতিমালা অত্যন্ত নিরাপদ। কারণ, কুরআন এবং সুন্নাহর শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সঠিকভাবে অবহিত। কিন্তু, যারা ইসলাম সম্পর্কে ততটুকু প্রাজ্ঞ নয়, তারা কেন কিছু আপাত দৃষ্টিতে জনকল্যাণমূলক বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বা ভিন্ন প্রেক্ষিতে দেখলে অথবা সর্বকালের জন্য উপযোগী কিনা ঐরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বিষয়টি জনকল্যাণমূলক নাও হতে পারে। সেজন্য আল মাসালিহ্ আল মুরসালাকে আইনের উৎস হিসেবে ব্যবহারে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। তবে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বহু ইমামই ইহা প্রয়োগ করেছেন।

মাসলাহা বলতে বুঝায় এমন প্রত্যেকটি কল্যাণকে যে বিষয়ে শরীয়াহ্দাতার তরফ হতে এমন কোন অকাট্য স্পষ্ট দলিল এসে পৌছায়নি, যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণ ও গণ্য করা হলে তাতে কোন না কোন ফায়দা অর্জন বা ক্ষতি প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ফিকাহবিদগণ এমন মাসলাহাত গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন যা প্রকৃত ও সাধারণ এবং যা গণ্য করা হলে কোন অকাট্য স্পষ্ট দলিলের সাথে বিরোধকারী হবে না।

সাহাবা ও মুজতাহিদদের অনেকে প্রাথমিক যুগসমূহে এ মাসলাহাত অনুযায়ী আমল করেছেন। মালিকী মাযহাব এবং অন্যান্য তিনটি মাযহাবের জমহুর ফিকাহবিদগণ মাসলাহাতকে গণ্য ও গ্রহণ করেছেন।

চ. উরফ (Urf) : প্রচলিত পদ্ধতি, সমাজের রীতিনীতি; রীতিনীতির ভিত্তিতে তৈরি আইন বা প্রথাই হচ্ছে উরফ। কোন নির্দিষ্ট সমাজে তত্ত্ব ও বাস্তবে উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত প্রথা ও দেশাচারই উরফ। সামাজিক রীতিনীতি যা ইসলামী মূলনীতির সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে না, তা ব্যক্তিগত, সরকারী, স্থানীয় বা অন্য যে কোন রকমই হোক না কেন। কোন বিষয়ে যদি শরীয়ার সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ না পাওয়া যায় তবে প্রচলিত পদ্ধতিকেই ইসলামসম্মতভাবে ধরে নেয়া যেতে পারে। ইসলামী আইন হিসেবে বিবেচনার জন্য এ উৎসটি ত্রুটিবহুল এবং বিপদসংকুল।

ছ. মদীনাবাসীদের আদর্শ (عمل أهل المدينة) : ইমাম মালিক (রহ) মদীনায় বাস করতেন। মদীনার লোকেরা নবী (সা)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। তাদের জীবনধারাকে ইমাম মালিক (রহ) ইসলামী আইনের একটি উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন।

জ. সাদ্দ আল জারাই বা গতিপথ রুদ্ধকরণ : সাদ্দ আল জারাই (سد الذرائع) অর্থাৎ পথ বন্ধ করে দেয়া– ইসলামী আইনের অন্যতম সম্পূরক উৎস।

প্রশ্নাবলী

১। মজলিসে শূরা কি? মজলিসে শূরার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। (What is Majlish-E-Shura? Explain the scope of Majlish-E- Shurah.)

২। মজলিসে শূরা বলতে কি বুঝায়? মজলিসে শূরার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো। (What is Majlish-E-Shura? Discuss about the development of Majlish-E-Shura.)

৩। মজলিসে শূরা কি? ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে শূরার গুরুত্ব বর্ণনা করো। (What is Majlish-E-Shura? Describe the importance of Majlish-E-Shura in Islamic state.)

৪। মজলিসে শূরা কি? এর সদস্যদের গুণাবলী আলোচনা করো। (What is Majlish-E-Shura? Discuss the qualities of its members.)

৫। ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে শূরার ভূমিকা/কার্যাবলী আলোচনা করো। (Discuss the Role/Functions of Majlish-E-Shura in the Islamic State)

৬। ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের উৎসগুলো আলোচনা করো। (Discuss the sources of law of Islamic State.)

৭। মজলিসে শূরার সংজ্ঞা উল্লেখ করে ইসলামী রাষ্ট্রে এর ভূমিকা আলোচনা করো।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখন (Write Short Notes on)

১। আল কুরআন Al Quran

২। সুন্নাহ Sunna

৩। ইজমা Ijma

৪। কিয়াস Qias

৫। আল ইসতিহ্সান Al Istihsan

৬। ইসতিদলাল Istidlal

৭। ইসতিসলাহ্ Istislah

৮। ইসতিসহাব Istishab

৯। মাসলাহা মুরসালা Maslahah Mursalah

১০। উরফ (Urf)

(৯)

বিচার বিভাগ
The Judiciary

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম বিভাগ হচ্ছে বিচার বিভাগ। বিচার কার্য ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ মীমাংসাকরণ দীন ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণভাবে সকল রাষ্ট্রেই বিচার বিভাগ মানবতার সেবায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কেননা এ কার্যটি সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হওয়ার উপরই গোটা সমাজের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের নাগরিকদের শান্তি, স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বস্তুত যে সমাজে বিচারব্যবস্থা নেই, জনগণের ফরিয়াদ পেশ করার কোন স্থান নেই এবং তার প্রতিকার করারও কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, তা পাশবিক সমাজ হতে পারে, তা কখনই মানুষের বসবাসপোযোগী সমাজ হতে পারে না।

মানুষের জন্য শুধু বিচার নয়, সুবিচারের প্রয়োজন। ফরিয়াদ পেশ করার একটা স্থান থাকাই যথেষ্ট নয়, তা মনোযোগসহকারে ও অনুকম্পাপূর্ণ অন্তর দিয়ে শুনার এবং তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা থাকাও একান্তই আবশ্যক।

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার। ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারবিহীন রাষ্ট্র 'ইসলামী' নামে অভিহিত হতে পারে না। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতেও তা 'রাষ্ট্র' নামে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়। একসাথে বসবাসকারী নাগরিকদের নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় প্রধানত নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রের স্বীকৃত আদর্শের অনুসারী বানাবার লক্ষ্যে এবং তাদের মধ্যে স্বভাবতই যেসব মতপার্থক্য, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়, তা দূর করে তার মীমাংসা করে, জনমতকে একই আদর্শিক খাতে প্রবাহিত করে, সবদিক দিয়ে মিলমিশ, আন্তরিকতা, সম্প্রীতি বহাল করে অব্যাহতভাবে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে চালিত করার উদ্দেশ্যে। আর এজন্যই রাষ্ট্রে নিরপেক্ষ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এ কাজটির জন্যই বিচার বিভাগ

অপরিহার্য। ইসলামে যে বিচার বিভাগ গড়ে তোলার জন্য তাকিদ, তা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের অধিকার, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার ও ক্ষমতার সংরক্ষক। বিচারকার্যে বিচার বিভাগই চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী। সংবিধানের ব্যাখ্যাদান এ বিভাগেরই কাজ। এ বিভাগই আইনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে রায়দানের অধিকারী। আইনের ভিত্তিতে প্রমাণিত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা এ বিভাগেরই দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর মনোনীত কাজী বা বিচারক ছিলেন। এ কারণে বিচার বিভাগও পরিপূর্ণভাবে তাঁরই হাতে ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর একটা বিশেষ নিয়ম ছিল। অর্থাৎ শুধুমাত্র ইনসাফ করাই হবে না বরং ইনসাফ যে করা হচ্ছে তা জনগণ প্রত্যক্ষও করবে। সকল মামলার শুনানী প্রকাশ্য আদালতে হত। রুদ্ধদ্বার শুনানির কোন দৃষ্টান্ত তাঁর বিচার ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটা ঘটনা, মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে একজন সাহাবী মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছিলেন, যাতে তাদের অবগত করানো হয়েছে যে, খুব শীঘ্রই তোমরা আক্রান্ত হতে যাচ্ছ। সে চিঠিটি ধরা পড়ল। তা ছিল একটা সরাসরি গোয়েন্দাগিরির ব্যাপার। এ যুগের লোকেরা বলবে, এমন বিপদজনক মামলার শুনানি তো রুদ্ধদ্বার কক্ষে হওয়া উচিত। কিন্তু রাসূল (সা) মসজিদে নববীতে এ মামলার প্রকাশ্য শুনানি গ্রহণ করলেন। বিচার ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনে কোন মামলার রায় মহানবী (সা) দিতেন না। এ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ না দিয়ে এক মুহূর্তের জন্য তার কোন মৌলিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হত না। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার বাইরে যেসব কাজী বা বিচারক নিয়োগ করতেন, তাঁদেরকেও তিনি (সা) নির্দেশ দিতেন, যেন উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনে মামলার রায় দেয়া না হয়। বিচার বিভাগের কাজে তদবির বা সুপারিশের দরজা তিনি (সা) অত্যন্ত কঠোরভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশের একটি সম্ভ্রান্ত বংশের এক মহিলা চুরির অপরাধ করে। তার বংশের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে তার হাত কাটা না হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একান্তপ্রিয় সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর মাধ্যমে সুপারিশ করানো হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে সুপারিশ করছ? তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত জাতিগুলো এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা সাধারণ মানুষের অপরাধের জন্য প্রচলিত বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিত এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা যখন একই অপরাধে অপরাধী হত, তাদের জন্য নমনীয়তা প্রদর্শন

করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদের (সা)-এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম"। এভাবে তিনি (সা) শুধু সুপারিশের দরজাই বন্ধ করে দেননি বরং আইনের দৃষ্টিতে সকলেই যে সমান-এ বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি এ বিধানও চালু করেছেন যে, আদালতকে ধোকা দিয়ে কেউ যদি ভ্রান্ত রায় নিজের পক্ষে নিয়ে যায় তাহলে এর সুবিধা শুধুমাত্র সে দুনিয়াতেই ভোগ করতে পারবে, কিন্তু পরকালে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কোন কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব লোকদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা। কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ভুলবশত শাস্তি দেয়ার চেয়ে অপরাধীকে ভুলবশত মুক্তি দেয়া বিচারকের জন্য শ্রেয়। পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের ফায়সালা উভয় পক্ষ মিলে নিজেরাই ফায়সালা করুক, অথবা একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দিক অথবা কোন অন্যায় অপরাধ গোপন করা গেলে তা গোপন করা হোক। এসব কিছু আদালতে মামলা পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু একবার মামলা আদালতে পৌছে যাবার পর কোন ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন, অথবা গোপন করার প্রক্রিয়া চালাতে পারে না। এরপর আদালত নিজেই আইন অনুযায়ী বিচার করবে। আদালতের বিচারকে প্রভাবান্বিত করার সকল প্রচেষ্টা রাসূল (সা) অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি বিচারককে কুরআন-সুন্নাহ এবং বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী নিঃসঙ্কোচে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন ঘোষণা করেছেন। তিনি (সা) জনগণকে এসবও বলেছেন, না জেনে-শুনে বিচার করা, অথবা জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে বিচার করা কঠিন গুনাহের কাজ। সত্যিকার বিচারক সে, যে আইন সম্পর্কে জানে এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী নিরপেক্ষ বিচার করে।

৯.২. ইসলামে বিচার ব্যবস্থার অবস্থান (Position of Judicial System/Judiciary in Islam)

বিচারকার্য সমুন্নতকরণ একটি কাজ, যার শিখরে মানব জাতির পদচারণা। পশুত্বের গহ্বর থেকে শক্তিশালী কর্তৃক দুর্বলদের শোষণ মুক্ত করে মানব-ইতিহাসকে তারাই সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইনসানিয়াত তথা মানবতার স্থিতিশীল সামাজিক জীবন, যেখানে থাকবে না জুলুম-শোষণ অত্যাচারের আগ্রাসন, থাকবে জীবন ও স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা, প্রাণ-সম্মানের সংরক্ষণ,

কল্যাণমূলক কাজের পারস্পরিক সহযোগিতার বাস্তব উপস্থিতি এবং নাশকতামূলক কাজের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন, এসব কিছু সুষ্ঠু বিচার ব্যতীত হতে পারে না।

বিচারকার্য মুসলমানদের নিকট ঈমান-পরবর্তী অবশ্য পালনীয় ফরযসমূহের একটি। মহত্তম একটি ইবাদতও বটে। কেননা আকাশমণ্ডলো ও পৃথিবী যে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে টিকে আছে, সেই ন্যায়পরায়ণতা বিচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে একজন বিচারক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ্ তাদের মাঝে মীমাংসা করবেন"। "নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাদের মাঝে বিচার করবেন"। তিনি (আল্লাহ্) তাঁর নবীকে বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, "আপনি তাদের মাঝে প্রত্যাদেশ অনুযায়ী ফয়সালা করেন, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।"

মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলের মাঝে তাঁর নবীদেরকে বিচারক বানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে : "আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে আছে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও আলোকবর্তিকা, যা দিয়ে নবীগণ ফয়সালা করেন।"

কোন জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিমালা পেশ করলে দেখা যাবে যে, তার ভিত্তি বিচার কার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।' (৩৮ : সূরা সাদ : ২৬)

বিচার সম্পর্কে হাদিসের সতর্কবার্তা ও ফযীলত

বিচারকের পেশা সর্বদা একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। কেননা তার ভয়াবহ পরিণতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই ভয়াবহতার ইঙ্গিত হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী (সা) বিচারককে ছুরিবিহীন যবেহকৃত পশুর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি তিন ধরনের বিচারক নির্ণয় করেছেন। একজন জান্নাতী আর দু'জন জাহান্নামী। বিচারকার্য সম্পর্কে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'কঠিন ফরয, অনুসৃত সুন্নত, উত্তম ইবাদত ও উন্নত বন্দেগী। তোমরা এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর।'

বিখ্যাত ও গ্রহণযোগ্য তাবেঈ হযরত ইমাম মাসরূক বলেন, 'একদিন যথাযথ ফায়সালা করা আমার নিকট এক বৎসর আল্লাহর রাস্তায় (মুসলিম দেশের) সীমান্ত পাহারা দেয়ার চেয়ে উত্তম।' যুক্তিস্বরূপ তিনি মহানবীর বাণী উল্লেখ করেন। (এক বছর ইবাদতের চেয়ে এক ঘণ্টা ন্যায়-ইনসাফ করা শ্রেয়)

তেমনিভাবে তিনি ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা ও প্রমাণ পেশ করেন : "দু'টি জিনিস ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ঈর্ষা করা জায়েয নয়। তন্মধ্যে একটি হলো– ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আর সে ব্যীক্ত ঐ জ্ঞানানুযায়ী অন্যকে শিক্ষা দেন এবং ফায়সালা করেন। ফকীহ্ মকহুল (র) বলেন, ট্রেজারার হওয়ার চেয়ে বিচারক হওয়া আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। আল্লামা সারাখসী (রহ) বলেন কেননা খাজাঞ্চী মুসলমানদের সম্পদের রক্ষক আর বিচারক তাদের ধর্মীয় বিষয়ের রক্ষক।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, 'যে বিচারক জ্ঞান অর্জন করে তার বিপরীত ফায়সালা করে আর যে ব্যক্তি না জেনেশুনে বিচার করে তারা জাহান্নামী।' ভাষ্যকাররা লিখেন, "যে হাদিসে বিচারককে ছুরিবিহীন যবেহ্কৃত পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে তাতে জালিম বিচারককে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে পরোক্ষ ইঙ্গিত অন্য হাদিসে আছে। হাদিসটি হলো : কোন বিচারক যতক্ষণ না জুলুম করে ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য (তার সাথে) থাকে।

৯.৩ স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা/বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary)

মুসলিম বিচার ব্যবস্থা পুরোপুরি স্বাধীন। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই, যাদের বিচারকার্যে স্বাধীনতার নজির মুসলমানদের সমপর্যায়ে অবস্থান করতে পারে। মুসলিম বিচারক কোন নির্দিষ্ট মতাদর্শের অধীন নন যে, ঐ মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করার তার ক্ষমতা থাকবে না। তেমনিভাবে তিনি আপন আইনের বলয়ে আবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ রহিত হবে। বিচারকের উপর কোন শাসকের বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ থাকবে না। মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে ও ভূখণ্ডে অবস্থান করেছে। শাসকের পরিবর্তন হয়ে ন্যায়পরায়ণ ও জালিম শাসকের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু বিচার বিভাগ দুর্ভেদ্য দুর্গে সংরক্ষিত ছিল। ন্যায়নিষ্ঠ ও জালেম এবং সত্যনিষ্ঠ ও অত্যাচারী শাসকের কারো হাত তাকে স্পর্শ করেনি। বিচারক ও তার ইজতিহাদের উৎস হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত, তত্ত্বাবধায়ক হলো তার বিবেক ও দীনদারী এবং অন্যায়ে বাধাদানকারী হলো তার ঈমান ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ থাকবে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। শরীয়ার কঠোর অনুবর্তিতার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা বিচার বিভাগের কাজ। পাকিস্তানের উলামা কনভেনশন তাদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের রূপরেখায় এ মর্মে

অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, বিচার বিভাগ হবে সকল দিক থেকে স্বাধীন যাতে নির্বাহী বিভাগের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্তভাবে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায়।[১] ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতবর্গ সুদৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেছেন যে, শাসক কর্তৃক বিচারপতিদের নিয়োগ দ্বারা কোনভাবে বিচার বিভাগের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। শরীয়ার একই আইন দ্বারা নির্বাহী ও আইন বিভাগ পরিচালিত; তাই শরীয়া বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের অন্যকোন কর্তৃপক্ষ হতে কর্তৃত্ব লাভের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। অপরদিকে বিচার বিভাগের বিস্তারিত কার্যাবলীর পরিধি এত ব্যাপক যে সরকারের সকল অঙ্গ ও কার্যাবলী বিচার বিভাগের পরিসীমার মধ্যে পড়ে।

অন্য সকল নাগরিকের মত রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান নির্বাহী ও সরকার প্রধানকেও বাদী বা বিবাদী হিসেবে আদালতের আদেশে বিচারালয়ে হাজির হতে হয়। ড. হাসান তুরাবী মন্তব্য করেছেন যে, তিনি (শাসক) কোন রূপ দায় মুক্তির সুবিধা ভোগ করেন না এবং তার সরকারী বা ব্যক্তিগত যে কোন কর্মকাণ্ডের জন্য তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা জরুজু করা যেতে পারে। এ হচ্ছে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আইনের মূলনীতি যা শরীয়ার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। (He (the ruler) enjoys no special immunities and can, therefore, be prosecuted or sued for anything he does in his private or public life. This is a fundamental principle of Islamic Constitutional law, anything from the supremacy of the shariah.)[২]

৯.৪ বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য (Duties and Responsibilitis of Judges)

ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারকের কিছু গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এগুলো জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কর্মনীতি ও বাণী থেকে। হাদিসের সহীহ ও সুনান সংকলনগুলোতে এ সংক্রান্ত হাদীস সংকলিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের রচনাবলীতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে বিচরকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, The Islamic Law and Constitution, p- ৩৩৪।
২. ড. হাসান তুরাবী, The Islamic state, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

এক. ক্রোধের সময় বিচার না করা

ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ হযরত আবু বকর (রা) সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لاَ يَحْكُمْ اَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. (مسلم، ترمذى، نسائى)

কেউ যেনো ক্রোধের সময় দুই পক্ষের মাঝে ফায়সালা না দেয়।

বুখারীর একটি বর্ণনায় কথাটি এ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

لاَ يَقْضِي الْقَاضِيْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانَ . (بخاري)

বিচারক ক্রোধের সময় দুই পক্ষের মাঝে ফায়সালা দেবে না।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে রক্ত উত্তপ্ত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুটে উঠবার ফলে ক্রোধের সঞ্চার হয়। এসময় মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। এসময় সে ন্যায় অন্যায় তারতম্য করতে পারে না। অথচ ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায় বলে চিহ্নিত ও স্বীকৃত করবার উপরই আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই রাসূলে করীম (সা) রাগ ও ক্রোধের সময় বিচার ফায়সালা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এ সময় বিচারক তার বিবেককে আয়ত্তে রাখতে না পেরে অন্যায় ফায়সালা দিয়ে বসতে পারেন।

দুই : উভয় পক্ষের কথা শোনা

আবু দাউদ ও তিরমিযী তাঁদের সুনানে এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে হযরত আলী (রা)-এর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِذَا تَقَاضِيْ اِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلْاَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلاَمَ الْاٰخِرِ
فَسَوْفَ تَدْرِيْ كَيْفَ تَقْضِيْ. (ابو داود - ترمذي - حاكم)

যখন দুই ব্যক্তির বিচার ফায়সালা করার জন্যে তোমাকে বিচারক মানা হবে, তখন তুমি কেবল এক পক্ষের কথা শুনেই রায় দিয়ে দেবে না। রায় দেবার পূর্বে অবশ্যই প্রতিপক্ষের কথাও শুনবে। তবেই বুঝতে পারবে, কী রায় দিতে হবে।

তিরমিযী বলেছেন : হাদিসটি হাসান। হাকিম বলেছেন, বিশুদ্ধ সূত্র। সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে হাদিসটি বর্ণিত হয়নি।

তিন : বিচারকের সামনে উভয় পক্ষ সমমর্যাদায় বসবে

মুহাম্মদ ইবনে নয়ীম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর একটি বিচার প্রত্যক্ষ করেছি : হারিস ইবনে হাকাম এসে সেই গদীতে বসলো, যাতে আবু হুরায়রা হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আবু হুরায়রা মনে করেছিলেন হারিস অন্য কোনো কাজে এসেছেন, বিচারের জন্য নয়। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি এসে আবু হুরায়রার সামনে বসলো। আবু হুরায়রা তাকে জিজ্ঞেস করলো সে কি কারণে এসেছে? লোকটি বললো : 'হারিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছি। তিনি আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছেন।' একথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হারিসকে বললেন : উঠো বাদীর পাশে গিয়ে বসো। এটাই আবুল কাসেম (সা)-এর সুন্নাহ।

উভয়ের মাঝে আসনের সমতা বিধান না করে এক পক্ষকে বিচারকের পাশে বসালে তার প্রতি বিচারকের সম্মান প্রদর্শন হয় এবং তাকে যুলুম করার কাজে আস্কারা দেয়া হয়। এতে অপর পক্ষের প্রতি অবিচার হয়। ইসলামের নিয়ম হলো, বাদী বিবাদী উভয় বিচারকের সামনে একই সমতলে বা সমমর্যাদার আসনে বসবে।

চার : উভয় পক্ষের প্রতি বিচারকের দৃষ্টিদানের সমতা

বায়হাকী এবং দারু কুতনি তাঁদের নিজ নিজ সুনান গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِيْ لِحْظِهِ وَاِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ وَمَجْلِسِهِ. (بيهقي دار قطني)

যাকে মুসলমানদের বিচারকের আসনে বসিয়ে অগ্নিপরীক্ষায় ফেলা হবে, সে যেনো উভয় পক্ষের মাঝে দৃষ্টিদান, লক্ষ্যারোপ, ইশারা-ইঙ্গিত ও বসার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করে।

এটা এ কারণে করতে হবে, যাতে করে বাদী বিবাদী কোন পক্ষই যেন এ ধারণা করতে না পারে যে, বিচারক বুঝি প্রতিপক্ষের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। এমনটি হলে সে বিচারকের কাছ থেকে সুবিচার পাবার ক্ষেত্রে সংশয়ে নিমজ্জিত হবে।

পাঁচ : কোন এক পক্ষকে উচ্চ স্বরে সম্বোধন না করা

বায়হাকী এবং দারু কুতনি তাঁদের নিজ নিজ সুনানে উম্মুল মুমিনীন উম্মে

সালামার (রা) সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يَرْفَعُ صَوتَهُ عَلَى اَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَالَمْ عَلَى الْاٰخِرِ. (بيهقي دار قطني)

যাকে মুসলমানদের বিচারকের আসনে বসিয়ে অগ্নিপরীক্ষায় ফেলা হবে, সে যেন এক পক্ষকে উচ্চ শব্দে আর অপর পক্ষকে নিচু শব্দে সম্বোধন না করে। এটি পূর্বোক্ত হাদিসটির অংশ।

ছয় : কেবল এক আপ্যায়ন না করা

ইসমাঈল ইবনে মুসলিম হাসান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন কূফায় থাকাকালে এক ব্যক্তি আলীর (রা)-এর ঘরে এসে মেহমান হয়। এসময় সে তাঁর কাছে একটি মকদ্দমা দায়ের করে। তখন আলী (রা) তাকে বললেন : 'যেহেতু তুমি মকদ্দমা দায়ের করেছো এবং মকদ্দমার একটি পক্ষে পরিণত হয়েছো, সুতরাং তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠো। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মকদ্দমার কোন একটি পক্ষকে মেহমানদারী করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। তবে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষকে মেহমানদারি করতে নিষেধ করেননি। উভয় পক্ষের প্রতি সমআচরণ করা ও উভয়কে সমমর্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন।'

এটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তাবরানী হাদিসটিকে মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই সূত্রের মাঝে হাইসান ইবনে গোসন বা কাসিম ইবনে গোসন নামে এক ব্যক্তি রয়েছে। লোকটি অপরিচিত (মজহুল)

সাত : উভয় পক্ষ ঠিকভাবে বসার আগে বিচারক কোন পক্ষের কথা শুনবেন না।

আবু দাউদ এবং বায়হাকী তাঁদের নিজ নিজ সুনান গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يَّجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَ بِالْقَاضِيْ.

(ابوداود - بيهقي - حاكم)

রাসূলুল্লাহ (সা) বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে (তাদের বক্তব্য শুরু করার আগে) বিচারকের সম্মুখে বসবার নির্দেশ দিয়েছেন।

এটা এজন্যে, যাতে করে প্রত্যেকেই ধীরে সুস্থে এবং নিশ্চিন্তে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে পারে।

হাকিম বলেন, ইমাম যাহাবী এই বর্ণনাটিকে সঠিক বলেছেন। অবশ্য বুখারী, মুসলিমে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়নি।

আট : সাধারণ এবং মর্যাদাবান, দাস এবং স্বাধীনের সাথে সমআচরণ

বুখারী এবং মুসলিম তাঁদের নিজ নিজ সহীহতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّمَا النَّاسُ كَالاِبِلِ الْمِائَةِ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً- (بخاري مسلم)

মানুষের উদাহরণ হচ্ছে একশ উটের মতো যার মধ্যে একটি সোয়ারী (বাহন) খুঁজে পাওয়া কঠিন। (বুখারী : কিতাবুর রিকাক)

এর অর্থ আল্লাহর দীনে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানুষই সমান। যেমন একশ উটের মধ্যে সবগুলোর মর্যাদাই সমান। একশ উটের মধ্যে একটি উত্তম সোয়ারী কদাচিতই পাওয়া যায়। তেমনি উঁচু-নিচু, ধনী-গরীব, সাদা-কালো সব মানুষের মর্যাদাই সমান।

সুতরাং বিচারক ধনী-গরীব, শাসক-শাসিত, দাস-মনিব, ছোট-বড় এবং শরীফ-ইতরের মধ্যে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য করতে পারবেন না। এভাবেই গোটা মানব সমাজকে আইনের দৃষ্টিতে একই সমতলে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

নয় : ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় বিচার না করা

বায়হাকী এবং তাবরানী আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لاَ يَقْضِى الْقَاضِيْ اِلاَّ وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ. (بيهقي - طبراني)

বিচারক যেন ভরা পেটে খোশমনে বিচার কার্য পরিচালনা করে। অর্থাৎ বিচারক যেন ক্ষুধা পিপাসা নিয়ে বিচার কার্য না করে। কারণ এতে মেজাজ উগ্র ও খিটখিটে হতে পারে।

বিচারপতি হযরত শুরাইহ (রা)-এর নিয়ম ছিল তিনি যখন রাগান্বিত হতেন কিংবা ক্ষুধার্ত হতেন তখন তিনি বিচারকার্য স্থগিত রাখতেন। কারণ ক্ষুধা মানুষের মেজাজ ও চিন্তার উপর প্রভাব ফেলে। এতে করে সত্য উপলব্ধি করতে

ব্যাঘাত ঘটে। হাদিসটির সনদে (সূত্রে) কাসিম বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর নামে এক ব্যক্তি রয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রাবি হিসেবে এ ব্যক্তি পরিত্যাজ্য। আবার কেউ বলেছেন রাবি হিসেবে লোকটি দুর্বল।

৯.৫ বিচার বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থা (Achieving Targets and Objectives of the Judiciary)

বিচার বিভাগের মৌলিক লক্ষ্য চারটি বিষয়ের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে :

১। বিচারকের যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এবং বিচারক হওয়ার উপযোগিতা;

২। বিচারকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্থিতিশীলতা, মুখাপেক্ষীহীনতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা;

৩। বিচারের নিয়ম-কানুনের পূর্ণ কার্যকারিতা;

৪। বিচারকের নিকট জনগণের অধিকারের সুস্পষ্ট ধারণা, কার্যসূচি এবং ন্যায়বিচারের রায়ের বাধাবিঘ্নহীন কার্যকারিতার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা বর্তমান থাকা।

ইসলামী রাষ্ট্রে এসব কয়টি জিনিসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

১। বিচারকের যোগ্যতা-কার্যক্ষমতা ও বিচার কার্যের উপযুক্ততা : বিচার বিভাগ রাষ্ট্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি বিচারকের প্রকৃত যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও সেজন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ততা বিচারকের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে। যদি বিচার কার্যের যোগ্যতার জন্য জরুরি শর্তসমূহ তার মধ্যে পুরোপুরি পাওয়া যায়।

ইসলাম বিচারকের কতিপয় গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে, যা বিচারকের মধ্যে বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যক। বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম এ গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে। এর পূর্বে কোন সময়ই এর প্রতি একবিন্দু গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

গুণগুলো হচ্ছে :

১। পূর্ণবয়স্কতা;

২। বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা;

৩। ঈমানদার হওয়া;

৪। মৌলিকভাবে ন্যায়নিষ্ঠতা ও পক্ষপাতহীনতা;

৫। জন্মের পবিত্রতা;

৬। আইন সম্পর্কে পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও বিচক্ষণতা;

৭। বিচারকের পুরুষ হওয়া;

৮। বিচারকের স্মরণশক্তির তীক্ষ্মতা, মেধা ও প্রতিভা।

কেননা বিচারক বিস্মৃতির শিকার হলে তার দ্বারা সঠিকভাবে বিচার কার্য সম্পাদন হতে পারে না। রাসূলে করীম (সা) বিচারকের পদের গুরুত্ব, তার মর্যাদা ও তার দায়িত্ব জবাবদিহির বিরাটত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন :

اَلْقَضَاءُ ثَلٰثَةٌ وَّاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَاَمَّا الَّذِيْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ قَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ نَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جِهْلِهٖ فَهُوَ فِي النَّارِ.

(আল ক্বাদাউ ছালাছাতুন ওয়াহিদুন্ ফিল জান্নাতি ওয়া ইছ্নানি ফিন্নার, ফাআম্মাল্লাজি ফিল জান্নাতি ফারাজুলুন আরাফাল হাক্কা ক্বাদা বিহী ওয়া রাজুলুন আরাফাল হাক্কা নাজারা ফিল হুকুমি ফাহুয়া ফিননারি ওয়া রাজুলুন কাদা লিন নাসি আ'লা জিহলিহী ফাহওয়া ফিন্নার)

বিচারকরা তিন ধরনের। এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে, আর অপর দু'ধরনের বিচারক জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। জান্নাতে যাবে সেই বিচারক, যে প্রকৃত সত্য অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বিচার করেছে। পক্ষান্তরে, যে লোক প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে পেরেও বিচারকার্যে রায় দানে জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যেতে হবে।[৩]

এ হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম জা'ফর সাদেক (রহ) বলেছেন, চার ধরনের বিচারক দেখা যায়। তন্মধ্যে তিন ধরনের বিচারকই জাহান্নামে যাবে, আর মাত্র এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যেতে পারবে। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অবিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি না-জেনে অবিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে

৩. জামিউল উলূম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫। আবু দাউদ থেকে উদ্ধৃত, ইবনে মাজাহ।

না-জেনেও সঠিক বিচার করে, সেও জাহান্নামে যাবে। আর যে জেনে-শুনে-বুঝে সুবিচার করে, কেবলমাত্র সে-ই জান্নাতে যেতে পারবে।[৪]

২। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচারকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা : একথা সর্বজনবিদিত যে, বিচারকের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত বড় ও কঠিন। এ দিক দিয়ে তার সাথে অপর কোন পদে অভিষিক্ত ব্যক্তিদেরর কোনই তুলনা হয় না। এ কারণে তার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। অন্যথায় তার পক্ষে দায়িত্ব পালন কিছুতেই সম্ভব নয়। তাকে যদি এরূপ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলেই আশা করা যায়, যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অনীহা বা বাধা-প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠা ও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অ-প্রভাবিত থাকা সম্ভব হবে। আর সেজন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে, যেন সে কখনোই লোভের ফাঁদের শিকার হতে না পারে। ইসলাম এ জন্য যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ইসলামী হুকুমাত বিচারকের জন্য বেতন-ভাতা হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

শুধু অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাই সুবিচার কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। মূলত বিচারককে সেজন্য সকল প্রকার বহিরাগত ও সরকারি বা রাষ্ট্রীয় প্রভাব থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া অপরিহার্য। বিচারকের বিচার কার্যের উপর কোন হস্তক্ষেপ করার-বিচারের নামে অবিচার করার জন্য কোনরূপ চাপ বা প্রলোভন প্রয়োগেরও অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। এজন্যই হযরত আলী (রা) খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তাঁর নিয়োগকৃত শাসনকর্তা মালিক আশতার নখয়ীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন :

বিচারককে তোমার নিকট এমন মর্যাদা দেবে, যা পাওয়ার লোভ তোমার বিশেষ লোকদের মধ্যে অপর কারোরই মনে কখনই জাগবে না। তোমার নিকট এরূপ মর্যাদা থাকলেই বিচারক লোকদের সকল প্রকার প্রভাব ও প্রলোভন থেকে রক্ষা পেতে পারবে। অতএব, তুমি সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য নিবদ্ধ করবে।[৫]

এর চরম লক্ষ্য হচ্ছে, বিচারক যেন সর্বতোভাবে বহিঃপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে এবং কোনরূপ ভয়ভীতি বা লোভের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা অবস্থায়ই প্রত্যেকটি মামলার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার চালিয়ে যেতে পারে। বিচার

---

৪. হুকুমাতুল ইসলামিয়া, পৃ. ৩৬৮।

৫. নাহজুল বালাসা, কিতাব অধ্যায় পৃ. ৫৩।

বিভাগের স্বাধীনতা (Freedom of Judiciary) বলতে বর্তমানে এ অবস্থাই বুঝায় এবং এজন্যই রাষ্ট্রের অন্যান্য সর্বপ্রকারের কর্তৃত্ব থেকে- বিশেষ করে নির্বাহী বিভাগরে (Exceutives) প্রভাব থেকে তার সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন থাকার দাবি সর্বজনীন দাবি হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়ে এসেছে। কেননা জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, বিচার বিভাগ সর্বতোভাবে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত না থাকলে এবং এ বিভাগের ক্ষমতার পরিধি অনিয়ন্ত্রিত ও অসংকুচিত না হলে জনগণ কখনই সুবিচার পাবে না, বরং তখন সরকার স্বৈরাচার হয়ে জনগণের অধিকার হরণ করবে, সে অধিকার ফিরে পাবার আর কোন উপায়ই অবশিষ্ট থাকবে না। ঠিক এ কারণে বিচার বিভাগের পূর্ণ মাত্রার স্বাধীনতা জনগণের স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ লিখেছেন, সরকারের প্রশাসন কর্তৃত্ব দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ হচ্ছে দেশ শাসন, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে, জনগণের সংশ্লিষ্ট জটিল সামষ্টিক বিষয়াদিতে স্পষ্ট-অকাট্য রায় দান, পথ নির্দেশনা ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে বিচারকার্য সম্পাদনা। রাসূলে করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এ দু'টি পদ দু'শ্রেণীর লোকদের উপর অর্পিত ছিল। প্রথম কাজের জন্য যেমন প্রত্যেকটি অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিল।

তেমনি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ পালন করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিচারক (কাজী) নিযুক্ত হয়েছিল। অবশ্য কখনও কখনও এ উভয় ধরনের কাজের দায়িত্ব একই ব্যক্তিকেও দেয়া হয়েছে এবং একই ব্যক্তি প্রশাসক ও বিচারক-উভয় পদমর্যাদার দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তখন তা দেয়া হয়েছে সে একই ব্যক্তির উভয়দিকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিশেষ যোগ্যতা থাকার কারণে। কিন্তু সাধারণত এরূপ হত না; বরং দুই কাজের দায়িত্বে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হত।[৬]

বিচার বিভাগের এ স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ নির্বাহী শক্তি প্রভাবমুক্ত থাকার কারণে রাষ্ট্রপ্রধানকেও প্রয়োজনে বাদী কিংবা বিবাদী হয়ে বিচারকের নিকট উপস্থিত হতে হত এবং তথায় তাকে প্রতিপক্ষের সাথে সমান ও সম্পূর্ণ অভিন্ন মর্যাদা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। তিনি নিজস্বভাবে যেমন কাউকে কোন অপরাধের জন্য দায়ী করে তাকে দণ্ডিত করতে পারেন না, তেমনি তাঁর নিজের ব্যাপারেও বিচারকের দ্বারস্থ হতে একান্তভাবে বাধ্য।

৬. হুকুমাতুল ইসলামিয়া, পৃ. ৩২৫।

এ কারণেই হযরত আলী (রা) তাঁর বর্ম হারিয়ে যাওয়ার পর একজন ইহুদির (কিংবা খ্রিস্টান) নিকট তা দেখতে পেয়ে স্বীয় দাপট ব্যবহার করে তার নিকট থেকে তা কেড়ে নিতে পারেন নি; বরং সেজন্য তাঁকে বিচারপতি শুরাইর আদালতে হাজির হয়ে রীতিমত মামলা দায়ের করতে হয়েছিল। তিনি দাবি করেছিলেন, এটি আমার বর্ম। আমি এটি বিক্রয় করিনি। কাউকে তা দানও করি নি। তখন বিচারপতি অভিযুক্তকে তার বক্তব্য বলার নির্দেশ দিলেন। সে বলল, এ আমার বর্ম। তবে আমি আমিরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদীও বলছি না। তখন বিচারপতি হযরত আলীর নিকট প্রমাণ চাইলেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমার নিকট কোন প্রমাণ নেই। (অপর এক বর্ণনায় সাক্ষী হিসেবে তাঁর পুত্র ও ক্রীতদাসকে পেশ করা হলে বিচারপতি বললেন পুত্রের সাক্ষ্য পিতার পক্ষে ও ক্রীতদাসের সাক্ষ্য তার মনিবের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হতে পারে না।) তখন বিচারপতি বর্মটি অভিযুক্ত ব্যক্তিরই বলে রায় দিলেন। লোকটি বর্মটি হাতে নিয়ে রওয়ানা দিল। আর খলীফাতুল মুসলিমীন দুই চোখ মেলে তাকিয়েই থাকলেন, তাঁর করার কিছুই ছিল না।

কিন্তু লোকটি কিছু দূর যাওয়ার পরই ফিরে এসে বিচারপতিকে লক্ষ্য করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– এটাকেই বলে নবীর বিধান ও সেই বিধানভিত্তিক বিচার। এ বর্ম যে আমীরুল মুমিনীনের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে আমিই মিথ্যা দাবি পেশ করেছিলাম।

৩। **সুবিচার নীতির পূর্ণ সংরক্ষণ :** ইসলাম শুধু বিচাররের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেনি। বিচারকের নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণ থাকার শর্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি। বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য কতিপয় নিয়মনীতিও নির্দিষ্ট এবং কার্যকর করেছে। বিচারকের জন্য তা অবশ্যই পালনীয় করে দিয়েছে। অন্যথায় জুলুম ও অসাম্য-অবিচারের কলঙ্ক থেকে তার রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। সেই নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করলে সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

বিচারকের নিয়মনীতি দু'ধরনের। এক ধরনের নিয়মনীতি পছন্দনীয় এবং অপর ধরনের নিয়মনীতি অপছন্দনীয়।

পছন্দনীয় নিয়মনীতি হচ্ছে :

ক. বিচারকের নিজস্ব ক্ষমতাসীন এমন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে যে জনগণের যাবতীয় সমস্যা ও মামলা তার সম্মুখে একের পর এক পেশ করবে।

খ. বিচারকের আদালত এমন এক স্থানে হতে হবে, যেখানে সকল লোকের

পক্ষেই উপস্থিত হওয়া খুবই সহজ হবে, উপস্থিত হতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।

গ. বিচারকের আদালত কক্ষ প্রশস্ত, প্রকাশমান ও সুপরিবেশ সম্পন্ন হতে হবে, যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সেখানে বসা ও স্বীয় বক্তব্য পেশ করা সহজ হয়।

ঘ. আইনবিদদের এমন একটা সমষ্টি তার নিকট উপস্থিত থাকতে হবে, যেন বিচারক কোনরূপ ভুল করে বসলে তারা তাকে সংশোধন করে দিতে পারে। তা সত্ত্বেও যদি কোনরূপ ভুল হয়ে যায়, তাহলে তার প্রতিকারের সুযোগ থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

ঙ. পক্ষদ্বয়ের মধ্যের কেউ সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করলে তাকে নম্রতাসহকারে বুঝিয়ে দিতে হবে ও তাকে ক্ষান্ত হতে বাধ্য করতে হবে।

আর অপছন্দনীয় নিয়মনীতি হচ্ছে :

ক. বিচারের সময় দ্বাররক্ষী নিয়োগ করা;

খ. ক্রুদ্ধ হয়ে রায় লেখা ও দেয়া;

গ. ক্ষুধা, পিপাসা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, অত্যধিক আনন্দ-স্ফূর্ত প্রভৃতিতে তার মন রায় লেখার কালে মশগুল থাকা উচিত নয়;

ঘ. খুব তাড়াহুড়া করে- গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা না করে, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য সূক্ষ্মভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিবেচনা না করে রায় দেয়াও অনুরূপ।

এ পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি সতর্ক করা হয়েছে ঘুষের ব্যাপারে। কেননা ঘুষ সম্পূর্ণ হারাম। তা গ্রহণ করা যেমন হারাম, তেমনি তা দিয়ে অন্যায়ভাবে নিজের পক্ষে রায় লেখানোর উদ্দেশ্যে দেয়াও সম্পূর্ণ হারাম।

এসব নেতিবাচক কথা। সে সাথে রয়েছে ইতিবাচক কিছু বাধ্যবাধকতা। এখানে তার মোট সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে :

প্রথম– সালাম, সম্মান প্রদর্শন, আসন গ্রহণ, দৃষ্টিদান, কথাবার্তা বলা, লক্ষ্য আরোপ করা প্রভৃতির দিক দিয়ে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয়– এক পক্ষকে অপর পক্ষের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির পরামর্শ না দেয়া।

তৃতীয়– একজনের সাথে সাগ্রহে কথা বলা, যার দরুন অপর পক্ষ নিজেকে অপমানিত ও অসহায়বোধ করতে বাধ্য হয়।

চতুর্থ– দুই পক্ষই যখন মামলায় প্রস্তুত হবে এবং বিচার্য বিষয়টিও হবে সুস্পষ্ট, তখন বিচার কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য। তবে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা করে দিতে চেষ্টা করা তখনও বাঞ্ছনীয়। তাতে উভয় পক্ষ অ-রাজি হলে নিশ্চয়ই বিচার করতে হবে। আর বিচার্য বিষয় যদি দুর্বোধ্য ও কঠিন হয়, তাহলে এ কাজটিকেই বিলম্বিত করবে। বিলম্বিত করার সীমা তখন পর্যন্ত প্রসারিত, তখন ব্যাপারটি স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে না উঠেছে।

পঞ্চম– মামলা যে পরম্পরায় দাখিল হবে, বিচার সে অনুযায়ী সমাধা করতে হবে।

ষষ্ঠ– বিবাদী যদি এমন কোন দাবি পেশ করে, যার ফলে বাদীর দাবি চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাহলে তা অবশ্যই শুনতে হবে এবং বাদীর নিকট থেকে তার জবাবও জেনে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে আবার শুরু থেকে মামলার শুনানি শুরু করতে হবে।

সপ্তম– বাদী পক্ষ বা বিবাদী নিজ নিজ দাবি প্রত্যাহার করলে মামলা খারিজ করে দেবে।

এসব কথাই কুরআন বা রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। একটি হাদিসে রাসূলে করীম (সা)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে,

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلاَ يَقْضِيْ وَهُوَ غَضْبَانُ–

(মানিব্ তুলিয়া বিল ক্বাদায়ি ফালা ইয়াক্দি ওয়া হুয়া গ্বাদবান (আল হাদিস)

যে লোক বিচারক হওয়ার বিপদে পড়বে, সে যেন ক্রুদ্ধ অবস্থায় কখনই বিচারের কাজ না করে।[৭] তিনি বলেছেন–

اِذَا تُقَاضٰى اِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلاَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الاٰخَرِ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ–

(ইযা তুকাদি ইলাইকা রাজুলানি ফালা তাক্বদ্বি লিল আওয়ালি হাত্তা তাসমিয়া মিনাল আখারি ফাইন্নাকা ইযা ফাআলতা যালিকা তাবাইয়্যানা লাকাল ক্বাদা)

দুই ব্যক্তি যদি তোমার নিকট বিচার প্রার্থী হয়, তাহলে প্রথম জনের জন্য রায় দেয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় জনের বক্তব্য শুনে নেবে। তুমি যদি সেরূপ কর তাহলে তোমার বিচার কার্য সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট হবে।

সাক্ষ্যদান : বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। সাক্ষ্য হলো বাদীর

---

৭. জামেউল উলূম, পৃ. ৫৪৯।

দাবির প্রমাণ এবং বিবাদীর পক্ষে বাদীর দাবি অস্বীকারের উপায়। বাদী যদি তার দাবি বিচারার্থে প্রমাণ করতে চায়, তাহলে তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করতে হবে এবং বিবাদী যদি সে দাবি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়, হালে তাকেও সেজন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। বিচার কাজে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

এ উভয় পক্ষের সাক্ষ্যদানে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। গোটা বিচারের ব্যাপারটিই এ সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভরশীল। সাক্ষী যদি সত্য সাক্ষ্যদান করে তাহলে বিচারকার্য সত্যভিত্তিক হবে এবং যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে অবিচার হবে।

ইসলামে এ ব্যাপারটিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় আহ্বান জানানো হয়েছে ঈমানদার লোকদের প্রতি :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا - فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا.

(ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ'মানূ কূনূ কাওয়্যামিনা বিলকিসত্বি শুহাদাআ লিল্লাহি ওয়া লাও আ'লা আনফুসিকুম আও উইলওয়ালিদাইনি ওয়াল আকরাবিনা, ইন্নাকুম গ্বানীয়্যান আ'ও ফাক্বিরান ফালিল্লাহু আওলাবিহিমা ফালা তাত্ত্বা বিউল হাওয়া আনতা'দিলু)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ন্যায়বিচারের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, যদিও সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতার ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে পড়ে। সে যদি ধনশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তাহলে তো আল্লাহ-ই তাদের জন্য অতীব উত্তম। অতএব, তোমরা ন্যায়বিচার না করে নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না।[৮]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ-

(ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ'মানূ কূনূ ক্বাওয়্যামিনা লিল্লাহি শুহাদাআ' বিল ক্বিসত্বি)

---

৮. ৪ : সূরা আন নিসা : ১৩৫।

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়বিচারের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।'[৯]

দু'টো আয়াতেই সাক্ষ্যদাতাকে আল্লাহর জন্য ন্যায়বিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে মামলার সাক্ষীরা মূলত আল্লাহর সাক্ষী- কোন বিশেষ পক্ষের নয়। তাদের এ সাক্ষ্যদান হতে হবে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে অর্থাৎ বিচারক ও সাক্ষ্যদাতা। সকলেরই সম্মুখে একটি মাত্র লক্ষ্য থাকতে হবে। আর তা হচ্ছে মামলার ন্যায়বিচার। অতএব, তারা কোন বিশেষ পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেন কোন সাক্ষ্য না দেয় বা তারা যেন এমনভাবে সাক্ষ্য না দেয়, যার দরুন সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা নস্যাৎ হবে, অবিচার ও জুলুমই প্রবল হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানকালে সাক্ষ্যদাতারা সাধারণত যা করে, তাতে ন্যায়বিচার কখনই সম্ভব হতে পারে না। এ জন্য ইসলামে সাক্ষী কি রকমের লোক হতে হবে, সে বিষয়ে কয়েকটি জরুরি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শর্তসমূহ এ :

১। সাক্ষীকে পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২। পূর্ণ ও সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে, পাগল বা মতিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না।

৩। সাক্ষীকে অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর দীনের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে। বে-ঈমান লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না।

৪। সাক্ষীকে ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হতে হবে। চরিত্রহীন, অন্যায়কারী বা শরীয়ত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে না।

৫। সাক্ষীকে সর্বপ্রকার দুষ্কৃতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। দুষ্কৃতির অভিযোগে পূর্বে অভিযুক্ত হয়েছে– এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যে সন্দেহমুক্ত সত্য কখনোই প্রমাণিত হতে পারে না।

'সাক্ষ্যদান'কে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'আশ শাহাদাহ' এর শাব্দিক অর্থ হলো 'উপস্থিতি'। অর্থাৎ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় যে লোক উপস্থিত ছিল, যে লোক নিজ চোখে ঘটনা সংঘটিত হতে দেখেছে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছে, সে-ই পারে সাক্ষ্যদান করতে। এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যার রয়েছে, সে-ই সাক্ষ্য দেবে, সাক্ষ্যদানের অধিকার বা যোগ্যতা কেবল তারই হয়।

৯. ৫ : সূরা আল মায়েদা : ৮।

ইসলামের দৃষ্টিতে সাক্ষীর ন্যায়বাদী ও ন্যায়পন্থী (আ'দীল) হওয়া অতটাই জরুরি যতটা জরুরি স্বয়ং বিচারকের ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হওয়া। উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে এ কথাই বলা হয়েছে। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, 'সাক্ষী যখন ঘটনাকে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত দেখতে পাবে, তখনই যেন সাক্ষ্য দেয়। নতুবা সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস যেন সে না করে'। 'অকাট্য-সুদৃঢ় বর্ণনা, যা আইনের বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে এমন ব্যাপারে দেয়া, যা বর্ণনাকারী স্পষ্টভাবে দেখেছে'- এটাই হচ্ছে সাক্ষ্যের সংজ্ঞা।

এভাবে ইসলামে সাক্ষ্যের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। এ জন্য সাক্ষ্যকে ন্যায়বাদী ও ন্যায়পন্থী হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। তার অর্থ, সাক্ষ্য সত্যভিত্তিক হতে হবে, দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ হতে হবে, কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারবে না। তা প্রত্যক্ষ ব্যাপারে ব্যাপার সম্পর্কে হবে, অন্যদের মুখে শোনা বিষয়ে নয়।[১০] সাক্ষীকে গণনায় আইনের অনুরূপ হতে হবে। প্রত্যেক সাক্ষীকে বিচক্ষণ ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হতে হবে।[১১] প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সাক্ষ্য না দেয়া আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অনীহা। পিতাপুত্র, স্বামী-স্ত্রী, দাস-মনিব প্রভৃতি লোকদের পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্যদান গ্রহণীয় নয়।[১২] সাক্ষ্যকে বিকৃত করা যাবে না। সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জানানোর কোন অধিকার নেই। সাক্ষ্য গোপন করা অতি বড় গুনাহ। তা আইন বিরোধীও। সাক্ষীকে কেনা চলবে না। সাক্ষীদের সম্মান করতে হবে। কেননা তাদের দ্বারাই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব বিভিন্ন হাদিসের কথা।

ইসলাম সমস্ত মানুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। আইনের দৃষ্টিতে-আইনের সম্মুখেও সকল লোক-ই সমান। বিচারকার্যেও লোকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যাবে না।

এ দৃষ্টিতে বর্তমান পাশ্চাত্য শাসন ও বিচার পদ্ধতি মানুষের উপর জুলুমের ধারক ও বাহক। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিচারালয় কায়েম করা ইসলামের দৃষ্টিতে জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। সকল শ্রেণীর মানুষের বিচার একই আইনের ভিত্তিতে একই আদালতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

১০. সারায়েউল ইসলাম, কিতাবুল কাদাহ।

১১. জাওহারুল কালাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯।

১২. উমদাতুল কারী শারহুল বুখারী, পৃ. ৩২২-৩৯৮।

ইসলাম বিচারক নিয়োগে যেসব শর্ত আরোপ করেছে, তা কেবলমাত্র পূর্ণ ঈমানদার, আল্লাহভীরু ও ন্যায়বাদী লোকদের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। ন্যায়বাদী-আল্লাহভীরু বিচারক দলিল-প্রমাণ ছাড়া কখনোই নিজ ইচ্ছামত বিচার করে না। ফলে অনেক ভুল থেকেই সে রক্ষা পেয়ে যায়। বর্তমানকালে বিচারকের সেসব গুণ অপরিহার্য মনে করা হয় না-পাশ্চাত্য বিচার দর্শনে সে ধারণাই অনুপস্থিত বলে বিচারের নামে চলছে নানাবিধ অবিচার।

হ্যাঁ, কোন বিচারালয়ের অবিচার হয়েছে বা বিচারে ভুল করা হয়েছে মনে হলে অবশ্যই অন্য কোন বিচারক দ্বারা সে মামলার পুনর্বিচার করানো যেতে পারে। এজন্য বিশেষজ্ঞগণ লিখেছেন :

كُلُّ حُكْمٍ قَضَى بِهِ الْاَوَّلَ وَبَانَ لِلثَّانِيْ فِيْهِ خَطَاءٌ فَانَّهُ يَنْقُضُهُ.

(কুল্লু হুকমিন ক্বা'দা বিহিল আওয়ালু ওয়া বিআন্না লিশ্‌শানি ফীহি খাত্বায়্যুন ফাইন্‌নাহু ইয়ানকু'দুহু)

প্রথম বিচারকের রায়ে ভুল প্রকাশিত হলে দ্বিতীয় বিচারক তা বাতিল করে দেবে।[১৩]

প্রথম বিচারক কোন জ্ঞানগত দলিলের বিরুদ্ধতা করে থাকলে, যাতে কোন ইজতিহাদের সুযোগ নেই কিংবা কোন ইজতিহাদি দলিলের বিরুদ্ধতা করে থাকলে, যাতে কোন ইজতিহাদের সুযোগ নেই কিংবা কোন ইজতিহাদি দলিলের বিরুদ্ধতা করে থাকলে-যারপর আর ইজতিহাদ চলে না, শুধু অসতর্কতার কারণেই ভুল করে থাকে, তাহলে সে বিচার বাতিল করা যাবে অথবা পক্ষদ্বয় যদি নতুন করে দাবি উত্থাপন করার এবং অপর কোন বিচারকের রায় গ্রহণ করতে রাজি হয়, তখনও পূর্বের রায় বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া অন্য কোনভাবে বিচারের রায় বাতিল হতে পারে না।[১৪]

৯.৬ ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary of Islamic State)

মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কতকগুলো অধিকার ভোগ আবশ্যক। ইসলামী রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকারগুলো স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অধিকার সংরক্ষণের এ দায়িত্ব বস্তুতপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগই সম্পাদন করে। ইসলামী

১৩. মাবসুত, পৃ. ১১৩।
১৪. মাবসুত, পৃ. ১২১।

আইনের ব্যাখ্যা, বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা, অধিকারগুলোকে বাস্তবে কার্যকর করা প্রভৃতি গুরুদায়িত্ব বিচার বিভাগকেই পালন করতে হয়। তাই বিচার বিভাগ ছাড়া ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা ভাবা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, বিচার বিভাগকে বাদ দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা কল্পনারও অতীত। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলী ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলীসমূহ নিম্নরূপ :

১. আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ : আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করাই হল ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। এ ক্ষেত্রে আইন শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইন বলতে আইনদাতা আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন ছাড়াও মহানবী (সা) প্রদর্শিত আইন, ইসতিহ্সান, ইসতিদলাল, উরফ- প্রচলিত প্রথা ইত্যাদি ইসলামী আইনের সকল উৎসসমূহকে বুঝায়।

২. বিরোধ নিষ্পত্তি (Settlement of disputs) : বিচার বিভাগ ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধের মীমাংসাও করে থাকে। সাংবিধানিক উপায়ে বা সাংবিধানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিচার বিভাগ এসব বিরোধের মীমাংসা করে।

৩. অন্যায় কার্যের প্রতিরোধ (Prevention of wrongful acts) : বিচার বিভাগ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যকার অন্যায়, অশ্লীল ও যাবতীয় গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে।

৪. বিচারিক ঘোষণা জারী (Issuing of declaratory Judgements) : বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের যাবতীয় মামলা মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য বিচারিক ঘোষণা দিতে পারে। এতে ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

৫. শাসন বিভাগকে পরামর্শদান : বিচার বিভাগ শাসন বিভাগকে কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রয়োজনবোধে কোন আইন বা তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের বা বিচার বিভাগের পরামর্শ চাইতে পারেন। বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত প্রধান নির্বাহীকে জানিয়ে দেন।

৬. নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক হিসেবেও বিচার বিভাগ গুরুদায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্রের যে কোন কর্তৃপক্ষের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৭. **ন্যায় বিচার সংরক্ষণ :** ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। দেওয়ানী, ফৌজদারী, হুদূদ[১৫] তাযীর[১৬] প্রভৃতি যে কোন অপরাধের মামলায় সত্যানুসন্ধানের দ্বারা অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে বিচার বিভাগকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

৮. **বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা (Judicial Review) :** বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের একটি বড় কাজ। এই ক্ষমতাবলে বিচার বিভাগ ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন আইন ও সরকারী সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে পারে। এ ক্ষমতার মাধ্যমে বিচার বিভাগ ইসলামী সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করে। বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার অধিকার (Power of Judicial Review) বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছুটা মতদ্বৈততা আছে। কিছু আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ বিচার বিভাগকে আইনের সাংবিধানিক বিষয়টি বিচার করার ক্ষমতা প্রদানকে সমর্থন করেন না। তারা বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও ভূমিকাকে শুধুমাত্র আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন তার অভীষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা অবলোকন ও পরীক্ষণের ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে।[১৭] ড. হাসান তুরাবী বিপরীত মত পোষণ করে বিচারকদের শরীয়ার অভিভাবক হিসেবে গণ্য করে আইনের সকল ক্ষেত্রে তাদের রায় প্রদানের ক্ষমতার অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ('Judges, as the guardians of the Shariah,

---

১৫. হদ্দ ইসলামী আইনের একটি পরিভাষা যা সুনির্দিষ্ট কতিপয় অপরাধ ও সেগুলোর জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে বুঝায়। অন্য কথায় সীমারেখা প্রান্তরেখা নিষিদ্ধ যেসব কার্যকলাপের জন্য কুরআনে শাস্তি বিধান করা হয়েছে। হদ্দ শব্দের বহু বচন হুদূদ। আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে হদ্দ বলে। হদ্দ যোগ্য অপরাধ ছয় প্রকার, যেমন : ১. যিনা (ব্যভিচার) ২. যিনার মিথ্যা অপবাদ (কাযফ), ৩. চুরি (সারাকা), ৪. ডাকাতি (কাতউত তারীক) ৫. মাদকাসক্তি (শুরবুল খামর) ৬. ইসলাম ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ)।

১৬. তাযীর হচ্ছে অনির্ধারিত শাস্তি, হদ্দের আওতা বহির্ভূত অপরাধ কর্ম এবং এজন্য যে শাস্তি ভোগ করতে হয় সে শাস্তিকেই তাযীর বলে। তাযীর কুরআন দ্বারা প্রমাণিত এবং তাযীর ন্যস্ত করা হয়েছে বিজ্ঞ বিচারকের সুচিন্তিত ও সুবিবেচনা প্রসূত রায়ের উপর। এটি বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন শাস্তি।

১৭. কামাল এ ফারুকী, 'The Evolution of Islamic constitutional Theory and Practice' করাচী, ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭১, পৃ. ৭২-৭৩।

adjudicated in all matters of law')[১৮] এই মতামতের সাথে আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং আবদুল কাদির কুর্দী বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৯]

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)-এর মতে, যদিও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় বিচার বিভাগের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা ধরনের কোন ক্ষমতা ছিল না কিন্তু বর্তমান সময়ে যেহেতু সাধারণ মানুষের কুরআন-হাদিসের জ্ঞানের বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নেই, তাই তিনি কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থীভাবে রচিত সংবিধান, আইন ও বিধিকে অবৈধ, আইনগতভাবে ভিত্তিহীন হিসেবে ঘোষণা করে বাতিল করে দেয়ার ক্ষমতা বিচার বিভাগকে প্রদান সমীচীন বলে মনে করেন।[২০]

শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানী উলামাবৃন্দ, আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ ও আনসারী কমিশন রিপোর্ট সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীর এ মত সমর্থন করেন।

৯. অন্যান্য কাজ : ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে কতকগুলি শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। যেমন– নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, কোন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা অছি নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান, দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারী নিয়োগ প্রভৃতি।

ইসলামী গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের ভূমিকার গুরুত্ব অতিমাত্রায় বেশি। ইসলামী রাষ্ট্রের সবথেকে শক্তিশালী স্তম্ভ হল বিচার ব্যবস্থার পরিচালনা। ড. জামাল বাদাবী মন্তব্য করেছেন, 'Administration of Justice is the firmest pillar of Islamic Goverment.' অর্থাৎ ইসলামী সরকারের সব থেকে শক্তিশালী স্তম্ভ হল বিচার ব্যবস্থার পরিচালনা।

---

১৮. ড. হাসান তুরাবী, দি ইসলামিক স্টেট, পৃ. ২৪৮-৪৯।

১৯. আবদুল কাদির কুর্দী, দি ইসলামিক স্টেট, পৃ. ৭৭-৭৯ (বিস্তারিত আলোচনার জন্য)

২০. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, দি ইসলামিক ল এণ্ড কনস্টিটিউশন, পৃ. ২২৮।

প্রশ্নাবলী

১। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। (Discuss the functions of the Judiciary in a Islamic state.)

২। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থাগুলো আলোচনা করো। (Discuss the effective ways of achieving Objectives and target of judiciary in Islamic State.)

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে সাক্ষ্যদান পদ্ধতি আলোচনা কর। (Discuss the witness system in a Islamic state.)

৪. ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুরুত্ব নির্দেশ করো। (Point out the Importance of Jndiciary in a Islamic State.)

৫. ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করো। (Discuss the duties and responsibilities of Judges in a Islamic state.)

৬. ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করো। (Discuss the independence of the Judiciary in a Islamic state.)

৭. ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সে সকল উপাদানের উপর নির্ভরশীল তাদের বর্ণনা দাও। (Indicate the factors upon which the independence of the Judiciary depends in an Islamic state.)

৮. ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। (Discuss the functions of Judiciary in a Islamic state.)

(১০)

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য
(Rights and Duties of Citizens in Islamic State)

১০.১ ভূমিকা (Introduction)

ইসলামী রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য অনেক। ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে নাগরিকগণ যেমন অধিকার ভোগ করেন তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও তাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে। (Rights imply duties)। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির আলোচনা চলে না। বস্তুত অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত আছে। অধিকার ভোগ ব্যতীত যেমন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করলেও নাগরিক জীবন সংহত হয় না। বস্তুত রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের ঐকান্তিক কর্তব্য পালনের উপর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভরশীল।

১০.২ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of citizens in Islamic State)

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্যেই ইসলামী রাষ্ট্রে যে মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে তা বহুবিধ। এ অধিকার যাতে কেউ হরণ করতে না পারে সেজন্যে রাষ্ট্রের সর্বশক্তি নিয়োগ করা একান্ত অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

১. জীবনের নিরাপত্তা

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ-

কোন মানুষকে তোমরা হত্যা করো না, এটা আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন- ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া।[১]

---

১. ১৭ : সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৩।

২. মালিকানা স্বত্বের নিরাপত্তা

وَلاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -

এবং তোমরা একে অন্যের মাল অবৈধ পন্থায় খেয়ো না।[২]

৩. সম্মানের নিরাপত্তা

لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ... وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ... وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا -

কোন দল যেন কোন দলের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। তোমরা একে অন্যের উপর দোষারোপ করো না– একে অন্যকে বিকৃত নামে ডেকো না। ... আর তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে।[৩]

৪. ঘরোয়া জীবনের (**Private Life**) নিরাপত্তা

لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا عَلٰى اَهْلِهَا -

তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা ঘরের বাসিন্দাদের অনুমতি লাভ করবে এবং তাদের প্রতি সালাম দেবে।[৪]

وَلاَ تَجَسَّسُوْا -

...এবং তোমরা মানুষের ছিদ্র অন্বেষণ করো না।[৫]

৫. জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার

لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ

আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রচারণা পছন্দ করেন না, তবে যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র।[৬]

৬. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানের অধিকার

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

---

২. ২ : সূরা আল বাকারা : ১৮৮।
৩. ৪৯ : সূরা আল হুজুরাত : ১১-১২।
৪. ২৪ : সূরা আন নূর : ২৭।
৫. ৪৯ : সূরা আল হুজুরাত : ১২।
৬. ৪ : সূরা আন নিসা : ১৪৮।

তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজে আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।[৭]

৭. সংগঠনের অধিকার (Freeom of Association)

যে সংগঠন ন্যায় ও সৎকাজের প্রচারের জন্যে কাজ করবে এবং সমাজ জীবনে কোন বিভেদ বা মতানৈক্য সৃষ্টির কাজে লিপ্ত না হবে, কেবলমাত্র সেরূপ সংগঠনেরই অধিকার থাকবে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ - وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

এবং তোমাদের মধ্যে এমন দল থাকা প্রয়োজন, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে, তারা হল সফলকাম। আর তোমরা তাদের মতো হইও না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট হিদায়াত আসার পরেও তারা মতনৈক্য সৃষ্টি করেছে। এমন লোকদের জন্যেই মহাআযাব রয়েছে।[৮]

৮. চিন্তার স্বাধীনতা (Freedom of Thought) অধিকার

لاَ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -

দীনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই।[৯]

৯. স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

এরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যে সকল উপাস্যকে ডাকছে, তোমরা তাদেরকে গালি দিও না।[১০]

---

৭. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ১১০।
৮. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ১০৪-১০৫।
৯. ২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৬।
১০. ৬ : সূরা আল আন'আম : ১০৮।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, ধর্মের মতভেদ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু এমন সুন্দর পন্থায় হতে হবে যে, কারুর মনে যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে। আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -

এবং তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করবে না, উত্তম পন্থায় ব্যতীত।[১১]

১০. অন্যের অপরাধে অপরাধী না হওয়ার অধিকার

প্রত্যেক নাগরিকই কেবল নিজ নিজ কাজে জন্যে দায়ী; অন্যের কাজের জন্যে কাউকে কোন অবস্থাতেই শাস্তি দেওয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا - وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

এবং প্রত্যেকেই যা অর্জন করবে তার কুফল তাকেই ভোগ করতে হবে; কোন বোঝা বহনকারীই অন্য কারুর বোঝা বহন করবে না।[১২]

১১. বিনা অপরাধে বন্দী ও শাস্তিপ্রাপ্ত না হওয়ার অধিকার

অপরাধের কোন প্রমাণ না থাকলে অথবা প্রকৃত ন্যায়-ইনসাফের দৃষ্টিতে যুক্তিসংগত কোন কারণ না থাকলে কাউকে বাদী করা, কোন শাস্তি দেওয়া কিংবা অন্য কোনরূপ পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। আল্লাহ্ বলেন :

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ -

যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে তা হলে তার সত্যতা যাচাই করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে তোমরা কারুর অসুবিধার সৃষ্টি করবে এবং পরে নিজ কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে।[১৩]

১২. অভাবীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সামগ্রী লাভের অধিকার

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সকল পথ উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও জীবন সংগ্রামে পশ্চাদপদ হয়ে যারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের এ অধিকার রয়েছে যে, অন্যান্য সাধারণ

---

১১. ২৯ : সূরা আনকাবুত : ৪৬।

১২. ৬ : সূরা আল আন'আম : ১৬৪।

১৩. ৪৯ : সূরা আল হুজুরাত : ৬।

মানুষের মতো বাঁচার জন্যে যা যা একান্ত প্রয়োজন, তা পূর্ণ করার দায়িত্ব স্বয়ং সরকারকেই বহন করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন :

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

এবং তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রয়েছে।[১৪]

১৩. বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার

জনগণের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ বা বৈষম্য সৃষ্টি করে আশরাফ-আতরাফ, উঁচু-নিচু, সুবিধাভোগী-সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীতে পরিণত করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। সকল নাগরিককে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং সমান সুযোগ-সুবিধা দান করাই রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য। ফেরাউনের স্বৈরশাসনের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ.

ফেরাউন যমীনের বুকে ঔদ্ধত হয়ে উঠল এবং তার নাগরিকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিল। তাদের এক শ্রেণীর লোকদেরকে দুর্বল করে রাখত, পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[১৫]

১০. ৩ ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের গুণাবলী (Qualities of Muslim citizens in an Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের গুণাবলীসমূহ নিম্নরূপ :

১. তাকওয়াবান হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের তাকওয়াবান খোদাভীরু হতে হবে, যেহেতু ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়। আল্লাহ্ বলেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াবান খোদাভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ।"[১৬]

২. চরিত্রবান হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সচ্চরিত্রবান হতে হবে।

---

১৪. ৫১ : সূরা আয যারিয়াত : ১৯।

১৫. ২৮ : সূরা আল কাসাস : ৪।

১৬. ৪৯ : সূরা আল হুজুরাত : ১৩।

কারণ সচ্চরিত্রই কোন জাতির উন্নতির মূল সোপান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "উন্নত চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।"

৩. বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যতবেশি দক্ষতা, উন্নত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে পারবে, ইসলামী সরকার ততই সফলতা অর্জন করবে।

৪. রাষ্ট্রের আনুগত্য করা : সরকারের আনুগত্য স্বীকার ও বিভিন্ন কর্ম এবং নীতিকে মান্য করার মনোভাব ব্যতীত কেউ সুনাগরিক হতে পারে না। তাছাড়া সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা, আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম নাগরিক জীবনের মহৎগুণ।

৫. সুশিক্ষিত হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুশিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং নাগরিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (সা) বলেছেন, "আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।"

৬. বিবেকবান, কর্তব্যবোধসম্পন্ন হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে বিবেকবান এবং কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দায়িত্ববোধ যা তাকে মানব কল্যাণ ও সমাজ-সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

১০.৪ নাগরিকদের নিকট ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকার (Rights of Islamic State to Citizens)

খিলাফতের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে জনসাধারণের ওপর সরকারের যে অধিকার রয়েছে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. নাগরিকদের আনুগত্য লাভের অধিকার

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার কর্মকর্তাদের।[১৭]

২. সরকারের আইনের মর্যাদা রক্ষার অধিকার

সরকারের যাবতীয় আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সেগুলো পুরোপুরি মেনে

---

১৭. ৪ : সূরা আন নিসা : ৫৯।

চলতে হবে এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে– এমন কোন কাজে জনগণ কখনো শরীক হতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا –

এবং তোমরা পৃথিবীর বুকে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[১৮]

৩. সৎকাজে সহযোগিতা লাভের অধিকার

জনগণকে সরকারের সকল কল্যাণকর কাজেই সহযোগিতা দান করতে হবে।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى –

এবং তোমরা সৎ ও পরহেযগারীর যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করো।[১৯]

৪. দেশ রক্ষার কাজে সর্বাত্মক সাহায্য লাভের অধিকার

যে রাষ্ট্র স্থাপিত হয় শুধু আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, স্থাপিত হয় শুধু কল্যাণকামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীর সার্বিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে, তার অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়, তখন সে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকদেরকে সবকিছু নিয়েই অগ্রসর হতে হয়; কেবলমাত্র আপন ধন-সম্পদ দিয়েই নয়, বরং প্রয়োজন হলে নর-নারী নির্বিশেষে সকলকেই সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। আল্লাহ্ বলেন :

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ – ذٰلِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

তোমরা অভিযানে অগ্রসর হও– হালকা অথবা ভারি রণ-সম্ভারসহ এবং তোমাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর-যদি তোমরা জান।[২০]

১০.৫ মুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties of Muslim Citizens)

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ :

১. বেঁচে থাকার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের বাঁচার অধিকার রাষ্ট্র

১৮. ৭ : সূরা আল আ'রাফ : ৮৫।
১৯. ৫ : সূরা আল মায়েদা : ২।
২০. ৯ : সূরা আত তাওবা : ৪১।

কর্তৃক সংরক্ষিত। কোন ব্যক্তি, সংঘ, সংগঠন, বহিঃশক্তি অথবা স্বয়ং রাষ্ট্র কোন নাগরিককে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হলে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।

ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন, "(শরীয়াহ নির্ধারিত) আইনানুগ কারণ ছাড়া যাদেরকে হত্যা করা অবৈধ তাদেরকে হত্যা করো না।"[২১]

মহানবী (সা) তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন,

"তোমাদের প্রত্যেকের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু তোমাদের পরস্পরের কাছে পূত পবিত্র" (সহীহ বুখারী)। মুসলিম মনীষীদের মত হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার কারণে কারো মৃত্যু হলে তাকে হত্যা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

২. বস্ত্রের অধিকার (Right to Cloth) : বস্ত্র দ্বারা মানুষ তার আব্রু রক্ষা করে। ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের এ মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বস্ত্র, পশু ও মানুষের মধ্যে ভেদ রেখা টেনে দেয়। এ উপরকণটি ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

৩. বাসস্থানের অধিকার (Right to Shelter) : বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের নিরাপদে আপন আপন বাসস্থানে বসবাস করার অধিকার সংরক্ষিত। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হওয়ার শর্তে দেশের যে কোন স্থানে বসবাস করার অধিকার রাখে, রাষ্ট্র-এর ব্যবস্থা করবে।

৪. শিক্ষার অধিকার (Right to Education) : ইসলাম বিদ্যাশিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয করে দিয়েছে। শিক্ষা ছাড়া যেমন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়া যায় না অনুরূপভাবে কোন উন্নতিও সাধন করা যায় না। ইসলামের দর্শনকে বুঝতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্র অশিক্ষিত ও অনক্ষর নাগরিকদের প্রতি আস্থা রাখে না। মুসলমানদেরকে অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীতা ছাড়াই নেতা নির্বাচন করতে হয়। শিক্ষা ব্যতীত একজন নাগরিকের পক্ষে এ গুরুদায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা সুলভ করবে যাতে ব্যাপক শিক্ষিত নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শকে অনুধাবন করতে পারে। আর এর ফলে দেশ ও জাতির ভিত মজবুত হবে এবং জ্ঞান গরিমায় মুসলিম

---

২১. ১৭ : সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৩।

উম্মাহ আল্লাহর ঘোষণামত শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

৫. সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার : ব্যক্তির জীবন ও সম্পদ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নয়। সেই সঙ্গে মান মর্যাদা রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মুসলিম মানেই সম্মানিত, কেননা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : "মান-ইজ্জত সবই আল্লাহ, রাসূল এবং সকল মুমিনদের জন্য।" অতএব কেউ অপমানিত হোক ইসলামী রাষ্ট্র তা কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

"একদল যেন অপরদলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করে।"

কুরআনে আরও এসেছে, "তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না, একে অন্যকে বিদ্রূপ পদবী দিও না। একে অন্যের গীবত করো না।"[২২]

৬. সম্পদ সঞ্চয় ও ভোগ করার অধিকার : মুসলিম রাষ্ট্রের বা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ ভোগ ও সংরক্ষণ করার অধিকার রাখে। সম্পদ উপার্জন-ব্যয় ও আল্লাহ্ বিধান মেনে যে কোন পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করা যায়। নাগরিকের এ বৈধ সম্পদ ভোগ ও সঞ্চয় কোন ব্যক্তি, সংঘ, সংগঠন অথবা অন্য কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করলে অথবা হরণের চেষ্টা করলে তা রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা অবৈধভাবে একে অন্যের সম্পদ ভোগ করো না।"[২৩]

৭. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে, তবে রাষ্ট্র বা অন্য কোন নাগরিকের কাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন স্বাধীনতা ইসলাম বৈধ মনে করে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা একটি ব্যাপক বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে বুঝায়, নাগরিকদের স্বাধীন ও অবাধ চলাফেরা, শত্রুর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা, সম্পদ সংরক্ষণ, অকারণে অত্যাচারী না হওয়ার অধিকার ভোগ করা। ইসলামী রাষ্ট্রেও উপরিউক্ত অর্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় স্বীকৃত। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা হানি হয় কিনা সেদিকে বিশেষভাবে ইসলামী রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কোনভাবে একজনের অপরাধ অন্যের উপর চাপানো যাবে না। বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে কাউকে যেন শাস্তি না

---

২২. ৪৯ : সূরা আল হুজুরাত : ১১-১২।

২৩. ২ : সূরা আল বাকারা : ১৮৮।

দেয়া হয় সেদিকে রাষ্ট্রকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। কেননা কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে : "একজনের বোঝা অপরজন কখনো বহন করবে না।"[২৪]

৮. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার : ইসলামের সাম্যনীতির অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে আইন। ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নজীরবিহীন সাম্যনীতি অনুসৃত হয়। কোন নাগরিক যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা আমরা এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান তার ন্যায্য অধিকার খর্ব করছে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বা তার উপর জুলুম করছে, তবে সে-এর প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। আদালত নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার প্রতিকার করতে বাধ্য। অভিযোগ যার বিরুদ্ধেই হোক না কেন আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ : "তোমরা বিচারে বসে যখন কথা বল, তখন ন্যায় কথাই বলবে; যদি বিচারাধীন ব্যক্তি তোমাদের নিকট আত্মীয়ও হয়।"[২৫]

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সম্পর্কিত বহু ঘটনা মহাবনী (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী যুগের অনেক মুসলমান শাসকের জীবনে দেখা যায়। ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার উপরই শ্রেণী বৈষম্যহীন ইসলামী সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

৯. বাক স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Speech) : বাক স্বাধীনতার অধিকারটি পৃথিবীর কোথাও নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ নয়। কারো কথা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম অথবা অন্য ব্যক্তির ন্যায্য অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার বাক স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে সত্য ও ন্যায্য কথা বলা নাগরিকের শুধু অধিকার নয় কর্তব্যও বটে। মহানবী (সা) এ মর্মে বাণী প্রদান করেছেন : "যে সত্য ও ন্যায্য কথা বলে না সে বোবা শয়তান।" সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি তার ন্যায্য কথা, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করে।

১০. সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার : কোন সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। পবিত্র কুরআনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাকিদ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে :

---

২৪. ৩৫ : সূরা আল ফাতির : ১৮।

২৫. ৬ : সূরা আল আন'আম : ১৫২।

"তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[২৬]

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ পরস্পর ঐক্যবদ্ধভাবে সত্য ও দীন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করবে এটা মহান আল্লাহর ইচ্ছা। কাজেই আল্লাহর এ ইচ্ছাকে ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

১১। চলাফেরার অধিকার : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অধিকার ক্ষুণ্ন না করে ইসলামী রাষ্ট্রের যে কোন মুসলিম নাগরিক দেশের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে পারবে। এ চলাচলের অধিকার একটি অন্যতম সামাজিক অধিকার, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে সমাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। শুধু তাই নয় শরীয়াহ এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "লোকেরা কি যমীনে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে না? এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি স্বচক্ষে দেখবে না?[২৭] তাছাড়া ব্যবসায়িক কাজে বিদেশ ভ্রমণের কথাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের চলাফেরার অধিকার স্বীকৃত। তার এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর কর্তব্য।

১২. মত প্রকাশের অধিকার : মত প্রকাশের অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার মুসলিম নাগরিকের অন্যতম অধিকার। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তার খিলাফত আমলে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিল। বর্তমানকালের নৈরাজ্যবাদী দলসমূহের সাথে তাদের অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা)-এর খিলাফতকালে তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করত এবং অস্ত্রবলে এর অস্তিত্ব বিলোপের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) এ অবস্থায় তাদেরকে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান :

"তোমরা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পার। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এ চুক্তি রইল যে, তোমরা রক্তপাত করবে না, ডাকাতি করবে না এবং কারোও উপর যুলুম করবে না।"[২৮]

অপর এক জায়গায় তিনি তাদের বলেন– "তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের আক্রমণ করব না।"[২৯]

---

২৬. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ১০৩।

২৭. ১২ : সূরা ইউসুফ : ১০৯।

২৮. নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড।

২৯. নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন দলের মতবাদ যাই হোক না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মতামত যেভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু তারা যদি নিজেদের মতামত শক্তি প্রয়োগ করে বাস্তবায়িত করতে চায় এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ করার চেষ্টা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৩. ভোটদানের অধিকার (Rigat to Vote) : যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রকৃতির সেহেতু দেশের শাসক নির্বাচনে জনগণ ভোটদানের অধিকার ভোগ করে থাকে। মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচনের সময় মুসলিম নাগরিকগণ তাদের সমর্থন ব্যক্ত করার মাধ্যমে ভোট দানের অধিকার প্রয়োগ করেছিল। খিলাফতের ভিত্তি রচিত হয়েছিল নাগরিকদের ভোটাধিকার সমর্থন তথা অসমর্থনের ইচ্ছা ব্যক্ত করার মাধ্যমে। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটদানের অধিকার রাখে।

১৪. নেতৃত্ব দানের অধিকার : ভোটের মাধ্যমে বা অন্য যে কোন উপায়ে জনমতের সমর্থনে নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। এখানে নেতৃত্ব প্রার্থনা করার রেওয়াজ না থাকলেও যে কোন নাগরিক তার গুণাবলি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে জনগণের সমর্থন লাভ করে তাদের নেতৃত্ব দানের অধিকার রাখে। এ জন্য মহানবী (সা) একজন ক্রীতদাসের নেতৃত্বও মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্ণ, গোত্র, আভিজাত্য ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া হয় না বলে ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার সর্বজনীন।

১৫. রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার (Right to Form Political Party) : দেশ ও জনগণের কল্যাণে নাগরিকগণ রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়, ন্যায্য সমালোচনা এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে দল গঠন করতে পারে। তবে যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ইসলাম অনুমোদিত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রচিত হতে হবে। মানুষের মনগড়া রাজনৈতিক মতবাদ ইসলামী রাষ্ট্রে অচল। মনে রাখতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা; যেখানে আল্লাহর দীন ও রাসূলের সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ আল্লাহর বিধান ও মহানবী (সা)-এর নির্দেশিত পদ্ধতির মধ্যে নিহিত।

১৬. অভাবমুক্ত হওয়ার অধিকার : অভাবী এবং বঞ্চিত ব্যক্তিদের তাদের জীবন

ধারণের অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র বা ধনী ব্যক্তিরা তার এ অধিকার পূরণ করবে। যেমন আল্লাহর বাণী "এবং তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[৩০]

১০.৬ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য (Duty of Citizens towards Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক শুধু অধিকারই ভোগ করে না। তাকে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের নিয়েই গঠিত হয়। অতএব নাগরিকদের অধিকারের সাথে কর্তব্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্বগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হল।

১. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা (Allegiance to the State) : নাগরিক হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। যে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয় সে নাগরিক হতে পারে না। নাগরিকগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করেন। নেতা জনসমর্থনের ভিত্তিতে ক্ষমতারোহণ করেন। তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মতো শাসন পরিচালনা করলে নাগরিকগণ তার প্রতি অনুগত থেকে রাষ্ট্র-সমাজ পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করবে। পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

"তোমরা আল্লাহ, রাসূল এবং তোমাদের নেতার (রাষ্ট্রপ্রধানের) অনুগত হও।"[৩১]

২. আইন মান্য করা (Obedience to law) : নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা। ইসলামী রাষ্ট্রের আইন হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার নির্দেশ। এ নির্দেশ অমান্য করা পক্ষান্তরে ইসলামকে অমান্য করার শামিল। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের পূর্বশর্ত হচ্ছে আইন মেনে চলা। মহানবী (সা) এ মর্মে বলেন,

"সুখে-দুঃখে ও আনন্দে-নিরানন্দে রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুম আহকাম শ্রবণ করা ও মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।"

যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের আইন শরীয়া পরিপন্থী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নাগরিক আইন মেনে চলতে বাধ্য। ইসলাম বিরোধী হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত।

---

৩০. ৫১ : সূরা আয-যারিয়াত : ১৯।

৩১. ৪ : সূরা আন নিসা : ৫৯।

কেননা ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে : "কোন ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর নাফরমানীর আওতায় পড়ে এমন কোন অন্যায় কাজে অন্যের আনুগত্য স্বীকার করা বৈধ নয়।"

৩. রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত না হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত না হওয়া। প্রতিটি নাগরিক যে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তার সুখ ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়াসী হয় এবং যে নাগরিক রাষ্ট্রে বসবাস করে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হয় সে সুনাগরিক নয় বরং রাষ্ট্রদ্রোহী। রাষ্ট্রদ্রোহিতা জঘন্য অপরাধ। কেননা এ কাজ সমাজ জীবনকে অস্থিতিশীল ও জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। পবিত্র কুরআনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। "শান্তি স্থাপনের পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"[৩২] রাষ্ট্রদ্রোহিতা ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপাপ। এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন : "আল্লাহর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।"[৩৩]

৪. সৎকাজে সহযোগী ও অসৎকাজে বাধাদান করা : মুসলমান হিসেবে সৎ ও কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করা এবং অসৎ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয়া প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র তথা সরকার কর্তৃক গ্রহীত শুভ উদ্যোগে সহযোগিতা করা, অসৎ অশুভ কাজে বাধা দান করা।

---

৩২. ৭ : সূরা আল আরাফ : ৫৬।

৩৩. ২৮ : সূরা আল কাসাস : ৭৭।

প্রশ্নাবলী

১. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা করো।
(Discuss the Rights and Duties of citizens of Islamic State.)

২. ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করো।
(Discuss the Rights of Muslim citizens in a Islamic State.)

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করো।
(Discuss the duties of citizens towards Islamic State.)

৪. আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধরনের যে অধিকারগুলো ভোগ করে তার বর্ণনা দাও।

(Discuss the different types of rights enjoyed by a citizen in a Modern Islamic State.)

৫. নাগরিকের কর্তব্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকের বিভিন্ন কর্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করো।
(Discuss the concept of duties of the citizen and different kinds of duties of the citizen in a Islamic State.)

১১

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

The Status, Rights and Duties of Woman in Islamic Society and State

'হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্য জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহকে) বেশি ভয় করে। অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সবকিছুর (পুঙ্খানুপুঙ্খ) খবর রাখেন।' (৪৯ : সূরা আল হুজুরাত : ১৩)

'...Individuals die of physical sickness, but societies die of loss of identity, that is, a disturbance in the guiding system of representatives of oneself as fitting into a universe that is specifically ordered so as to make life meaningful. -Fatima Mernishi (Beyond the veil, 1987)

'আমি নর-নারী নির্বিশেষে তোমাদের কোন কাজ কখনো বিনষ্ট করবো না, (আমি সবার কাজের বিনিময় দেবো) এবং তোমরা তো একে অপরেরই অংশ।[১] (৩ : সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

১১.১ ভূমিকা (Introduction)

ইসলাম মহান রাব্বুল আলামীনের মনোনীত একমাত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে নারী-পুরুষ সকলের অধিকারসমূহ সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। কুরআন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল আঁধার বা উৎস। ইসলামী সমাজ-রাষ্ট্র ও আইন শাস্ত্রের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে কুরআন মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে, আর নির্ধারণ করে দিয়েছে নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও ভূমিকাকেও।

---

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, John L. Esposito, Women in Muslim law, Syracuse : Syracuse University Press, 1982.

এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম পূর্ব ঐতিহ্য এবং সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বদেশীয় আচার প্রথার কোন প্রভাব মুসলিম বিশ্বের নারীদের উপর ছিল না। এমনকি তা বিভিন্ন মুসলিম দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণে বা নারীদের অবস্থা, ভূমিকা ও অধিকারের উপর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের প্রভাবকে অস্বীকার করে না। এ থেকে যে বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো বিভিন্ন মুসলিম দেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কুরআনের আদেশ, নির্দেশ এবং ইসলামী আইন ও বিধিবিধান এসব দেশে বহাল রয়েছে। এগুলো মুসলিম বিশ্বের নারীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রভাব রেখে চলেছে।

মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে ইসলাম যতটুকু করেছে অতটুকু অপর কোন ধর্ম কোনদিন করতে পারে নি। মানুষের সর্বাঙ্গীন শান্তি বিধানে ইসলামের চোখে মানুষ আল্লাহর খলীফা বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি, কাজেই কর্মে-ধর্মে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সে আল্লাহরই অনুসারী। আল্লাহ এ মানুষ বলতে শুধু পুরুষ বুঝাননি। নর-নারী এ দু'য়ের সমন্বয়েই মানব গোষ্ঠী। নারী কাজে ও চিন্তায় পুরুষের সঙ্গিনী। পুরুষের আনন্দক্ষণে খুশির বার্তাটুকু জানানোর জন্য আর তার দুঃখের মুহূর্তে তার বেদনার সহানুভূতি জানানোর জন্য-ই নারী। ইসলাম নারীর এ স্বকীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নর-নারী উভয়ই সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসের নির্মাতা। ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নারীকে দেয়া হয়েছে অত্যন্ত সম্মানের স্থান। তাকে সব প্রয়োজনীয় অধিকারও দেয়া হয়েছে। নারীর মর্যাদা ইসলামে পুরুষের সমান। অবশ্য অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক অধিকার দেয়া হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে পুরুষকে নারী অপেক্ষা বেশি অধিকার দেয়া হয়েছে। সামগ্রিক তুলনায় পুরুষ ও নারীর অধিকার প্রায় সমান বলা যায়।

১১.২ ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা (Dignity of Women in Islam)

১। কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা (Status of women as a daughter) : প্রাক-ইসলামী যুগে কন্যা সন্তানদেরকে কোন মর্যাদা দেয়া হত না, সেখানে কন্যা অকথ্যভাবে ঘৃণা করা হত। তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হত। কন্যা সন্তানের মুখ দেখতেও রাজি হত না স্বয়ং কন্যার পিতা। ইসলাম এ ধরনের অপকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা সন্তানকে ছেলের মতোই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। আর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হলে

কিয়ামতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, ইসলাম তা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? এ কারণে নবী করিম (সা) বলেছেন, "যে লোকের কোন কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার উপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ পাক বেহেশত দান করেন"[২] পিতা জীবিত থাকাকালীন সময় পর্যন্ত যদি কোন কন্যা সন্তানের বিয়ে না হয় তাহলেও পিতাকেই তার লালন-পালনের সকল দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। এমনকি পিতা জীবিত থাকাকালীন সময় কোন কন্যা সন্তান স্বামীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করলে তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। এটা পিতার কর্তব্য। উপরন্তু ছেলে বড় হলে পিতা তাকে কামাই-রোজগার করতে বাধ্য করতে পারে; কিন্তু কন্যা সন্তানকে তা পারে না।

২। স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা (Status of woman as a wife) : প্রাক-ইসলামী আরবে স্ত্রী হিসেবেও নারী চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করত। তাদেরকে স্বামীর ঘরে যথাযোগ্য মর্যাদা বা অধিকার দেয়া হতো না। তাদেরকে হীন, নগণ্য, দয়ার প্রার্থী মনে করা হতো। নিতান্ত দাসী-বাদীর মতো ব্যবহার করা হতো তাদের সাথে। ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে।

প্রথমত ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, তারা নারী বলে মৌল অধিকারের দিক দিয়ে পুরুষের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ সমান। মৌল অধিকারের দিক দিয়ে কম নয়, কেউ বেশি নয়।

দ্বিতীয়ত নবী করিম (সা) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন, "তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর নামে এবং এভাবেই তাদের হালাল মনে করে তোমরা তাদের উপভোগ করছো।" এ পর্যায়ে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "জাহেলিয়াতের যুগে আমরা স্ত্রীদেরকে কিছুই মনে করতাম না-কোনই গুরুত্ব দিতাম না। পরে যখন আল্লাহ পাক নারীদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট অকাট্য বিধান নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে

২. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব।

দিলেন, তখন আমাদের মনোভাব ও আচরণের আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো।" দশম হিজরী সালে হজ্জের সময় আরাফাতে হাজীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বিদায়ী ভাষণে মহানবী (সা) বলেন, 'হে জনগণ! তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের কতগুলো অধিকার আছে এবং তাদের ওপরেও তোমাদের কতগুলো অধিকার আছে। তাদের সাথে ভালো আচরণ করো, তাদের প্রতি দয়াশীল হও, কারণ তারা তোমাদের অংশীদার ও নিষ্ঠাবান সাহায্যকারী।' মহানবী (সা) আরো বলেন 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম (আচরণকারী)'।[৩]

৩। মা হিসেবে নারীর মর্যাদা (Status of woman as a mother) : ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে দুনিয়ার অপর কোন সম্মানের সাথেই তার তুলনা হতে পারে না। নবী করিম (সা) ঘোষণা করেছেন,

"বেহেশ্‌ত মায়ের পায়ের তলে অবস্থিত।"[৪] অর্থাৎ মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে, তার উপযুক্ত খিদমত করলে এবং তার হক আদায় করলে সন্তান বেহেশ্‌ত লাভ করতে পারে। অন্য কথায় সন্তানদের বেহেশ্‌ত লাভ মায়ের খেদমতের উপর নির্ভরশীল। মায়ের খেদমত না করলে কিংবা মার প্রতি কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করলে, মাকে কষ্ট ও দুঃখ দিলে সন্তান যত ইবাদত বন্দেগি আর নেক কাজই করুক না কেন, তার পক্ষে বেহেশ্‌ত লাভ করা সম্ভবপর হবে না। মাকে পিতার চাইতে তিনগুণ বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে অন্য একটি হাদীসে। এ হাদীসে বলা হয়েছে, একজন সাহাবী মহানবী (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুনিয়ায় আমার সদ্ব্যবহার ও সম্মান পাওয়ার কে বেশি হকদার। মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, তোমার মাতা, সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন তারপর কে? জবাব হল তোমার মাতা, তারপর কে? তোমার মাতা। সাহাবী চতুর্থবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? মহানবী (সা) বললেন, তোমার পিতা।[৫] ড. জাকির নায়েক এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ৭৫% সম্মান মায়ের জন্য এবং পিতার জন্য ২৫% সম্মান। চারভাগের তিনভাগ সম্মান ও মর্যাদা বা এর উত্তমাংশ মায়ের জন্য, বাকী চারভাগের একভাগ সম্মান এবং মর্যাদা পিতার জন্য। সংক্ষেপে স্বর্ণের মেডেল মায়ের জন্য রৌপ্যের

---

৩. আত তিরমিযী।

৪. আন নাসাঈ।

৫. সহীহ বুখারী, ৮ম খণ্ড, অধ্যায়-২, হাদীস নং-২।

মেডেল পিতার জন্য আবার ব্রোঞ্জের মেডেল মাতার জন্য হলে পিতার জন্য শুধু সান্তনা পুরস্কার।[৬]

৪। মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা (Status of women as a man) : ইসলাম নারীদেরকে মানুষ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কুরআন পাকের ঘোষণায় বলা হয়েছে, পুরুষ যেমন কাজ করবে, ঠিক তেমনি ফল পাবে এবং নারী যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে।[৭] "তাদের প্রভু তাদের প্রার্থনার উত্তরে বলেন, আমি তোমাদের কোন আমল নষ্ট করব না, সে আমলকারী পুরুষ হোক নারী, তোমরা একে অন্যের অংশ।"[৮] "আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি।"[৯] এ সম্মানে নারী-পুরুষ সমান অংশীদার। নারী-পুরুষে বা মানুষে-মানুষে সম্মানের পার্থক্যের কল্যাণ একমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহকে মেনে চলা। যদি নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী হয় তবে সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। পুরুষ বলেই কেউ নারী থেকে অধিক সম্মানিত হয় না। আল্লাহর ঘোষণা 'হে মানব জাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।[১০]

৫। বুদ্ধিবৃত্তিতে নারীর মর্যাদা (Status of woman in intellectual arena) : ইসলাম নারী জাতির জন্য শিক্ষার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেন, জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য।[১১] নবীজীর এ হাদীসের প্রতি সাড়া দিয়ে জ্ঞানাহরণ ও বিদ্যার্জনে আত্মোৎসর্গ করার ন্যায্য স্বাধীনতা রয়েছে প্রত্যেক নারীর। পর্দার মধ্যে থেকে ইচ্ছা করলে যে কোন নারী উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে।

৬। নারীর সামাজিক মর্যাদা (Social status of woman in Islam) : ইসলামী শরীয়াহ নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান সামাজিক মর্যাদা এবং অধিকার

---

৬. ড. জাকির আবদুল করিম নায়েক, ইসলামে নারীর অধিকার, আধুনিক নাকি সেকেলে, পিস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৩৪-৩৫।

৭. ৪ : সূরা আন নিসা : ৩২।

৮. ৩ : সূরা আলে ইমরান : ১৯৫।

৯. ১৭ : সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০।

১০. ৪৯ : সূরা আল হুজুরাত : ১৩ নং আয়াত।

১১. ইবনে মাজাহ।

দিয়েছে। কোন নারী যদি আশ্রয়হীন বা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে তাহলে সে তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজন পূরণ এবং স্বীয় সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে যে কোন হালাল উপায়ে কামাই-রোজগার করতে পারে। এজন্য সবরকম বিধিসম্মত উপায়ও সে অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু তার এ দায়িত্ব খতম হয়ে যায় তখন যখন তার এ দায়িত্ব পালনের জন্য কোন পুরুষ স্বামী হিসেবে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। নারী ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সম্পদ-সম্পত্তি থাকলে সেসবের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তদারকির জন্য বাইরে যেতে পারে।

৭। নারীর আইনগত মর্যাদা (Legal status of woman in Islam) : ইসলাম নারীকে তার পিতা-মাতা, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের অধিকার দিয়েছে। নারী তার স্বামীর নিকট হতে নির্ধারিত ও সম্মানসূচক অতিরিক্ত আর্থিক নিশ্চয়তাস্বরূপ মোহরানার অধিকারী। নারী বিয়ের পূর্বে অভিভাবক ও বিয়ের পরে স্বামীর নিকট হতে নিশ্চিতভাবে ভরণ-পোষণের অধিকারী। নারী ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থে, নিজ পরিশ্রমের অর্থে ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পদে তার আইনগত মালিকানা স্বীকৃত। তালাকের ব্যাপারে স্বামীর যতটুকু অধিকার রয়েছে স্ত্রীরও ঠিক ততটুকু অধিকার রয়েছে। স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে সব সময়ই বৈবাহিক অধিকার দাবি করতে পারে। যদি স্বামীর একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে তবে সব স্ত্রী সমানাধিকার দাবি করতে পারে। কখনও বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে নারী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আইনগত মর্যাদা রাখে।

৮। নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা (Spiritual status of woman in Islam) : ইসলাম পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমানভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি-উৎকর্ষ সাধনের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করা যেমন পুরুষের কর্তব্য, তেমনি নারীরও এ বিধি-বিধান মেনে চলে ফল লাভের অধিকার সমান। আধ্যাত্মিক মর্যাদার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নি। মহানবী (সা) বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা কি জান না নারীরা পুরুষের চেয়ে অধিকতর পুরস্কৃত হওয়ার অধিকারী কারণ নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সে পুরুষদের জন্য বেহেশত নসীব করবেন, যাদের স্ত্রীরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও তাদের জন্য দোয়া করে।

উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, নারী জীবনের আবাহন, পুলকের সংগীত, পবিত্র স্নেহ-মমতার প্রতীক, বিশ্ব নিখিলের প্রাণ স্পন্দন। বিশ্বের বড় বড় ব্যক্তি যারা তারা সবাই নারীর গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করেছে, নারী কর্তৃক প্রসবিত এবং

নারীর ক্রোড়েই লালিত-পালিত হয়েছে। মানব জাতির মর্যাদা নারী বাড়িয়েছে গোটা মানবতাই নারীর কাছে ঋণী। কেউ অস্বীকার করতে পারে না, পারেনি, পারবেও না কোনদিন। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ মূল্যমান নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পবিত্রতা, প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি শব্দ তারই জন্য হয়েছে রচিত। নারীদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা মুসলমানদের অন্যতম জাতীয় দায়িত্ব।

১১.৩ বিভিন্ন সভ্যতায় ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা (Status/Positions of Woman in Other Civilization and Religion)

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রদানে বিশ্বের প্রাচীন ও বর্তমান সভ্যতা এবং ধর্মের চেয়ে ইসলাম যে কত অগ্রগামী ছিল তা অনুধাবন করার জন্যই বিভিন্ন প্রাচীন ও বর্তমান সভ্যতা এবং ধর্মে নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন।

১১.৩.১ প্রাচীন চীন সভ্যতায় নারীর মর্যাদা

Status of woman in Ancient China Civilization

নারীদের প্রতি প্রাচীন চীনাদের আচরণের উদ্বৃতি পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে হুমায়ুন নামক কবির লেখায়, 'নারী হওয়া বড় দুঃখের, পৃথিবীতে কোন কিছুই নারীর মতো এত সস্তা নয়।'

কুনফুসিয়াস বলেন, 'নারীর মূল কাজ আনুগত্য, শৈশব কৈশোরে পিতাকে, বিয়ের পর স্বামীর এবং বিধবা হওয়ার পর পুত্রের।' তিনি আরও বলেন যে, এ আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র। একটি চীনা প্রবাদে আছে : "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, তবে বিশ্বাস করো না।"

১১.৩.২ বৌদ্ধ ধর্মে নারীর মর্যাদা

Status of Woman in Buddaism

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে নিচ এবং পাপে পূর্ণ হিসেবেই দেখানো হয়েছে, বলা হয়েছে, 'নারীর মতো ভয়াবহ আর কিছুই নেই'। মোটকথা বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান আরো নিচু। এ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হয়। মহান বুদ্ধের বাণী, "নারী মোহের বাস্তবস্বরূপ মানবতার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন।"

১১.৩.৩ হিন্দু ধর্মে নারীর মর্যাদা

Status of Woman in Hinduism

হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বেদ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়া অথবা

কোন ধর্মীয় কার্মকাণ্ডে নারীর কোন ভূমিকা ছিল না। বিধবা হবার পর পুনর্বিবাহ বা সম্পত্তির অধিকার তো দূরের কথা, স্বামীর সাথে এক চিতায় সহমরণই ছিল তার একমাত্র পরিণতি। হিন্দু ধর্ম ও সমাজে কোনকালেই নারী তার যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার পায়নি। হিন্দু পুরাণে উল্লেখ আছে, "মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প, অগ্নি ও ঝড় বন্যা এর কোনটিই নারী অপেক্ষা অধিক খারাপ ও মারাত্মক নয়।" ডঃ আহমদ সালাবি লিখেছেন, ভারতে কিছুদিন পূর্বেও হিন্দুরা নারীকে মৃত্যু, পোকামকড়, সাপ এমনকি নরকের চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে করত। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে যেত। অতীতে হিন্দু নারীকে মৃত স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিতে হতো। (In India, the Hindus until recently considered their women worse than death, pists, serpents or even hell. A wife's life ended with the death of her husband. In the past, the widow had to jump into the flames of her husband's funeral pyre.)[১২] হিন্দু সমাজে যুবতী নারীকে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কিংবা বৃষ্টি, ধনসম্পত্তি লাভের জন্য বলিদান করা হত। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ কিংবা সহমরণের ন্যায় জঘন্য রীতি প্রচলিত ছিল। এখনো হিন্দু সমাজে নারীরা পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত। প্রাচীন হিন্দু মনীষীরা এ মত পোষণ করত যে, মানুষ যাবতীয় সাংসারিক জাগতিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব নয়। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে, পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হবার কোন অধিকার নেই। এই তিনজন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোন একজন পুরুষ নিকটাত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। সারা জীবন তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় কাটাতে হয়। এমনকি এক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। তাকে স্বামীর একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। সতেরশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সতিদাহ প্রথা চালু থাকে। এরপর থেকে এই প্রথা বিলোপের প্রচেষ্টা থাকলেও ধর্মীয় নেতাদের তা মনোপুত ছিল না। কৃষি ও ক্ষেতে ভালো ফলন প্রাপ্তির আশায় নারীকে বলি দেয়া হত।

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে একটি বড় গাছের গোড়ায় প্রতিবছর একজন করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালু রয়েছে।

১২. Dr Ahmad Shalaby, Islam : Belief, legislation and Morals, cairo, 1970, P. 308.

১১.৩.৪ গ্রীক সভ্যতায় নারীর মর্যাদা
Status of Woman in Greek Civilization

গ্রীক সভ্যতায় নারী ছিল পিতা, ভাই বা অন্য পুরুষ আত্মীয়ের অধীন, কেননা তাদেরকে Minor মনে করা হত। বিয়ের সময় তাদের মতামতের কোন প্রয়োজন হত না এবং পিতার কাছ থেকে সে যেত তার স্বামী নামক প্রভুর ঘরে। প্রাচীন গ্রীসের নারীরা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারতো না। সমাজে তারা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে সমাজের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হত। আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মতো। বাজারে নারী বেচাকেনা হতো। এ প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা লিখেছেন, গ্রীকরা নারীকে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য বলে মনে করত। (The Greeks considered their women a commodity to be bought and sold)[১৩] যেসব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন উঠত, সেক্ষেত্রে নারীর কোনই অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। গ্রীক নারীকে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল। সারা জীবন তারা পুরুষের দাসী-বাদীর ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হত। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে পুরুষদের এখতিয়ারাধিন ছিল। পুরুষ অভিভাবকরা নারীদের জন্য যে স্বামী ঠিক করতো সে স্বামীই তাকে বরণ করে নিতে হত। পুরুষরাই নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতো। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারতো না। গ্রীক সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের একচেটিয়া। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক পাওয়ার অধিকারও নারীকে দেয়া হত না। বরং এ অধিকার অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হতো। যেমন কোন নারী যখন তালাক পাওয়ার জন্য আদালতে রওয়ানা হত, তখন স্বামী পথিমধ্যে ওতপেতে থাকতো এবং তাকে পাওয়া মাত্র পাকড়াও করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

বিকাশের এক পর্যায়ে গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করলো, তখন নারীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো। তারা পুরুষদের সাথে সর্বত্র প্রকাশ্যে অবাধ মেলামেশা শুরু করে। ফলে নির্লজ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, ব্যভিচার আর দূষণীয় রইল না। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠে নৃত্য-গীত-সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। এ পর্যায়ে শিল্প ও সাহিত্যের মাঝে নর-নারীর উলঙ্গ

---

১৩. Encyclopaedia Britannica, Vol. 19, 1977 Edition, P. 909.

মূর্তি স্থাপিত হতে থাকে। নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক স্বীকৃতি পেয়ে বসলো। তাদের দেবী আফ্রোদিইতি এক দেবতার স্ত্রী হয়েও তিনজন দেবতার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি একজন সাধারণ মানুষকেও সে নিজের উপপতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার ঔরস থেকে 'কিওপিড' নামক যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক জাতির প্রেমের দেবতা। এতেও তাদের তৃপ্তি আসেনি। অবশেষে তারা পুরুষে পুরুষে, নারী-নারীত্বেসও অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এ পর্যায়ে এসেই প্রাচীন গ্রীস সভ্যতার পতন ঘটে।

১১.৩.৫ রোমান সভ্যতায় নারীর মর্যাদা
Status of Woman in Roman Civilization

রোমান সভ্যতায় নারী যে পৃথকভাবে কিছু করতে সক্ষম তাই বিশ্বাস করা হত না। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ভাষ্য মতে, রোমান সভ্যতায় নারীকে দাসী হিসেবে গণ্য করা হতো (a women was regarded as a slave)[১৪] কোন মহিলা বিয়ে করলে স্বাভাবিকভাবেই তর সম্পদের মালিক হত তার স্বামী। সেই সম্পত্তি আর সে ফেরত নিতে বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করতে পারত না। মহিলারা কোন উইল বা চুক্তি করতে পারত না; এমনকি নিজের সম্পদের ব্যাপারেও না।

রোমান আইনে নাগরিক অধিকার লাভের পথে তিনটি বিষয়কে অন্তরায় বিবেচনা করা হয়। এই তিনটি বিষয় হলো- অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, বুদ্ধির অপরিপক্কতা ও নারী হওয়া। প্রাচীন রোমান আইনবিদগণ নারীদেরকে নাগরিক অধিকার না দেয়ার প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করতেন তাদের বুদ্ধির স্বল্পতাকে। জাস্টিনিয়ানের জারীকৃত আইনে এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করার চেষ্টা করা হয় মাত্র। এ আইনে বলা হয় যে, চুক্তি সম্পাদনের জন্য দু'রকম যোগ্যতা প্রয়োজন : আইনগত যোগ্যতা ও বাস্তব যোগ্যতা।

আইনগত যোগ্যতার অভাব হেতু তিন শ্রেণীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের তথা স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে চিহ্নিত করা হয়। এরা হচ্ছে : ১. দাস-দাসী ২. বিদেশী ৩. পরিবার প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বাধীন স্ত্রী ও মেয়েরা। আর বাস্তব যোগ্যতার অভাবহেতু যে চার শ্রেণীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচিত হয়, তারা হচ্ছে : ১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা বালক-বালিকা, ২. বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও ঋণগ্রস্ত, ৩. ঋণগ্রস্ত প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা ও

---

১৪. Encyclopaedia Britannica, Vol. 19, 1977 Edition, P. 909.

স্ত্রীগণ, ৪. অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঋণগ্রস্ত ও অভিভাবকের আশ্রিত স্বাধীন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীগণ।

অবশ্য রোমান সাম্রাজ্যবাদী যুগের শেষের দিকে নারীদের জন্য অভিভাবক থাকার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় উপরোক্ত চতুর্থ অবস্থাটি আর টিকে থাকেনি। তথাপি এসব প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন নারীগণ ঋণগ্রস্ত থাকলে পুরোপুরিভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হতো না।[১৫]

১১.৩.৬ ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় নারীর মর্যাদা
Status of Woman in Babylonian Civilization

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় নারী ছিলো নিগৃহীত। তারা ছিল সকল অধিকার বঞ্চিত। একজন পুরুষ কোন মহিলাকে হত্যা করলে সে পুরুষটির শাস্তির পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত।

১১.৩.৭ হিব্রু ও প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য সভ্যতায় নারীর মর্যাদা
Status of Woman in Hebrew and Ancient Middle East

প্রাচীন আরবে হিব্রু ও আরবি রীতি চালু ছিল। প্রাচীনকালে আরবরা যখন শুনতো কন্যা সন্তান হয়েছে তখন রাগে তাদের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করতো। এটা ছিল এমন একটা যুগ যখন কন্যাশিশুদের জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা হতো। ধারণা করা হতো যে কন্যা শিশু পিতার অসম্মানের কারণ হবে। পক্ষান্তরে, পুত্রের জন্ম সংবাদে তারা আনন্দে মাতোয়ারা হতো। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানরা পিতার বিধবা স্ত্রীদের মালিক হতো।

১১.৩.৮ ইহুদী ধর্মে নারীর মর্যাদা
Status of Woman in Judaism

ইহুদী আইন এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে, সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত যে বিয়ে, তাতে স্ত্রী কার্যত স্বামীর লর্ডশীপে (রাজত্বে) প্রবেশ করে। শাইয়ান সম্পাদিত এনসাইক্লোপেডিয়া বাইব্লিকা বলে, 'বিয়েতে মেয়েদের মতামত অপ্রয়োজনীয়...'। একই পুস্তকে বেট্রোথাল (Betrothal) নামক বিয়ের কথা এসেছে যেখানে ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে স্ত্রী লাভ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তালাকের একমাত্র অধিকার স্বামীর। কারণ তার স্ত্রী হচ্ছে তার সম্পত্তি (Property)। মোটকথা, ইহুদী ধর্মে নারী সকল পাপকর্মের হোতা হিসেবে উপেক্ষার পাত্রী হিসেবেই গণ্য। ইহুদী

১৫. ডঃ মারুফ দাওয়ালিবী, রোমান আইনের ইতিহাস বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে।

ধর্মের বাণী, "মেয়েদের গুণের চাইতে পুরুষের দোষও ভালো।" হিন্দু ধর্মের ন্যায় এ ধর্মেও সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার নেই। ইহুদী জাতির কোন কোন গোষ্ঠীর নারীকে দাসীর পর্যায়ে রাখা হতো। তার পিতা তাকে ইচ্ছে করলে বিক্রি করে দিতে পারত। কেবলমাত্র পুত্র সন্তান না থাকলে মেয়ে সন্তান পিতামাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পেত। আর জীবদ্দশায় পিতা কর্তৃক কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তাকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। তাওরাতে আছে, 'আইয়ুবের স্ত্রীদের ন্যায় সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তাদের পিতা তাদের ভাইদের সাথে তাদেরকে উত্তরাধিকারের অংশ দিয়েছে।' অর্থাৎ একাধিক ভাই থাকলে শুধু সে ক্ষেত্রেই বোন উত্তরাধিকার পেত। একজন ভাই থাকলে বোন পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত। এ ক্ষেত্রে বিয়ের সময় বোন একমাত্র ভাইয়ের কাছ থেকে খোরাপোশ ও মোহরানার সমপরিমাণ এককালীন সম্পত্তি লাভ করতো। পিতা যদি ভূ-সম্পত্তি রেখে যেত, তাহলে ভাই তাকে কিছু ভূ-সম্পত্তি দিত। কিন্তু পিতা যদি অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যেত, তাহলে তা যে পরিমাণই হোক না কেন, বোন ভাইয়ের কাছ থেকে সে সম্পত্তির কানাকড়িও পেত না। আর পুত্র সন্তান মোটেই না থাকার কারণে যখন কন্যা পিতার উত্তরাধিকার পেত, তখন তার উপর এ বিধি নিষেধ আরোপিত থাকত যে, সে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কোন গোত্রে বিয়ে করতে ও উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে না।

এ ছাড়া ইহুদীরা নারীকে সচরাচর অভিশপ্ত মনে করে থাকে। কারণ নারীই নাকি আদম (আ) কে বিপথগামী করেছিল। তাওরাতে বলা হয়েছে, 'স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি সৎ, যে স্ত্রীলোকের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এক হাজার জনের মধ্যে এ রকম পুরুষ মাত্র একজন পাওয়া যাবে। কিন্তু হাজার জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও সৎ পাওয়া যাবে না।

১১.৩.৯ খ্রিস্ট ধর্মে নারীর মর্যাদা

Status of Woman in Christianity

প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানরা নারীকে প্ররোচনাদানকারিণী এবং বেহেশত থেকে হযরত আদম (আ)-এর পতনের জন্য বলে মনে করত।[১৬]

বাইবেলের বর্ণনা মতে, হযরত আদম (আ) এর পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (যার ভিত্তিতে অনেকে নারীকে বাঁকা ও ভঙ্গুর

---

১৬. এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০৯।

স্বভাবের বলে থাকে)। বাইবেল আদি পাপের জন্য বিবি হাওয়াকে দায়ী করে। বাইবেলের জেনেসিস ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, মানবতার পতনের জন্য হাওয়া (আ) দায়ী। মূল পাপের বিশ্বাস অনুযায়ী হাওয়া (আ) এর কারণে সকল মানবতা পাপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। বাইবেলের জেনেসিস তৃতীয় অধ্যায় শ্লোক নং ১৬ তে নারীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তুমি গর্ভধারণ করবে, দুঃখের মাঝে জন্ম দেবে, তোমার আশা হবে তোমার স্বামী এবং সে তোমাকে শাসন করবে। অন্য কথায় গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদানকে বাইবেলে নারীদের জন্য অসম্মানজনক এবং প্রসব বেদনাকে এক ধরনের শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেল বলে মহিলাদের মাসিকের সময় তাদের সাতদিন পৃথক রাখতে হবে। এ সাতদিন পর মহিলাকে ধর্মযাজকের কাছে উপস্থিত হয়ে দু'বার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে– একটি অপবিত্রতার জন্য, অপরটি পাপের জন্য, কারণ ঋতুস্রাব একটি পাপ।[১৭]

নারীর প্রতি যীশু কোনো নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন না। শোনা যায় তিনি আদি পাপের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। মেয়েরা এ পাপ বয়ে চলেছে বলে তিনি মনে করতেন না। কিন্তু সেন্টপল যীশুর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন। সেন্টপল বলেন, নারী নীরবতার মধ্যেই জীবন যাপন করবে, তাকে শিক্ষিত করার বা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি নারী প্রসঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিই পুনর্ব্যক্ত করেন যে, হযরত আদম (আ) কে প্রথম সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁর পাঁজরের হাড় থেকেই বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। বিবি হাওয়া সাপের প্ররোচনায় হযরত আদম (আ)-কে আদি পাপ করতে উৎসাহিত করেন। এই আদি পাপের গ্লানি সকল নারীকে বহন করতে হবে। তিনি আরও বলতেন ঈশ্বর নিজের মত করে পুরুষকে বানিয়েছেন আর পুরুষ থেকে নারী। ফলে নারী অবশ্যই পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের। নারীর প্রতি ঘৃণাবশত সেন্টপল চিরকুমার থেকে যান এবং অনুসারীদেরও চিরকুমার থাকতে আদেশ করেন। যদিও যীশুর শিষ্যরা নারীর প্রতি চরম নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন কিন্তু তারা মেরী (আ)-কে বিশেষ সম্মান করতেন কারণ তিনি 'ঈশ্বরের জন্মদাত্রী'। এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায়ও দেখা যায় যেখানে নারীকে দেব-দেবীর জন্মদাত্রী ভাবা হত। নারী মূর্তির পূজা হত অথচ সে সমাজে নারীর কোন মর্যাদা বা অধিকার ছিল না।

---

১৭. কুরআনে এ রকম কিছুর উল্লেখ নেই; বরং কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ্ প্রথমে এক আত্মার সৃষ্টি করেন এবং তা থেকেই উভয়ের সৃষ্টি। কাজেই এ ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনায় নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা এবং সম-অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রাচীনকালের খ্রিস্টান যাজকদের উপর সেন্টপলের চিন্তাধারার প্রভাব সর্বক্ষেত্রে ছিল। নারীর প্রতি সেন্টপল-এর নেতিবাচক ধারণার প্রভাব প্রথম যুগের যাজকদের বিভিন্ন লেখায় দেখা যায় যেমন : Lecki-তে আছে 'নারী হচ্ছে সমস্ত দোযখের দরজা, সকল রোগের জননী। আরও বলা হয় নারী হয়ে জন্ম নেয়ার জন্য তাকে সার্বক্ষণিক অনুশোচনায় থাকা উচিত। সেন্ট গাস্টিনসহ প্রথম প্রায় সকল যুগের ফাদার বিবি হাওয়ার আদি পাপে বিশ্বাস করতেন এবং সব নারীই যে পাপ বয়ে চলছে তা মানতেন। প্রথম যুগের খ্রিস্ট ধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধঃপতন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং এসব অনাচারের জন্য নারীকেই এককভাবে দায়ী করেন। কেননা নারীরা সবসময় অবাধ মেলামেশা, চলাফেরা ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করত। তাই খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকগণ স্থির করলেন যে বিয়ে একটি নোংরা কাজ এবং অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা সম্মানার্হ, তারা ঘোষণা দিলেন যে, নারী হল শয়তানের প্রবেশ দ্বার এবং নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার লজ্জা করা উচিত। কেননা নারীর সৌন্দর্য হল বিপথগামী ও প্রলুব্ধ করার কাছে শয়তানের অস্ত্র।

তারতোলিয়ান নামক যাজক বলেন : "নারী হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশের সিংহদ্বার। নারী হচ্ছে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনকারী এবং পুরুষকে বিস্মৃতকারী।"

মোস্তাম নামক আরেক যাজক বলেন : 'নারী এক অনিবার্য আপদ। এক শোভনীয় আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।'

পঞ্চম শতাব্দীতে 'মাকোন' একাডেমী এ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে যে, নারী এক আত্মাহীন দেহ, নাকি তার আত্মাও আছে। গবেষণা শেষে একাডেমী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসীহের মাতা মরিয়ম ব্যতীত আর কোন নারীই দোযখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারীণি নয়।

পাশ্চাত্য জগৎ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবার পর উপরোক্ত যাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে, নাকি অমানুষ বলে? অবশেষে স্থির করা হয় যে, নারী মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পুরুষের সেবা করা। পাশ্চাত্যবাসী খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে নারীর প্রতি অবজ্ঞা, তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই ধারা অব্যাহত থাকে মধ্যযুগ পর্যন্ত।

মজার বিষয় হলো এই যে, ১৮০৫ সাল পর্যন্তও ব্রিটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ সময় স্ত্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া হয়েছিল ছয় পেনস। ঘটনাক্রমে ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে পাঁচশো পাউণ্ডে বিক্রি করে দেয়। তার উকিল তার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বললো যে, ব্রিটিশ আইন একশো বছর আগে স্বামীকে নিজের স্ত্রী বিক্রি করার অনুমতি দিত। আর ১৮০১ সালের ব্রিটিশ আইনে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তাকে বিক্রি করা হলে তার জন্য মূল্য ছয় পেনস নির্ধারিত ছিল। আদলত জবাবে বলে যে, এ আইন ১৮০৫ সালে বাতিল হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আদালত উক্ত স্বামীকে দশ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

১৯৩০ সালে ইতালীতে স্ত্রী বিক্রির আরেকটি ঘটনা ঘটে। জনৈক ইতালীয় নিজের স্ত্রীকে কিস্তিতে বিক্রি করে। শেষের দিকে কয়েক কিস্তি বাকী থাকতে ক্রেতা দাম পরিশোধ করা বন্ধ করলে বিক্রেতা তাকে হত্যা করে।[১৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতার জীবন যাপন থেকে মুক্তি দানের কথা ঘোষণা করা হলো, তখনও নারীর মর্যাদা পুনর্বহাল হলো না। ফরাসী নাগরিক আইনে নারী অবিবাহিত হলে সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হলো। এই আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নারী-শিশু-পাগল এই তিন শ্রেণীর মানুষ অধিকারহীন ও দায়-দায়িত্বহীন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এরপর নারীর স্বার্থে এই আইন সংশোধিত হয়। কিন্তু এরপরও বিবাহিত নারীর কিছু কিছু তৎপরতার উপর কড়াকড়ি বহাল থাকে।

মোটকথা, খ্রিস্টধর্মে নারী নরকের দ্বার ও মানবের সকল দুঃখ-দুর্দশার হেতু বলে পরিগণিত। নারী সকল অন্যায়ের মূল, তারা পুরুষের মনে লোভ-লালসা উদ্রেককারী। তাদের কারণে ঘর ও সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। আবার আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে নারী তার অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পেলেও প্রতিনিয়ত তারা অবাধ যৌনাচারের যুপকাষ্ঠে বলির শিকার হচ্ছে।

এভাবে পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম ও সমাজে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করলে স্বচ্ছ-ফটিকের ন্যায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে একমাত্র ইসলামই নারীকে তার স্বমর্যাদায় ও স্বমহিমায় সমাসীন করেছে। ইসলাম নারীর নগ্নতাকে কিংবা

---

১৮. মাজানসাতু হাযারাতিল ইসলাম, ২য় বর্ষ, পৃ. ১০৭৮।

ভোগ-বিলাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম নারীকে পুরুষের ন্যায় সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা)-এর অসংখ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত যে নারী ও পুরুষ এক ও অভিন্ন জীবন সত্তা থেকে সৃষ্ট। সৃষ্টিগত দৃষ্টিকোণে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ বা বৈষম্য নেই। আবার ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। যেমন : আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, "নারীরা হলো পুরুষের পোশাক, আর তোমরা পুরুষরা হলে নারীদের পোশাকস্বরূপ"[১৯]। কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সভ্যতা ও ধর্মে নারীকে এরূপ সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয় নি। বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মে নারীর অবস্থান দৃষ্টেই তা প্রতীয়মান হয়।

১১.৪ ইসলামে নারীর অধিকার (Rights of Woman in Islam)

ইসলামের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রের কাছে, সরকারের কাছে নারীর ও পুরুষের সমঅধিকার, সুবিচার লাভের অধিকার, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা তাদের ভূষণ।" (২ : সূরা আল বাকারা : ১৮৭)। এ প্রসঙ্গে জনাব আবদুল লতিফের উক্তি, "The status of woman in Islam is something unique, something noble, something that has no similarly in any other system."

১১.৫ ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights of Woman in Islam)

ইসলাম নারীদেরকে পশ্চিমাদের ১৪০০ বছর পূর্বে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে।[২০] ইসলামী জীবন বিধান মতে, একজন নারী বিয়ের পূর্বে বা পরে যে কোন পরিমাণ সম্পদ অর্জন করতে পারেন। তার সম্পদ তিনি কারো পরামর্শ ছাড়া ইচ্ছেমতো বিক্রয় করতে, ভাড়া দিতে, বিনিয়োগ করতে, কর্জ দিতে বা দান করতে পারেন। ইসলাম তার ব্যক্তিত্ব সবসময়ই হেফাজত করে। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, "মাতা-পিতা এবং আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের

১৯. ২ : সূরা আল বাকারা : ১৮৭।

২০. ১৮৭০ সালে প্রথম ইংল্যাণ্ডে বিবাহিত নারীকে কারো সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে সম্পদ অর্জন ও বন্টন করার আইনগত অধিকার প্রদান করা হয়।

ন্যায় নারীরও অংশ আছে তা অল্পই হোক বা বেশিই এক নির্ধারিত অংশ"। ফলে নারী সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনেও সম্মানজনক মর্যাদার অধিকারী।

মহানবী (সা) এর আগমনের সময় সম্পত্তিতে নারীর তো কোন অধিকার ছিলই না; বরং নারী নিজেই ছিল সম্পত্তির অংশ। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলে সন্তানরা অন্য সম্পত্তির সাথে স্ত্রীদেরও ভাগ করে নিত। আর সে যুগে কুরআন সম্পদে নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকারের ঘোষণা করে। তাদের পাওনা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, যা কারো পক্ষে বদলানো সম্ভব নয়। ইসলামে একজন নারী সকল প্রকার অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত। অতএব জীবিকার্জনে তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানে অর্থনৈতিক সঙ্কট আছে সেখানে তার কাজ করার সুযোগ আছে। এখানেও তাকে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, তিনি তার নিজস্ব সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করবেন। একজন নারী পুরুষের তুলনায় অধিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করেন। কোন রকম অর্থনৈতিক দায়িত্ব নারীর উপর বর্তায় না। এটি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর বর্তায়। এটা পিতা ও ভ্রাতার উপর বিয়ের পূর্বে। বিয়ের পর স্বামী অথবা সন্তানের উপর। বিয়ের পর তার বাসস্থান, খাওয়া, পোশাক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব তার স্বামীর উপর বর্তায়। স্ত্রী যত সম্পদশালীই হোক না কেন, তাঁর থাকা-খাওয়া ও পরনের খরচ স্বামীকেই বহন করতে হবে। তা সত্ত্বেও নারীকে সম্পদ লাভের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্ম অনেক বেশি সুযোগ করে দিয়েছে।

হিন্দু ধর্মে : ভারতে নারীদের স্বাধীনতা একটি অন্যতম বিষয়। মনু বলেন, নারী সমাজ তাদের কর্তার বশ্যতা স্বীকার করে দিন-রাত তাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। এখানে উত্তরাধিকার আইন অনুপস্থিত। এ আইন থেকে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষরা তাদেরকে অধঃগতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পায় না। অন্য উত্তরাধিকারীদের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হলেও যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পায় না।

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। তবে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন দ্বারা শাসিত। ডি. এফ. মোল্লা লিখেছেন, "ভারতের জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব প্রথাসম্মত আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত"।

ইয়াহুদী ধর্মে : ইয়াহুদী ধর্মে নারীকে সকল পাপের কারণ এবং পুরুষের সাথে প্রতারণাকারী বলা হয়েছে। কাজেই নারী উপেক্ষার পাত্রী। ইয়াহুদী ধর্মে পিতা নিজ কন্যাকে বিক্রয় করে দিতে পারতো এবং তার কোন উত্তরাধিকার স্বত্ব স্বীকৃত ছিল না। এ ধর্মে নারীদের জন্য পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই।

খ্রিস্টান ধর্মে : খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনে প্রথমদিকে নারী ছিল অবহেলিত। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। তবে ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের (অপঃ ৯৩ ভূত ১৯২৫) ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে বসবাসকারী খিস্টানদের জন্য উত্তরাধিকার আইন হিসেবে সমভাবে প্রযোজ্য। যুক্তরাজ্যের আইন অনুসারে বহু বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না। মোটকথা খ্রিস্ট ধর্মের উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা প্রত্যেকেই কমবেশি উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে কিন্তু নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ নেই। এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানার মতে, ব্রিটিশ সাধারণ আইনে একজন নারীর যাবতীয় সম্পত্তি তার বিয়ের পর স্বামীর মালিকানায় চলে আসত। স্বামী তার জমি থেকে ভাড়া গ্রহণ বা যে কোন লাভ তোলার সামর্থ্য রাখতেন। পরবর্তীতে ১৮৭০ সালের পর ইংল্যাণ্ডে; তারও পর ইউরোপে এ আইনের সামান্য সংশোধন করা হয় যে স্বামী, স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া এ সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে না। এ সংশোধনীর পর বিবাহিত মহিলারা সম্পত্তি ক্রয় ও চুক্তি করার অধিকার পায়। ফ্রান্সে ১৯৩৮ সালের পূর্বে এ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। অথচ সপ্তম শতকের অন্ধকার যুগে ইসলাম নারীকে এর চাইতে অনেক বেশি অধিকারই দিয়েছিল।

মহানবী (সা)-এর নবুওয়াত পূর্ব সমাজে নারীর সম্পদ লাভ : অধিকার বলতে যা বুঝায় তদানীন্তন আরব সমাজে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। নারীর উত্তরাধিকার, দেনমোহরের অধিকার কিংবা বিবাহ-তালাক কোন কিছুতে মতামত প্রদানের যেমন কোন সুযোগ ছিল না, তদ্রূপ তার কোন অধিকারও স্বীকৃত হত না। কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মারা গেলে ঐ মৃতের অন্য কোন স্ত্রীর ঔরসজাত পুত্র সন্তান থাকলে তখন পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের ন্যায় তার সৎ মায়ের উত্তরাধিকারী হত এবং ইচ্ছা করলে তাকে স্ত্রী হিসেবেও গ্রহণ করতে পারতো।

মহানবী (সা)-এর নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। লোকজন তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাদের অবস্থা কিরূপ হত সে প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট"।[২১]

ইসলামে মীরাসী আইনের গুরুত্ব : ইসলামে মীরাসী আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আইন যেমন দুনিয়ায় অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সুগম করে অপরদিকে আখিরাতের সাফল্য নিশ্চিত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদে রয়েছে এক-চতুর্থাংশের অধিকার, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদে রয়েছে এক-অষ্টমাংশের অধিকার...। এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি"।[২২]

মহানবী (সা) বলেছেন, "তোমরা নিজেরা ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং লোকজনকে তা শিক্ষা দাও। কেননা এটা (ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয়) জ্ঞানের অর্ধেক।"[২৩]

এক মনীষী বলেন, "আধুনিক সভ্য পৃথিবী ধন বণ্টনের যত নিয়ম ও পন্থা আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে ইসলাম ঘোষিত পন্থাই নির্ভুল। এ আইনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যও নিখুঁত।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সম্পদ লাভের ক্ষেত্রসমূহ কুরআন মাজীদের ঘোষিত অধিকার : বর্তমান বিশ্বে নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার বিষয়টি অত্যন্ত আলোচিত মুখরোচক বিষয়। তবে যারা এ বিষয়ে অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের দ্বারাই নারী অধিকার সবচেয়ে বেশি ক্ষুণ্ন হয়েছে ও হচ্ছে বলা হলে তা মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অথচ একমাত্র ইসলামই সম্পদে নারীর

---

২১. ১৬ : সূরা আন নাহল : ৫৮-৫৯।

২২. ৪ : সূরা আন নিসা : ১৩-১৪।

২৩. জামে আত-তিরমিযী।

অধিকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। কুরআন মাজীদের সূরা আন নিসা'র ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ আয়াতে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মাজীদে ঘোষিত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার লাভকারীদের ৬টি অংশ বর্ণিত হয়েছে। এই ছয় প্রকার অংশের জন্য কুরআন মাজীদের মৃতের স্বত্ব লাভকারীদের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪জন এবং নারীর সংখ্যা ৮জন।

৪ জন পুরুষ হলেন– (১) পিতা, (২) দাদা, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৪) স্বামী।

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশপ্রাপ্ত ৮জন নারী হলেন, (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) পুত্রের কন্যা, (৪) মাতা, (৫) সহোদর বোন, (৬) বৈমাত্রেয় বোন, (৭) বৈপিত্রেয় বোন, (৮) দাদী/নানী। তবে এখানে কেবল সম্পদে নারীর অধিকার বিষয়ে আলোচনা সীমিত থাকবে।

মীরাস স্বত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তির অপনোদন : ইসলামী জীবন বিধানে মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার নিকটতম সম্পর্ক যেমন একটি স্থায়ী মূলনীতি তেমনি নারীর তুলনায় পুরুষের দ্বিগুণ সম্পদ প্রাপ্তিও একটি স্থায়ী মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলার বাণী, "এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান"।[২৪] এ বিষয়ে একদল অমুসলিম ও কিছুসংখ্যক তথাকথিত মুসলিম ঘোর আপত্তি জানায় এবং ইসলাম নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে বলে ঘোরতর অভিযোগ উত্থাপন করে।

শুধুমাত্র মীরাস বণ্টনে প্রাপ্ত অংশের ভিত্তিতে এমন মন্তব্য করা অজ্ঞতাপ্রসূত এবং অন্যায়। কারণ নারী শুধু এই এক উৎস থেকে সম্পদ পায় না। আল্লাহ পাক তাকে আরও আয়ের উৎস দিয়েছেন। দিয়েছেন অনেক দায়িত্ব থেকে মুক্তি। পক্ষান্তরে, পুরষের বহুমুখী আর্থিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক সুবিধা/অধিকারগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। **বাগদানে উপহার :** বিয়ের পূর্বে বাগদানে (Engagement) নারী যা উপহার পায় তা সবই তার।

২। **মোহরানা :** দেনমোহর বিবাহিত নারীর মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার। বিবাহের জন্য স্বামী যে অর্থ স্ত্রীকে দান করে তাকে মোহর বলে।[২৫] মোহর এমন

---

২৪. ৪ : সূরা আন নিসা : ১১।

২৫. আলওয়াসীত ১/৮৮৯।

সম্পদ যা বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। এটা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া সম্মাননা। বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে মোহরের আকারে আর্থিক গ্যারান্টি প্রদানে আইনত বাধ্য। এই আর্থিক গ্যারান্টি না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রী তার দাম্পত্য কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে, এই অবস্থায় স্বামীর কিছুই করার নেই। ইসলাম বিবাহকে পবিত্র করণার্থে মোহরানাকে আবশ্যকীয় করেছে। ইসলাম মোহর নির্ধারণে কোন সর্বোচ্চ পরিমাণ বা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক স্ত্রীকে এই সম্পদ পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। সাধারণভাবে দেনমোহরকে দান কিংবা প্রীতি উপহার হিসেবে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেনমোহর কোন দান বা উপহার নয়। দেনমোহর সাধারণত নগদ অর্থে দেয়া হয়। অপরিশোধিত দেনমোহর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায় বা ঋণ। পবিত্র কুরআনে স্ত্রীর দেনমোহর যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে স্বামীকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। স্বামীর সামর্থ্য এবং স্ত্রীর পারিবারিক মর্যাদা এবং সৎগুণাবলীর উপর ভিত্তি করে দেনমোহর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একজন বিবাহিতা নারীর তার স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্তব্য প্রথম ও প্রধান অধিকার হচ্ছে মোহর প্রাপ্তি। আল্লাহ্ পাক সন্তোষ সহকারে (ফরয মনে করে) মোহরানা আদায়ের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন এবং তোমরা যদি তাদের কাউকে প্রচুর পরিমাণে মোহরানা দিয়ে থাক তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে নিও না।[২৬]

দেনমোহরের অর্থ বিত্তহীন দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলাম নারীদের মোহরানায় অধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করেছে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) খেজুরের আটির সমপরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী যদি নারীদের মোহরানা বিয়ের দিন বা বিয়ের পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যে পরিশোধ করা হয় তাহলে সে মোহরানাই হতে পারে নারীর জন্য সুদমুক্ত পুঁজি (Interest Free Capital), যা বিনিয়োগ করে নারী তার পছন্দমত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে।

মোহরানার অর্থ বিনিয়োগ নারীকে ঋণের ঝুঁকি, সুদের অক্টোপাস, বেসরকারী সংস্থার নানা শর্ত থেকে মুক্ত রেখে লাভবান হতে সহায়তা করবে। বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা তিনি পরিবারসহ যে কোন কাঙ্ক্ষিত সামাজিক কাজে ব্যয়

---

২৬. ৪ : সূরা আন নিসা : ২০।

করে প্রশান্তি অনুভব করতে পারেন। বস্তুত মোহরানাই হতে পারে দরিদ্র নারীদের জন্য প্রথম সুদমুক্ত পুঁজি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করার প্রথম আর্থিক উৎস। কোন কারণে তালাক হলে মোহরানার অবশিষ্ট অংশ নারী তাৎক্ষণিকভাবে পাবে।

৩। **বিয়ের পূর্বেকার সম্পদের অধিকার :** নারী বিয়ের পূর্বে কোন সম্পদের মালিক থাকলে সে মালিকানা বিয়ের পরও অব্যাহত থাকবে। তার স্বামী ঐ সম্পদ দাবি করতে পারবেন না।

৪। **নাফাকা :** খরচ, ব্যয়, মহার্ঘ্য ইত্যাদি অর্থে অভিধানে নাফাকা শব্দ ব্যবহৃত হয়।[২৭] স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্য আহার্য পোশাক-পরিচ্ছদ, আবাস, সন্তান লালন-পালন, পরিচর্যা ইত্যাদির নিমিত্তে যে অর্থ ইসলামের বিধান মোতাবেক বর্তায় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'নাফাকা' বলে।[২৮] যে কোন অবস্থায় পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের। পুরুষদের কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়া নারীদের জন্য করুণা নয় বরং ন্যায্য অধিকার। স্ত্রী যদি আর্থিকভাবে স্বামীর চেয়ে ধনীও হন তবুও তার উপর সংসারের কোন খরচের দায়িত্ব নেই। তার এবং সন্তানদের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসা, সাহায্যকারী লোকের খরচ ও বিনোদনসহ সকল খরচের দায়িত্ব স্বামীর।

৫। **সকল সম্পদ ও আয়ের উপর অধিকার ঃ** বিবাহিত জীবনে নারী চাকরী করে বা টাকা বিনিয়োগ করে যা আয় করবে তা সবই তার এবং নিজের ইচ্ছেমত খরচ করতে পারবে। যে কোন নারী বৈধ পন্থায় পুরুষের মতোই ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকারী। তার সম্পদে তার সম্মতি ব্যতীত পিতা , ভাই, স্বামী বা অন্য কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ বিষয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান রয়েছে : 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস ও জ্ঞাতসারে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।[২৯] স্ত্রীর ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি থাকলে তাতে হস্তপেক্ষপ করার কোন অধিকার স্বামীর নেই।

৬। **ইদ্দতকালে ভরণ-পোষণ ঃ** কোন কারণে তালাক হলে ইদ্দতের সময় নারী

২৭. আল মিসাবাহুল মুনীর ১/৬১৮. আর ওয়াসীত ২/৯৪২-৯৪৩।

২৮. আলওয়াসীত ২/৯৪২।

২৯. ২ : সূরা আল বাকারা : ১৮৮; ৪ : সূরা আন নিসা : ২৯।

পুরো ভরণ-পোষণ পাবে এবং পরবর্তীতেও সন্তানদের পুরো খোরপোষের খরচ পেতে থাকবে।

৭। **স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী** ঃ বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়।

মেয়েরা যদিও পিতার সম্পত্তিতে ভাইদের অর্ধেক পায় কিন্তু স্বামীর সম্পত্তির অধিকার, মোহরানা, নাফাকা সব মিলিয়ে অনেক বেশি সে পেয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, ইসলাম প্রদত্ত অধিকার নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পায় না। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম না থাকার কারণেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কুরআনের মিরাসের আইন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিধান। যা মানব সমাজে ইনসাফ কায়েমের জন্যই দেয়া হয়েছে।

১১.৬ ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights of Woman in Islam)

কুরআন ও হাদীস থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিপূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব। তাই মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বন্ধু ও অভিভাবকের মতো একে অপরকে সহযোগিতা করবে। আর এ সহযোগিতা সব ক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদীসের যেসব স্থানে 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ' এর কথা বলা হয়েছে– তা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এই সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ব্যক্তিজীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা রাখা আবশ্যক।

তাই নারীদের নিজেদের মতামত প্রকাশ, ভোটাধিকার প্রয়োগ এমনকি আইন প্রণেতা ও নেতা হিসেবে নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই ইসলামে।

ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

১। **ভোটদানের অধিকার** : নারীর রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হলো ভোট প্রদানের অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রের একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী নাগরিক যে কোন স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকার ভোগ করে। মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভোটের প্রচলন ছিল না। তখন জনগণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি জনগণের কাছে বাইআত

(আল্লাহর অনুগত শাসক হিসেবে তার আনুগত্যের শপথ) আহ্বান করা হত। কুরআন এবং হাদীসে দেখা যায় তখন মেয়েরাও বাইআত করতেন। ৬০নং সূরা আল মোমতাহেনার ১২নং আয়াতে দেখা যায় একদল নারী মহানবী (সা)-এর হাতে বাইআত নিতে চাইলে 'তাদের' বাইআত নিতে আদেশ করে। ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, আকাবা নামক স্থানে একদল মদিনাবাসী তাঁর নিকটে বাইআত হন। তাদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন। যখন নারীরা মহানবী (সা)-এর কাছে বাইআত নিচ্ছিলেন তখন তারা মহানবী থেকে শুধু আল্লাহর রাসূল হবার স্বীকৃতিই দিচ্ছিলেন না বরং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবেও স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন। বর্তমানকালের ভোটেও এইভাবে সম্মতি/স্বীকৃতিই প্রকাশ করা হয়। নারীরা খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম সপ্তম শতকেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ পাশ্চাত্য এই সেদিন নারীকে ভোটাধিকার দিয়েছে। বিশ শতকের পূর্বে একমাত্র নিউজিল্যাণ্ডে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৮৯৩ সালে। অস্ট্রেলিয়ায় নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে। নারীর ভোটাধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত হয় ১৯২০ সালে, ব্রিটেনে ১৯২৮ সালে। ফ্রান্সে তা স্বীকৃত হয় ১৯৪৭ সালে এবং সুইজারল্যাণ্ডে মাত্র সেদিন ১৯৭১ সালে।

২। **নির্বাচিত হওয়ার অধিকার :** শুধু ভোট প্রদান নয় একজন নাগরিক হিসেবে দেশের যে কোন নির্বাচনে যোগ্যতা সাপেক্ষে নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও নারীরা রাখে। যদিও ইসলামে নেতা নির্বাচনের নিয়ম ভিন্নতর তবুও পাশ্চাত্য নির্বাচন পদ্ধতির সাথে এর কিছু মিল আছে। ইসলামে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শূরা অর্থাৎ পরামর্শের মাধ্যমে করতে হয়। যদিও প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা কোন বিশেষ ভবন তৈরী করেনি যার নাম 'পার্লামেন্ট' বা সংসদ ভবন বলবে– যেখানে সংসদীয় আলোচনা ও মিটিং হবে, খলীফারা জনগণকে ডাকতেন এবং যে কোন বিষয়ে পরামর্শ নিতেন।

রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর, খলীফারা একদল লোকের পরামর্শ নিতেন, যাদের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়ার অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল। মুসলমানদের জন্য সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করার গুরুত্ব আরো ব্যাপকতর হয় এ হাদীসে, যেখানে রাসূল (সা) বলেন, "সত্য ঈমান হচ্ছে উপদেশ দেয়া" (True faith is advice)। স্বয়ং রাসূল (সা)-এর সময়েও কোন কোন বিষয়ে মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার নজির আছে।

মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার ব্যাপারে কেউ বৈধতার প্রশ্ন তুলেছে এমন নজির নেই। তবে পরামর্শ নেবার পদ্ধতি ছিল ইসলামের আদব অনুযায়ী।

৩। মতামত তুলে ধরার অধিকার : মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলিম নারী-পুরুষ নাগরিকগণ নিজেদেরকে ইসলাম সম্মতভাবে পরিচালিত করতেন। সে সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় মুসলিম মেয়েরা সমাজে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত ও অভিযোগ তুলে ধরত। কুরআনের ৫৮নং সূরা আল মোজাদালাহর প্রথম কয়েক আয়াত রাসূল (সা)-এর কাছে একজন মহিলার আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে নাযিল হয়। আল্লাহ সেই মহিলার বক্তব্য শুনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকালে বিভিন্ন বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা) সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) বা কেউ সে সমালোচনার জবাবে এ কথা বলেননি যে নারী রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্য দিতে পারে না। হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা)-এর খলীফা হিসেবে মনোনয়নের বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা) দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন, কিন্তু কেউই তার মতামতের অধিকারের বিপক্ষে কিছু বলেননি। যদিও পরবর্তী সময়ে আয়েশা (রা) এর জন্য অনুশোচনা করেন, কেননা হযরত আলী (রা)-এর বিরোধিতা করা ভুল (Bad judgement) ছিল। একবার হযরত ওসমান (রা)-এর স্ত্রী রাজনৈতিক বিষয়ে বলতে চাইলে তাঁর একজন সহযোগী বাধা দিলে হযরত ওসমান (রা) বলেন, "তাঁকে বলতে দাও, সে তাঁর উপদেশ প্রদানে তোমার চেয়েও আন্তরিক।" কাজেই মুসলিম মেয়েরা রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিতে পারে। যদিও তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ঘর রক্ষা, তবুও এটা তাদের সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয় না।

৪। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং পার্লামেন্টারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার : দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রা) যখন দেখলেন যে, জনগণ বেশি অঙ্কের মোহরানা (কাবিন) দিচ্ছে, তখন তিনি মোহরানাকে সর্বোচ্চ ৪০০ দিরহামে স্থির করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর বেশি যেই দেবে সেই টাকা বায়তুল মালে জমা করার সিদ্ধান্ত তিনি দিলেন। তিনি যখন মসজিদুন নববীতে এই ঘোষণা দিচ্ছিলেন তখন একজন মহিলা আপত্তি করে বললেন, 'হে ওমর তোমার এ কাজের অধিকার নেই'। এই প্রসঙ্গে মহিলা কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে অঢেল স্বর্ণ পরিমাণ মোহরানা দেয় তবুও সে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। রাষ্ট্রপ্রধানের মুখের উপর একথা বলার জন্য মহিলার

বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেনি; বরং হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, "মহিলা যা বলেছে তাই ঠিক এবং ওমর ভুল বলেছে"। হযরত ওমর ফারুক (রা) আরও আক্ষেপ করে বললেন, "হে ওমর, তোমার চেয়ে অনেকে বেশি জানে"। এভাবেই প্রাথমিক যুগের মহিলারা রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারণেও ভূমিকা রাখতেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর সময়কার উল্লিখিত ঘটনার সাথে আধুনিক পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার অনেক মিল আছে। যেমন :

ক. হযরত ওমর ফারুক (রা) কর্তৃক মসজিদে দাঁড়িয়ে মোহরানার সীমা নির্ধারণ করার প্রস্তাব আধুনিক পার্লামেন্টে সংসদ নেতা কর্তৃক কোন আইন সংশোধন প্রস্তাব আনার অনুরূপ।

খ. এই প্রস্তাব আনার স্থানটি আধুনিক পার্লামেন্ট ভবনে ছিল না। এটা মসজিদে ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ইসলামে মসজিদ শুধু নামাজেরই স্থান নয়; বরং খেলাফতের যুগে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ নেতারা মসজিদে বসেই করতেন। মসজিদে বসেই যুদ্ধ পরিচালনা, বিদেশী কূটনৈতিক মিশনকে গ্রহণ করা, সবই হত। এখানে জনগণ যেতেন রাষ্ট্র নায়কদের কথা শুনতে ও প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে। কাজেই সব মুসল্লীই পার্লামেন্ট সদস্যদের সমান মর্যাদা পেতেন।

গ. হযরত ওমর ফারুক (রা) জনগণের কাছে তাঁর প্রস্তাব রাখায় বুঝা যায় তাঁর সিদ্ধান্তের উপর মতামত দেবার অধিকার জনগণের ছিল।

ঘ. সমাজের সব স্তরের মানুষই মসজিদে উপস্থিত থেকে তাদের মতামত সমানভাবে প্রয়োগের সুযোগ পেত।

ঙ. উক্ত মহিলা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে, ঐ প্রস্তাব সংবিদান পরিপন্থী। ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআনই হচ্ছে সংবিধান, যা কোন মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না।

চ. মহিলার সংশোধনী শুনে তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে হযরত ওমর ফারুক (রা) সাথে সাথে তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী তার বর্ণনায় মহিলার নাম উল্লেখ করেননি। তাতে প্রতীয়মান হয় এ মহিলা তদানীন্তন সমাজের কোন উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না। তখন মসজিদে সমবেতদের মধ্যে রাসূল (সা)-এর পরিবারের সদস্য এবং অনেক সাহাবাও ছিলেন। কিন্তু কেউ কোন মহিলার রাজনৈতিক মত প্রদানের বৈধতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেননি। এতে বুঝা যায় তখনকার সমাজের আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বাধীনভাবে তাদের মত দিতে পারত। শুধু এই

ঘটনাতেই নয় এমন আরও অনেক ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর শাহাদাতের পর নতুন খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) মহিলাদেরও পরামর্শ নিয়েছিলেন।

৫। বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নারী : সাধারণ অর্থে 'নেতৃত্ব' বলতে কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে নেতৃত্ব বলতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী পদকেই বুঝায়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম মেয়েদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় যেমন : চিকিৎসা, শিক্ষা, নার্সিং ইত্যাদি এসবই গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী কাজ। এগুলো কি সমাজ তথা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণকারী পদ নয়? এসব পদে অধিষ্ঠিত থেকে কি জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া যায় না? শুধু এসব পদ কেন, যে মহিলা ঘরে বসে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলছেন তিনি কি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করছেন না?

ব্যাপকভাবে নেতৃত্বের এই আলোচনার পরও বলা যায় নির্দিষ্টভাবে কোন জন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শরীয়তে কোন সর্বসম্মত বাধা নেই; বরং চিকিৎসা শিক্ষাসহ কিছু বিষয়ে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব মেয়েদেরই থাকা উচত। অন্যদিকে বেশিরভাগ আলেমের মতে যে তিনটি পদে নারীর অধিষ্ঠিত হতে বাধা আছে তা হচ্ছে :

ক. রাষ্ট্রপ্রধান।

খ. বিচারক।

গ. সেনাপ্রধান (অবশ্য এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে ভিন্নমতও আছে।

যদিও কুরআনে নারীর রাষ্ট্রীয় শীর্ষপদে আসীন হবার বিপক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায় না, তবুও আলেমরা একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন যেখানে রাসূল (সা) বলেন, সে জাতি উন্নতি করতে পারে না যারা তাদের নেতা হিসেবে একজন নারীকে নির্বাচিত করেন। পারস্যের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শাহজাদী 'পুরাণ'-এর মনোনয়নের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা) এই মন্তব্য করেন বলে উল্লেখ করা হয়। (যদিও এই হাদীসের যথার্থতা এবং এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে বেশকিছু আলেম দ্বিমত পোষণ করেছেন।

রাসূল (সা) কর্তৃক নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে এই মন্তব্যের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে প্রথমত এই যে, রাসূল (সা) ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব সম্পর্কে বলছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা শুধু জনগণের মুখপাত্রই নন; তিনি প্রধান নামাযের

জামাতেরও ইমাম এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, নামায এমন একটি কাজ যাতে নারীর ইমামতি করা তো দূরের কথা, পুরুষের সামনে মেয়েদের দাঁড়ানোটাই দৃষ্টিকটু। আর সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নারীকে এখনো পর্যন্ত খোদ পাশ্চাত্যও মনোনীত করেনি। আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, ইসলামী মতে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কোন পুরস্কার তো নয়ই বরং চরমতম পরীক্ষা ও বোঝা। কেউই এই দায়িত্ব আগ্রহ করে নেয় না।

মেয়েদের বিচারক হতে বাধা কোথায়, এ বিষয়ে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ কোন মত নেই। যারা এর বিপক্ষে বলেন তাদের যুক্তি হচ্ছে ঃ

ক. বিচারকদের দায়িত্বটা তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বের অনুরূপ এবং যেহেতু মেয়েদের রাষ্ট্রপ্রধান হতে বারণ করা হয়েছে সেহেতু তাদের বিচারক হওয়াও নিষেধ।

খ. যেহেতু পরিবারের প্রধান হিসেবে ইসলামে পুরুষকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেহেতু বিচারকের আসনে নারী বসাটা এই শৃঙ্খলার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিপক্ষে মত হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান বাদে আর সব পদ এমনকি বিচারক পদেও নারী আসীন হতে পারবে (আত-তাবারী) অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, যেহেতু মেয়েদের আদালতে সাক্ষী হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে সেহেতু তার বিচারকও হতে পারবে।[৩০]

১১.৭ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসির) মানবাধিকার ঘোষণার আলোকে নারীর অধিকার (Rights of Woman in the Light of OIC Declaration of Human Rights)

ওআইসি মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগঠন। এটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি চার বছর পরপর এক শীর্ষ সম্মেলন ও প্রতিবছর একবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর হেড কোয়ার্টার সৌদি আরবের জেদ্দায়। ওআইসির বিজ্ঞান, কালচারাল হেরিটেজ, ফিকহ, ব্যাংকিংসহ বেশ কয়েকটি পার্শ্ব সংগঠন রয়েছে।

১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত মিশরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় উনিশতম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন। সেখানে 'OIC : Declaration of Human Rights in Islam' নামে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। যা 'কায়রো ঘোষণা'

৩০. শাহ আব্দুল হান্নান, বিষয় চিন্তা, দি প্রিন্ট মাস্টার, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ১৫৯-১৬৩।

নামে পরিচিত।[৩১] এর আলোকেই নারীর অধিকারগুলো এখানে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

যদিও এটি ১৯৯০ সালে পাস হয়, কিন্তু তারও প্রায় ১০ বছর আগ থেকেই এর কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর এর উপর কাজ করে নানা পদ্ধতির মাধ্যমে এগিয়ে প্রস্তুতকৃত এ ডকুমেন্টটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় ওআইসি'র আইনবিদগণ, ইসলামের পণ্ডিতগণ অংশীদার ছিলেন। এদিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশ্বের সমস্ত বড় বড় ইসলামী পণ্ডিতদের সংগঠন ওআইসির ফিকহ একাডেমীর সমর্থন এবং অনুমোদন এর পিছনে রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের এ আলোচনাও করা দরকার যে, এ ঘোষণার আগে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে The Universal Declaration of Human Rights নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রদান করা হয়। তার আগে অফিসিয়ালি কোন হিউম্যান রাইটস ডিক্লারেশন বিশ্বের সামনে ছিল না। তবে মানবাধিকারের ধারণা ইতিহাসের গভীরেই প্রোথিত আছে। এগুলো ধর্মের মধ্যে, ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে। যাকে ন্যাচারাল ল' বা প্রাকৃতিক আইন বলা হয় কিংবা স্বাভাবিক ধর্ম বা আইন বলা হয় তাতেও মানবাধিকারের ধারণাগুলো রয়েছে। বিশেষ করে ইসলামে এসব অধিকার দেয়া হয়েছে। যে কুরআন শরীফ মনোযোগ দিয়ে পড়বে সে দেখবে সেখানে অনেক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কুরআনে পিতামাতাকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে। শিশুদের অধিকার, প্রতিবেশীদের অধিকার, এমনকি রাষ্ট্রের অমুসলিমদের এবং নাগরিকদের কি অধিকার হবে তার কথা বলা হয়েছে।

মানবাধিকার সম্পর্কে একটি সুস্থ কাঠামো দেয়ার দরকার ছিল। সে কাজটিই প্রথমে জাতিসংঘ করে ১৯৪৮ সালে এবং পরে ১৯৯০ সালে ওআইসি করে তার ঊনিশতম ঘোষণায়। এখানে তার ২৫টি ধারার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে কিছু বলা হবে।

ওআইসির ডিক্লারেশনের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে ঃ

Article 1 :

(a) All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All

৩১. OIC : Declaration on Human Rights in Islam : The message International, September, 2000.

men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along with the path to human perfection.

(b) All human beings are God's subjects and the most loved by Him are those who are most useful to the test of His subjects and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

অনুবাদ ঃ

ক. হযরত আদম (আ:) থেকে উদ্ভূত এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারের সদস্য। জাতি, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ, ধর্ম বিশ্বাস, রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক অবস্থান বা অন্য কোন বিবেচনা নির্বিশেষে মূল মানবিক মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক থেকে সকল মানুষ সমান। খাঁটি ঈমান ব্যক্তির মধ্যে মানবিক পূর্ণতা এনে দিয়ে এ মর্যাদা বৃদ্ধিকে গ্যারান্টি দেয়।

খ. প্রতিটি মানুষ আল্লাহর অধীন। সেসব ব্যক্তিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, যারা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিয়োজিত এবং শুধুমাত্র খোদাভীতি (তাকওয়া) ও সৎকর্মের ভিত্তিতেই একজন মানুষ অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

এটি এখানে সুস্পষ্ট করে বলা হলো যে সকল মানুষের মর্যাদা– লিঙ্গ নির্বিশেষে মূলত সমান। এ ঘোষণার সকল অধিকারই মানবাধিকার। এগুলো সবার জন্যই। আর এর ভেতর যদি কারোর জন্য বিশেষ কোন অধিকারের কথা থেকে থাকে তা আলাদাভাবে বলা হয়েছে। যেমন : অনুচ্ছেদ 6A-তে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

Woman is equal to man in Human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lincage.

অনুবাদ :

মর্যাদা এবং তা ভোগ করার অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের দিক থেকেও

নারী-পুরুষ সমান। নারীর রয়েছে স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা বা পরিচয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং তার নিজের নাম ও বংশ পরিচয় বজায় রাখার অধিকার।

অর্থাৎ তার দায়িত্বও রয়েছে, অধিকারও রয়েছে। তার একটি আলাদা সত্তা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে। সে সাথে সে তার নিজস্ব নাম ও বংশ ধারাকে আলাদাভাবে সমুন্নত করতে পারবে। ওআইসির ঘোষণায় এ ধারার 'B' অংশে আরো বলা হয়েছে যে, 'The husband is responsible for the support and welfare of the family' অর্থাৎ পুরুষ মেয়েদের ভরণ-পোষণ ও পরিবারের কল্যাণের জন্য দায়ী থাকবে।।

কাজেই দেখা যাচ্ছে এ ঘোষণায় সকল অধিকার সমান হওয়া সত্ত্বেও এখানে ইসলামী আইনের আলোকে নারীর বিশেষ অধিকার সুস্পষ্ট করে দেয়া হলো যা জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশনে নেই।

এর ৬ ধারায় নিজের নাম রক্ষার যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তাতে সে স্বামীর নাম গ্রহণে বাধ্য নয়। আমরা পাশ্চাত্যে এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে স্বামীর নাম নিতে দেখি। আমাদের সমাজেও কিছু লোকের মধ্যে এটি প্রবেশ করেছে। তবে বর্তমানে তা অবশ্য কমছে বলে মনে হয়। কিন্তু ওআইসির ঘোষণায় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে নিজের নামের রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

ওআইসির এ ঘোষণার অন্যান্য ধারাতে যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা সবার মত মেয়েদেরও রয়েছে। যেমন– আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া কেউ জীবন নিতে পারবে না বা হত্যা করতে পারবে না, তা বিস্তৃতভাবে ২২নং ধারায় বলা হয়েছে। ৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যুদ্ধ এবং অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষের সময় যারা যুদ্ধরত নয় তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। এখানে বিশেষভাবে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের কথা বলা হয়েছে। এ অধিকার সবারই থাকবে। এখানে ইসলামের আলোকে আরো বলা হয়েছে, যুদ্ধের সময় গাছ কাটা যাবে না, ফসল নষ্ট করা যাবে না, পশুপাখি মারা যাবে না। এমনকি জনসাধারণের বাড়িঘর ধ্বংস করা যাবে না। আবার ৪নং ধারায় বলা হয়েছে মানুষের সম্মান কেউ নষ্ট করতে পারবে না। এটি জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং রাষ্ট্র ও সমাজ তার মৃতদেহ রক্ষা করবে।

এভাবেই ধারাগুলোতে মানুষের যেসব অধিকার তার আলোচনা করা হয়েছে। সবার শিক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের আলোকে এখানে আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে পুরুষ নারী যেই হোক প্রত্যেক মানুষেরই দু'ধরনের

শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। একটি হলো দুনিয়ার জন্য– যা না হলে এখানে চলে না, আরেকটি হলো ধর্মীয় শিক্ষা। এটি ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটস ডিক্লারেশন থেকে একটু আলাদা।

এখানো আরো বলা হয়েছে মানুষকে দাস করা যাবে না। ইসলাম যদিও শুরুতেই দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করে দেয়নি কিন্তু ইসলাম সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস করা যাবে না। এখন দাসপ্রথা নেই, আর নতুন করে কাউকে দাস করার প্রশ্নও উঠে না। কিন্তু এখানে স্পষ্টত বিধানের জন্য বলে দেয়া হলো কাউকে দাস করা যাবে না। তেমনিভাবে উপনিবেশবাদকেও নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করার অধিকার কারো নেই। আরো বলা হয়েছে সবারই চলাচলের স্বাধীনতা থাকবে।

অন্যান্য ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই কাজ করার অধিকার রয়েছে। আইন সাপেক্ষে সে যে কোন কাজ করতে পারে। কাজের মধ্যে তার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাকে দেখতে হবে। তাকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া যাবে না। এ কথাগুলো ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে। এ ধারায় এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে নারী এবং পুরুষকে সমান মজুরি দিতে হবে। কোন পার্থক্য করা যাবে না। এখানে আবার নারীর কথা আলাদা করে বলা হয়েছে এভাবে শব্দ ব্যবহার করে, 'Without any discrimination between males and females'- আর সে মজুরিটাও কোন প্রকার বিলম্ব ছাড়াই দিয়ে দিতে হবে। কেননা রাসূল (সা) বলেছেন ঘাম শুকাবার আগেই মজুরি দিয়ে দাও।

ধারাগুলোতে আরো বলা হয়েছে, সে তার নিজের মালিকানায় সম্পদ ভোগ করতে পারবে। সে যদি বিজ্ঞান গবেষণা কিংবা শিল্প-সাহিত্যকর্ম থেকে কোন অবদানের স্বাক্ষর রাখে তাহলে তার অধিকার আছে সেসব থেকে বেনিফিট নেবার। শর্ত থাকে যে এসব কাজ শরীয়াহর বিরুদ্ধে হবে না। তেমনিভাবে কাজের বেলায় সব কাজ শরীয়াহ বিরোধী না হলে তার তা করার অধিকার রয়েছে, এ শরীয়াহর কথাও ২৪নং ধারায় বলে দেয়া হয়েছে, All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shariah. অর্থাৎ শরীয়াহর ভায়োলেট করে এসব কিছুই করা যাবে না।

এ ঘোষণায় প্রত্যেকেরই অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে কোন কদর্যতা, দুরাচার থাকবে না। নৈতিক অবক্ষয় থাকবে না। বস্তুগত পরিবেশ ভালো হতে হবে। এসবের মধ্যে কোন প্রকার নারী-পুরুষ পার্থক্য থাকবে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এসব দেখা। এখানে মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সম্পদগত

নিরাপত্তার অধিকারের সাথে সাথে গোপনীয়তার অধিকারও রয়েছে। ইসলাম এটি বিশ্বাস করে যে, মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়টি গোপন থাকবে। এতে কোন প্রকার গুপ্তচরবৃত্তি করা যাবে না। ১৯ ধারায় আইনের চোখে সবাই সমানের কথা বলা হয়েছে। নিয়ম কি তা বড় নয় সবাই আইনের অধীন। সবার জন্যই ন্যায়বিচার করতে হবে এবং দায়দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের ঘাড়েই বর্তাবে। একের দোষ আরেকজনের ঘাড়ে চাপানো যাবে না। অন্যায় হয়রানি থেকে বাঁচার অধিকার সবারই রয়েছে। ধারা ২১-এ বলা হয়েছে, Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden অর্থাৎ কাউকে পণবন্দি (হোস্টেজ) করা যাবে না।

তবে সব অধিকারের কথা বলা থাকলেই শুধু হবে না। ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন থাকার পরও মানুষ অধিকার পায় না। কুরআনে সব কথা বলা থাকলেও মানুষ সব অধিকার পায় না। তাই শুধু ঘোষণা থাকাই সব নয়। এসব অধিক হারে ছড়াতে হবে। বিশ্বব্যাপী 'ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটস ডিক্লারেশন', ওআইসির 'ডিক্লারেশন অন হিউম্যান রাইটস ইন ইসলাম'-এর উপর ব্যাপকভাবে পত্র-পত্রিকাগুলোতেও লেখালেখি হচ্ছে না, এগুলো বেশি বেশি করতে হবে।

সবারই মত প্রকাশের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকেরই অধিকার আছে নিজের মত প্রকাশ করার। তথ্যের স্বাধীনতা দরকার, কিন্তু তাকে অপব্যবহার করা যাবে না। নবীদের সম্মানহানি করা হয়, মোরাল এবং এথিকেল মূল্যবোধকে অবমূল্যায়ন করা হয় অথবা সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা হয়, বিশ্বাসকে দুর্বল করা হয়– এসব কাজে তথ্যকে ব্যবহার করা যাবে না। এটি করলে তথ্যের অধিকার নষ্ট হয়।

ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিও বলা হয়েছে– জাতীয়তা, গোত্রগত, ধর্মীয় মাযহাবভিত্তিক আবেগকে উস্কানো যাবে না। বলা হয়েছে যার যা কর্তৃত্ব রয়েছে তা তার আমানত, এসব উদ্দেশ্যহীন ব্যবহার করা যাবে না। দেশের প্রশাসন এবং অন্যান্য কাজে প্রতেকেরই অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এসবই শরীয়াহ মোতাবেক করতে হবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, ওআইসির এ মানবাধিকার সনদ ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ইসলামভিত্তিক। এটি ইসলাম বিশেষজ্ঞদের অনুমোদনকৃত। কিন্তু খুব কম লোকই এ ঘোষণা সম্পর্কে জানে। ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটসের সাথে এর অনেক মিল রয়েছে। এ মিল থাকাও স্বাভাবিক। মানুষের প্রকৃতিগত যে

স্বভাব তা তো অনেক ক্ষেত্রে একই। এ ঘোষণায় ইসলামের মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১.৮ নারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের শিক্ষা (Violence Against Woman : Teachings of Islam Against its Resistance)

বিশ্বজুড়ে নারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস তাদের মর্যাদা ও অধিকারের পথে এক বিরাট অন্তরায়। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উত্থিত এ ইস্যুটি বর্তমানে বিশ্ব এজেন্ডায় স্থান লাভ করেছে। নারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা অনবদ্য। একমাত্র ইসলামের শিক্ষা মেনে চললেই নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী সহিংসতা বা নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস (Violence against women) ইসলামী শিক্ষার অনুসৃতির অভাবে বেড়েই চলছে। নারী সহিংসতা শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী এটা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর নাম, ধরন, রূপ বিভিন্ন প্রকৃতির হলেও নারী সহিংসতা বা নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস আজ এক সর্বজনীন ধারণা।

নারীর প্রতি সহিংসতা বা সন্ত্রাসের ধরনগুলো নিম্নরূপ :

১। শারীরিক নির্যাতন (Physical violence)

২। গৃহ নির্যাতন (Domestic violence)-এটিকে পারিবারিক নির্যাতনও (Domestic battery) বলা হয়।

৩। কর্মস্থলে নির্যাতন (Violence against women in workplaces)

৪। যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন (Dowry related violence)-একে যৌতুক সংক্রান্ত সন্ত্রাস বলা হয়।

৫। নিকট রক্ত সম্পর্কিত সহিংসতা (Incest)

৬। নারী পাচার (Trafficking), শিশু পাচার

৭। পতিতাবৃত্তি (Prostitution), বলপূর্বক দেহব্যবসায় নিয়োজিতকরণ।

৮। ইভ টিজিং

৯। এসিড নিক্ষেপ (Acid throwing)-এসিড সন্ত্রাস নামেও পরিচিত।

১০। বাল্যবিবাহ (Child marriage)

১১। বহুবিবাহ (Poligamy)

১২। বিবাহোত্তর সন্তানধারণে বাধা দান (Post pregnancy)

১৩। মাতৃত্বকালীন হয়রানী (Reproductive choice and maternal mortal)

১৪। চিকিৎসা বিকৃতি (Medical abuse)

১৫। যৌন হয়রানী (Sexual harasment)

১৬। ধর্ষণ (Rape)

ক. বৈবাহিক বা দাম্পত্য ধর্ষণ (Marital rape)

খ. পুলিশী হেফাযতে ধর্ষণ (Rape in police custody)

গ. দলগত ধর্ষণ (Group rape)

ঘ. শিশু ধর্ষণ (Child rape)

১৭। মানসিক নির্যাতন (Mental torture)

১৮। ধর্ষণের পর হত্যা (Killed after rape)

১৯। বিকৃত অশ্লীল চিত্র (Pornographic abuse)

২০। বৈষম্যমূলক আচরণ (Discriminatory behaviour)

২১। নারী যৌনাঙ্গ কর্তন (Female genital mutilation : FG-M)

২২। দাসোচিত বা ভাড়াটে বিবাহ (Servile or mercenary marriage)

২৩। পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বঞ্চনা (Deprivation of nourishment and health care)

২৪. পুত্র সন্তানের কাম্যতা (Preference for male children)

২৫। পুলিশী হয়রানী/মিথ্যা মামলা

এ সমস্ত বৈষম্য বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসরোধে এ পর্যন্ত সাংবিধানিক, আইনগত পদক্ষেপ কম নেয়া হয় নি। নির্যাতনের ধরনের উপর ভিত্তি করে আইনের সংযোজন ও সংস্করণ এ পর্যন্ত কম হয়নি। এরপরও আশঙ্কাজনক হারে নারী সহিংসতা বেড়েই চলছে।

ইসলাম ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন ও সম্মেলনে নারীর অধিকারগুলো

যেমন স্বীকৃত/গৃহীত হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনেও নারী অধিকার রক্ষা, নারীর প্রতি বৈষম্যরোধ ও নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এতকিছুর পরও নারী সহিংসতা বন্ধ করা যায়নি, নারীরা পাচ্ছে না তাদের প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার। পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন প্রতিবেদনের প্রাত্যহিক চিত্রে নারী সহিংসতার ধরন দেখে শিউরে উঠতে হয়। মমতাময়ী মা, আদরের কন্যা, স্নেহাশীষ বোন, আর প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি এ ধরনের সহিংসতা গোটা মানবতাকেই বিপর্যস্ত করছে।

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে পৃথিবীতে মানুষের আবাদ হলেও নারীরা স্মরণাতীতকাল থেকেই নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে এসেছে। একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, ইসলামই প্রথম এই লাঞ্ছিত, পদদলিত ও অবহেলিত নারীকে অসম্মানের ধুলো মুছে সম্মানের আসনে আসীন করেছে।

মনে রাখতে হবে নারী এবং পুরুষ কখনও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং পরস্পর পরিপূরক। যে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র নারীকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছে তারা ততই শান্তি ও অগ্রগতির পানে এগিয়ে আসতে পেরেছে। সে সাথে নারীদেরও স্মরণ রাখতে হবে মর্যাদা ও অধিকারের অবাধ সুযোগে যেন তারা সীমালঙ্ঘন না করে বসেন। নারীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার মাধ্যমেই নিজেদের যথাযথ স্থানে জায়গা করে নিতে হবে। নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নারী দিবস পালন করে, সিম্পোজিয়াম আর সেমিনারে আলোচনার ঝড় তুললেই নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, এজন্য প্রয়োজন উভয় পক্ষের সচেতনতা মানসিকতার পরিবর্তন। ইসলাম প্রদত্ত নারীর কালজয়ী অধিকার কর্তব্যগুলো জানা এবং তা পরিপালনের মাধ্যমেই সম্ভব হবে এ অবস্থা উত্তরণের। সবক্ষেত্রে এজন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। নারী তার অবস্থানে থেকে যদি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে ছেলের ক্ষেত্রে, ভাইয়ের ক্ষেত্রে, স্বামীর ক্ষেত্রে তেমনি পুরুষেরাও যদি সত্যিকার বাবা, স্বামী ও ভাই হতে পারে তবে সমাজে সব ধরনের সহিংসতারই অবসান হওয়া সম্ভব।

প্রশ্নাবলী

১। নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে ইসলামী ধারণা ব্যাখ্যা করো। (Explain the Islamic concept about the status and rights of women.)

২। ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা আলোচনা করো। (Discuss the position and status of women in Islam.)

৩। ইসলামে নারীর মর্যাদা আলোচনা করো। (Discuss the status of women in Islam.)

৪। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার আদায় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতার বিশ্লেষণ করো। (Elucidate the women's rights, dignity and power in Islam in perspective of the world movement for establishing women rights.)

৫। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার আদায় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে প্রদত্ত নারী অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করো। (Illustrate the rights, status and power of women in Islam inrespect of the world wide movement for confirming their rights.)

৬। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা আলোচনা করো। (Discuss the rights and status of women in society and state in the light of Islam.)

১২

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা

Rights and Status of Non-Muslim's in Islamic State

১২.১ ভূমিকা (Introduction)

রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মদীনার এ রাষ্ট্রটি ছিল মানব জাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। মদীনা রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল ইসলাম। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। ইসলাম সৃষ্টিকর্তারই বিধান, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট হাওয়া, পানি যেমন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান কল্যাণকর, তেমনি ইসলামের বিধানও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সমান কল্যাণকর। ধর্মসহ সকল ক্ষেত্রে অমুসলিমরা মদীনা রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ভোগ করতো। মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতা বিকাশের এক নতুন সংস্থা। আগে যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের ভিত্তিতে নাগরিকগণ ছিল বহুধা বিভক্ত, সেখানে মহানবী (সা) বৃহত্তর মানব কল্যাণের লক্ষ্যে এমন এক রাজনৈতিক কাঠামো রচনা করেন যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি বজায় রেখেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সাথে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারত। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষত্ব এখানেই।

ইসলাম শ্রেণী, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্ত, সহিষ্ণুতা ও অধিকার সংরক্ষণেরই নামান্তর। তথাপি ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে মানুষের ভীতি ও সংশয়ের অন্ত নেই। এটি কিছু মানুষের বিদ্বেষ এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতারই ফল। ইসলামী যুগের প্রথম থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করে আসছেন। মুসলিমদের মতো তাদেরও রয়েছে জানমালের নিরাপত্তা, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ অন্যান্য সমঅধিকার।

১২.২ মদীনা রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা (Rights and status of Non-Muslim's in Medina State)

মদীনা সনদের (The Character of Medina) মাধ্যমেই মদীনার ইসলামী

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, মহানবী (সা) কর্তৃক প্রদত্ত এ 'মদীনা সনদ' বিশ্বের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র (First written constitution of the world)। এ সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল একটি Multi Religious State. ইসলামের সহনশীলতার মহান আদর্শ সকল যুগের সকল জাতির আদর্শকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। মদীনা রাষ্ট্র সহনশীলতার নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকগণকে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে সমঅধিকার প্রদান করেন। মদীনা সনদে অমুসলিমদের যতটা অধিকার দেয়া হয়েছে, দুনিয়ার কোন জাতি তার সংখ্যালঘুকে তা দেয়নি।[১] পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, "ধর্মের জন্য কোন বাড়াবাড়ি নেই"।[২] তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।[৩] মহানবী (সা) অমুসলিমদের যিম্মীর মর্যাদা দান করেন এবং তাদের জীবন, সম্পদ ও ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করেন। তিনি অমুসলিমদের স্ব স্ব ধর্ম পালনে স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং স্ব স্ব সংস্কৃতির সেবার অবাধ অধিকার প্রদান করেন। তিনি সামান্য জিযিয়ার পরিবর্তে ইহুদি এবং নাজরানের খ্রিস্টানদের যিম্মাগ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব ধর্ম ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করেন। তিনি নিজ ধর্ম বা সংস্কৃতি কারো উপর চাপিয়ে দেননি বা কারো সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারা গ্রাস করাবার নীতি অবলম্বন করেননি।

অমুসলিমদের সাথে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ চুক্তি ও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন মদীনা রাষ্ট্রের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। মহানবী (সা) জিযিয়ার বিনিময়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে যে সকল মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন তার মূল বিষয়বস্তু ছিল :

১। অমুসলমানগণ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে রক্ষা করবেন।

২। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না।

৩। তাদেরকে সকল প্রকার নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

৪। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি ও অধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

৫। তাদের ধর্ম, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গির্জাদির কোন ক্ষতি করা হবে না বা ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করা হবে না।

---

১. শাহ আবদুল হান্নান, ওয়ার্ল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত মদীনা দিবস উপলক্ষ্যে ২৪.৯.৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ, উদ্ধৃত, দৈনিক সংগ্রাম ২৫.৯.৯৯, পৃ. ৭।

২. ২ : সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৫৬।

৩. ১০৯ : সূরা আল কাফিরূন, আয়াত : ৬।

৬। তাদের কোন নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে না।

৭। তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে না বা সামরিক বাহিনীতে তাদের যোগদানেও বাধ্য করা হবে না এবং

৮। ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে।[৪]

বস্তুত মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের জান-মাল ও ধর্ম পালনে নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়। স্বয়ং মহানবী (সা) বলেন, যাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, কেউ যদি তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে কিংবা তাদের উপর বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা (কর) চাপায়, তবে আমি শেষ বিচারের দিনে তাদের যিম্মার পক্ষে ওকালতি করব।[৫] মহানবী (সা) বলেন : মনে রেখো, যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো।[৬]

আল কুরআন খ্রিস্টান এবং ইহুদি সম্প্রদায়কে 'আহলে কিতাব' (Ahlal Kitab) বলে আখ্যায়িত করেছে। যার অর্থ কিতাবধারী জনগোষ্ঠী (People of the Book)। 'কিতাব' বলতে আসমানী কিতাব তাওরাত, যাবুর ও ইনজীলকে বুঝায়। এসব কিতাবের ভিত্তিতে তাদের সাথে মুসলমানদের একটি বিশ্বাসগত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। মুসলমানগণ আবার পূর্বে আগমনকারী সকল নবী রাসূলগণকে বিশ্বাস করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : তোমরা বল, আমরা ঈমন এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না।[৭] আল্লাহ বলেন : বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম এবং তোমাদের জন্য

---

৪. ড. মুহাম্মদ আলী আজগর খান, মোখলেছুর রহমান ও শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, বুকস প্যাভিলিয়ন, রাজশাহী, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩।

৫. আল হাদিস, উদ্ধৃত ড. মুহাম্মদ আলী আজগর খান ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৩।

৬. আবু দাউদ, উদ্ধৃত রাহে আমল ২য় খণ্ড, হাদিস নং ২২৫, পৃ. ২৩।

৭. ২ : সূরা আল বাকারা : ১৩৬।

তোমাদের ধর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[৮] এভাবে কুরআন খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের গভীর বন্ধন ও যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছে। মহানবী (সা) বাহরাইনের জরদস্তের অনুসারী অগ্নি উপাসকদের (Zoroastrians of Bahrain) আহলে কিতাবদের মতো অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন, "Let it be with them as it is with Ahlal Kitab."

১২.৩ অমুসলিমদের সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ার ভাষ্য (Sayings of Islamic Shariah regarding Non-Muslims)

অমুসলিমদের সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ার ভাষ্য হচ্ছে নিম্নরূপ :

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ তাদের সকল মানবাধিকার ভোগ করবে এবং তাদেরকে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী আহালুয যিম্মাহ (Ahlal Dhimmah) বা 'আল মুয়াহিদুন' (Al Muahhidun) বলে অভিহিত করা হয়। আহলুয যিম্মাহর এক বচনে যিম্মী (Dhimmi) এবং আল মুয়াহিদুন একবচনে মুয়াহিদ (Muahhid) শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'যিম্মী' শব্দ 'যিম্মাহ' হতে উৎপন্ন। এর অর্থ আহদ (Al Ahd)-অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি বা কওল করার। সুতরাং 'আহলুয যিম্মাহ' যিম্মীর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যাদের সাথে কোনরূপ অঙ্গীকার বা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ড. লোকমান তাইব যিম্মী শব্দের অর্থ লিখেছেন প্লেজ (Pledge), গ্যারান্টি (Al Damam). নিরাপত্তা (Al Aman)[৯] অমুসলিমদেরকে যিম্মী' (Dhimmi) বলা হয় এ কারণে যে তারা আল্লাহর প্লেজভুক্ত, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্লেজভুক্ত এবং ইসলামী উম্মাহর প্লেজভুক্ত যাতে তারা ইসলামের ছায়াতলে নিরাপদে বসবাস করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে যে প্লেজ অব সিকিউরিটি এবং গ্যারান্টি দেয়া হয় তা রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয়তা (Political Nationality) প্রদানের মতো। এ মোতাবেক যিম্মীরা হচ্ছে The people of the abode of Islam (Ahlal Daral Islam)[১০] এবং তারা ইসলামী জাতীয়তার ধারক (Al-jinsiyah al

৮. ৪২ : সূরা আশ-শূরা : ১৫।

৯. ড. লোকমান তাইব, Political System of Islam. Kualalumpur. 1994, পৃ. ৯৫।

১০. ড. আবদুর রহমান এল দোই, Shariah : The Islamic Law (UK. তাহা পাবলিশার্স ১৯৮২) পৃ. ৪২৬।

Islamiyyah)[১১] ইসলামী রাষ্ট্রীয় আইনে তাদের সদস্যপদ হচ্ছে নিরাপত্তা প্রদানের চুক্তি (Contract of protection) বা আকদ আল যিম্মা (Aqd al Dhimmah) ভিত্তিক। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তথাকার স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করেছে। কিংবা অন্যকোন অমুসলিম রাষ্ট্র দারুল ইসলামে এসে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি লাভ করেছে। এরাই ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী নাগরিক। ইসলামী রাষ্ট্রেও যেসব অমুসলিম নাগরিক জন্মগ্রহণ করবে, তারাও তাদের পূর্বসূরীদের পক্ষ থেকে 'আকদ'-এর আওতায় আসবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইনের আওতায় মুসলিম এবং অমুসলিম নাগরিকদের সমান অধিকার এবং সমান বাধ্যবাধকতা সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে শরীয়ত প্রদত্ত অধিকারগুলো দিতে বাধ্য। এসব অধিকার কেড়ে নেয়া বা কমবেশি করার এখতিয়ার কারো নেই। এসব অধিকার ছাড়া অতিরিক্ত কিছু অধিকার যদি মুসলিমরা দিতে চায় তবে ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী না হলে দেয়া যেতে পারে।

১২. ৪ অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকার (General Rights of Non-Muslim's)

অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকারের মধ্যে রয়েছে :

১। **প্রাণের নিরাপত্তা :** ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মতো অমুসলিম নাগরিকদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। অমুসলিম নাগরিকদের রক্তের মূল্য মুসলিমদের রক্তের মূল্যের সমান। কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত ঠিক তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। মহানবী (সা)-এর আমলে জনৈক মুসলিম জনৈক অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। মহানবী (সা) বলেন, যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।[১২]

---

১১. আবদুল কাদের আওদাহ, আল তাশরী আল জানাই আল ইসলামী (আলেকজান্দ্রিয়া মানশাহ আল মাআরিফ, ১৯৭৪) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

১২. ইনায়া শরহে হিদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬।

২। **ফৌজদারী দণ্ডবিধি :** ফৌজদারী দণ্ডবিধি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলিমকে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেয়া হবে।

৩। **দেওয়ানী আইন :** দেওয়ানী আইনেও মুসলিম ও অমুসলিম সমান। 'তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো'। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা)-এর এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে– মুসলিমদের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয় অমুসলিমের সম্পত্তির হিফাযতও তদ্রূপ করা হবে এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের দেওয়ানী অধিকারও সমান এবং অভিন্ন হবে।

৪। **সম্মানের হিফাযত :** কোন মুসলিমকে জিহ্বা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা গীবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অমুসলিমের বেলায়ও অবৈধ। দুররে মুখতারে আছে : একজন অমুসলিমকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করার মতোই হারাম।[১৩]

৫। **অমুসলিমদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা :** অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলিমদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ এ চুক্তি করার পর মুসলিম তা ভাঙতে পারে না। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে তারা যতদিন খুশি তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেঙ্গে দিতে পারে। অমুসলিম নাগরিক যত বড় অপরাধই করুক, তাদের রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ সমন্বিত নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। তবে দু'অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়। প্রথমত. যদি সে মুসলিম দেশ ছেড়ে গিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। দ্বিতীয়ত. যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করে।[১৪]

৬। **ঘরোয়া কর্মকাণ্ড :** অমুসলিমদের ঘরোয়া কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন (Personal law) অনুসারে স্থির করা হবে। ওদের উপর ইসলামী আইন কার্যকরী করা হবে না। ঘরোয়া পরিবেশে তারা তাদের আকীদা বিশ্বাস অনুসারে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

৭। **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা :** ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার যে মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা শুধু মুসলিম নাগরিকদের

---

১৩. দুররে মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-২৭৪।

১৪. বাদায়ে ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩। ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৮২ উদ্ধৃত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, পৃ. ৩৯৩।

জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। বস্তুত এ ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিমের কোনই পার্থক্য সৃষ্টি করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সাবধান! যে ব্যক্তি কোন অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করবে, অথবা তাকে কষ্ট দেবে, অথবা তার সম্মান হানি করবে, তার আন্তরিক সম্মতি ব্যতিরেকে তার কোন সম্পদ গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হব।[১৫]

উল্লিখিত হাদিসে অমুসলিমদের জান-মাল, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) অমুসলিমদের সাথে যে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন তা একটি ঐতিহাসিক দলীল। 'অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যে লোক বার্ধক্য, পঙ্গুত্ব বা বিপদের কারণে অথবা সচ্ছলতা থাকার পর দরিদ্র হয়ে পড়ার কারণে যদি এমন অবস্থায় পড়ে যে, তার স্বধর্মীরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে তাহলে তার নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া বন্ধ করা হবে এবং সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন পর্যন্ত তার পরিবারকে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণ করা হবে।[১৬]

সেনাপতি হিসেবে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) এ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন এবং খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এ চুক্তি মেনে নিলেন।

আবু আবদুর রহমান বলেন, হযরত সা'আদের সঙ্গে একবার আমরা রাত্রি যাপন করছিলাম। নিকটে এক অমুসলিমের বাড়ি ছিল, আমরা গৃহস্বামীর সন্ধান করলাম, সে বাড়ি ছিল না। সা'আদ বললেন, সাবধান! মুসলমান হিসেবে আল্লাহর সাক্ষাৎ করতে চাইলে যিম্মীর কিছু স্পর্শ করবে না। সুতরাং ক্ষুধার্ত অবস্থায় তার দেয়ালের পার্শ্বে আমরা রাত্রি যাপন করলাম।[১৭]

৮. ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্র যিম্মীদেরকে তাদের ধর্ম ও কৃষ্টি রক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে। আল কুরআনের বাণী 'ধর্মের ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করা হবে না'। ইসলামের বিজয়ের যুগে দেখা যায়, যে সকল বিজিত দেশে অমুসলিমগণকে বসবাসের অধিকার দেয়া হয়েছিল সে সকল দেশে তাদের ধর্ম পালন ও কৃষ্টি রক্ষার অধিকারও প্রদান করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়েমেন দেশীয় নাজরানের অধিবাসীদের জন্য লিখে দিলেন, আল্লাহ এবং

---

১৫. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ : পৃ. ৮২।

১৬. কিতাবুল খারাজ-১৫৪ পৃ.।

১৭. কিতাবুল আমওয়াল : পৃ. ১৫০।

আল্লাহর রাসূলের যিম্মা-প্রতিশ্রুতি, নাজরান ও নাজরানের শহরতলীর অধিবাসীদের জন্য তাদের জান সম্পর্কে, তাদের মাল সম্পর্কে, তাদের ধর্ম সম্পর্কে, তাদের ধর্মমন্দির ও ধর্মস্থান সম্পর্কে, তাদের উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলের সম্পর্কে এবং তাদের অধিকার অল্প বিস্তর যা কিছু আছে সব সম্পর্কে। অধিকন্তু তাদের কোন পুরোহিতকে তাদের পদ হতে অপসারিত করা হবে না এবং তাদের কোন সাধু-সন্যাসীকে তাদের ব্রত হতে বিরত রাখা হবে না। এতদ্ব্যতীত রাজস্ব উসূলের জন্য তাদের সকলকে এক জায়গায় একত্রিত করা হবে না এবং তাদের নিকট হতে 'উশর' গ্রহণ করা হবে না। অপরদিকে শত্রুর আক্রমণ হতে তাদের রক্ষা করা হবে। তাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হবে না বা তাদেরকে কোনরূপ কষ্টে পতিত করা হবে না। তবে তাদের কর্তব্য ভবিষ্যতে এগুলো পালন করা ও দেশের পক্ষে মঙ্গল কামনা করা।[১৮]

খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-র সময় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) হিরার অধিবাসীদেরকে যে সনদ দান করেছিলেন তা ছিল : তাদের ধর্মমন্দিরসমূহ বিনষ্ট করা হবে না, তাদের দুর্গগুলোকে ধ্বংস করা হবে না– যাতে তারা শত্রুর আক্রমণকালে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, তাদেরকে ঘন্টা বাজাতে বা শঙ্খধ্বনি করতে নিষেধ করা হবে না, তাদের ঈদ-পার্বণে তাদের ক্রুশ শোভাযাত্রা বের করতে বাধা দেয়া হবে না।[১৯]

৯। ব্যক্তি স্বাধীনতা : রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে বুঝায়, রাষ্ট্রে নাগরিকদের স্বাধীন, অবাধ চলাফেরা ও যাতায়াতের অধিকার, শত্রুর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা করার অধিকার, কারো সম্পদ ও সম্পত্তি অকারণে কেউ হরণ করে নেবে না, কেউ তাদেরকে বিনা অপরাধে আটক করবে না। দেশের বৈধ আইন মোতাবিকই প্রত্যেকে জীবন যাপন করতে পারবে এবং তাদের সাথে আইনসম্মত আচরণ করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের জন্যেও পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত থাকে। এ পর্যায়ে ইসলামী আইনবিদরা যে ফর্মূলা ঠিক করেছেন তা হচ্ছে, 'আমাদের জন্যে যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যেও তাই এবং আমাদের উপর যে দায়িত্ব তাদের উপরও তাই।'

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) বলেন, 'অমুসলিম নাগরিকেরা জিযিয়া আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে তাদের জান-মাল মুসলিম নাগরিকদের মতোই সংরক্ষিত হবে।'[২০]

---

১৮. কিতাবুল আমওয়াল : পৃ. ১৮৮।

১৯. কিতাবুল খারাজ : পৃ. ৪১।

২০. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।

ফকীহ কারাফী বলেন, অমুসলিম নাগরিককে যদি কেউ কষ্ট দেয়, একটি খারাপ কথাও বলে, তাদের অসাক্ষাতে তাদের সম্মানের উপর এক বিন্দু আক্রমণও কেউ করে কিংবা তাদের সাথে শত্রুতার ইন্ধন যোগায় তাহলে সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের এবং দীন ইসলামের দায়িত্বকে লঙ্ঘন করলো। নবী করীম (সা) ঘোষণা করেছেন- 'যে লোক ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে কোনরূপ কষ্ট দেবে আমি নিজেই তার বিপক্ষে দাঁড়াবো এবং আমি যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করবো।[২১]

১০। **ন্যায়বিচার লাভের অধিকার :** ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিকই বিচারের ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। সেখানে যে কোনো লোকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যায় এবং আদালত যে কোন লোককে বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য করতে পারে। বিচারালয়ে বাদী বিবাদীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা চলবে না। এমনকি কোন শত্রুও যদি আদালতের সামনে ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সে ঠিক তেমনি আচরণই পাবে যেমন আচরণ পাবে একজন মিত্র বা স্বদেশের নাগরিক। আল কুরআনের ঘোষণা : 'হে ঈমানদার লোকগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্য দাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যার ফলে তোমরা ইনসাফ পরিত্যাগ করো। ন্যায়বিচার করো। বস্তুত আল্লাহ পরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক।[২২]

বস্তুত আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও বিচারের ক্ষেত্রে সাম্য-এ দুটোই ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত আমলে মিসরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল আস (রা) একজন কিবতী নাগরিককে অকারণে চপেটাঘাত করেছিলেন। কিবতী হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করলো। পরে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) যখন খলীফার দরবারে হাজির হলেন, তখন তিনি কিবতীকে হাজির করে জিজ্ঞেস করলেন- তোমাকে এ লোক মেরেছিল? কিবতী বলল, হ্যাঁ, এ লোকই আমাকে অকারণে চপেটাঘাত করেছিল। খলীফা বললেন- তাহলে তুমিও ওকে একইভাবে মারো। এ আদেশ পেয়ে সে

২১. আল-জামেউস সাগীর লিস সুয়ূতী - ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪।

২২. ৫ : সূরা আল মায়েদা : ৮।

হযরত আমর ইবন আস (রা)কে মারতে শুরু করলেন। পরে খলীফা উমর ফারুক (রা) হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন– হে আমর! কবে থেকে তুমি লোকদেরকে গোলাম বানাতে শুরু করলে, অথচ তাদের মায়েরাতো তাদেরকে স্বাধীনরূপেই প্রসব করেছিল?[২৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের একজন অমুসলিম নাগরিক শাসক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। এমনি ন্যায়বিচার শুধু আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান ইসলামী শাসনতন্ত্রেই খুঁজে পাওয়া যায়। কোন মানব রচিত বিধানে এরূপ বিচারের কল্পনা করাও যায় না।

১১। অমুসলিমদের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষায় ইসলামী রাষ্ট্র : আজকের বিশ্বে অঙ্গীকার করা হয় সাধারণত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং সামান্য অজুহাত দেখিয়ে তা ভঙ্গ করা হয়। এর সাথে ইসলামী রাষ্ট্রকৃত ওয়াদার তুলনা করলে নিশ্চয়ই ভুল হবে। অঙ্গীকার রক্ষা করা মুসলমানদের পক্ষে ধর্মীয় কর্তব্য বা ফরয। অতএব কোন মুসলমান স্বীয় দীন ও ঈমান বিসর্জন দিয়ে কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারবে না। আল্লাহ্র নির্দেশ– "নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে পরকালে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।"[২৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন অমুসলমানকে আশ্রয় দিয়ে হত্যা করেছে অর্থাৎ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, পরকালে তাকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেয়া হবে।[২৫] নবী করীম (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়াতে যে সন্ধি হয়েছিল, তার একটি শর্ত ছিল এই যে, মক্কার কোন নওমুসলিম মদীনায় পলায়ন করলে তাকে পুনরায় মক্কায় ফেরত দিতে হবে। অতঃপর কুরাইশ কর্তৃক নির্যাতিত ও শৃঙ্খলিত হযরত আবু জন্দল (রা) নামীয় এক নও-মুসলিম শৃঙ্খলসহ মক্কা হতে পলায়ন করে মদীনায় আসলে মহানবী (সা) তাকে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে যেতে বাধ্য করেন। সাহাবাগণও এ সিদ্ধান্তকে নির্মমতা মনে করলেন। তবুও হযরত মুহাম্মদ (সা) অঙ্গীকার পালনে অটল রইলেন।[২৬]

খলীফা আমীর মুআবিয়া (রা) ও রোমীয়দের (এশিয়া মাইনরের খ্রিস্টানদের) মধ্যে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কোন কারণে সন্ধির মেয়াদ শেষ না হতেই তাদের প্রতি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে হযরত মুআবিয়া (রা) সীমান্ত অভিমুখে সৈন্য চালনা করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে সাহাবী হযরত আমর

২৩. ড. আবদুল করিম যায়দান, ইসলামী রাষ্ট্র।
২৪. ১৭ : সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪।
২৫. মিশকাত শরীফ।
২৬. মিশকাত শরীফ।

বিন আস (রা) বলে উঠলেন– আল্লাহু আকবর। খলীফা, আপনি একি করছেন! অঙ্গীকার পূর্ণ করুন। বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, কারো সাথে কারো সন্ধি থাকলে কখনো যেন তার ব্যতিক্রম না করা হয়, যে পর্যন্ত না তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অথবা পূর্বাহ্নেই প্রতিপক্ষকে সন্ধি রহিত হলো বলে জানিয়ে দেয়া না হয়।[২৭]

১২। মর্যাদা ও চাকরির অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মর্যাদা ও চাকরির অধিকার রয়েছে। ইরাকের ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে তথাকার অমুসলমান অধিবাসীদের মোড়লদের ডেকে পরামর্শ করার জন্য খলীফা উমর ফারুক (রা) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন।[২৮]

মিশরের বিনয়ামীন নামক এক ব্যক্তি কিবতীদের নেতা ছিলেন। বিনয়ামীন স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও মর্যাদাবান ব্যক্তি জানতে পেরে খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) মিসরের শাসন কর্তা হযরত আমর বিন আস (রা)কে শাসন ব্যাপারে তার পরামর্শ গ্রহণ করতে লিখে পাঠান। সুতরাং আমর তার উপর কিবতীদের ব্যক্তিগত আইনের ভার অর্পণ করেন।[২৯]

অমুসলিমদের মধ্যে যারা বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে পেরেছে ইসলামী সমাজে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও মূল্যায়ন করেছেন। বনি খুযাআ গোত্র মহানবী (সা)-এর বিশ্বাসভাজন ছিলেন বলে মহানবী (সা) তাদের প্রতি বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভার অর্পণ করেছিলেন। তাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই মহানবী (সা) মক্কা অভিযান করেন, আর বনি খুযাআ'র সমস্ত লোক এই অভিযানে মহানবী (সা) সাথে শরীক হন।[৩০]

১৩। রাজপথে চলা : বর্ণহিন্দুদের সম্মানার্থে মাদ্রাজের অস্পৃশ্যদের যেরূপ পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে এরূপ কোন ব্যবস্থা নেই। ইসলাম সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে এক মাতা-পিতার সন্তান বলে মনে করে। এমন কি ইসলামে মুসলমানদের পক্ষে অমুসলমানদের উচ্ছিষ্ট খেতে কোন আপত্তি নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু 'উসামা প্রমুখের মতে মুসলমানদের পক্ষে অমুসলমানদের প্রতি প্রথমে অভিবাদন জ্ঞাপন করতেও কোন আপত্তি নেই।[৩১]

---

২৭. নাইলুল আওতার, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।
২৮. আল্লামা শিবলী নোমানী, আল ফারুক।
২৯. হুকুকুয যিম্মী ইন-ইছলাহী : পৃ. ৪৯।
৩০. আল্লামা শিবলী নোমানী, সীরাতুন্নবী।
৩১. নাইলুল আওতার, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

১৪। বাণিজ্য শুল্ক : ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের চেয়েও অমুসলিমদের জন্য বাণিজ্য শুল্কের ব্যাপারে কড়াকড়ি অনেক কম ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যিম্মীদের নিকট হতে তাদের পশু এবং অন্তর্বাণিজ্যে কোন শুল্কই উসুল করা হত না।[৩২]

অপরদিকে মুসলমানদের নিকট হতে পশু, কৃষি এবং অন্ত ও বহির্বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই শুল্ক (উশুর, উশর ও যাকাত) উসুল করা হত। এ কারণেই 'যিম্মী' অমুসলিমদের নিকট হতে কেবল মাত্রই বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছু দিন হরবীদের (যুদ্ধে বিজিত যিম্মী) পর্যন্ত শুল্ক হ্রাস করা হত। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) সিরিয়ার যৈতুন তেল ও গম ব্যবসায়ীদের শুল্ক অর্ধেক করে দিয়েছিলেন।[৩৩]

১৫। খারাজ : ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিকট থেকে খারাজ ও বাণিজ্য শুল্ক বেশি আদায় করা হয় অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। খারাজ শুধু কৃষিযোগ্য ভূমির উপরই ধার্য করার ব্যবস্থা রয়েছে। হযরত উমর ফারুক (রা) ইরাকের ভূমি জরিপ করিয়ে তার উপযুক্ততা অনুসারে তার খারাজ ধার্য করেছিলেন, অনাবাদী জমি এবং কারো কারো মতে বাস্তভিটাও খারাজের আওতা হতে বাদ দেয়া হয়েছিল।[৩৪]

ইসলামী হুকুমত খারাজ ধার্য ও তা উসুলের ব্যাপারে সর্বদা অমুসলমানদের প্রতি কোমল ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। হযরত উমর ফারুক (রা) তার মৃত্যুর পূর্বে একদিন ইরাকের রাজস্ব নির্ধারণকারী হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামন (রা) ও হযরত উসমান বিন হুনাইফ (রা)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন– তোমরা কোন ভূমির উপর তাদের শক্তির অতিরিক্ত খারাজ নির্ধারণ করনি তো? উসমান বললেন যা করেছি তার দ্বিগুণ করা হলেও নিশ্চয়ই তারা দিতে সক্ষম ছিল। হুযাইফা বললেন, যা করেছি তার অর্ধেক রেখে দিয়েছি।[৩৫]

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) উকবায় নিযুক্ত তার রাজস্ব কর্মকর্তাকে বলেছিলেন– দেখ, খারাজের জন্য কখনো তাদের গরু, মহিষ প্রভৃতি ও শীত গ্রীষ্মের বস্ত্র ক্রোক করবে না এবং তাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করবে! কোমল

---

৩২. মাবসুত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮০।
৩৩. মুয়াত্তা ইমাম মালিক : পৃ. ২৬৬।
৩৪. কিতাবুল আমওয়াল : পৃ. ৬৮।
৩৫. কিতাবুল আমওয়াল : পৃ. ৪০।

ব্যবহার করবে!! কোমল ব্যবহার করবে!!! আমার নির্দেশের ব্যতিক্রম করলে অপসারিত হবে।[৩৬]

১৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান : অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে এটা অবাধে করতে পারবে। তবে নির্ভেজাল ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতাও দিতে পারবে। আবার কোন ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলেও তাও করতে পারবে।

১৭। কর প্রদানে সুবিধা দান : কর আদায়ে অমুসলিমদের উপর কঠোরতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ। তাদের সাথে নম্র ও কোমল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তারা বহন করতে পারে না এমন বোঝা তাদের উপর চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত উমর ফারুক (রা) নির্দেশ ছিল, "যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলবে না।"[৩৭]

১৮। বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা ইত্যাদি : ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমান যেমন বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করে, অমুসলিমরাও অবিকল সেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। আইনসঙ্গতভাবে তারা সরকার, আমলা ব্যবস্থা এবং স্বয়ং রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে। ধর্মীয় আলোচনা ও গবেষণার যে স্বাধীনতা মুসলমানদের রয়েছে, তা আইনসঙ্গতভাবে তাদেরও থাকবে। অমুসলিমদের তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন চিন্তা ও কর্ম অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোন কাজ তারা আপন বিবেকের দাবি অনুসারে করতে পারবে।

১৯। চাকরি লাভের অধিকার : কতিপয় সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকরিতে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোন বৈষম্য করা চলবে না। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের যোগ্যতার একই মাপকাঠি হবে এবং যোগ্য লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নির্বাচন করা হবে।

২০। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশা : শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সকল পেশার দরজা অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মুসলিমগণ

---

৩৬. কিতাবুল আমওয়াল : পৃ. ৪৪।

৩৭. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৮।

যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে তা অমুসলিমরাও ভোগ করবে। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর সমান অধিকার থাকবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ যে বিরাট অধিকার ও সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে দুনিয়ার অপর কোন আদর্শিক রাষ্ট্রে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের শুধু বেঁচে থাকার অধিকারই দেয় না বরং তারা বেঁচে থাকার সর্ববিধ অধিকার লাভ করে। অমুসলিম নাগরিকদের জন্যে স্বয়ং আল্লাহ বা তাঁর রাসূলই নিরাপত্তার জিম্মাদার।

প্রশ্নাবলী

১। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা আলোচনা করো।
(Discuss about the Rights and Status of Non-Muslims in Islamic State.)

২। ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা করো।
(Discuss the Rights and Duties of Non-Muslim Citizens in Islamic State.)

১৩

ইসলামী রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র

Islamic State and Democracy

১৩.১ ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র একটি পরিচিত শব্দ, একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে একটি স্বীকৃত ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী দলের এজেণ্ডায় রয়েছে গণতন্ত্রের কথা, অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। আবার এমন সব দল বা ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যায়, যারা গণতন্ত্রকে ইসলামসম্মত মনে করেন না, কেননা গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে।

১৩.২ গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of Democracy)

১৩.২. ১ গণতন্ত্রের ধারণা প্রাচীন

গণতন্ত্র কোন নতুন ব্যবস্থা নয়। গণতন্ত্র মানবেতিহাসের মতোই পুরনো। মুহাম্মদ আল ব্যুরে লিখেছেন, গণতন্ত্র হল সরকার ব্যবস্থার ধরনের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিচিত একটি ধরন। ইতিহাসে এর মূল নিহিত রয়েছে অনেক পিছনে।[১] হযরত আদম (আ) এর সময় থেকেই এই ধারণার সৃষ্টি হয়। সেই সুদূর অতীত থেকে বিভিন্ন শতাব্দীতে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা একে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন অর্থে ও নানাভাবে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মবোর্ট মন্তব্য করেছেন, '... the most clusive and ambiguous of all political terms.'

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র বিভিন্ন ও

১. মুহাম্মদ আল ব্যুরে, প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, বিআইআইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৮৫।

বিচিত্র অর্থে ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমে বিভিন্ন অর্থে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হত।

১৩.২. ২ প্রাচীন ব্যাবিলনে গণতন্ত্র
Democracy in the Ancient Babylon

বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচারিত গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যদি হয় আইনের শাসন, তার প্রাথমিক সূচনা ঘটেছিল পাশ্চাত্যে নয়, প্রাচ্যে দজলা ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় অবস্থিত প্রাচীনতম ভূমি ব্যাবিলনে, যেটি বর্তমানে ইরাক নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যের মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায় পশুর ন্যায় জীবন যাপন করছিল, তখন মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম আইন রচিত হয়েছিল ব্যাবিলনে। 'খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে ব্যাবিলনের প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ শাসক হাম্মুরাবি (১৭০২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব) প্রণয়ন করেছিলেন এক শাসনবিধি যেটি ইতিহাসে হাম্মুরাবির দণ্ডবিধি (Code of Hammurabi) নামে পরিচিত। পারিবারিক (বিয়ে ও তালাক), অর্থনৈতিক (মূল্য, শুল্ক ও বাণিজ্য), ফৌজদারি, (হামলা ও চুরি) ও দেওয়ানি (দাসত্ব ও ঋণ) ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ২৮২টি বিষয়ে আইনের সমাহার হাম্মুরাবির এই দণ্ডবিধি ছিল এক বিশদ আইন যা ব্যাবিলনে গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

১৩.২. ৩ প্রাচীন ইরানে ও ভারতে গণতন্ত্র
Democracy in the Ancient Iran and India

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'গণতন্ত্র কেবল পশ্চিমা কিংবা ইউরোপীয় ধারণা ভাবাটা ভুল হবে... একই সময়ে ইরান ও ভারতীয় সমাজও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতি-নীতির চর্চা করেছে।' তাঁর মতে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণতন্ত্র ব্যাপকতম অর্থে জনগণের বিচার বুদ্ধির অনুশীলন... ভারতে যুক্তি-তর্কসহকারে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠানের এক সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী ঐতিহ্য রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকাশ্যে জনসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজধানী পাটনায়।[২] এছাড়াও মোঘল সম্রাট আকবর ১৫৯০ এর দশকে আগ্রায় বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীদের মধ্যে বিশ্বের প্রথম সুপরিকল্পিত প্রকাশ্য আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেটা এমন এক সময়ে করা হয় যখন ইউরোপে ধর্মীয় অপরাধ তদন্তের জন্য রোমান ক্যাথলিক যাজকদের বিচার সভা চলছিল।

---

২. অমার্ত্য সেন, Contrary India, The Economist, ডিসেম্বর ৩, ২০০৫।

১৩.২. ৪ প্রাচীন গ্রীসে গণতন্ত্র

Democracy in the Anciest Greece

গ্রীকরা গণতন্ত্র শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে। 'Demos' ও 'Kratos' এ দুটি গ্রীক শব্দ থেকে ইংরেজি Democracy শব্দটি সৃষ্টি। গ্রীক শব্দ 'ডেমস' মানে হল জনগণ এবং 'ক্রেটস' মানে হল শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জনগণের শাসন। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরীতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে। গ্রীক ঐতিহাসিক থুসাইডিডেস (Thucydides) পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাসে গণতন্ত্র শব্দটি উল্লেখ করেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিরোডটাস (Herodotus) নামে এক গ্রীক ঐতিহাসিক গণতন্ত্রের ধারণার আলোচনায় 'বহুজনের শাসন' এবং সমাজে 'সমঅধিকারের' কথা বলেছেন। এই সময় ক্লিওন (Cleon) নামে আর একজন গ্রীক পণ্ডিত গণতন্ত্রকে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে প্লেটো-এরিস্টটলের আমলে গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। এই সময় গণতন্ত্র বলতে 'জনগণতন্ত্র' (Mobocracy) কে বুঝানো হত এবং তা নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হত। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস (Pericles) এর মতানুসারে যেখানে সরকারী কর্মচারিগণ গুণগত বিচারে নিযুক্ত হয় এবং আইনানুসারে যেখানে সকলে সমান, তেমন এক সরকারই হল গণতন্ত্র। তিনি এথেন্সকে আদর্শ গণতন্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমের নগর রাষ্ট্র (City State) গুলিকে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রীক গণতন্ত্র ছিল একটি নির্দেশনা, যা সরকারী কার্যাবলীতে তার নাগরিকদের প্রকৃত অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। গ্রীক গণতন্ত্র বৈশিষ্ট্যায়িত হতে পারে 'জনগণের উপর জনগণের একটি সরকার হিসেবে'।

১৩.২. ৫ রোমে গণতন্ত্র

Democracy in Rome

প্রাচীন রোমে ছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের অবসানের পর 'প্যাট্রিসিয়ান' (Patrician)দের ক্ষমতা দখল এবং তারও পরে 'প্লেবিয়ান' (Plebeians) দের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিণতিতে উভয় তরফই সমানাধিকারের সুযোগ পায় এবং সমসাময়িক শাসনব্যবস্থা অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এক সংযুক্ত রূপ ধারণ করে। রোমে অভিজাত শ্রেণীর শাসন বলবৎ হয়। তবে

শাসক নির্বাচনের নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। বস্তুতপক্ষে প্রাচীনকালের রোমের নগর রাষ্ট্র (City State) গুলোকে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা যায়। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিকাশে রোমক আইনের অবদান ও প্রভাব অনস্বীকার্য।

১৩.২. ৬ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র
Democracy in the Islamic State of Medina

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'গণতন্ত্র' একটি বহুল আলোচিত বিষয়। প্রাচীনকালে আরব উপদ্বীপে এই ধারণার বিকাশ ঘটে। আরব উপদ্বীপের মক্কা নগরীতেই গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে। আরবের সমাজব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক সংস্থা ও রীতিনীতির অস্তিত্ব দেখা গেছে। আরবে সভা, সমিতি, আলমালা (মক্কার পরামর্শ সভা), বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ, মজলিস, নাদিউ কাউম, নদওয়া, মশওরা, কিয়াদাহ্‌, সেদানা, হিযাবা, সেকায়া, ইফাদা, ইজাজাহ্‌, নসি, ইমরাতুল বাইত, কুব্বা, আন্নাহ্‌, রিফাদাহ্‌, আমওয়ালে মাহজরা, ইসার, এশনাক, হুকুমাহ্‌, সেফারা, ইকাব, বুয়া, হিলওয়া নুন নফর প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সংস্থা বর্তমান ছিল। এছাড়াও তাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ২১টি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] সে সময় জনসাধারণের বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয়। 'দারুন নাদওয়া'তে মক্কার পরামর্শ সভা (পার্লামেন্ট) ও 'সাকিফা বানু সায়ীদা'তে মদীনার পরামর্শ সভার (পার্লামেন্ট) অধিবেশন বসত। মহানবী (সা) কর্তৃক মদীনায় কেন্দ্রীয় ইসলামী সরকার গঠনের পর মজলিসে খাস (বিশেষ পরামর্শ পরিষদ), মজলিসে আম (সাধারণ সভা) এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ সময় জনগণ সমানাধিকারের সুযোগ পায়। নাগরিকদের স্বাভাবিক সাম্য, আইনানুসারে চলার প্রবণতা, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও শাসক নির্বাচনের নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। তদানীন্তন আরবের গোত্রীয় সমাজেরও নেতৃত্ব নির্বাচন ও পরামর্শ সভার মাধ্যমে স্থানীয় ও গোত্রীয় বিষয়াদি সম্পাদনের ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। মদীনায় ইসলামী বিপ্লব গণতান্ত্রিক ধারণার বিকাশে সাহায্য করেছে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, আইনের শাসন ইত্যাদি মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রেই বিকশিত হয়েছিল।

---

৩. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, আহাদে নববী মে নেজামে হুকুমরানী, পৃ. ৩৩।

১৩.২. ৭ পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র
Western Democracy

আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক ধারণার সূত্রপাত ঘটে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধনতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাতের সময় থেকে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। উদার নৈতিক গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে। তবে গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে। শেষের দিকে গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, হিতবাদ ও উদার নৈতিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং উদার নৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অনেকের মতে উদার নৈতিক গণতন্ত্র হল পুঁজিবাদী দেশসমূহের গণতন্ত্র। আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এ আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র ক্ষমতার সরাসরি চর্চার চেয়ে ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকেই সূচিত করে। আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে 'জনগণের ক্ষেত্রে যারা শাসিত হচ্ছে এবং যারা শাসন করে তারা এক নয়।[৪]

১৩. ২. ৮ শোষিতের গণতন্ত্র
Democracy of the Oppressed

মার্কসবাদীদের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতে সৃষ্ট শোষিতের গণতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy)ই যথার্থ গণতন্ত্র। সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর গণতন্ত্রের এই নতুন রূপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দাবি করা হয় যে, গণতন্ত্রের আদর্শ কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই যথাযথভাবে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। লেনিন মন্তব্য করেছেন : 'It marks a break with bourgeois democracy and the rise of a new, epoch-making type of democracy, namely, proletariat democracy on the dictatorslip of proletariat.'

১৩.৩ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Democracy)

বিভিন্ন লেখক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে নির্দেশ করেছেন। গণতন্ত্রের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. **লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)**-এর মতে, যে শাসনব্যবস্থায় জনসমষ্টির অন্তত

৪. International Encyclopedia of Social Sciences, ১৯৬৮, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫।

তিন-চতুর্থাংশ নাগরিক এবং তাদের অধিকাংশের মতে শাসনকার্য পরিচালিত হয় তাই গণতন্ত্র। ('A government in which the will of the majority of qualified citizens rules...')

২. **অধ্যাপক সিলী (Selley)**-এর মতে, গণতন্ত্র এমন এক সরকার যার পরিচালনার প্রত্যেকে অংশীদার। (A government in which everybody has a share)

৩. সি এফ স্ট্রং (C.F. Strong) এর মতে, শাসিতদের সক্রিয় সম্মতির উপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলা হয়।

৪. **অধ্যাপক ডাইসি (Dicey)** বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোক সংখ্যার বিরাট অংশ। (A form of government in which the governing body is comparatively large fraction of the nation.)

৫. **ডি. ডি. র‍্যাফেল (D. D. Raphal)** বলেন, 'Democracy in practice has to mean following the view of the majority.'

৬. **প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের সংজ্ঞা**– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক[৫] প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) (১৮০৯-১৮৬৫) প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র হল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন (Democracy is a government of the people, by the people and for the people.) ১৮৬০ এর দশকে সংজ্ঞাটি প্রদান করার পর থেকেই এটি গণতন্ত্রের একটি সার্বজনীন ব্যাখ্যা হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে।

লিঙ্কনের এ সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণে বলা যায় যে,

১. **গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হল জনসাধারণের কল্যাণের জন্য (of the people)** : এই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে। সুইজির মতানুসারে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎস হল জনগণ এবং জনগণ ও

---

৫. ১৮৬০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আব্রাহাম লিঙ্কন রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে জয় লাভ করেন। ১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল গুড ফ্রাইডের রাত্রে উইকলি বুথ নামে এক উগ্র বর্ণবাদী তাকে গুলি করেন। ১৫ এপ্রিল লিংকন মৃত্যুবরণ করেন। দাসপ্রথা রহিত করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে লিংকন কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর গেটিসবার্গের ভাষণ অনবদ্য।

সরকার অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদিও সরকার কিছু লোক দ্বারাই পরিচালিত হয় বটে কিন্তু সরকার এমন হতে হবে যেন সকল জনগণ মনে করে সরকার তাদের সকলের ।

২. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের দ্বারা পরিচালিত (by the people) : অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় সকলেই অংশগ্রহণ করে তা হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃকই পরিচালিত হতে হবে।

৩. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হল জনগণের জন্য তথা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা (for the people) : গণতান্ত্রিক সরকার কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়। সর্বসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত হয়। সরকারকে জনগণের খেদমতের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের বিশেষ একটি পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র। গণতন্ত্র বিশ্বজনীন একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। জনগণের অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতিকেই বলে গণতন্ত্র। নীতিগতভাবে এ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করে। সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকুক এটা প্রত্যেক সরকারের ঐকান্তিক কামনা। গণতন্ত্র অনেকটা স্পর্শ মণির মতো, এর স্পর্শে সবকিছু সোনা হয়ে উঠে। গণতন্ত্রের স্পর্শ লাভ করেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা বৈধতা অর্জন করে। এ কারণে স্বৈরাচারী একনায়কগণও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। অন্যকথায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিপুল জনপ্রিয় ও সার্বজনীন পদ্ধতি। ভিন্ন মত এবং পথের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বৈরী ধুলিঝড়ের মধ্যে গণতন্ত্র সৃষ্টি করে সমাজে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের উপযোগী কাঠামো। বাসযোগ্য করে রাজনৈতিক সমাজকে।

১৩.৪ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristies of Democracy)

গণতন্ত্র পরীক্ষার জন্য রয়েছে ৬টি পদ্ধতি। কোন শাসনব্যবস্থাকে এই ৬ পদ্ধতির মানদণ্ডে বিচার করে বুঝতে হবে তা গণতান্ত্রিক কিনা। যেমন–

১. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার : দেখতে হবে শাসনব্যবস্থায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারে সরকার গঠিত হয় কিনা।

২. নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা : নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারকে পরিবর্তন করা যায়

কিনা। গণতান্ত্রিক সরকার হলো শাসনতান্ত্রিক সরকার, যাকে এরিস্টটল বলেছেন, নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Constitutionalism)

৩. **দলীয় ব্যবস্থা :** রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দল গঠন, মত প্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কি না।

৪. **অধিকার ব্যবস্থা :** জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষার সুবন্দোবস্ত রয়েছে কি না।

৫. **অধিকার সংরক্ষণ :** প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আইনগতভাবে সংরক্ষিত হয় কিনা।

৬. **সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা :** জনসাধারণ এই আশ্বাস পেয়েছে কিনা যে, সুষ্ঠু বিচার ছাড়া তাদের অহেতুক বন্দীদশা ভোগ করতে হবে না বা অন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

ফলপ্রসূ কার্যকারিতার (Functionally) ভিত্তিতে গণতন্ত্রের দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

প্রথমত. শাসন বিভাগ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আইন সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ (Accountable)।

দ্বিতীয়ত. গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে।

উপরের মানদণ্ডের উপস্থিতিতে যে কোন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হতে সক্ষম। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকলে সে ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত হবে না।

১৩.৫ গণতন্ত্রের মূলনীতি (Principles of Democracy)

গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিযোগী ভাবাদর্শ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এটি সহনশীলতা ও আপোষের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সংখ্যাগুরুর শাসনকে মেনে নেয়ার এবং বিরোধী ভাবাদর্শকে সুযোগ দেয়ার মনোভাবই গণতন্ত্র। কতগুলো বিশেষ মূলনীতির উপর গণতন্ত্র ভিত্তিশীল। মূলনীতিগুলো হচ্ছে :

১. **সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন :** যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন লাভ করে তাদেরই সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে।

২. **সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান :** নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও

নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। এরূপ সরকারকে বিরোধী দলও বৈধতা ও নৈতিকভাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

৩. সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার : সরকারের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করার ক্ষেত্রে জনগণের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইন শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ।

৪. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার পরিবর্তন : নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতার পটপরিবর্তন হতে হবে। জনগণের মতামত ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৫. সংবিধান অনুসৃতি : সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা সংবিধানে বিধিবদ্ধ হতে হবে, অসাংবিধানিক কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

১৩.৬ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত (Preconditions of Democracy)

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হিসেবে রবার্ট ডাল সাতটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিবরণ দিয়েছেন। শাসন ব্যবস্থায় এদের উপস্থিতি ঘটলে সে ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা যায়। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার : নীতি নির্ধারণ এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করা থাকবে। সংবিধান কর্তৃক তা স্বীকৃত হবে।

২. নিয়মিত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন : কর্মকর্তা নির্বাচন এবং অপসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায়, নিয়মিত।

৩. সার্বজনীন ভোটাধিকার : নির্বাচনে প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা থাকতে হবে।

৪. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ : শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। অন্যকথায় নির্বাচনে তারা শুধু ভোটাধিকারই প্রয়োগ করেন তা নয়, প্রার্থী হিসেবেও দাঁড়াতে পারেন।

৫. মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা : বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যধারা পর্যালোচনা ও সমালোচনা তথা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনায় নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃত থাকতে হবে।

৬. তথ্য ভাণ্ডারে সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত থাকবে : রাষ্ট্র এবং সমাজ সংক্রান্ত তথ্য এবং তথ্যের উৎস এমনভাবে পরিচালিত হবে যে তার উপর সরকার বা বিশেষ সুবিধাভোগী কোন গ্রুপের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৭. রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার : সংঘ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দল গঠনে নাগরিকদের অধিকারে স্বীকৃতি থাকতে হবে, যার মাধ্যমে তারা বিকল্প সরকার গঠনে অথবা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে। রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করে এবং সরকারের বিকল্প হিসেবে প্রতিযোগিতায় রত থাকে।

এসব প্রক্রিয়া কোন দেশে কার্যকর থাকলে বুঝতে হবে ঐ দেশে গণতন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রের পথে চলতে শিখেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করার মানসিকতা অর্জন করেছে। অভিজ্ঞতার পশরা জমিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেছে।

১৩.৭ গণতন্ত্রের ইসলামী বিশ্লেষণ (Islamic Analysis of Democracy)

ইসলামী প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শব্দগত মারপ্যাচের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিষয়টি ভালভাবে বুঝা দরকার। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক বিশ্বে ইসলামী দলসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ, ইসলামী পণ্ডিতগণ এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন যেখানে সরকার পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবে। সকলের মত প্রকাশের অধিকার তথা ভোটাধিকার থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, মৌলিক মানবাধিকার রক্ষিত হবে ইত্যাদি। এটি দেখা যাচ্ছে যে, যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলা হয় তখন তার পূর্বশর্ত হিসেবে এসবের কথাই বলা হয়। অর্থাৎ গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে

যে, ইসলামী দলগুলোর সরকার ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠন কাঠামো একই ধরনের।

তত্ত্বগতভাবে বলা যায় যে, কেবল সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে যেখানে ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মুখ্য সেখানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, সার্বভৌমত্বের ধারণা পাশ্চাত্যে এক রকম নয়। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ রকম কথা বলেছেন যে, সার্বভৌমত্বের ধারণার কোন প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তকে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে তেমন গুরুত্বের সাথে আলোচনাও করা হয় না। তবে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত্ব শব্দটির আপত্তি সম্পর্কে এ সময়ের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ 'আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী' রচিত 'Priorities of The Islamic Movement in the Coming Phase' বইয়ের The Movement and Political Freedom and Democracy শীর্ষক আলোচনার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে–

The fear of some people here that democracy makes the people a source of power and even legislation (although legislation is Allah's alone) should not be heeded here, because we are supposed to be speaking of a people that is Muslim in its majority and has accepted Allah as its Lord, Mohammad (sm) as its Prophet and Islam as its Religion. Such a people would not be expected to pass a legislation that contestable Islam and its incontestable principles and conclusive rules. Any way these fears can be over come by one article (in the constitution) that any legislation contradicting the incontestable provisions of Islam shall be null and void.

অর্থাৎ কিছু সংখ্যাক মানুষের ভয় গণতন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার উৎসে পরিণত করে এবং আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয় (যদিও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার), তার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। কারণ আমরা এমন এক মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কথা বলছি যারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আল্লাহকে তাদের প্রভু হিসেবে, মুহাম্মদ (সা)-কে তাদের নবী এবং ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে। আশা করা যায়, এ ধরনের মানুষ এমন আইন

প্রণয়ন করবে না যা ইসলামের অকাট্য নীতি ও সিদ্ধান্তমূলক আইনের পরিপন্থী হবে। যা হোক, এ ব্যাপারে সকল ভয় দূর করতে সংবিধানে একটি ধারা যোগ করে যে ইসলামের অকাট্য বিধান ভঙ্গ করে কোন আইন করা যাবে না।

এছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ তথা উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে মহাকবি আল্লামা স্যার ড. মুহাম্মদ ইকবাল-এর মতামত হচ্ছে এ রকম :

"ইসলাম গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছিল যে, বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক ও বাহক হলো উম্মত এবং যেসব কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী তাদের নেতা নির্বাচনের নিমিত্ত গ্রহণ করে তার অর্থ শুধু এই যে, তারা তাদের সম্মিলিত ও স্বাধীন নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা উক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এমন একজন নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাঝে ন্যস্ত করে দেয়, যারা তাকে উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে। ইসলামী আইন প্রণয়নের ভিত্তি মিল্লাতের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি ও যৌথ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৬] একটি দেখা যাচ্ছে যে অনেক ইসলামী পণ্ডিত গণতন্ত্র শব্দকে শর্তসাপেক্ষে ইসলামের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন-এর 'মহাকবি' বইতে বলা হয়েছে যে, আল্লামা ইকবাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু আল্লামা ইকবাল তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। 'রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম'-এর ৬ষ্ঠ ভাষণে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল আরও বলেন, "ইসলামী রাষ্ট্র স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্থিতিশীলতার চিরন্তন বিধানসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির নীতিমালা শুধু ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং যেসব শক্তি মুসলিম বিশ্বে কার্যরত রয়েছে তাকেও সুসংহত করা অপরিহার্য।"[৭]

আল্লামা ইকবালের মতে, গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি রূহানী ও নৈতিক হয় তাহলেই তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতি। রূহানী গণতন্ত্রের মানে হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে, আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনে মানুষের গণতন্ত্র। ইসলামী রাষ্ট্রকে এ কারণেই তিনি 'রূহানী গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইংরেজি পত্রিকা 'নিউ এরার' ২৮ জুলাই ১৯১৭ সালের সংখ্যায় আল্লামা ইকবাল লেখেন,

---

৬. আল্লামা ইকবাল, ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, লাহোর ১৯১০-১৯১১। দ্রষ্টব্য : মহাকবি ইকবাল, ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পৃ. ২৩৪।

৭. দ্রষ্টব্য : মহাকবি ইকবাল, লেখক ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পৃ. ২৩৫।

"ইউরোপে গণতন্ত্র অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজসমূহের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ থেকে জন্ম নেয়। কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্র অর্থনৈতিক সুযোগের সম্প্রসারণ থেকে জন্ম নেয়নি, বরং এটা একটি রূহানী নীতি যা ঐ কথার ভিত্তিতে এসেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলো সুপ্ত শক্তির এমন একটি আধার, যার সম্ভাবনাসমূহকে এক বিশেষ গুণ ও চরিত্রের দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।"[৮]

অর্থাৎ ইসলাম এমন এক গণতন্ত্র দিয়েছে যা আল্লাহর আইনের অধীন।

অন্যদিকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) পঞ্চাশ বছর পূর্বে তাঁর 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' বইতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য The Democracy শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি Democracy বা গণতন্ত্র শব্দটি পরিত্যাগ করেননি বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে তাকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রদত্ত বক্তব্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

করাচীর 'আখবারে জাহান' পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের ২ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেন, "ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পরের বিরোধী নয়। গণতন্ত্র সেই শাসনব্যবস্থার নাম, যেখানে জনমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত, পরিচালিত ও পরিবর্তিত হয়। ইসলামী শাসনব্যবস্থাও তদ্রূপ। তবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভিন্ন। কেননা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র লাগামহীন হয়ে থাকে। জনগণের রায় হালালকে হারাম করে দিতে পারে, যেমন : ব্রিটেনে হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে, ইসলামী গণতন্ত্র কুরআন ও হাদিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গোটা জাতি চাইলেও ইসলামের সীমানার বাইরে গিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সমাজতন্ত্র এর ঠিক বিপরীত। সমাজতন্ত্র একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের নাম। তার রয়েছে নিজস্ব আকীদা বিশ্বাস, দর্শন ও নৈতিকতা। ইসলামের সাথে তার কোনই মিল নেই।[৯]

লণ্ডনের মাজাল্লাতুন গুরাবা পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেন, "যুগের লোকদের কথা বুঝানোর জন্য আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করা তো অপরিহার্য। তবে এগুলো ব্যবহারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোন কোন পরিভাষা বর্জন করা ভালো এবং ওয়াজিব, যেমন : সমাজতন্ত্র। আর কোন কোনটার ব্যবহার এ শর্তে জায়েয যে, তার

৮. দ্রষ্টব্য : মহাকবি ইকবাল, লেখক ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন পৃ. ২৩৯।

৯. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) সাক্ষাৎকার, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা পৃ. ২৬৩।

ইসলামী তাৎপর্য ও পাশ্চাত্য তাৎপর্যের পার্থক্য পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন : গণতন্ত্র, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সংসদীয় পদ্ধতি।[১০]

এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানে যখন বর্তমান বিশ্বের প্রথম ইসলামী সংবিধান রচিত হচ্ছিল তখন তার মধ্যে গণতন্ত্র শব্দটি নিয়ে নেয়া হচ্ছে আলেমদের সমর্থনে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে শাসনতন্ত্রের ভূমিকা আলেমরাই প্রণয়ন করেছিলেন প্রথমত একটি আদর্শ প্রস্তাবনারূপে। এ ভূমিকায় গণতন্ত্রের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে :

Where in the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, should be fully observed.

অনুবাদ : যেখানে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নীতি ইসলামে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পুরোপুরি সেভাবে মান্য করা হবে।[১১]

অর্থাৎ ইসলাম গণতন্ত্রকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা সেভাবেই অনুসৃত হবে। এর অর্থ হচ্ছে আলেমগণ, ইসলামী রাজনীতিকগণ শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্র শব্দটি, গণতন্ত্র পরিভাষাটি এবং তা দ্বারা যা বুঝায় তা গ্রহণ করেছেন। এটি আরো দেখা যাচ্ছে যে, আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী তাঁর 'Priorities of The Islamic Movement in the Coming Phase' বইয়ের একটি আলোচনার শিরোনাম করেছেন, 'The Movement and Political Freedom and Democracy.' তিনি এতে দেখিয়েছেন যে, ইসলাম কোন স্বৈরাচার এবং রাজতন্ত্র সমর্থন করে না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, Political Freedom-এর মধ্যেই ইসলাম বিকশিত হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও ইসলাম, গণতন্ত্র থেকে ব্যাপক একটি বিষয়, একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, তথাপি তিনি গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন এবং ইসলামে মানুষের জন্য যে সকল মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন। তবে যারা ভয় পায় যে, গণতন্ত্রের নামে ইসলাম বিরোধী আইন প্রণীত হতে পারে, তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য সংবিধানে 'কুরআন ও সুন্নাহ

---

১০. পূর্বোক্ত পৃ. ২৫৫।

১১. দ্রষ্টব্য : ১৯৭৩ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা।

বিরোধী কোন আইন পাস করা যাবে না' এমন ধারা সংযোজনের পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন,

"However, the tools and guaranties created by democracy are as close as can ever be to the realization of the political principles brought to this earth by Islam to put a leash on the ambitions and whims of rulers. These principles are : shura (consultation), good advice enjoining what is proper and forbidding what is evil, disobeying what illegal orders, resisting unbelief and changing wrong by force whenever possible. It is only in democracy and political feeedom that the power of Parliament is evident and the people's deputies can withdraw confidence from any government that breaches the Constitution, and it is only in such an environment that strength of free press. free parliament, opposition and the masses is most felt.

অনুবাদ : যাহোক, গণতন্ত্র যে সকল নীতি ও নিশ্চয়তা দান করেছে তা শাসকদের উচ্চাশা ও খেয়ালীপনার উপর একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপের নিমিত্তে ইসলাম পৃথিবীতে যে সকল রাজনৈতিক নীতির অবতারণা করেছে তার নিকটতম। এ সকল নীতিসমূহ হচ্ছে শুরা (Consultation), নসীহত (পরামর্শ প্রদান), যা সঙ্গত তার আদেশ দেয়া, যা খারাপ তা বর্জন করা, অবৈধ আদেশসমূহ অমান্য করা, নাস্তিকতা প্রতিরোধ করা এবং যখনই সম্ভব শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। স্বাধীন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং গণতন্ত্রেই কেবল সংসদীয় পদ্ধতির বৈধতা ও ক্ষমতা স্বীকৃত এবং জনগণের প্রতিনিধিগণ যে কোন সরকারের উপর সংবিধান লঙ্ঘনের অপরাধে অনাস্থা স্থাপন করতে পারেন এবং এটা (গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা) এমন একটি পরিবেশ যেখানে স্বাধীন সংবাদপত্র, নিরপেক্ষ সংসদ, বিরোধী দলের অবস্থান এবং জনসাধারণের মতামত সর্বাপেক্ষা প্রতিফলিত।[১২]

---

১২. আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ..."Priorities of The Islamic Movement in The Coming Phase' বইয়ের "The Movement and Political Freedom and Democracy" শীর্ষক আলোচনা।

খিলাফত মানেও গণতন্ত্র। খিলাফত হলো প্রতিনিধিত্ব। জনগণের যারা প্রতিনিধি তারা রাষ্ট্রশাসন করবেন। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি গণ্য হবেন, ইসলাম মোতাবেক শাসন করবেন এটাই খিলাফত। গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন করবেন। খিলাফতের বাংলা অনুবাদ গণতন্ত্র করা যেতে পারে। গণতন্ত্র মানে আল্লাহর শাসন লঙ্ঘন নয়। আল্লাহর বিপরীতে জনগণের শাসন এটি মুসলিমগণ বলতে পারে না। এটি বলা যেতে পারে যে রাজার শাসনের বিপরীতে জনগণের শাসন। মিলিটারী ডিক্টেশনের বিপরীতে জনগণের শাসন। গণতন্ত্র বলতে আল্লাহর শাসনের বিপরীতে কিছু– এটি একেবারেই ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে জনগণ রাজার শাসন, স্বৈরশাসন কিংবা সামরিক শাসন চায় না। সবাই জনগণের শাসন চায়। এ শাসন জনগণের। বাস্তবে শাসন তো আল্লাহ তা'আলা করেন না। আল্লাহ মানুষকে খলীফা করে পাঠিয়েছেন। মানুষই সে খলীফার দায়িত্ব পালন করে। দুনিয়া চালাবে খলীফারা।[১৩]

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম জনগণ ভোটাধিকার, আইনের শাসন এবং জনগণের নির্বাচিত সরকারই চায়। এসব বুঝাবার জন্যই আজকাল 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সার্বিক প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, শর্তাধীনে 'গণতন্ত্র' শব্দ গ্রহণ করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে যে ইসলাম আগ্রাসী এবং একনায়কত্ববাদী (Violent, Authoretarian) এসব দূর হবে। মুসলিম বিশ্বেও এর ফলে রাজা বাদশাহ, সাময়িক একনায়ক ও স্বৈরশাসকগণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন শাসনতন্ত্র এবং বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইতোমধ্যেই শর্তসাপেক্ষে 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছেন। এটাই সংগত এবং মুসলিম জনগণ এ মত গ্রহণ করতে পারে।[১৪]

১৩.৮ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বনাম ইসলামী গণতন্ত্র (Western Democracy Vs. Islamic Democracy)

মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটি ছিল মানব জাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক নীতিমালা ছিল এ রাষ্ট্রের

১৩. শাহ আবদুল হান্নান, আমার কাল আমার চিন্তা, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ১৮৯-১৯০।

১৪. শাহ আবদুল হান্নান, দেশ, সমাজ ও জাতি। কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৯৬-১০১।

ভিত্তি। মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা ছিল কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। এ শাসনব্যবস্থা ছিল জাহেলিয়াতের যুগের সকল অন্যায়, অত্যাচার ও বে-ইনসাফী হতে মুক্ত। আজ অনেকে বলতে চান ইসলামে নাকি গণতন্ত্র নেই। এ ধারণা ভ্রান্ত। ইসলামই মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার (State and government) এ জীবনব্যবস্থার দু'টি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম মনে করে দুনিয়ার মানুষের স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় ইসলাম গণতান্ত্রিক নীতিমালাকেই বেছে নিয়েছে। তবে ইসলামে পাশ্চাত্য ধাঁচের সেকুলার গণতন্ত্র নেই যা বিশ্ব চাহিদার উপযোগী নয়। পাশ্চাত্যের সেকুলার গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব দাবি করা হয়। যদিও প্রকৃত বিশ্লেষণে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকট সার্বভৌমত্ব আছে বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের ভাষায় গণতন্ত্র হলো ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ জনগণের শাসন। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য শাসন বলা হয় (Government of the people, by the people and for the people)। এ শাসনব্যবস্থায় সত্যের মানদণ্ড ও আইনের উৎস হচ্ছে জনগণের ইচ্ছা ও মতামত। জনগণই হয় এখানে সর্বময় ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। জনগণের এ কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এর চেয়ে বড় আর কোন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নেই। ইসলামী গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হচ্ছে, Rulership of Allah on men by pious ruler with justice. অর্থাৎ আল্লাহর শাসন জনগণের উপর, সৎ লোকদের দ্বারা, ন্যায়বিচারসহকারে। অন্য কথায়, আল্লাহর শাসন, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য। আল্লাহর এ শাসন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ পরিচালনা করবেন। তাই ইসলামে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকে বুঝানো হয়ে থাকে।

১৩. ৯ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Western Democracy and Islamic Democracy)

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

পার্থক্যের ভিত্তি	পাশ্চাত্য গণতন্ত্র	ইসলামী গণতন্ত্র
১। মূলভিত্তি	১। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের তিনটি মূলভিত্তি হলো জনগণের সার্বভৌমত্ব, সেকুলারিজম ও পুঁজিবাদ।	১। ইসলামী গণতন্ত্রের তিনটি মূলভিত্তি হলো তাওহীদ বা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রিসালাত তথা রাসূলের নেতৃত্ব এবং খেলাফত তথা জনগণের প্রতিনিধিত্ব।
২। সার্বভৌমত্বের ধারণা	২। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের দাবি করা হয়। জনগণই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছা ও মতামত। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইন সভাই সকল ক্ষেত্রে আইনদাতা। সার্বভৌমত্ব মানুষেরই করায়ত্ব। অন্যকথায়, Sovereignty belongs to the people. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। অর্থাৎ জনগণই দেশের ও জাতির সর্বময় ক্ষমতার মালিক। জনগণই দেশের আইনের উৎস। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী, জনগণের ইচ্ছা পূরণার্থে এবং জনগণের স্বার্থে আইন প্রণীত হবে। বলা হয় জনগণ সর্বশক্তিমান। এ	২। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরোধ রয়েছে। কারণ ইসলামে সকল নাগরিক চাইলেও আল্লাহর আইন বদলানো যাবে না। ইসলামের মতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। ইসলামী গণতন্ত্রে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। অন্য কথায়, Sovereignty belongs to Allah. যে রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশভাবে গৃহীত হয় তাই ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং জনগণ তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে মনে করা হয়।

	ব্যবস্থা কার্যত মানুষের নিরঙ্কুশ শাসন। সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতেই ব্যবহৃত । এ সার্বভৌমত্বের বলেই মানুষ মানুষের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী।	
৩। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক	৩। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদা (Church and state are seperated)। এ গণতন্ত্রে ধর্মীয় নীতি ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি একটার থেকে অন্যটা সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্ম থাকবে ধর্মের জায়গায়, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তার কোন দখলদারি থাকবে না। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ব্যক্তিগত জীবনে চাইলে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে পারে। কিন্তু ধর্মকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমগ্র কার্যধারা থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।	৩। ইসলামী গণতন্ত্রে ধর্ম তথা দীন ও রাষ্ট্র একই সূত্রে গ্রথিত (Religion) Din and state are united)। ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও নীতিমালা দিয়েছে। খিলাফত তত্ত্ব হচ্ছে ইসলামের মূল রাষ্ট্রতত্ত্ব। যার মূল কথা : সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ্। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মূল সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশরূপে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। একজন মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে ইসলামে বিশ্বাসী ও ইসলামের অনুবর্তী। একজন মুসলিম যেমন ব্যক্তি জীবনে ইসলামের অনুবর্তী হবে, তেমনি তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামের অনুবর্তী হতে হবে। কাজেই ইসলামী তত্ত্বে রাজনীতি ও ইসলামকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই।

৪। আইনের শাসন	৪। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দলের শাসন সেজন্য তাদের রচিত আইনই হয় দেশের আইন (Law of the land)। তাই মানতে বাধ্য হয় গোটা জনগণ। এভাবে জনগণ হয় মানব রচিত আইন দ্বারা শাসিত। অন্যকথায়, জনগণের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে বসে যে আইন তৈরি করে সে আইনে আল্লাহ, রাসূল ও আসমানী কিতাবের অনুশাসন মেনে চলার কোন প্রশ্নই উঠে না এবং এমনকি প্রচিলিত নৈতিক মূল্যবোধেরও তোয়াক্কা করা হয় না।	৪। ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত সুন্নাহই আইনের প্রধানতম উৎস। অন্যকথায়, Rule of the Shariah is the governing principle. আইনকানুন, নিয়মনীতি সব কিছুরই মূল উৎস হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ। প্রকৃতপক্ষে আইনের নিরপেক্ষ শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনের অধীনেই চালু করা সম্ভব। মানব রচিত আইনের এমন নৈতিক মর্যাদা সৃষ্টি হতে পারে না যা পালন করার জন্য মানুষ অন্তর থেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মানুষের তৈরি আইনকে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ থেকে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টাকে কেউ বড় দোষ মনে করে না। কিন্তু আল্লাহর আইনের বেলায় পুলিশ থেকে বেঁচে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা নেই বলে এর নৈতিক প্রভাব গভীর।
৫। ভোট সম্পর্কিত ধারণা	৫। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ভোটকে অনেক ক্ষেত্রেই আমানত মনে করা হয় না। প্রত্যেক প্রার্থী নিজের বা নিজ দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে ভোট প্রার্থনা করে। সেজন্য	৫। ইসলামে ভোটাধিকারকে আমানত মনে করা হয়। এ আমানত প্রয়োগ করেই বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি আমানতের

	ক্যানভাসার বাহিনী ময়দানে নামিয়ে দেয়া হয়। বিপুল মৌখিক প্রচারণার সাথে পান-সিগারেট, চা, বিরিয়ানীর প্রবাহ চলে। শাড়ি, লুঙ্গী, নগদ টাকাও বিলি বণ্টন করা হয়। সাধারণ দরিদ্র অসচেতন জনমত কোন প্রার্থীর প্রচারণার ব্যাপকতা ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে অথবা নগদ অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা পেয়ে ভোট দিয়ে থাকে। আর ভোটটা দেয়া হয়ে গেলে তার আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। ফলে জনগণের অসহায়ত্ব অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠে। ক্ষমতায় গিয়ে অনেক দলই জনগণের কথা ভুলে যায়, রাষ্ট্র ক্ষমতা নিজের হস্তগত করে এবং সমাজের উৎপাদন শক্তির উপর নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে না। সেজন্য অনেকেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন।	খেয়ানত করে, তারা যদি জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সেই জনগণই তাদের নিকট থেকে এ আমানত কেড়ে নেয়ার অধিকার রাখে। অন্যকথায়, শাসক কারা হবেন তা দেশের জনগণই ভোটের মাধ্যমেই ঠিক করবেন এবং শাসকমণ্ডলীকে অপছন্দ হলে বা তারা আমানতের খেয়ানত করলে ভোটের মাধ্যমেই তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন। ভোটের এ আমানত সে ধরনের সৎ ও যোগ্য লোকদের নিকট অর্পণ করা হয় যারা তা যথাযথভাবে পালন করবে।

৬। জবাবদিহিতা	৬। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে শাসকগণ জনগণের কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। অন্যকথায়, Accountability of the rulers before the people. আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ এখানে অনুপস্থিত।	৬। ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে শাসকগণ দায়িত্ব পালন করেন। অন্যকথায়, Accountability of the rulers before Allah. জনগণের কাছে জবাবদিহিতা স্বভাবতই এখানে উপস্থিত থাকে। শাসকগণ আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতির পাশাপাশি জনগণের কাছেও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক থাকেন।
৭। জনগণের ভূমিকা	৭। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের নামে জনগণ কঠিনভাবে প্রতারিত হতে বাধ্য হয়। জনগণ ভোট দেয়ার অধিকারী হয় বটে কিন্তু সে ভোট দান ক্ষমতা প্রয়োগ তার নিজের ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী করতে পারে না। ভোট দান কেবল ভোট প্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রার্থীদের মধ্যে কাউকে না কাউকে ভোট দিতে হবে। প্রার্থীদের বাইরে কাউকে ভোট দেয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রার্থীদের কেউই ভোটদাতার পছন্দ না হলেও তাদের কোন একজনকেই ভোট দিতে হয়।	৭। ইসলামী গণতন্ত্রে জনসমর্থন প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমিত উৎস। নিরঙ্কুশ উৎস আল্লাহ। এ সীমিত উৎস শুধু আল্লাহ সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ ও ইসলামী আইন জারিকরণে ভূমিকা পালন করে। ইসলামে জনগণই সংসদ সদস্য নির্বাচন, স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য দায়িত্বশীল। জনগণকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করার জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়। এরাই আল্লাহর শরীয়াতী বিধানকে সামষ্টিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে। মুসলিম জনগণ

	ভোট দানের স্বাধীনতা এখানে ক্ষুণ্ন হয়। ভোট প্রার্থীরা কোন না কোন দল থেকে মনোনীত হয়ে থাকে। ব্যক্তি হিসেবে কোন প্রার্থীকে পছন্দ না হলেও দলকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতায় তাকে ভোট দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। দল পছন্দ হলো, দলের প্রার্থীকে পছন্দ করতে না পারলেও ভোট তাকেই দেয়া হয়। এ দলীয় প্রভাবের দোহাই দিয়ে কত কলা গাছ যে বট-গাছে পরিণত হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই।	এভাবে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের উৎস। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নির্বাচন এ জন্যই মুসলিম উম্মাতের অধিকার ও কর্তব্য। জনগণ আল্লাহর প্রতিনিধি খলীফা হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের আম-ানতী অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালন করে।
৮। আইনসভার ক্ষমতা	৮। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে আইনসভা সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় যে কোন আইন জারি করতে পারে। এ গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইনসভাই সকল ক্ষেত্রে আইনদাতা।	৮। ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে না। ইসলামে আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার বৈধ অধিকার জনগণের বা পার্লামেন্টের নেই। তবে পার্লামেন্ট ইসলামের মূলনীতির সাথে সংগতিশীল প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারবে।
৯। ধর্মের ভূমিকা	৯। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে স্বীকৃত কোন ধর্ম নেই এবং কোন ধর্মকে বিশেষ কোন মর্যাদা	৯। ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামী

	দেয়া হয় না। ধর্ম এ রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র।	নীতিমালাকে বাস্তবায়িত করা।
১০। ন্যায়-অন্যায় প্রসঙ্গ	১০। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয় কোন নীতিমালার নিকট দায়বদ্ধ নয়।	১০। ইসলামী গণতন্ত্রে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি আল্লাহর বিধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী রাষ্ট্র নিঃশর্তভাবে আল্লাহর বিধানের নিকট দায়বদ্ধ যা চিরন্তন ও সর্বজনীন।
১১। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা	১১। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ব্যক্তি চিন্তা, বিশ্বাস, ধর্ম, কর্ম, মত প্রকাশ, সভা সমিতিতে যোগদান, প্রকাশনা ইত্যাদিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যা নিজের জন্য লাভজনক ও স্বার্থের অনুকূল মনে করে সেসব ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা ধর্মীয় আদর্শ ব্যক্তির উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না।	১১। ইসলামী গণতন্ত্রে ব্যক্তির এ ধরনের কোন স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রদর্শিত পথে চলতে হয়। এক্ষেত্রে যে কোন ধরনের বিচ্যুতির জন্য ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব ও গজবের সম্মুখীন হতে হয়।

উপরিউক্ত পার্থক্যসমূহ সত্ত্বেও গণতন্ত্রের বড় বড় ছয়টি পয়েন্টে ইসলামের সাথে কোন বিরোধ নেই। যেমন :

১। নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন যারা পায় তাদেরই সরকারী ক্ষমতা হাতে নেয়ার অধিকার রয়েছে।

২। এ নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে এর বাস্তব ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে পারে। বিরোধী দলও এমন সরকারের বৈধতা ও নৈতিক অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

৩। জনগণের সম্মতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সরকারী ক্ষমতা দখলের বৈধ অধিকার কারো নেই। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলকভাবে ক্ষমতা দখল করা জঘন্য অন্যায়। জনগণের মতামত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪। সরকারের সমালোচনা করা, সরকারী সিদ্ধান্তের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা ও তা সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের শুধু অধিকারই নয়, দায়িত্বও। সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করার জন্য জনগণের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইন ও শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ।

৫। আইনের নিকট সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের ভিত্তিতে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থী হওয়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

৬. সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিধিবদ্ধ হতে হবে। শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ বিবেচিত হবে।

জনগণের উপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। মহানবী (সা) এর পর যে চারজন রাষ্ট্রনায়ক খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে বিখ্যাত তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে শাসনক্ষমতা দখল করেননি। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের প্রেক্ষিতে তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের নির্বাচন পদ্ধতি একই রকম ছিলো না কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে

নির্বাচিতই ছিলেন। তাঁরা কেউ এ পদের জন্য চেষ্টা করেননি। মহানবী (সা) এর ঘোষণা অনুযায়ী পদের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পদের অযোগ্য মনে করতে হবে।

ইসলামে শাসন ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব থেকে পালানোরও অনুমতি নেই। এ নীতি গণতন্ত্রের আধুনিক প্রচলিত পদ্ধতির চেয়েও কত উত্তম। ইসলামে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। নামাযে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির উপর লুকমা (ভুল ধরিয়ে দেয়া) ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হচ্ছেন রাসূলের প্রতিনিধি। নামাযের ইমাম যেমন রাসূলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাদিদেরকে পালন করতে হয়, তেমনি মহানবী (সা) যে নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য।

এসব দিক বিবেচনা করলে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ইসলামে শুধু মিলই নয়, ইসলামের নীতি গণতন্ত্রের চাইতেও অনেক উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত।

১৩. ১০ উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকে বিবেচনায় আনা হয়নি। পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষ রচিত আইন দ্বারা শাসিত। মানব রচিত আইন-কানুন মানতে হয় গোটা জনগণকে। ইসলামের দৃষ্টিতে তা হচ্ছে রাজনৈতিক ও আইনগত শিরক। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে অনেক সময় আইন পাস করার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লোকের জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখে থাকে অতি স্বাভাবিকভাবে। এটিই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের আসল রূপ। সত্যিকার অর্থে ইসলাম হচ্ছে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। ইসলাম মানুষের মন জয় করতে চায়। ইসলাম সর্বদাই আইনের শাসন কায়েম করতে চায়, যা গণতন্ত্রের আসল লক্ষ্য। গণতন্ত্রের মূল শিক্ষা হচ্ছে জনগণের মর্জির বিরুদ্ধে তাদের উপর কোন শাসক বা আইন চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এদিক থেকে আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী গণতন্ত্রের কোন বিরোধ নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্নাবলী

১। গণতন্ত্র কি? ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

(What is Democracy? Show the relationship between Islam and Democracy.)

২। ইসলামী গণতন্ত্র কি? গণতন্ত্রের ইসলামী বিশ্লেষণ করো।

(What is Islamic democracy? Discuss and Analíse the Islamic Democracy.)

৩। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্র বলতে কি বুঝ? পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

(What do you mean by Western Democracy and Islamic Democracy? Explain the points of distinction between Western Democracy and Islamic Democracy.)

৪। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য?

৫। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।

(Discuss the charactristics of Democracy.)

৬। গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করো।

(Discuss the basic principles of Democracy.)

৭। গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো।

(Discuss the origin and Development of Democracy.)

৮। গণতন্ত্র সম্পর্কে আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞা কি? আলোচনা করো।

(Discuss the definition of Democracy as givern by Abraham Lincoln.)

৯। ইসলামী গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য কি কি?

(What are the basic tenents of Islamic Democracy.)

১০। গণতন্ত্রের পূর্ব শর্তগুলো বর্ণনা করো।

(Describe the preconditions of Democracy.)

১৪

নির্বাচন ও ইসলামী রাষ্ট্র

Election and Islamic State

১৪.১ ইসলাম ও নির্বাচন (Islam and Election)

গণতন্ত্রের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নির্বাচন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাম্প্রতিক উন্নয়ন হল আধুনিক নির্বাচন পদ্ধতি। সম্রাট এবং রাজা-বাদশাহগণ নির্বাচিত নন। তারা নির্বাচিত বা মনোনীত না হয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ক্ষমতা লাভ করে থাকেন। এ ধরনের ব্যবস্থায় রাজা বা রাণী শাসনব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন। এ ব্যবস্থায় জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। ইসলাম বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র অনুমোদন করে না।

নির্বাচিত সরকার (Elected Government) ইসলামী রাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি ইসলামী গণতন্ত্রের বিশেষত্ব। নির্বাচনই সরকার পরিবর্তনের মাধ্যম এবং এটি ইসলামে স্বীকৃত। ইসলামে গণতন্ত্র মানে নির্বাচনী গণতন্ত্র। আইন তৈরির গণতন্ত্র নয়। আধুনিককালে সমগ্র বিশ্বে জনমতের ভিত্তিতে নেতা বা শাসক নির্বাচনের মূলনীতি সর্বজন স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। এটি ইসলামের শিক্ষারই ফল। কুরআন মাজীদের সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ এবং সূরা আশ শূরার ৩৮ আয়াতের ভিত্তিতেই নির্বাচনী গণতন্ত্র সার্বজনীনতা লাভ করেছে।

জনগণের মানসিক ও নৈতিক দাবীর প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের চিন্তা ও চরিত্র বিপ্লবের এক স্বাভাবিক পরিণতিতে ইসলামী রাষ্ট্র বিপ্লব সংগঠিত হয়। জনগণের স্বাভাবিক দাবি হয় ইসলামী সরকার চাই। আর এ জন্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি/গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বর্তমান পদ্ধতি হচ্ছে ভোট। দেশের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ শাসনের জন্য নেতা নির্বাচন করবে, এটিই ইসলামী নীতি। মহানবী (সা) রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জনগণের উপর শাসক হিসেবে জোরপূর্বক চেপে বসেননি। মদীনার জনগণের মত ও আহ্বানের ভিত্তিতেই তিনি শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামে পরামর্শ বা মতামত বা নির্বাচনের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হবেন,

বংশগতি বা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। সত্যিকার নেতা তো সে, যাকে জনগণ নিজেদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। মহানবী (সা) এর ওফাতের পর পরবর্তী শাসক নির্বাচনের পরই তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। মহানবী (সা) এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তাঁরা পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের সকল খলীফাই জনমতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। যেমন–

১. হযরত আবু বকর (রা) প্রস্তাব সমর্থনের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২. হযরত উমর ফারুক (রা) পূর্ববর্তী খলীফার প্রস্তাব এবং জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হন।

৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) জনমতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হন।

৪. হযরত আলী (রা) কেও জনগণই শাসন ক্ষমতায় বসায়। তিনি গোপনে অথবা জনগণের অনুমোদন ব্যতিরেকে খলীফার পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন।

কোন খলীফাই বাইয়াত দাবি করেননি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ বাইয়াত হয়েছেন। খলীফা হিসেবে চার খলীফার সকলের হাতেই জনগণের সাধারণ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ) যাকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ বলা হয় তিনি জনগণের দ্বারাই খলীফা নির্বাচিত হন।

সেকাল আর একালের মধ্যে কেবল নির্বাচন পদ্ধতিরই পার্থক্য। বর্তমানকালে নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে নির্বাচন বলতে তো বুঝায় জনগণের ইচ্ছা ও মতামতের প্রতিফলন। এ বিষয়টি যেমন বর্তমানকালের নির্বাচনের উদ্দেশ্য, তেমনি তখনকার বাইয়াত ও নির্বাচনের উদ্দেশ্যও এটাই ছিল।[১]

মহান খলীফাগণ যখন নির্বাচিত শাসক হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখনকার দিনে অধিকাংশ শাসক ছিলেন স্বঘোষিত, স্বআরোপিত, বংশানুক্রমিক বাসাম্রাজ্যবাদী শাসক। অন্যদিকে খোলাফায়ে রাশেদার সকল খলীফাই 'বাইয়াত' গ্রহণ করেন যা একধরনের ভোট বা জনগণ কর্তৃক শাসককে প্রদত্ত বৈধতার অনুমোদন। সম্রাট, রাজা বা বাদশাহগণ স্বনিয়োগপ্রাপ্ত কিন্তু খলীফাগণ ছিলেন নির্বাচিত। ইবনে খালদুন, ইবনে তাইমিয়া, আল গাযালী, আল মাওয়ার্দী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, হাসান আল বান্না, মুহাম্মদ কুতুব (১৯১৯-২০০১)

---

১. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, নির্বাচনে জেতার উপায়, বর্ণালি বুক সেন্টার, বাংলাবাজার, ঢাকা, জুলাই ২০০১, পৃ. ১১।

ড. হাসান তুরাবী, ড. জামাল বাদাবী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এ নীতিতে একমত যে শাসককে অবশ্যই জনগণের পছন্দসই নির্বাচিত হতে হবে।[২] বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের অপরিহার্যতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। চল্লিশের দশকে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রতিষ্ঠাতা শেখ হাসানুল বান্না একটি মুক্ত অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইসলামী মনীষীগণ একটি সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্বারোপ করেন যার মাধ্যমে রাষ্ট্র শাসক ও সংসদ নির্বাচিত হয়ে সরকার পরিচালনা করবে। এটি লক্ষণীয় যে শেখ হাসানুল বান্না প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানুল মুসলিমুন মিশর, জর্ডান, সুদান, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, কুয়েত, ফিলিস্তিন সিরিয়া প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক দল ও জোটের ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং তাঁর দল জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন নির্বাচনের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছে এবং জামায়াত পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, কাশ্মীর ও বাংলাদেশে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলন মিল্লি সালামত পার্টি, রিফাহ পার্টি, ভার্চু পার্টি এবং সাম্প্রতিককালে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং এখন সরকার পরিচালনা করছে। ইয়েমেনে ইখওয়ান নেতা শেখ আবদুল মজিদ আল জিনদানী সেখানকার আলেমদের সাথে একটি এলায়েন্স গঠন করেন যার নাম আল ইসলাহ পার্টি এবং তারা নিয়মিত নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ও ইয়েমেনের পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাহরাইন, ওমান, জর্ডান, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, নাইজেরিয়া, সুদান, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশেও ইসলামী দলগুলো নির্বাচনকে গ্রহণ করেছে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ নিচ্ছে। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুমোদিত ও বৈধ। ইসলাম নির্বাচন ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সরকার পরিবর্তনের পক্ষে। কোন ব্যবস্থাই ১০০% সঠিক নয়। নির্বাচন ব্যবস্থায়ও ভুল-ভ্রান্তি আছে। তথাপি এটিই এখন সরকার পরিবর্তন, গঠন ও শাসক পছন্দ করার একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলাম ও গণতন্ত্র উভয়েরই নির্বাচনের ব্যাপারে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।[৩]

১৪.২ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র ও নির্বাচন (Islamic State of Medina and Election)

ইসলাম ও আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হলেও, উভয় শাসন ব্যবস্থায়

২. মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ইসলাম এণ্ড ডেমোক্রেসি, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ১০।

৩. মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ইসলাম এণ্ড ডেমোক্রেসি, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ১০-১২।

রাষ্ট্রপ্রধান ও আইন পরিষদ নির্বাচনের প্রকৃতি বলতে গেলে একই রকম। মিসরের সুবিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ কুতুব তাঁর 'ইসলাম কি এ-যুগে অচল? শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "আধুনিক যুগের অধিকাংশ জাতি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের শাসক নির্বাচিত করে থাকে। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য পালনে তাঁরা ব্যর্থ হলে জনগণ তাদের সাসপেণ্ড বা ডিসমিসও করতে পারে। কিন্তু চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলাম যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল, এটা তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের আধুনিক প্রয়োগবিধি মাত্র।" বাস্তবিকই তাই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে-রাষ্ট্রে ওই অর্থে কোনো নির্বাচন কমিশন ছিল না, ভোটার লিস্ট ছিল না, ভোটকেন্দ্র ছিল না- একথা সত্য। কিন্তু নিজেদের শাসক বা খলীফা নির্বাচনের পুরো হক ছিল সে রাষ্ট্রের জনগণেরই। ইসলামের শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) সে রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ছিলেন এবং তিনি মনোনীত হয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক। কিন্তু তিনিও তো কোনো ডিক্টেটর ছিলেন না! ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ তাঁকে স্বেচ্ছায় নবী হিসেবে, শাসক হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর, পরপর চারজন সত্যপন্থী খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ককে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁরা সবাই জনগণের ভোটেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমরা যদি সেই ইতিহাস খানিকটা ঘেটে দেখি, তবে মুহাম্মাদ কুতুবের আলোচ্য বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ পাবো।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) তাঁর 'ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন : "দীর্ঘ দশ বছরকাল পর্যন্ত নবী করীম (সা) রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দানের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার পর তাঁর 'শ্রেষ্ঠতম বন্ধুর' (অর্থাৎ আল্লাহর) সঙ্গে মিলিত হলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী (বা খলীফা) নির্বাচন সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট, নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাঁর ওই নৈঃশব্দে এবং কুরআন মজীদের বাণী [তাদের অর্থাৎ মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ পারস্পরিক পরামর্শে সম্পন্ন হয়'-(৪২ : সূরা আশ শূরা : ৩৮] অনুসারে সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন যে, নবী করীম (সা)-এর পর রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা নিয়োগের দায়িত্ব মুসলমানদের নিজস্ব নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং এ নির্বাচন মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।" মহানবী (সা)-এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের সকল খলীফাই জনমতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৪.২. ১ প্রথম খলীফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন
Hazrat Abu Bakar (R) Elected as First Kalifh of Islam

ইতিহাস বলে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর মদীনার সম্মানিত আনসারদের একাংশ আনসারদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা নিয়োগের দাবি তুললে, জনগণের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হযরত আবু বকর (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : "আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আমি আপনাদের মর্যাদা অস্বীকার করছি না। কিন্তু কুরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব সমগ্র আরবের লোক একসঙ্গে মেনে নেবে না। ... এখানে আবু ওবায়দা বিন আল জায়াজ (রা) ও হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) উপস্থিত আছেন। আপনারা তাঁদের যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচিত করতে পারেন।" পাঠক লক্ষ্য করুন! হযরত আবু বকরের (রা) কণ্ঠে প্রকাশ পাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা!! যাই হোক, হযরত আবু বাকরের (রা) বক্তৃতার পর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে খলীফা হিসেবে পেশ করবার পরিবর্তে, খোদ হযরত আবু বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করবার প্রস্তাব রাখেন এবং জনগণ সে প্রস্তাব সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে তাঁকে (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা)-কে) খলীফা নির্বাচন করেন। মাওলানা হাজী মঈন উদ্দীন নদভী বলছেন : "ইসলামের গণতান্ত্রিক রূপ হযরত আবু বকরের (রা) হাতেই বাস্তবায়িত হয়। তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই খলীফা নির্বাচিত হন।" খলীফা নির্বাচিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা) দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন : 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি চাচ্ছিলাম, আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি চান আমার আচরণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আচরণের মতো হোক, তাহলে আমাকে সে পর্যায়ে পৌছার ব্যাপারে অক্ষম মনে করবেন। তিনি ছিলেন নবী। ভুলত্রুটি থেকে ছিলেন পবিত্র। তাঁর মতো আমার কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনাদের কোন একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবি আমি করতে পারি না।... "আমার প্রিয় ভায়েরা! আমি আপনাদের শাসক নির্বাচিত হয়েছি, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলাম না। যদি আমি ভালো কাজ করি, আপনারা আমাকে সহযোগিতা করবেন। আর যদি মন্দপথে ধাবিত হই, আপনারা আমাকে সোজাপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।" তাঁর সেই নীতি নির্ধারনী সংক্ষিপ্ত প্রথম ভাষণটি চিরকাল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনায়কের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

১৪. ২. ২ দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা)-এর নির্বাচন
Hazrat Omar bin Khattab (R) Elected as Second Kalifh of Islam

হযরত আবু বকরের (রা) ইন্তেকালের পর মুসলিম জনতা খলীফা হিসেবে নির্বাচন করে হযরত উমর বিন খাত্তাবকে (রা)। মৃত্যু সন্নিকটে বুঝতে পেরে, রোগাক্রান্ত খলীফা হযরত আবু বকর (রা) জনগণের এক মহাসম্মেলনে বলেছিলেন : "জনমণ্ডলী! আমি যাকে আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করবো আপনারা কি তাঁকে নির্বাচিত করবেন? ... আমি আমার কোনো আত্মীয়কে মনোনীত করছি না, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা)-কে মনোনীত করছি।" ইতিহাস সাক্ষী, রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর পর খলীফা হিসেবে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন এবং জনগণ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে হযরত উমর ফারুক (রা)-কে পরবর্তী খলীফা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। মাওলানা হাজী মঈন উদ্দীন নদভী তাঁর 'সাহাবা চরিত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন : "হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খেলাফত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ছিল। অর্থাৎ সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সমস্যা মজলিসে শূরায় (বা সংসদে) পেশ করা হতো এবং সেখানে তার মীমাংসা হতো। মুহাজির ও আনসারগণের নির্বাচিত ও নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ এই মজলিসের সদস্য হতেন।" দশ বছরের শাসনকালে হযরত উমর ফারুক (রা) গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬টি শহর বিজিত হয়। ইসলামী হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা মূলত তাঁর যুগেই হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের সকল শাখা তাঁর যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে আছে।

১৪.২. ৩ তৃতীয় খলীফা হিসেবে হযরত উসমান জুননুরাইন বিন আফফান (রা)-এর নির্বাচন
Hazrat Osman Zunnurain bin Affan (R) Elected as Third Kalifh of Islam

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর নির্বাচনে খানিকটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় খলীফা নির্বাচনের সময় একজন 'প্রধান নির্বাচন কমিশনারের' অস্তিত্বও লক্ষণীয়। হযরত উমর (রা) শাহাদাত বরণের পূর্বে হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত যোবাইর (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত সায়াদ

ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এই ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবার মধ্য হতে একজনকে তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা নির্বাচন করবার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। ছয়জনের এ মজলিস সর্বসম্মতভাবে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার' নিযুক্ত করেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) মদীনা রাষ্ট্রের অলিগলি ঘুরে জনগণের মত জেনেছেন, ঘরে ঘরে পৌঁছে নারীদের পছন্দের কথা শুনেছেন (লক্ষণীয় ইসলাম নারীদের 'ভোটাধিকার' স্বীকার করে নিয়েছিল প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই), স্কুল-মাদরাসা তথা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেয়ে ছাত্রদের মতামত নিয়েছেন। এভাবে অবিশ্রান্ত ও সর্বোত্তম 'ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া' সম্পন্ন করবার পর তিনি অর্থাৎ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) জনসম্মুখে ঘোষণা করলেন যে, হযরত উসমান (রা) সর্বাধিক 'ভোট' পেয়েছেন এবং তিনিই নির্বাচিত খলীফা। জনগণ তাঁর সে রায় কোনো ধরনের কারচুপির অভিযোগ না তুলে মেনে নিয়েছিল। সাধারণ জনসমাবেশে হযরত উসমান (রা) বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়।

১৪.২. ৪ চতুর্থ খলীফা হিসেবে হযরত আলী (রা)-এর নির্বাচন
Hazrat Ali (R) Elected as Fourth Kalifh of Islam

ইতিহাস বলে, হযরত উসমান বিন আফফান (রা)-এর শাহাদাত বরণের পর জনগণ চতুর্থ খলীফা হিসেবে হযরত আলী (রা)-কে নির্বাচিত করেছিল তাও সর্বসম্মতিক্রমেই। অন্যকথায় জনগণই হযরত আলী (রা)-কে ক্ষমতায় বসায়। তাঁর হাতেই জনগণের সাধারণ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর হযরত আলী (রা) উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

'আল্লাহ্ পাক হেদায়াতের কিতাব নাযিল করেছেন যাতে ভাল-মন্দের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। সৎকর্ম করতে থাক। মন্দকাজ পরিত্যাগ কর। ফরয কাজগুলো নিষ্ঠাসহকারে সম্পন্ন করো। ... আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং তাওহীদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। সে ব্যক্তিই মুসলিম যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে।'

'কিছু লোক তোমাদের আগে চলে গিয়েছে, মৃত্যু তোমাদেরকে অনুসরণ করছে। বোঝা হালকা কর। পূর্ববর্তীরা পশ্চাতবর্তীদের জন্য অপেক্ষা করছে। আল্লাহর বান্দাহগণ আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর বান্দাদের হক বিনষ্ট করা থেকে বেঁচে থাক। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর নাফরমানী কর না। সত্য ও কল্যাণ যেখানেই থাকুক না কেন সেখান থেকে তা

হাসিল কর এবং মন্দকাজ বন্ধ কর। মনে রেখ একসময় তোমরা অল্পসংখ্যক লোক ছিলে এবং তোমাদেরকে দুর্বল গণ্য করা হত।'

হযরত আলী (রা)-এর নির্বাচনোত্তর এই ভাষণে ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন–

১. নিষিদ্ধ কার্যাবলী যাতে সমাজে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সৎকর্মের প্রসারের মাধ্যমে সমাজের মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে হবে এবং কল্যাণ সকলের দোর গোড়ায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

২. আমল বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকারের কার্যসূচীতে সকল স্তরের মানুষকে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্যেই আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হযরত আলী (রা) যখন মৃত্যু শয্যায় তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আমরা আপনার পুত্র হযরত হাসান (রা)-এর হাতে বাইয়াত করতে চাই। জবাবে হযরত আলী (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছি না, নিষেধও করছি না। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে ভালভাবে বিবেচনা করতে পারো।[৪] তিনি যখন আপন পুত্রদেরকে শেষ অসিয়ত করছিলেন, ঠিক সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরজ করল, হে আমীরুল মুমিনীন। আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনীত করছেন না কেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি মুসলিমদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন মহানবী (সা)।[৫]

খেলাফতের আদর্শ ব্যবস্থার বিশুদ্ধরূপ ও জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন বজায় থাকেনি। নির্বাচিত খেলাফত ব্যবস্থা সহসা উমাইয়া খলীফাদের হাতে মুলুকিয়াত ও একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয় এবং আব্বাসীয় খেলাফতের হাতে পরবর্তীতে আরো বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বস্তুত খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল ছিল এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শে চিহ্নিত উৎসস্থল। যাকে ভিত্তি ও অনুসরণ করে মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ একটি আদর্শ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন করেন। আল মাওয়ার্দী থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী পর্যন্ত সকল মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ ও চিন্তাবিদগণের লিখনীতে এ রূপরেখা পাওয়া যায়। খেলাফত বা ইসলামী

---

৪. আততাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১২।

৫. ইবনে কাসীর, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪; আল-মাসউদী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন অধিকার নয় বরং জনগণের পক্ষে সম্পাদনের জন্য একটি পবিত্র দায়িত্ব। শরীয়াহ্ ক্ষমতা জবর দখল করাকে বা রাজনৈতিক বৈধতা লাভের উদ্দেশ্যে বংশানুক্রমিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তিগত কর্তৃত্বকে ঘৃণা করে এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের বিরোধী।[৬]

বস্তুত, ইসলামে নির্বাচন ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক গণতন্ত্রে। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার (সংসদ) সদস্যদের সরাসরি নির্বাচন করবার অধিকার জনগণের। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন সত্যপন্থী খলীফারা। ইসলামে জোর করে যেমন রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা হয়ে বসবার কোনো অবকাশ নেই, তেমনি 'খলীফার ছেলে খলীফা হবে' ধরনের কোনো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও ইসলামে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। খলীফা নির্বাচন করবে জনগণ এবং সে নির্বাচনও হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অবাধ। খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকদের অবাধে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়াকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা ও মতামত কীভাবে বা কী পন্থায় জানা যাবে? উত্তর হচ্ছে : ইসলাম এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা পন্থা ঠিক করে দেয়নি। অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী পন্থা (যেমন, আধুনিক ভোটগ্রহণ পদ্ধতি) গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে ইসলাম কোন বিশেষ ধরনের নির্বাচনকে নির্দিষ্ট করে দেয়নি।

১৪.৩ ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচনে ভোট প্রদান প্রসঙ্গে (Casting of Vote in Election in the light of Islam)

সভ্যতার বর্তমান স্তরে ভোট মানুষের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, ভোট এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে চোখ বন্ধ করে রেখে দিনকে রাত বলে এড়িয়ে যাওয়া।

বর্তমান বিশ্বে ভোট দেয়া বা নেয়া হয় নানা স্থানে, নানাভাবে। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দু'টি হচ্ছে আইন পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনে ভোট দেয়া বা নেয়া।

---

৬. জামিল উদ্দীন আহমদ, Iqbal's concept of Islamic polity. করাচী, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, পৃ. ২১।

১৪. ৩. ১ ভোটের সংজ্ঞা

Definition of Vote

কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি সমর্থন জানানোকে ভোট বলে।[৭] ভোট শব্দের শাব্দিক অর্থ মত বা রায়। ভোটের সাধারণ ও প্রচলিত অর্থ হলো– মত প্রদান করা, সমর্থন করা, সমর্থন প্রত্যাহার করা, পছন্দ বা অপছন্দের কথা প্রকাশ করা। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে মত দেয়া। ভোট ইংরেজি শব্দ, অভিধানে[৮] এর অর্থ বলা হয়েছে :

১. An expression of wish on opinion in an authorised and formal way.

অনুমোদিত ও বিধিসম্মত পন্থায় নিজের ইচ্ছা বা মত প্রকাশ করা।

২. a formal indication of one's choice between two on more people.

৩. to indicate formally one's choice of candidate in an election.

৪. one's preferred course of action.

৫. Collective opinion on decision by a majority.

বাংলায় বললে অভিধান অনুযায়ী ভোট মানে–

❖ নিজের ইচ্ছা বা মত প্রকাশ করা।

❖ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্য থেকে কোন একজনকে সমর্থন করা।

❖ কোন ব্যক্তি বা সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে আস্থা বা অনাস্থা প্রকাশ করা।

❖ কোন নির্বাচনে নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে সমর্থন করা।

❖ নিজের মত বা পছন্দ কার্যকর করা।

❖ অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ)-এর মতে, পরিভাষায় ভোট দেয়ার অর্থ কাউকে সততা, বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়ে তাকে প্রতিনিধিত্বের পদের জন্য সমর্থন করা।[৯]

---

৭. ডা. মতিয়ার রহমান, ভোট (সেমিনার প্রবন্ধ) পৃ. ১।

৮. অক্সফোর্ড ডিকশনারি ও সংসদ ইংরেজি বাংলা অভিধান দ্রষ্টব্য।

৯. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, ভোটারের দায়িত্ব ও ভোট সম্পর্কে শরীয়াতের নির্দেশ, আল জামিয়া, আগস্ট ২০০১, পৃ. ১১।

১৪.৩. ২ ইসলামে ভোট সাধারণভাবে সিদ্ধ না নিষিদ্ধ

Status of Vote in Islam

আল কুরআন

Al Quran

১। (হে নবী) ...এবং সকল ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অতঃপর (সেই পরামর্শের ভিত্তিতে) যখন সিদ্ধান্তে পৌছে যান।... (৩ : সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

২। ...এবং নিজেদের সকল সামগ্রিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদন করে। (৪২ : সূরা আশ শূরা : ৩৬-৩৮)

৩। আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানত উহার যোগ্য লোকদের নিকট সোপর্দ করে দিতে। আর (আমানত প্রাপ্তির পর) লোকদের মধ্যে যখন বিচার ফায়সালা করবে তখন তা ন্যায়ের ভিত্তিতে করবে। (৪ : সূরা আন নিসা : ৫৮)

এ আয়াতসমূহ থেকে একদিকে যেমন সকল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়, অন্যদিকে এ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার কয়েকটি মূলনীতিও বেরিয়ে আসে। যেমন– ইসলামী রাষ্ট্র হবে পরামর্শ বা জনমত ভিত্তিক রাষ্ট্র। এখানে পরামর্শ বা মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচিত হবেন, বংশগত বা উত্তরাধিকারেরর ভিত্তিতে নয়। বর্তমানকালে ইসলামের এ শিক্ষার ফলেই সমগ্র বিশ্বে জনমতের ভিত্তিতে শাসক নির্বাচনের মূলনীতি সর্বজন স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। উপরে উদ্ধৃত সূরা আশ শূরার ৩৮ নং আয়াতের তাফসীর লিখেছেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে। তিনি লিখেছেন, 'জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়ের নেতা নির্বাচিত হনে জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে। ...কোন ঈমানদার ব্যক্তি জোরপূর্বক জাতীয় নেতা বা শাসক হয়ে বসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারেন না। কিংবা প্রথমে জোরপূর্বক জাতির ঘাড়ে চেপে বসে পরে জোর জবরদস্তি করে তাদের সম্মতি আদায়ের চেষ্টাও করতে পারেন না। জাতীয় ও সামষ্টিক নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হবেন।... সত্যিকার নেতাতো সে, যাকে জনগণ নিজেদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে।[১০]

---

১০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শূরা, টীকা ৬১।

আল হাদীস

Al-Hadith

১। হযরত উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামায তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না...। গোত্র বা জাতির ইমাম কিন্তু মানুষ তাকে পছন্দ করে না। (তিরমিযী)

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত : তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হবে না...। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিন ব্যক্তির নামায তাহার মাথার উপর এক বিঘতও উঠে না...। (ইবনে মাজাহ)

কুরআন সুন্নাহর উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে বুঝা যায় ইসলামে ভোট সাধারণভাবে সিদ্ধ।

১৪. ৩. ৩ যে সকল বিষয়ে ভোটাভোটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করা ইসলামে সকল সময়ে নিষিদ্ধ

Areas on Which Decision Making Through voting is Always prohibited in Islam

১। কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা বিষয়সমূহ।

২। কুরআন ও হাদীসে অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট বা ব্যাপক অর্থবোধকভাবে উল্লিখিত বিষয়সমূহের মূল বিষয়সমূহ–

❖ এর কারণ হচ্ছে ঐ বিষয়গুলো মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুখ, শান্তি, শৃঙ্খলা ও প্রগতির জন্য মৌলিক বিষয়। তাই আল্লাহ চান ঐ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আইন বানাতে গিয়ে ভুল করে মানুষ যেন দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যাপক দুঃখ কষ্টের মধ্যে না পড়ে।

❖ আর ঐ নিষিদ্ধতার কথা আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে নানাভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যার কয়েকটি হচ্ছে–

ক. (যুক্তিসঙ্গত কারণে) হুকুম করার তথা আইন বানানোর সার্বভৌম অধিকার (যোগ্যতা) আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। (৬ : সূরা আল আনআম : ৫৭)

খ. এবং তার (আল্লাহর) হুকুম করা তথা আইন বানানোর অধিকারের সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করো না। (১৮ : সূরা আল কাহাফ : ২৬)

গ. যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন দিয়ে দেশ শাসন করে না তারা কাফির। (৫ : সূরা আল মায়েদা : ৪৪)

১৪. ৩. ৪ যে সকল বিষয়ে, সব সময়ে সকল বা অধিকাংশ ঈমানদারের ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

Areas of which Decision Making be taken Through voting of Imandar Voter

একজন নাগরিককে বহুবিধ কাজে ভোট দিতে হয়। যেসব ক্ষেত্রে ভোট দিতে হয় তা নিম্নরূপ :

১. কুরআন হাদীসে অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট বা ব্যাপক অর্থবোধকভাবে উল্লিখিত বিষয়সমূহের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ।

২. নেতা নির্বাচন

❖ আর এর কারণ হচ্ছে–

(ক) মানব সভ্যতাকে উত্তোরত্তর অধিক সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার জন্য ঐ বিষয়গুলোর খুঁটিনাটি বিষয়সমূহকে সময়ের ব্যবধানে উন্নত করতে হবে। তাই ঐসব বিষয়গুলোকে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে উন্নত করার জন্য কুরআন বার বার বলেছে এবং তা না করার জন্য তিরস্কার করেছে।

খ. যে নেতার উপর সকল বা অধিকাংশ মানুষের সমর্থন নেই সে নেতা বেশি দিন নেতৃত্বে টিকে থাকতে পারে না এবং তার নেতৃত্বে সমাজে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

গ. অধিকাংশ মানুষ অন্যায় প্রভাব মুক্ত হয়ে যাকে যোগ্য মনে করবে তার যোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নাগরিকগণ নিজেদের ভোট প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান নির্বাচন করেন। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য ভোট প্রয়োগ করেন। নিজের পছন্দসই আদর্শের ব্যক্তি ও দলকে ক্ষমতাসীন করার জন্য ভোট প্রয়োগ করেন। নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্যে ভোট দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের কাঠামো অনুযায়ী নাগরিকগণ পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দিয়ে থাকেন। স্থানীয় পরিষদসমূহের নেতা নির্বাচনের জন্যও ভোট দেয়া হয়। দলীয় নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ভোট দেয়া হয়ে থাকে।

৩. কোন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোট

কোন দেশের মৌলিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নাগরিকগণ সরাসরি ভোট প্রয়োগ করেন। কোন রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান অনুমোদন, রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্ধারণ, সংবিধান সংশোধন এবং অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সে দেশের নাগরিকদের নিকট থেকে ভোট গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের ভোটকে রেফারেন্ডাম (Referendum) বা গণভোট বলা হয়।

৪. আস্থা বা অনাস্থা ভোট

আস্থা বা অনাস্থা ভোটও এক ধরনের রেফারেন্ডাম। কোন বিষয় গ্রহণ করা বা না করা কিংবা কোন নেতাকে তার পদে বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে এই আস্থা বা অনাস্থা ভোট প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১৪. ৪ ইসলামে ভোটাধিকারের তাৎপর্য (Significance of Suffrage in Islam)

ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের সম্মিলিত সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের এ সম্মতি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিনিধিমূলক। রাজনৈতিক দল ও ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ শাসন প্রতিষ্ঠিত। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার ছাড়া ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে। ভোটাধিকারের মাধ্যমেই জনগণ শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। এজন্য ভোটাধিকার ইসলামী গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ।

ভোটাধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার ক্ষুণ্ন করার অধিকার কারো নেই। সকল দেশেই সে দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার সংবিধানসম্মত মৌলিক অধিকার। এ অধিকার ক্ষুণ্ন করা আইন ও সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কাউকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানে তাকে তার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

কাউকে তার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা বিরাট দণ্ডনীয় অপরাধ। সাধারণত জালিম, সন্ত্রাসী ও স্বৈরশাসকরাই নাগরিকদেরকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ভোটাধিকার সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকারের মূল উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে রাষ্ট্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি। এই অধিকার অর্জনের জন্য মানব জাতির ইতিহাসে

বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন ও রক্তপাত ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত সার্বিক ভোটাধিকারের দাবি তেমন বিশেষ সোচ্চার হয়ে উঠেনি। তখনও সমাজের কেবল নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিই ভোট দিতে পারত। কিন্তু বর্তমানে এই সামন্ততান্ত্রিক রীতির পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের দাবি স্বীকৃত হয়েছে।

বর্তমান কালের নির্বাচনের ভিত্তি হলো সার্বজনীন ভোটাধিকার। নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার সকল নর-নারী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত। এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতেও লেগেছে দীর্ঘদিন। বিশ শতকের পূর্বে একমাত্র নিউজিল্যাণ্ডে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৮৯৩ সালে। অস্ট্রেলিয়ায় নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে। নারীর ভোটাধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত হয় ১৯২০ সালে, বৃটেনে ১৯২৮ সালে। জাপান ও ফ্রান্সে তা স্বীকৃত হয় ১৯৪৭ সালে। সুইজারল্যাণ্ডে মাত্র সেদিন ১৯৭১ সালে। এ সময়ে নারীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাই নয়, সম্পত্তির মালিকানা, শিক্ষা ও অন্যান্য মানদণ্ডেও জনসমষ্টির অধিকাংশ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বর্তমানে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তবে নারীর ভোটাধিকার এখনও পৃথিবীর সকল দেশে সমভাবে সম্প্রসারিত হয়নি।

১৪.৫ ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট ভোটার ও প্রার্থী (Vote, Voter and Candidete in the light of Islam)

ভোট ও ভোটার
Vote and Voter

নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়া কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক হিসেবে এটা একটা সত্য সাক্ষ্য। ভোটার যাকে ভোট দেবেন তা প্রার্থীর সততা, যোগ্যতা ও আমানতের উপর সাক্ষ্যস্বরূপ যে, এ ব্যক্তি এ কাজের জন্য অধিকতর উপযুক্ত ও আমানতদার। প্রার্থীর অযোগ্যতা ও ধর্মহীনতার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে ভোট দিলে এটা একটা মিথ্যা সাক্ষ্যে পরিণত হবে। শরীয়তে এরূপ করাটা কবীরা গুনাহ। এই গুনাহর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্য এক হাদীসে মিথ্যা

সাক্ষ্যকে জঘন্য কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে। যে অঞ্চলে একাধিক প্রার্থী থাকেন এবং ভোটারগণ জানেন যে, অমুক ব্যক্তি সর্বাধিক যোগ্য ও সৎপ্রার্থী, তাহলে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেয়া গুনাহ হবে। এতে নিজেকে পাপের সাথে জড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করা হল না। তাই ভোটারগণকে দীন, ঈমান ও আখেরাতের কথাকে সামনে রেখে রায় দেয়া কর্তব্য। হুজুগ, অর্থের লোভ কিংবা পেশী শক্তির ভয়ে নিজের সুচিন্তিত মতামতকে অপাত্রে দান করা ঠিক হবে না।

দ্বিতীয়ত. ভোট এক প্রকার সুপারিশ। যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিলে ভোটদাতা যেন প্রার্থীর সততা ও যোগ্যতার ব্যাপারে অন্যের কাছেও সুপারিশ করল। সুপারিশ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো নিম্নরূপ : "যে ব্যক্তি ভালো কাজে সুপারিশ করল সেখানে তারও অংশ (নেকী) আছে আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুপারিশ করল সেখানেও তার অংশ আছে।" অর্থাৎ গুনাহগার হবে। সর্বোত্তম সুপারিশ হলো, উপযুক্ত নেককার ও দীনদার ব্যক্তির জন্য অন্যের কাছে সুপারিশ করা। যিনি জনগণের প্রাপ্য অধিকার নিতান্ত নিষ্ঠার সাথে আদায় করবেন। অধিক মন্দ সুপারিশ হলো, অনুপযুক্ত ফাসেক, দুষ্কৃতিকারীর পেছনে লাফালাফি ও হৈ হল্লা করা। অনাচারীর জন্য মানুষের কাছে ভোট চাওয়া। কেননা, প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়ী করার পর তার ভালোমন্দ সব কাজের দায়ভার ও তার অপকর্মের কিছু অংশ ভোটদাতাকেও নিতে হবে। **তৃতীয়ত.** ভোটারগণ প্রার্থীকে প্রকারান্তরে নিজেদের ও জনস্বার্থের জন্য উকিলস্বরূপ নির্বাচন করল। কেউ যদি ব্যক্তিগত কাজের জন্য একজন উকিল ধরেন, আর সে তার ক্ষতি করে, তা মক্কেলের পক্ষে কখনো বরদাশত হয় না। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে কাউকে উকিল বানাতে গেলে বিষয়টি অধিক অনুভব করার ব্যাপার আছে। সেখানে কিছুতেই যেন জাতির সর্বনাশা না করা হয়।

সারকথা হলো, ভোটের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) ভোট সাক্ষ্যস্বরূপ (২) সুপারিশস্বরূপ (৩) জাতীয় স্বার্থে উকিল নির্বাচনস্বরূপ। তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিষ্ঠাবান সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেয়া যেমন অধিক পুণ্যের কাজ, তেমনি অসৎ, অনুপযুক্ত, সন্ত্রাসী, দুষ্কৃতিকারী কোন ব্যক্তিকে ভোট দেয়া শক্ত গুনাহর কাজ। পবিত্র কুরআনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে যেমন হারাম করা হয়েছে, তদ্রূপ সত্য সাক্ষ্য দেয়াকে ওয়াজিবও করেছে। ইরশাদ হচ্ছে "তোমরা আল্লাহর জন্য সৎ ও নেকের সঙ্গে সাক্ষী হয়ে যাও।" অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের জন্য সাক্ষ্য দিতে বিরত থাকার গুনাহকে ভয় কর।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে "সত্য সাক্ষ্যকে গোপন করিও না এবং যে গোপন করবে তার দিল জঘন্য অপরাধী"। উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দিতে সামান্য পিছপা হওয়ারও কোন অবকাশ নেই।

আজকাল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম, সন্ত্রাস, ধ্বংস, জ্বালাও-পোড়াও চলছে এর একটা বড় কারণ হলো সমাজের দীনদার, পরহেজগার, ব্যক্তিগণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া তো দূরের কথা, বরং ভোট দেয়া ও অন্যকে ভোট দিতে উৎসাহ দান করা থেকে বিরত থাকাটাকেই পরহেজগারীর আলামত বলে গণ্য করতে শুরু করেছেন। যার অশুভ নতিজা আমরা আজ নির্বাচনী মহড়ায় প্রত্যক্ষ করছি। আজকাল ব্যালটবাক্সে ওদের ভোটগুলোই বেশি আসে যারা প্রার্থীর কাছ থেকে চাটুকারী করে কিছু হাতিয়ে থাকে বা প্রার্থী নিজেই খরিদ করে নেয়। এদের দ্বারা নির্বাচিত বিজয়ী প্রার্থীই তখন হয়ে উঠে দেশ ও জাতির সমস্ত অপকর্ম ও ধ্বংসলীলার মূল হোতা ও ত্রাস-ভীতির নায়ক। সুতরাং কোন এলাকার যোগ্য ও সৎ প্রার্থী থাকলে তাঁকে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এটা কওম ও মিল্লাতের উপর মস্ত বড় জুলুম। যদি কোন এলাকায় উপযুক্ত ও দীনদার প্রার্থী না থাকে তবে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তিকে ভোট দেয়া কর্তব্য।

মোটকথা, ভোট একটা সত্য সাক্ষ্য। আর সত্য সাক্ষ্য গোপন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম, এখানে মিথ্যা বলাও হারাম এবং এর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করাও হারাম। নির্বাচনকে শুধু একটা রাজনৈতিক হারজিত এবং দুনিয়াদারী মনে করা নেহায়েত ভুল ধারণা। ভোট দেয়া, ভোটে অংশগ্রহণ করা কিছুতেই ধর্ম ও শরীয়তের বাইরে নয়।

১৪.৬ ভোটারের কর্তব্য (Duties of Voter)

১. ভোট সাক্ষ্যস্বরূপ। এর দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তির কৃত পাপ-পুণ্যের ভাগিদার ভোটদাতাকেও হতে হবে।

২. ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে কোন ভুলের অশুভ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আযাব-শাস্তি নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। কিন্তু কাওম ও মিল্লাতের মোয়ামেলায় ভুলের ক্ষতি দেশ-জাতির সবাইকে ভোগ করতে হয়। ফলে এর শাস্তিও হয় ভয়াবহ।

৩. সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। সুতরাং নির্বাচনী এলাকার সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট না দেয়া শক্ত গুনাহ। সৎ যোগ্য প্রার্থী বলতে ইসলামে বুঝায় (১)

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলামী আদর্শের অনুসারী। (২) বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রমাণিত যে তিনি খাঁটি ঈমানদার, খোদাভীরু ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ডে সঠিক মানুষ। (৩) দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী- পার্থিব কর্মকাণ্ডের সঠিক ধারণা ও যোগ্যতা। (৪) পদলোভী নয়- সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভে প্রয়াসী নয়।

৪. যে প্রার্থী ইসলামী ধ্যান-ধারণার ও আকীদার পরিপন্থী তাকে ভোট দেয়া জঘন্য অপরাধ।

৫. অন্যের দাম্ভিকতা ও অহমিকা এবং জনতার সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ বাড়ানোর জন্য নিজের দীন ও ঈমানকে বিক্রি করা অত্যন্ত আফসোস অনুশোচনার ব্যাপার। পিয়ারা নবীজির (সা) ইরশাদ হচ্ছে, "সে ব্যক্তি সবচে' ক্ষতিগ্রস্ত যে অন্যের দুনিয়াদারী বৃদ্ধির জন্য নিজের দীন ও ঈমানকে বিক্রি করে দেয়"।

ভোট দেয়া আল্লাহর পবিত্র আমানত। স্বজনতোষণ বা অন্য কোন কারণে অযোগ্য পাত্রকে নির্বাচন, মনোনয়নদান কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে ২টি হাদিস প্রণিধানযোগ্য।

مَن استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو ارضى الله عنه منه فقد خان الله ورسوله (رواه حاكم)

অনুবাদ : যদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কোন পদে এমন কোন লোককে নিয়োজিত, নির্বাচিত বা মনোনীত করে যে, যার চাইতে আল্লাহর বিচার অনুসারে অধিকতর পছন্দসই লোক সেই সমাজে বিদ্যমান থাকে, তবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহর রাসূলের নিকট পবিত্র আমানতের খেয়ানতকারী সাব্যস্ত হবে।

من ولى من امر المسلمين شيئا فامر عليهم احدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم (رواه حاكم)

অনুবাদ : যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম সমাজের কোন দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্বের পদ পায় এবং সে যদি কোন লোককে রাষ্ট্রীয় কোন পদে যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও সততার

মাপকাঠিতে বিচার না করে আঞ্চলিকতা, আত্মীয়তা, তোষামোদ, স্বার্থ ইত্যাদির খাতিরে কাউকেও নিয়োজিত, নির্বাচিত বা মনোনীত করে, তবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে– তার ফরয, নফল কোন বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না; শেষ বিচারে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে পাঠানোর আদেশ দান করবেন।

১৪.৭ ঈমানের দৃষ্টিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করার ক্ষতি (Loss of Islam for non Applying voting power in the light of Islam)

কোনো প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম ব্যক্তি যদি, তার ভোটের আমানত প্রয়োগ না করেন, কিংবা উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ না করেন, তবে তিনিও একজন অপরাধী। মনে রাখতে হবে, এই ভোটাধিকার মুমিনদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত। এই আমানত প্রয়োগ করতে হবে খোদাদ্রোহী ব্যবস্থা এবং ফাসিক ও পাপিষ্ঠ নেতৃত্ব উৎখাত করার আর আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা এবং ঈমানদার ও সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ উদ্দেশ্যে যদি কোনো মুমিন তার ভোটাধিকার প্রয়োগ না করেন, তবে তিনি অনেকগুলো বড় বড় পাপের অপরাধে অপরাধী হবেন এবং তিনি বিরাট ক্ষতির কাজে নিজেকে জড়িত করবেন। যেমন–

১. তিনি আল্লাহর দীন বিজয়ী করার বিপক্ষে অবস্থান নিলেন।

২. তিনি খোদাদ্রোহী ফাসিক, পাপিষ্ঠদের নেতৃত্ব বহাল রাখার পক্ষে অবস্থান নিলেন।

৩. তিনি আমানত উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে অর্পণ না করে খেয়ানত করলেন।

৪. তিনি সমাজে অনৈসলামী ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে অবস্থান নিলেন।

৫. তিনি খোদাদ্রোহী ফাসিক, ফাজির ও পাপিষ্ঠদের আনুগত্যে সন্তুষ্ট থাকলেন।

৬. তিনি ইসলাম থেকে কুফরকে অধিক ভালোবাসলেন।

৭. তিনি মানুষকে মানব রচিত আইন ও কর্তৃত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার বিপক্ষে অবস্থান নিলেন।

৮. তিনি মানুষকে আল্লাহর আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করলেন।

৯. তিনি সমাজে পাপ পঙ্কিলতা, ফিতনা ফাসাদ ও যুলুম অত্যাচার জিইয়ে রাখার পক্ষে অবস্থান নিলেন।

১০. তিনি কুফরি ও বাতিল শক্তির সহায়ক হিসেবে এবং আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করলেন।

কোনো মুসলিম সমাজে এ ধরনের লোক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সেখানে খোদাদ্রোহী ব্যবস্থাই চালু থাকবে। সেখানে ফাসিক, ফাজির ও খোদাদ্রোহী পাপিষ্ঠদেরই কর্তৃত্ব চলবে। সেখানে আল্লাহর দীন কায়েম হবে না, আল্লাহর আইন চালু হবে না এবং সেখানকার জনগণ মানব রচিত আইনের এবং অসৎ-পাপিষ্ঠ লোকদের নেতৃত্বের যুলুম থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা যদি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন হয়, তবে নির্বাচন ও ভোট যুদ্ধের মাধ্যমে দেশে আল্লাহর আইন চালু করা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা সম্ভব। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যদি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সচেতন না হয় এবং আল্লাহভীরু, সৎ ও যোগ্য লোকদের পক্ষে নিজেদের ভোটের আমানত প্রয়োগ না করে, তবে–

- কুরআন-সুন্নাহ্ তথা আল্লাহর দীন পরাজিত ও বাতিলের অধীন হয়ে থাকবে।
- ঈমানদার মুসলিম জনগণকে খোদাদ্রোহী, ফাসিক, ফাজির ও অসৎ লোকদের আনুগত্য করতে হবে।
- ইসলামী জনগণ আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে না।
- মানুষকে মানব রচিত আইন ও মতবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না।
- মানুষ আল্লাহর দাসত্বের পরিবর্তে মানুষের গোলামি করতে বাধ্য হবে।
- বাতিল শক্তি যতোটুকু ইসলাম পালন করার সুযোগ দেবে, তার চাইতে অধিক ইসলাম পালন করা যাবে না।
- পূর্ণ মুসলিম হবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।
- সমাজ পাপ-পঙ্কিলতা ও অনাচারে ভরে যাবে।
- মানুষ দুর্নীতির যাঁতাকলে পিষ্ঠ হতে থাকবে।
- হানাহানি, রাহাজানি ও সন্ত্রাসে সমাজ ও রাষ্ট্র ছেয়ে যাবে।
- অসৎ নেতৃত্ব কর্তৃত্বের কারণে সমাজে খোদাদ্রোহিতার প্রসার ঘটবে।
- সৎ জীবন যাপন করা হয়ে উঠবে কঠিন। পক্ষান্তরে অসৎ জীবন যাপন করাটা হবে সহজ।
- ঈমানদারদের সন্তানরা মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না।
- মুসলিম সমাজ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।
- আল্লাহর আযাব অবধারিত হবে।
- মানবতা হিদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে।

১৪.৮ ভোটাধিকার প্রয়োগ ও সংরক্ষণের মহান কাজে অংশগ্রহণ (Participation in Applying and preserving of voting power)

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে,

১. খোদাদ্রোহী, সীমালঙ্ঘনকারী, দুর্নীতিবাজ, পাপিষ্ঠদেরকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা যাবে না, তাদের কর্তৃত্ব মানা যাবে না এবং তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

২. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুগত-বাধ্যগত মুমিনদেরকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে, কেবল তাদেরই আনুগত্য করা যাবে।

৩. মুমিনদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নেতৃত্বের আমানতের বোঝা বহন করার অধিকতর যোগ্য, তাদের হাতেই এ আমানত অর্পণ করতে হবে।

যোগ্য মুমিনদের হাতে জাতীয় নেতৃত্ব অর্পণ করার পন্থা বা কৌশল কি হবে এর জবাবে বলা যায় যেখানে জনমত তথা নির্বাচন ও ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে, সেখানে প্রকৃত মুমিনদেরকে অবশ্যই নির্বাচন ও ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে খোদাদ্রোহী, ফাসিক, ফাজির ও পাপিষ্ঠদেরকে জাতীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে উৎখাত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত আল্লাহভীরু লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করতে হবে। আমানত উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করার অর্থ এটাই। এ ক্ষেত্রে ভোট ও নেতৃত্বের দায়িত্ব দুটোই আমানত।

বাতিল, ধর্মনিরপেক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা ও নেতৃত্ব মূলোৎপাটিত করে আল্লাহর আইন ও সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোট প্রয়োগ করা ও ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য ফরয। এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা ও গাফলতি কুফরি শক্তির সহায়তার নামান্তর।

তবে দেখা যায়, বাতিল সমাজে ভোটাধিকার সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন–

– ভোটার না করা, কিংবা অসতর্কতাবশত ভোটার না হওয়া।

– ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেয়া।

– ভোট প্রদানে বাধা দান।

– অসৎ লোক কর্তৃক সৎ লোকদের ভোট দিয়ে ফেলা।

– অজ্ঞতা ও অসতর্কতার কারণে নিরীহ বা দরিদ্র ইসলামপ্রিয় লোকদের ভোট অসৎ লোক কর্তৃক ক্রয় করা।

– ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।

– ব্যালট বাক্স ছিনতাই করা।

– ভোট গণনায় হেরফের করা।

– তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে সৎ লোকদের পরাজিত করা।

ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে এসব এবং অনুরূপ আরো অনেক বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব বাধা প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেই একজন মর্দে মুমিনকে তার ভোটাধিকার সংরক্ষণ ও প্রয়োগ করতে হবে। সেই সাথে তার প্রয়োগকৃত ভোট ও ভোটের ফলাফল যেনো ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ছিনতাই, বাতিল কিংবা বিনষ্ট না হয়, সেজন্য তাকে নির্বাচনী যুদ্ধে অতন্দ্র বীর প্রহরীর মতো সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হবে। সেই সাথে তাকে দীপ্ত ঈমানের দুর্বার তাকিদে নিম্নোক্ত কাজগুলোও করতে হবে :

১. দীনের বিজয় ও সৎ নেতৃত্বের পক্ষে ব্যাপক দাওয়াত ও জনমত সৃষ্টি করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

২. ভোটার হবার সময় এবং ভোটার হবার যাবতীয় নিয়ম-কানুন জানতে হবে।

৩. নিজে ভোটার হতে হবে, পরিবারের বয়স্ক সবাইকে এবং সপক্ষের লোকদের ভোটার করতে হবে।

৪. ভোটার তালিকা প্রকাশ হবার সাথে সাথে নিজেদের নাম তালিকায় আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। না থাকলে নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করে ভোটার তালিকায় নাম লেখাতে হবে।

৫. ইসলামপ্রিয় মহিলারা যেনো ব্যাপকভাবে ভোটার হয় সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে।

৬. নির্বাচনের সময় অন্য কেউ যেনো নিজস্ব ভোটারদের প্রতারিত করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭. যাতে করে ভোট কেনা-বেচা হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৮. ভোটের দিন আগে ভাগেই ভোট দিতে হবে। কেউ যেনো স্বীয় ভোট দিয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৯. ভোট কেন্দ্রে পৌঁছার পথে সকল বাধা দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০. সব কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে হবে।

১১. সব ধরনের জাল ভোট প্রদান প্রতিরোধ করতে হবে।

১২. কেউ যেনো ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৩. ব্যালট বাক্স যাতে করে ছিনতাই হতে না পারে, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৪. ভোট গণনার সময় ভোট কেন্দ্রে এজেন্টদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং ভোটারদের এ ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় অধিক সক্রিয় থাকতে হবে।

১৫. রেজাল্ট শীটে স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. তথ্য সন্ত্রাস প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. গুজবের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। গুজবে কান দেয়া যাবে না।

১৮. রেজাল্টে যেন কারচুপি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

১৯. নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেই দুর্নীতিগ্রস্ত সেক্যুলার বাতিলপন্থীরা পরাজিত হবে।

ভোট সংগ্রহ, স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান ও ভোটের ফলাফল ধরে রাখার সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এক বড় জিহাদ, বলিষ্ঠভাবে এ জিহাদে অংশ গ্রহণ প্রত্যেক মুমিন ভোটারের ঈমানের দাবী।[১১]

---

১১. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, নির্বাচনে জেতার উপায়, বর্ণালি বুক সেন্টার, জুলাই ২০০১।

প্রশ্নাবলী

১. নির্বাচন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

(Discuss about Election in Islamic perspective)

২. মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ ছিলেন নির্বাচিত– আলোচনা করো।

(Rulers of Islamic State of Madina were Elected-Discuss)

৩. ইসলামের মহান খলীফাগণ কিভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, বর্ণনা করো।

(Describe how the great kalifhs of Islam were elected?)

৪. ভোটের সংজ্ঞা দাও। ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচনে ভোট প্রদানের গুরুত্ব কতটুকু? ব্যাখ্যা করো।

(Define vote. How nuch important is vote in Islam and applying voting power in the election.)

৫. একজন নাগরিকের যেসব ক্ষেত্রে ভোট দিতে হয় তা বর্ণনা কর।

(Describe the area for whieh voting power is necessary for a citizen)

৬. ইসলামে ভোটাধিকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

(Discuss the significance of suffrage in Islam.)

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট, ভোটার ও প্রার্থীর ভূমিকা বর্ণনা করো।

(Describe the role of vote, voter and candidate in the light of Islam)

৮. ইসলামে ভোটারের কর্তব্যসমূহ বর্ণনা কর।

(Describe the duties of voter in the light of Islam)

৯. ইসলামের দৃষ্টিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করার ক্ষতিসমূহ বর্ণনা করো।

(Describe the loss of Islam for non applying voting power)

১০. ভোটাধিকার সংরক্ষণের মহান কাজে অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং এক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো দেখা দেয় তা বর্ণনা করো।

(Describe the necessity of participation in the voting right preservation and mention barrier in this field.)

১৫

ইসলামী শাসনতন্ত্র বা সংবিধান

Islamic Constitution

১৫.১ ভূমিকা (Introduction)

ইংরেজি 'Constitution' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে কিছু মতভেদের অবকাশ রয়েছে তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে 'সংবিধান' ও 'শাসনতন্ত্র' শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত তত্ত্বগত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'সংবিধান' এর পরিবর্তে 'শাসনতন্ত্র' কথাটি অধিক উপযোগী মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে দু'টি কারণ উল্লেখযোগ্য।

১. যে কোন স্থানীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক সংঘ-সমিতির ক্ষেতেই সংবিধান কথাটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। সম্যক বিধান বা সুব্যবস্থা অর্থে সংবিধান। যে কোন একটি সাধারণ ক্লাব বা সমিতির পরিচালনার ক্ষেত্রেও এরূপ সুব্যবস্থা বা সংবিধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এসব সংঘ-সমিতির ক্ষেত্রে শাসন কথাটির কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্র বা ইসলামী রাষ্ট্রে যে নিয়ম-কানুন বা সম্যক বিধানের প্রয়োজন হয় তা পুরোপুরি শাসন ব্যবস্থার ব্যাপার। রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-কানুনের বিষয়টি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'সংবিধান' কথাটির চাইতে 'শাসনতন্ত্র' কথাটি যথাযথ বলেই প্রতিভাত হয়।

২. মানব সমাজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক প্রকৃতির সংঘ বা সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্র যে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (Institution) কে নির্দেশ করে তার সঙ্গে অন্যান্য যে কোন মানবিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত ও মাত্রাগত পার্থক্য আছে। এখানে গুণগত পার্থক্য বলতে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক আনুগত্যকে বুঝানো হয়। 'শাসনতন্ত্র' কথাটির মধ্যেই এই বাধ্যতামূলক প্রকৃতিটি বর্তমান আছে।

মাত্রাগত দিক থেকে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী রাষ্ট্রের অন্তর্গত যে কোন সংঘ-সমিতির সংবিধানসমূহকে ছাপিয়ে বিরাজমান। অন্য যে কোন সংবিধানই রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুনের দ্বারা শাসিত। এই অর্থেও 'শাসনতন্ত্র' কথাটি অধিকতর উপযোগী।

১৫.২ শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Constitution)

শাসনতন্ত্র বলতে সংক্ষেপে রাষ্ট্র পরিচালনার কতকগুলো মূলনীতিকেই বুঝায়। রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্রের গঠন, সরকারের কাঠামো, ক্ষমতা ও কার্যাবলী, সরকারের সঙ্গে নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ে অপরিহার্যভাবে কতকগুলো বিধি-বিধান থাকে। এই বিধি-বিধানগুলো সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র হিসেবে অভিহিত হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রামাণ্য কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. এরিস্টটলের মতে, The way of life the state has Cheren for itself. রাষ্ট্র কর্তৃক বাছাইকৃত জীবন প্রণালীই হলো শাসনতন্ত্র।

২. অধ্যাপক ফাইনারের মতে, যে সকল নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার ও বন্টনের রীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাই শাসনতন্ত্র।

৩. ডাইসির মতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেসব নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার ও বন্টনের রীতি-নীতিকে প্রভাবান্বিত করে তাই শাসনতন্ত্র।

৪. লর্ড ব্রাইসের মতে, শাসনতন্ত্র হল সেসব আইন ও প্রথার সমষ্টি যেগুলো রাষ্ট্রের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

৫. অগ ও জিংগ (Ogg & Zink) এর মতে, শাসনতন্ত্র হল বিশেষভাবে পবিত্র সেই সকল মৌলিক আইন যার দ্বারা শাসনব্যবস্থার কাঠামো স্থিরীকৃত হয় (... fundamental Law of special sanctity... out lining the structure of a governmental system.)

৬. অধ্যাপক হোয়ার (K.C. Wheare) এর মতে, শাসনতন্ত্র হলো সেই সব আইনের সমষ্টি যা সরকারের ক্ষমতার প্রয়োগের লক্ষ্য ও মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে (The constitution is the body of rules which regulates the ends for which and the organs through which government power is exercised.)

৭. সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong) এর মতে, শাসনতন্ত্র হল কতকগুলো নীতির সমষ্টি যার মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার ও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়। (A constitution may be said to be a collection of principles according to which powers of government,

the rights of the governed and the relation between the two are adjusted.)

৮. অস্টিন রেনী (Austin Ranney) এর মতে, লিখিত বা অলিখিত, বিধিসম্মত বা বিধি বহির্ভূত সকল মৌলিক নিয়ম-কানুন যা দেশের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তাই হল শাসনতন্ত্র। (A constitution is the whole body of fundamental rules, written and unwritten, legal and extra legal according to which a particular government operates.)

৯. গিলক্রাইস্টের (Gilchrist) এর মতে, শাসনতন্ত্র বলতে কতকগুলো লিখিত বা অলিখিত নিয়মকে বুঝায় যার ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়, সরকারের বিভাগসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয় এবং ঐ সমস্ত বিভাগের কার্যক্ষেত্র নির্ধারিত হয়।

১০. মার্কসবাদীদের মতে, শাসনতন্ত্র হল এমন কতকগুলো বিধি-নিয়ম যার মাধ্যমে সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিফলিত হয়। শ্রেণী বৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী প্রভুত্বকারী শক্তি হিসেবে শাসনক্ষমতা অধিকার ও প্রয়োগ করে। ঐ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। তাকেই বলে শাসনতন্ত্র।

১৫.৩ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of the Constitution)

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. **আইনমূলক ধারণা :** শাসনতন্ত্র হল একটি আইনমূলক ধারণা।

২. **রীতিনীতি ও প্রথাগত ধারণা :** বিধিবদ্ধ আইন ছাড়াও শাসনতন্ত্র বলতে বহু রীতিনীতি এবং প্রথাকেও নির্দেশ করে। শাসনতন্ত্র বলতে এই সব বিধিবদ্ধ আইন, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, প্রথা সব কিছুকেই বুঝায়।

৩. **দেশের মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন :** শাসনতন্ত্র হল দেশের মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন (Fundamental law)। দেশে শাসনতন্ত্র নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইন প্রণীত হয়। সেজন্য শাসনতন্ত্র হল অন্যান্য আইনের নিয়ামক। তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ মর্যাদাযুক্ত।

৪. **সরকারের কাঠামো বর্ণনা :** শাসনতন্ত্র সরকারের মূল কাঠামো এবং গঠন ব্যবস্থা স্থির করে দেয়।

৫. সরকারের সবকিছুই শাসনতন্ত্র দ্বারা স্থিরীকৃত হয় : সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, তাদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী, সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক সবকিছুই শাসনতন্ত্রের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

৬. সরকারকে নিয়ন্ত্রণ : শাসনতন্ত্র সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৭. রাষ্ট্রের চরিত্রের প্রতিফলন : শাসনতন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্র চরিত্র প্রতিফলিত হয়।

৮. রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রয়োগবিধির বর্ণনা : শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রয়োগবিধি প্রণয়ন করে।

৯. নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা : শাসনতন্ত্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকার চিহ্নিত করে এবং সংরক্ষণের বিধান দেয়।

১০. পরিবর্তন পদ্ধতির বর্ণনা : শাসনতন্ত্র পরিবর্তনশীল। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের পদ্ধতিও শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত থাকে।

১৫.৪ ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি (Principles of Islamic Constitution)

১. শাসনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি

খেলাফতের জন্যে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার শাসনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُو الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

হে মুমিনগণ, আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার কর্মকর্তাদের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ হয় তাহলে উহা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে অর্পণ কারে– যদি সত্যি তোমরা আল্লাহ এবং কেয়ামত বিশ্বাস কর। (৪ : সূরা আন নিসা : ৫৯)

২. শাসনতন্ত্রের মূলনীতি

উপরোক্ত ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন শাসনতন্ত্রের যে মূলনীতিসমূহ পেশ করে, তা সংক্ষেপে এরূপ :

এক. মূল আনুগত্য আল্লাহর

খেলাফতের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তর কাজের পরিচালনায় মূল আনুগত্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর; আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কোথাও কোনরূপ আনুগত্যের অধিকার কারো নেই। আল্লাহর আনুগত্যকে অব্যাহত রেখে নিম্নরূপ আনুগত্য ও কর্তব্যকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে:

ক. আল্লাহর আনুগত্যের পর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

খ. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকে ঠিক রেখে কর্মকর্তাদের আনুগত্য করতে হবে।

গ. কর্মকর্তাদেরকেও মুমিন হতে হবে।

ঘ. রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং সরকারের সাথে মতভেদ করার অধিকার জনগণের অবশ্যই থাকবে।

ঙ. এরূপ মতভেদের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নিতে হবে আল্লাহ ও রাসূলের আইন থেকে।

চ. রাষ্ট্রে এমন একটি সর্বোচ্চ আদালতের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা সরকারি কর্মকর্তা বা জনগণের চাপের ঊর্ধ্বে থেকে উপরোক্ত মতভেদের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের আলোকে চূড়ান্ত ফায়সালা দিতে পারে।

দুই. শাসন বিভাগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়ন্ত্রণ

শাসন বিভাগের যাবতীয় ক্ষমতা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে এবং আল্লাহ ও রাসূলের যাবতীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এই সীমা ও আইন লঙ্ঘন করে কেউ কোন নীতি নির্ধারণ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে পাপ বা অন্যায় হতে পারে– এমন কোন আদেশও কেউ দিতে পারবে না। কেননা আল্লাহ ও রাসূল যে আইন দিয়েছেন, তার বাইরে গিয়ে কেউ কারো আনুগত্য লাভের অধিকারই পেতে পারে না। [এ সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের বিস্তৃত হুকুম সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

এ ছাড়া শাসন বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদের মাধ্যমেই নিয়োগ করতে হবে। এই পরিষদের নির্বাচনের কোন নির্দিষ্ট পন্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কিছু বলা হয়নি। স্থান-কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী নির্বাচনের যে কোন সুষ্ঠুরূপ নির্ধারণের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

তিন. আইন পরিষদে আল্লাহ-রাসূলের নিয়ন্ত্রণ

আইন পরিষদকে (Judiciary) অবশ্যই একটি পরামর্শ সংস্থা (Consultative Body) হিসেবে কাজ করতে হবে এবং এ পরিষদের আইন প্রণয়নের অধিকারকে আল্লাহ রাসূলের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের স্পষ্ট আইন-কানুন ও সুনির্ধারিত নীতি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে এ পরিষদের নতুন কিছু করার নেই। এ পরিষদ ঐ সকল আইন ও নীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিতে পারবে, যেগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য উপধারা, শাখানীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে। কিন্তু উক্ত কোন আইন বা নীতিকে রহিত অথবা পরিবর্তন করতে পারবে না।

যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন স্পষ্ট বিধান দেননি, কোন সীমা বা নীতিও নির্ধারণ করেননি, সে ক্ষেত্রে এই আইন পরিষদ ইসলামের মূল ভাবধারা (Spirit) ও সাধারণ নীতি অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে যে কোন আইনই রচনা করতে পারবে। কেননা সেরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের কোন আইন না থাকায় এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ তা রচনার দায়িত্ব মুমিনদের ওপরই অর্পণ করেছেন।

চার. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
Freedom of Judiciary

বিচার বিভাগকে (Judiciary) সরকার বা জনগণের যাবতীয় হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও চাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে, যাতে করে তা জনগণ বা সরকারি কর্মকর্তাদের বিপক্ষেও প্রকৃত আইন মুতাবিক নির্ভয়ে রায় দান করতে পারে। এ বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের সর্বোচ্চ আইন কানুন মুতাবিক চলতে হবে এবং এর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে নিজের বা অন্যের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে হক ও ইনসাফ মোতাবিক যাবতীয় মুকাদ্দমার সঠিক রায় দান করা। আল্লাহ বলেন–

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

অতএব, তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহর নাযিল করা আইন মোতাবিক বিচার কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৪৮)

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

আর তুমি সত্যের সাথে মানুষের মধ্যকার বিচার সম্পন্ন করো এবং নিজ প্রবৃত্তির

কখনো অনুসরণ করো না; কেননা তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। (৩৮ : সূরা সোয়াদ : ২৬)

১৫.৫ মানব ইতিহাসের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র : মদীনা সনদ (The first written constitution of the world : The Charter of Medina)

১৫.৫.১ ভূমিকা
Introduction

৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর মহানবী (সা) সেখানে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। সে সময় মদীনায় ছিল ব্যক্তি ও গোত্রকেন্দ্রিক শাসন। মদীনায় ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। মদীনাবাসী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন, মদীনায় সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা) একটি সনদ প্রকাশ করেন। এ সনদটি বিখ্যাত মদীনার সনদ (The Charter of Medina) নামে খ্যাত। এ সনদ মহানবী (সা)-এর ধর্মীয় উদারতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ লিখেছেন, মুসলিমরাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের জন্য লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। বস্তুত মহানবী (সা) ছিলেন এ শাসনতন্ত্রের রচয়িতা। তিনি যখন জনগণকে একটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে নিয়ে এলেন তখন তিনি একটি লিখিত শাসনতন্ত্র জারি করলেন। শুরুতে মদীনা ছিল একটি নগর রাষ্ট্র। কিন্তু মাত্র দশ বছর পর মহানবী (সা)-এর ওফাতের সময় সমগ্র আরব ভূখণ্ড, ইরাকের দক্ষিণাংশ এবং ফিলিস্তিন ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়।[১] মহানবী (সা)-এর লিখিত শাসনতন্ত্রটি এখন পর্যন্ত হুবহু সংরক্ষিত আছে। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম এবং আবু উবায়েদের বর্ণনার মধ্যদিয়ে এটি বর্তমান কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, আইন-প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিচারব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয় এই লিখিত শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানসহ জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে স্পষ্টভাবে। অমুসলিমদের সাথে আচরণবিধি, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং তৎকালীন সমাজের চাহিদা প্রভৃতি বিষয়গুলোও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এই শাসনতন্ত্রের আলোচ্য সূচী খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। ৫২টি ধারা সম্বলিত এ শাসনতন্ত্রটি প্রণয়ন

১. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ইসলাম পরিচয়, আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৭৯।

ও জারি করা হয়েছিল হিজরী প্রথম বর্ষে ৬২২ খৃষ্টাব্দে।[২] Reuben Levy এর মতে, এই মদীনা সনদের মধ্যেই নিহিত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ।[৩]

১৫.৫.২ মদীনা সনদের উদ্দেশ্য

Objective of the Charter of Medina

মহানবী (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল মদীনায় কুরআনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তিনি মদীনায় বিবাদমান আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে মদীনায় বসবাসরত সকল মুসলমান ও অমুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ধর্মীয় বিকৃতি ও সাংস্কৃতিক বেলেল্লাপনা দূর করে মহানবী (সা) ত্রাণকর্তারূপে মদীনায় হিজরত করে একটি সনদ জারি করেন। এ সনদই মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি। মদীনায় আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে মদীনা সনদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এ সনদের উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধ; যেমন :

এক. শতধা বিভক্ত মদীনাবাসীদের মধ্যে যাবতীয় অনৈক্য ও বিভেদ দূর করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

দুই. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মদীনার সকল নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা।

তিন. দীনের কারণে জন্মভূমি ত্যাগকারী সর্বস্ব হারানো মুহাজিরদের জন্য বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা করা।

চার. মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে মৈত্রী, সদ্ভাব ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

পাঁচ. মদীনায় ইসলামকে বিজয়ী শক্তির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে মানব মুক্তির এ আদর্শের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সাধন করা।

১৫.৫.৩ মদীনা সনদের ধারাসমূহ

Clauses of the Charter of Medina

শিগরিগরই একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হলো। এটি ছিল একটি বিরাট সাফল্য। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শাসিত আর শাসকের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা লিখিত

---

২. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

৩. Reuben levy, The Social Structure of Islam (London, Cambridge University press 1979) p. 275.

হয়। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত অনুমতি নিয়ে মদীনা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র তৈরী করা হয়। এভাবেই একটি রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্রের ঐতিহাসিক দলীল বাস্তবে রূপায়িত হয়।

পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র [মদীনা সনদ]

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'

[আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক জারিকৃত এটি লিখিত কিতাব বা চুক্তি– কুরাইশ এবং ইয়াসরিবের মু'মিন, মুসলিম আর যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তাদের সাথে জিহাদের অংশগ্রহণ করবে।]

১। তারা আর সব লোকের থেকে স্বতন্ত্র একটি উম্মাহ্ বা জাতি।

২। কুরাইশের মুজাহিদগণ পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যকার রক্তপণ প্রদান করবে আর মু'মিন, মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম এবং ন্যায়নীতির নিরীখে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করবে।

৩। বনু আউফ পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তপণ আদায় করবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মনীতি এবং ন্যায় বিচার ও আদল ইনসাফের বিত্তিতে মুক্তিপণের সাহায্যে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৪। বনু সাঈদা পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের পূর্বহারে রক্তপণ প্রদান করবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনের মধ্যে উত্তম পন্থা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণের সাহায্যে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৫। বনু হারিস পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তপণ প্রদান করবে, আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে উত্তম পন্থা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে বন্দীদের মুক্ত করবে মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে।

৬। বনু জুমাম পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যগণের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তের মূল্য দেবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৭। বনু নাজ্জার পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তের মূল্য প্রদান করবে, আর অন্যসব গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণের এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৮। বনু আমর ইবন আউফ পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের রক্তের মূল্য পূর্বহারে প্রদান করবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করে বন্দীদের মুক্ত করবে।

৯। বনু নবী ৩ (আননবী ১৩) পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তের মূল্য দেবে আর প্রতিটি গোত্র মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণকর এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রক্তপণের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১০। বনু আউস (আল আউস) পূর্ব প্রথানুযায়ী সদস্যদের জন্য তাদের প্রদত্ত পূর্বহারে রক্তপণ আদায় করবে, আর তাদের প্রতিটি দল মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মনীতি এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রক্তপণের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

১১। মু'মিনরা নিজেদের ঋণগ্রস্ত/অভাবগ্রস্ত কাউকেই পরিত্যাগ করবে না এবং মুক্তিপণ ও রক্তপণ আদায়ের জন্য তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে।

১২। কোন মু'মিনই অন্য মু'মিনের আশ্রিত ব্যক্তির সাথে (মাওলা) বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না তাকে (আশ্রয়দাতা) বাদ দিয়ে।

১৩। খোদাভীরু (মুত্তাকী) মু'মিনগণের মধ্য থেকে কেউ বিদ্রোহী হলে তার বিপক্ষে থাকবে অথবা কেউ মু'মিনদের মধ্য থেকে অত্যাচার, পাপাচার, শত্রুতা বা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাইলে সে তাদের মধ্য থেকে কারো সন্তান হলেও তারা সম্মিলিতভাবেই তার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৪। এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে কোন কাফিরের জন্য হত্যা করবে না আর কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করবে না।

১৫। আল্লাহ্ প্রদত্ত জিম্মা বা নিরাপত্তা একটিই। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা দুর্বলকেই আশ্রয় দেয়া হবে। অন্যান্য লোক ব্যতীত মু'মিনগণ পরস্পর বন্ধু।

১৬। ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে যারা আমাদের অনুসরণ করবে তাদের জন্য সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা হবে আর তাদের সাথে করা হবে সদাচরণ। তাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন তো হবেই না। অধিকন্তু তাদের শত্রুদেরও সাহায্য করা হবে না।

১৭। মু'মিনদের একটি মাত্র চুক্তি। কোন মু'মিন অন্য মু'মিন ব্যতীত আল্লাহর রাহে জিহাদ করার লক্ষ্যে চুক্তি করবে না, ঐ চুক্তি যতক্ষণ না সমতা এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে।

১৮। আমাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করবে এমন প্রতিটি সেনা দল পরস্পরানুসারে একে অন্যের পেছনে থাকবে।

১৯। আল্লাহর রাহে দেয়া রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার অদম্য স্পৃহায় মু'মিনগণ পরস্পরকে সাহায্য করবে।

২০। মুত্তাকী বা খোদাভীরু মু'মিনগণই সর্বোত্তম এবং সঠিক হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২১। কোন মুশরিকই কুরাইশদের জান অথবা মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না বা মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন কুরাইশের পক্ষাবলম্বন করবে না।

২২। কোন মু'মিনকেই কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করলে এবং তা প্রমাণিত হলে প্রতিদানে তাকেও হত্যা করা হবে। তবে হ্যাঁ নিহত ব্যক্তির ওলী বা উত্তরাধিকারী যদি রক্তপণ গ্রহণে সন্তুষ্ট হয় সেটা ভিন্ন কথা।

২৩। এ সহীফায় সন্নিবেশিত বিষয়ে ঐক্যমত পোষণকারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন মু'মিনের জন্যই কোন অন্যায়কারীকে সাহায্য করা বা আশ্রয় দেয়া বৈধ হবে না। কেউ এমন লোককে সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করলে তার উপর আল্লাহর লানত এবং গযব আপতিত হবে। তার কাছ থেকে কোন বিনিময় এবং বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪। তোমাদের মধ্যে কখনো কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে একমাত্র আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে (মীমাংসার) প্রত্যাবর্তন করবে।

২৫। যুদ্ধকালীন সময়ে ইয়াহুদীরা মু'মিনদের সাথে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে।

২৬। বনু আউফের ইয়াহুদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মাহ। ইয়াহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম, তাদের মাওয়ালী বা আশ্রিত এবং তারা নিজেরাও। অবশ্য, যেই অন্যায় বা অপরাধ করবে, সে নিজের এবং তার পরিবার পরিজনের ক্ষতিই করবে।

২৭। বনু নাজ্জারের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

২৮। বনু হারিসের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদেরই মতোই।

২৯। বনু সা'ইদার ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩০। বনু হুদামের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩১। বনু আউসের ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই।

৩২। বনু সালাবার ইয়াহুদীরাও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই। অবশ্য যে অত্যাচার করবে, যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে নিজের এবং পরিবার পরিজনের জন্য ক্ষতি সাধন করবে।

৩৩। সালাবার শাখাগোত্র জাফনার ইয়াহুদীরাও সালাবারই অনুরূপ।

৩৪। বনু শুতাইবার ইয়াহুদীরা ও বনু আউফের ইয়াহুদীদের মতোই পাপাচার নয়, পুণ্যই কাম্য।

৩৫। সালাবার মাওয়ালী বা আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ তাদের মতোই।

৩৬। ইয়াহুদীদের বন্ধুরাও (চুক্তিবদ্ধ) তাদের মতোই।

৩৭। মুহাম্মদ (সা)-এর অনুমতি ছাড়া তাদের কেউ যুদ্ধের জন্য বেরুবে না।

৩৮। কারো ক্ষতির প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে কাউকেই বাধা দেয়া হবে না। কেউ হটকারিতা প্রদর্শন করলে সে নিজে এবং তার পরিবারই হবে দায়ী। তবে হ্যাঁ কেউ অত্যাচারিত হলে তার জন্য এটা প্রয়োজ্য নয়। এ চুক্তিনামায় যা আছে তার সর্বাধিক হিফাযতকারী একমাত্র আল্লাহ।

৩৯। ইয়াহুদী এবং মুসলমানগণ নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪০। এ সহীফা বা দলীল গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে, তাদের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিতভাবে পরস্পরকে সাহায্য করবে। পরস্পরকে সদুপদেশ এবং কল্যাণকর কাজেই তারা সাহায্য করবে, পাপ কাজে নয়।

৪১। বন্ধুর দুষ্কর্মের জন্য কেউই দায়ী হবে না, আর মজলুম বা অত্যাচারিতকে করা হবে সাহায্য।

৪২। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইয়াহুদীরা মু'মিনদের সাথে যুদ্ধে ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪৩। এ সহীফায় অঙ্গীকারাবদ্ধদের জন্য ইয়াসরিবের উপত্যকা পবিত্র।

৪৪। আশ্রিতরা আশ্রয়দানকারীদের নিজেদের মতোই যে পর্যন্ত তার কোন অন্যায় বা বিশ্বাসঘাতকতা না করে।

৪৫। কোন নারীকে তার গোত্রের বা পরিবারের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৬। এ সহীফায় অঙ্গীকারাবদ্ধ গোত্রের মধ্যে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে– এমন কোন ঘটনা ঘটলে আল্লাহ এবং রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে (মীমাংসার

জন্য) সমর্পণ করতে হবে। এ সহীফায় যা আছে তা রক্ষার এবং পূর্ণতা দানের জন্য আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক।

৪৭। কুরাইশ বা তাদের সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৮। ইয়াসরিবের উপর অতর্কিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তারা একে অন্যকে সাহায্য করবে।

৪৯। তাদেরকে যে কোন চুক্তি করার আহ্বান জানানো হলে তা চুক্তি করবে এবং মেনে চলবে। মু'মিনদেরকে চুক্তি করার আহ্বান জানালে, তারাও অনুরূপই করবে। তবে কেউ যদি ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে।

৫০। প্রতিটি মানুষই স্বপক্ষের কাছ থেকে তার প্রাপ্য অংশ পাবে।

৫১। বনু আউসের ইয়াহুদীরা তাদের মাওয়ালী এবং তারা নিজেরা এ সহীফার শরীক দলের মতোই হবে, তারা সহীফার শরীক দলের ন্যায় সম্মানজনক আচরণ করবে।

ইবনে ইসহাক বলেন, কারো কারো মতে এ অংশ হবে নিম্নরূপ : 'বিশ্বস্ততাই কাম্য, বিশ্বাসঘাতকতা নয়। যে এটা আয়ত্ত করে, সে নিজের জন্যই করে। এ সহীফায় যা রয়েছে আল্লাহই তার সত্যতার সাক্ষী এবং রক্ষাকারী।'

৫২। এ কিতাব বাস্তবায়নে অত্যাচারী এবং পাপী ছাড়া কেউ বাধা প্রদান করবে না। যেই যুদ্ধের জন্য বেরুবে আর যেই মদীনায় থাকবে সবই থাকবে শান্তিতে।

১৫.৫.৪ মদীনা সনদের গুরুত্ব

Importance of the Charter of Medina

১। **প্রথম লিখিত সংবিধান :** মহানবী (সা) প্রণীত ও কার্যকরীকৃত মদীনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান (First written constitution of the world)। প্রকৃতপক্ষে এ সনদ ছিল পরবর্তীকালের ব্রিটিশ ম্যাগনা-কার্টা বা মহাসনদ সমতুল্য এবং শুধু তৎকালীন যুগের নয় সর্বযুগের জন্য এতে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রয়েছে বলে ঐতিহাসিক মুর উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে জাতিসংঘের যেসব মানবাধিকার নীতি এবং নিরাপত্তার বিধান রয়েছে তা চৌদ্দশ বছর পূর্বে রচিত মদীনা সনদে বিদ্যমান দেখা যায়।

২। **মহানবী (সা)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক :** মদীনা সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। এ সনদ তাঁর নবুয়তের সাক্ষাৎ বহন করছে। সমকালীন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অবশ্যম্ভাবী

পরিণতি হতে মদীনাকে রক্ষার মানসে সনদ সম্পাদন নিঃসন্দেহে মহানবী (সা)-এর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

৩। **জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠন (Nation Building and State Buiding) :** মদীনা সনদ প্রণীত হওয়ার ফলে শতধা বিভক্ত মদীনাবাসীরা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে পায়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়। মদীনায় মুহাজিরদের সাথে আনসারদের গাঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। আনসারগণ মুহাজিরদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে এবং স্বীয় সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করে। মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি এ সনদের ফলেই গড়ে উঠে। ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশিজনিত স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিবর্তে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের উপর অধিকার এবং দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়। বস্তুত মদীনা সনদ ইসলামী গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে।

৪। **ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি :** মদীনা সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত এ সনদই পরবর্তীকালের বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল স্থাপন করে। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "Out of the religious community of all Medina the later and larger state of Islam arose". অর্থাৎ মদীনা রাষ্ট্রই পরবর্তীতে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।

৫। **ধর্মীয় উদারতা :** মদীনা সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা) ধর্মের ব্যাপারে যে উদার নীতির পরিচয় দেন, তা তৎকালীন বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ সে সময়ে বিশ্বের কোথাও ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। রাজার ধর্মই প্রজাকে মেনে চলতে হত। মদীনার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে সনদের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ করে উদারতার পরিচয় দেয়া হয়।

৬। **মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি :** মদীনা সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। মদীনার সমাজ ও রাজনীতির গণ্ডির মধ্যে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত নীতি নির্ধারক। মদীনা সনদ অনুযায়ী মদীনা রাষ্ট্রে মহানবী (সা)-এর সার্বিক কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই কর্তৃত্ব সার্বভৌম আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। মহানবী (সা)-এর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থনে হোসাইনীর মন্তব্য হচ্ছে, 'He regulated social relations, he raised armies and commanded them, he acquired territories and administered

them.'[8] প্রকৃতপক্ষে, মদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহই ছিলেন আইনগত সার্বভৌম এবং মহানবী (সা) ছিলেন কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

১৫.৫.৫ উপসংহার

বিশ্বের ইতিহাসে মদীনা সনদের গুরুত্ব অপরিহার্য। এ সনদ মহানবী (সা)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা, ধর্মীয় সহনশীলতা, জাতি গঠন, রাষ্ট্র গঠন ও সমাজ সংস্কারের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে। এ সনদই প্রমাণ করে যে মহানবী (সা) রাষ্ট্র পরিচালনায় একজন সুদক্ষ রাষ্ট্রপ্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রফেসর আবদুন নূর যথার্থই বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে জাতিগঠন ও সাংবিধানিক সরকার গঠনের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীর মহানবী (সা) কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত মদীনা সনদ। এই সনদের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সাংবিধানিক সরকার তথা ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে। সাংবিধানিক সরকার গঠন ও মদীনায় বসবাসকারী বহু ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে নিয়া একটি উম্মাহ বা সহিষ্ণু জাতি গঠনের অনুপম উদাহরণ হচ্ছে এই মদীনা সনদ।

১৫.৬ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসনতন্ত্র (The Constitution of the Islamic Republic of Iran)

১৫.৬.১ ভূমিকা
Introduction

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান এ যুগের ইসলামী রাষ্ট্র। ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সংঘটিত ইসলামী বিপ্লবের মধ্যদিয়ে আড়াই হাজার বছরের পুরনো রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎখাত করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান যুগের জটিল রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের উপযোগী একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে ইরানে যা বর্তমান বিশ্বের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দ্বন্দ্বে জর্জরিত রাষ্ট্রসমূহের সামনে ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্য বিধানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ– তারা সরকারি-বেসরকারী বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে একটি

৪. এস.এ.কিউ হুসেইনী, কনস্টিটিউশন অব দি আরব এম্পায়ার (লাহোর : শেখ মুহাম্মদ আশরাফ, ১৯৮৫) পৃ. ১৯।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন এবং গণভোটের মাধ্যমে তা গৃহীত হয়। শুরুতে বারটি অধ্যায় ও ১৭৫টি ধারা বিশিষ্ট এ শাসনতন্ত্র যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর মোট ধারা সংখ্যা ১৭৭ এ উন্নীত হয়েছে।

১৫.৬.২ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
Characteristies of the Constitution of the Islamic Republic of Iran

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে–

১. লিখিত সংবিধান

২. শরীয়া সর্বোচ্চ আইন

৩. মোটামুটি সংক্ষিপ্ত

৪. জাফরী ইসনা আশরীয়া ফিকাহ্‌র অনুসরণ (ধারা-১২)

৫. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি

৬. এককেন্দ্রিক / যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

৭. বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য

৮. ন্যায়বান উলামায়ে মুজতাহিদীনের প্রাধান্য (ধারা-৫)

৯. মুস্তায আফদের স্বার্থ সংরক্ষণ

১০. নারীর মর্যাদা সমুন্নতকরণ

১১. রাষ্ট্র নির্বাহীগণ জনগণের সেবক

১২. বিশ্বব্যাপী মজলুম, পর্যদুস্ত ও সংগ্রামী জনগণের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন

১৩. সংখ্যালঘুদের অধিকারের স্বীকৃতি (ধারা-১৩)

১৪. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির সকল প্রকার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং সকলের জন্য ইনসাফপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত নিরাপত্তা সৃষ্টি ও আইনের বরাবরে সকল মানুষের সমতার নিশ্চয়তা বিধান।

১৫. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং সকল জনগণের মধ্যে সার্বজনীন সহযোগিতাকে সম্প্রসারিত ও মজবুতকরণ।

১৬. ইসলামী মানদণ্ডের ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতির বিন্যাস সাধন, সকল মুসলমানের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ অঙ্গীকার এবং বিশ্বের মুস্তায আফ জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন।

১৫.৬.৩ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান ধারাসমূহ
Main Clauses of the Constitution of the Islamic Republic of Iran

সাধারণ মূলনীতি
Generalities

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে প্রজাতন্ত্রের সাধারণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যা (সুনির্দিষ্ট কতগুলো বিষয়ে) ঈমানের ওপর ভিত্তিশীল। এরপর ঈমানের বিষয়বস্তুসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে ঈমান ও তার অপরিহার্য দাবিসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমেই আল্লাহতে ঈমানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ অপরিহার্য। ঈমানের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হিসেবে খোদায়ী ওহী তথা নবুয়ত ও রিসালাত এবং 'আইন বর্ণনায়' তার মৌলিক ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয় বিষয় হিসেবে পরকালীন জীবনে ঈমানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহর পানে মানুষের পথপরিক্রমায় এর গঠনমূলক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ বিষয় হিসেবে সৃষ্টি প্রকৃতিতে এবং আইন প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়ানুগতা ভারসাম্য (عدل)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় হিসেবে অব্যাহত ইমামত ও নেতৃত্ব এবং ইসলামী বিপ্লবের স্থায়িত্ব বিধানে এর মৌলিক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে এবং ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে মানুষের সুমহান মর্যাদা ও মূল্যমান এবং আল্লাহর সামনে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতাসহ স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত ঈমান তিনটি পন্থায় ন্যায়নীতি ও ন্যায় বিচার, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় সংহতি সুনিশ্চিত করছে। এ তিনটি পন্থা হচ্ছে : (ক) পরিপূর্ণ শর্তবিশিষ্ট ফকীহগণ (মুজতাহিদগণ) কর্তৃক কিতাব এবং মা'ছুমগণের সুন্নাতের ভিত্তিতে অব্যাহত ইজতিহাদ, (খ) উন্নত মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতার ব্যবহার এবং তার অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টা, (গ) যে কোন ধরনের জুলুম অত্যাচারকরণ ও জুলুম অত্যাচার সহ্যকরণ এবং আধিপত্যকামিতা ও আধিপত্য মেনে নেয়াকে প্রত্যাখ্যান।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে নিশ্চিত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় ধারায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সর্বশক্তি নিয়োগকে ইরানের ইসলামী সরকারের দায়িত্ব কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

১. ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে এবং দুর্নীতি-অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার যাবতীয় বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২. সংবাদপত্র, গণমাধ্যম ও অন্যান্য উপায়-উপকরণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জ্ঞান ও অবহিতির স্তরের উন্নয়ন সাধন করা।

৩. সকল স্তরে সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও শরীরচর্চা শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং উচ্চশিক্ষাকে সহজ ও সার্বজনীনকরণ।

৪. গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং গবেষকগণকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও ইসলামী সকল ক্ষেত্রে পর্যালোচনা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মানসিকতাকে শক্তিশালীকরণ।

৫. সাম্রাজ্যবাদের পরিপূর্ণ বিতাড়ন এবং বিজাতীয়দের প্রভাব প্রতিহতকরণ।

৬. যে কোন ধরনের স্বৈরতান্ত্রিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও একচেটিয়াবাদের বিলোপ সাধন।

৭. আইনের সীমারেখার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান।

৮. স্বীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাগ্য নির্ধারণে সাধারণ গণমানুষের অংশগ্রহণ।

৯. অন্যায় বৈষম্যসমূহের উৎখাত সাধন এবং বস্তুগত ও মানসিক সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা।

১০. সঠিক পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অপরিহার্য নয় এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলোপ সাধন।

১১. দেশের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার হেফাজতের লক্ষ্যে সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকে শক্তিশালীকরণ।

১২. জনকল্যাণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বাসস্থান, কাজ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে কোন

ধরনের বঞ্চনার অবসান ঘটানো এবং বীমা ব্যবস্থার সার্বজনীনকরণের লক্ষ্যে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক, সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিতকরণ।

১৩. বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি, শিল্প, কৃষি, সামরিক বিষয় ও এরূপ অন্যান্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা বিধান।

১৪. নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির সকল প্রকার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং সকলের জন্য ইনসাফপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত নিরাপত্তা সৃষ্টি ও আইনের বরাবরে সকল মানুষের সমতার নিশ্চয়তা বিধান।

১৫. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং সকল জনগণের মধ্যে সার্বজনীন সহযোগিতাকে সম্প্রসারিত ও মজবুতকরণ।

১৬. ইসলামী মানদণ্ডের ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতির বিন্যাস সাধন, সকল মুসলমানের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ অঙ্গীকার এবং বিশ্বের দুর্বল জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন।

সংবিধানের চতুর্থ ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সকল প্রকার (সিভিল), ফৌজদারী, দেওয়ানী, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য আইন কানুন, বিধিবিধান ইসলামী মানদণ্ডভিত্তিক হবে। এ ধারার প্রয়োগ হবে নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ তথা সংবিধানের সকল ধারা এবং সকল আইন-কানুন, বিধিবিধান এর আওতাভুক্ত। এ ধারা রক্ষিত হয়েছে কিনা সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের মুজতাহিদ সদস্যগণ তা নির্ধারণ করবেন।

পঞ্চম ধারায় বলা হয়েছে যে : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসন ক্ষমতা ও নেতৃত্ব ন্যায়বান, তাকওয়াসম্পন্ন, যুগসচেতন, সাহসী, সুপরিচালক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুজতাহিদের ওপর অর্পিত থাকবে।

ষষ্ঠ ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জনমতের ভিত্তিতে দেশের কাজকর্ম পরিচালিত হবে। জনগণ প্রেসিডেন্ট, মজলিসে শূরায়ে ইসলামী (পার্লামেন্ট)-এর সদস্য, বিভিন্ন শূরা (পরিষদ/কমিটি) ইত্যাদির সদস্যপদ নির্বাচন অথবা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে গণভোটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করবে।

সপ্তম ধারায় শূরাসমূহের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : মজলিসে শূরায়ে ইসলামী, প্রাদেশিক শূরা, জিলা শূরা, শহর শূরা, মহল্লা শূরা, থানা শূরা, গ্রাম শূরা প্রভৃতি।

অষ্টম ধারায় বলা হয়েছে : "ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে কল্যাণের প্রতি আহ্বান, ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা সার্বজনীন ও পারস্পরিক কর্তব্য; এ দায়িত্ব জনগণের পরস্পরের প্রতি, জনগণের প্রতি সরকারের এবং সরকারের প্রতি জনগণের।"

দশম ধারায় বলা হয়েছে : "যেহেতু পরিবার হচ্ছে ইসলামী সমাজের মৌলিক ইউনিট সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকল আইন-কানুন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য হবে পরিবার গঠনকে সহজকরণ, এর পবিত্রতার হেফাযত এবং ইসলামী অধিকার ও আখলাকের ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পর্ককে সুদৃঢ়করণ।"

একাদশ ধারায় বলা হয়েছে : "যেহেতু কুরআনে কারীমের আয়াত ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون -এর হুকুম অনুযায়ী সকল মুসলমান এক উম্মত, সেহেতু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে স্বীয় সাধারণ নীতিকে ইসলামী জাতিসমূহের মধ্যে জোটবদ্ধতা ও ঐক্য সৃষ্টির ওপর ভিত্তিশীল করা এবং ইসলামী জাহানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাস্তবায়নের জন্যে অবিরত প্রচেষ্টা চালানো।"

দ্বাদশ ধারায় বলা হয়েছে : "ইরানের রাষ্ট্রীয় দীন ইসলাম এবং মাযহাব জাফরী ইসনা আশারী, আর এ ধারা কখনোই পরিবর্তনযোগ্য নয়; হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী ও জায়েদীসহ ইসলামের অন্যান্য মাযহাব পরিপূর্ণ সম্মানের অধিকারী এবং এসব মাযহাবের অনুসারীরা স্বীয় ফিকাহ অনুযায়ী মাযহাবী অনুষ্ঠানাদি আনজাম দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং দীনী শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে (বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার ও অছিয়ত) এবং তদনুযায়ী বিচারালয়সমূহে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ফায়সালা পাবার ক্ষেত্রে আইনগত স্বীকৃতির অধিকারী, তেমনি যে কোন এলাকায় এসব মাযহাবের যেটির অনুসারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হবে সেখানকার শূরাসমূহ পর্যায়ের স্থানীয় বিধিবিধানসমূহ ঐ মাযহাব অনুযায়ী হবে; এসব ক্ষেত্রে (শর্ত হচ্ছে এই যে,) অন্যান্য মাযহাবের অধিকার রক্ষা করা হবে।"

ত্রয়োদশ ধারায় বলা হয়েছে : "যরথুস্ত্রীয়, কালিমী (ইয়াহুদী) ও খ্রিস্টান ইরানীরা একমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে যারা আইনের আওতায় স্বীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং তারা ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে ও দীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীয় ধর্মানুযায়ী আমল করবে।"

চতুর্দশ ধারায় বলা হয়েছে : "ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকার এবং

মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে অমুসলমানদের সাথে সদাচার এবং ইসলামী ন্যায়নীতি ও সুবিচারের সাথে আচরণ করা ও তাদের মানবিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তবে এ নীতি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা ইসলাম ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে না বা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।"

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রভাষা ফারসী এবং স্থানীয়ভাবে মাতৃভাষাসমূহের পাশাপাশি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আরবি ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হিজরী চান্দ্রবর্ষ ও হিজরী সৌরবর্ষ উভয়বর্ষ উভয়কেই বর্ষগণনা ও তারিখ নির্দেশের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য সরকারী কাজকর্মের জন্য হিজরী সৌর পঞ্জিকা অর্থাৎ ইসলামী ফার্সী পঞ্জিকা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় পতাকায় বিশেষ পদ্ধতিতে আরবি হরফে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি খচিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৫.৬.৪ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে মানবাধিকার
Human Rights in Islamic Republic of Iran

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে এসব অধিকার বিবৃত হয়েছে। সংবিধানের এ অধ্যায়ের আওতাভুক্ত ধারাসমূহ নিম্নরূপ :

ধারা-১৯ : জাতি ও গোত্র নির্বিশেষে ইরানের জনগণ সমান অধিকার ভোগ করবে এবং রঙ, বর্ণ, ভাষা ও এ জাতীয় অন্য কোনকিছু (কারো জন্য) বিশেষ সুবিধার কারণ হবে না।

ধারা-২০ : নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি সমানভাবে আইনের সহায়তা লাভের অধিকারী এবং ইসলামী মানদণ্ড অনুযায়ী তারা সকল মানবিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লাভ করবে।

ধারা-২১ : ইসলামী মানদণ্ড অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব এবং সরকারকে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে :

১. নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তার বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

২. মায়েদেরকে, বিশেষ করে গর্ভকালীন ও সন্তানকে দুগ্ধ দানকালীন পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে এবং অভিভাবকবিহীন শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

৩. পরিবারের সংরক্ষণ ও স্থিতি বিধানের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত আদালত গঠন করতে হবে।

৪. বিধবা এবং বৃদ্ধ ও অভিভাবকবিহীন নারীদের জন্যে বিশেষ বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. আইনগত অভিভাবকের অবর্তমানে সন্তানদের কল্যাণার্থে সক্ষম মায়ের নিকট সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রদান করতে হবে।

ধারা–২২ : আইনের দাবি ব্যতীত ব্যক্তিদের মর্যাদা (ইজ্জত), জান, মাল, অধিকার, বাসস্থান ও পেশা যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

ধারা–২৩ : চিন্তা বিশ্বাস (আকীদা) সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ এবং শুধু কোন চিন্তা, বিশ্বাস (আকীদা) পোষণের কারণে কারো উপরে চড়াও হওয়া বা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না।

ধারা–২৪ : ইসলামের ভিত্তিসমূহ এবং সার্বজনীন অধিকারের ওপর হামলা চালানো ব্যতিরেকে সংবাদপত্র ও প্রকাশনা যে কোন বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আইনের দ্বারা নির্ণীত হবে।

ধারা–২৫ : আইনগত আদেশের ক্ষেত্র ব্যতীত তল্লাশী, চিঠিপত্র না পৌছানো, টেলিফোনের কথোপকথন রেকর্ড ও ফাঁস করা; টেলিগ্রাম ও টেলেক্সে প্রেরিত বক্তব্য ফাঁস করা, সেন্সর করা, না পাঠানো ও না পৌছানো; আড়িপাতা ও যে কোন ধরনের গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ।

ধারা–২৬ : মুক্তি, স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য ও ইসলামী মানদণ্ডের মূলনীতি এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তির বরখেলাফ বা লঙ্ঘন না হওয়ার শর্তে রাজনৈতিক ও পেশাগত দল, সমিতি ও সংগঠন এবং ইসলামী বা স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমিতি গঠনের অধিকার থাকবে। এসবে অংশগ্রহণে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না বা এর কোন একটিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা–২৭ : ইসলামের ভিত্তিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে অস্ত্র বহন ব্যতিরেকে যে কোন ধরনের সমাবেশ ও শোভাযাত্রার অধিকার থাকবে।

ধারা–২৮ : ইসলাম, সর্বসাধারণের স্বার্থ ও কল্যাণ এবং অন্যদের অধিকারের বিরোধী না হলে যে কেউ নিজ পছন্দমাফিক যে কোন পেশা নির্বাচনের অধিকারী।

সমাজের প্রয়োজন রক্ষা করে কর্মক্ষম সকল ব্যক্তির জন্য কাজের ব্যবস্থা ও কাজের সমান সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সরকারের দায়িত্ব।

ধারা–২৯ : অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, বার্ধক্য, কর্মে অক্ষম হয়ে পড়া, অভিভাবকহীনতা, পথে আটকে পড়া ও দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার কারণে এবং স্বাস্থ্যগত, চিকিৎসা সংক্রান্ত ও সেবা শুশ্রুষা সংক্রান্ত খেদমতের প্রয়োজনে বীমা আকারে ও বিনা খরচে সার্বজনীনভাবে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আইন অনুযায়ী জনগণের (রাষ্ট্রীয়) আয়ের খাতসমূহ এবং জনগণের অংশগ্রহণ থেকে প্রাপ্ত আয়সমূহ হতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উপরোক্ত সেবা ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

ধারা–৩০ : দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যে মাধ্যমিক স্তর (দ্বাদশ শ্রেণী) পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা এবং দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিধান পর্যন্ত বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষা ও তার উপায় উপকরণ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

ধারা–৩১ : প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিশীল আবাসনের অধিকারী হওয়া প্রতিটি ইরানী ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকার। এক্ষেত্রে যাদের প্রয়োজন তীব্রতর, বিশেষ করে গ্রামবাসী ও শ্রমিকদেরসহ তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ এ নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সরকারের দায়িত্ব।

ধারা–৩২ : আইনে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও যথাযথ আদেশ ব্যতীত কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। কাউকে আটক করা হলে প্রমাণাদি উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাথে সাথেই অবহিত করতে হবে ও তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগের প্রাথমিক ফাইল যথাযথ বিচার কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাতে হবে এবং সম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কেউ এ ধারা লঙ্ঘন করলে তাকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে।

ধারা–৩৩ : আইনের দাবিকৃত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে কাউকে তার বাসস্থান থেকে নির্বাসিত করা যাবে না বা তার পছন্দনীয় স্থানে বসবাসে তাকে বাধা দেয়া যাবে না বা কোন জায়গায় বসবাসে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা–৩৪ : বিচার প্রার্থনা করা প্রতিটি ব্যক্তির অকাট্য অধিকার এবং যে কেউই যথোপযুক্ত আদালতের নিকট বিচার প্রার্থনা করতে পারবে। এ ধরনের আদালতকে আওতার মধ্যে পাওয়া জাতির প্রতিটি সদস্যের অধিকার এবং যে

কেউ আইন অনুযায়ী যে আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকারী তাকে সেখানে গমনে বাধাদানে কারো অধিকার নেই।

ধারা–৩৫ : সমস্ত আদালতেই বিবদমান পক্ষদ্বয় নিজের জণ্যে আইনজীবী নিয়োগের অধিকার রাখে এবং কেউ যদি আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য না রাখে সেক্ষেত্রে তাদের জন্যে আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য সৃষ্টি করতে হবে।

ধারা–৩৬ : শাস্তির ও তা বাস্তবায়নের আদেশ শুধু যথোপযুক্ত আদালতের মাধ্যমে ও আইন অনুযায়ী হবে।

ধারা–৩৭ : নীতিগতভাবে মানুষকে নির্দোষ গণ্য করতে হবে এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপরাধী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আইনের দৃষ্টিতে কেউ অপরাধী হিসেবে পরিগণিত হবে না।

ধারা–৩৮ : স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায়ের জন্যে যে কোন ধরনের নির্যাতন নিষিদ্ধ। সাক্ষ্য দান, স্বীকারোক্তি বা শপথ করতে কাউকে বাধ্যকরণ অনুমোদিত নয় এবং এ ধরনের সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তি ও শপথের কোন মূল্য বা গ্রহণযোগ্যতা নেই।

এ ধারা লঙ্ঘনকারী আইনানুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

ধারা–৩৯ : আইনের আদেশ অনুযায়ী গ্রেফতার, আটক, কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত হয়েছে এরূপ ব্যক্তির সম্ভ্রম ও মর্যাদার হানি ঘটানো তা যে কোন ভাবেই হোক না কেন নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য।

ধারা–৪০ : কেউ নিজের অধিকার ভোগ করার নামে অন্যের ক্ষতি সাধনের বা সর্বসাধারণের স্বার্থহানি ঘটাবার অধিকারী নয়।

ধারা–৪১ : প্রতিটি ইরানী ব্যক্তির জন্য ইরান রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব এক অকাট্য অধিকার এবং ব্যক্তির নিজের আবেদনক্রমে বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্র ব্যতীত সরকার কোন ইরানীর নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবে না।

ধারা–৪২ : বিদেশী নাগরিককরা আইন অনুযায়ী ইরানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবে এবং এ ধরনের ব্যক্তিরা যদি অন্য দেশে নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হয় বা তারা নিজেরা (নাগরিকত্ব বাতিলের) আবেদন করে কেবল সেক্ষেত্রেই তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা যেতে পারে।

১৫.৬.৫ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অর্থনৈতিক নীতিমালা

Economic Principles of the Islamic Repulic of Iran

ইসলামী আদর্শের আলোকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল ও শক্তিশালী দেশ

হিসেবে ইরানকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতিমালা ও দিক নির্দেশনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ১৩টি ধারা এ লক্ষ্যে নিবেদিত হয়েছে। এ ধারাগুলো থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, Economy is a means, not an end এর মধ্য থেকে প্রধান ও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ এখনো উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

ধারা-৪৩ : সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মূলোৎপাটন এবং মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার হিফাযতসহ তার বিকাশের প্রয়োজনসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অর্থনীতি নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর ভিত্তিশীল হবে :

১. মৌলিক প্রয়োজনসমূহের পূরণ : সকলের জন্যে আবাসন, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং পরিবার গঠনের জন্যে অপরিহার্য উপায় উপকরণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. পরিপূর্ণভাবে কর্মে নিয়োজিত হবার লক্ষ্যে সকলের জন্যে কাজের পরিবেশ ও সম্ভাবনা নিশ্চিতকরণ, যারা কাজ করতে সক্ষম অথচ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণের অধিকারী নয় তাদেরকে কাজের উপায় উপকরণ সরবরাহ যা সমবায় আকারে দেয়া হবে বা বিনা সুদে ঋণ আকারে দেয়া হবে, অথবা অন্য কোন বৈধ পন্থায় দেয়া হবে যাতে না বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত ও আবর্তিত হতে পারে, না সরকারকে এক বিরাট ও নিরঙ্কুশ কর্মে নিয়োগকারীতে পরিণত করতে পারে। উন্নয়নের পর্যায়সমূহের প্রতিটি পর্যায়ে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. এমনভাবে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং কাজের বিষয়বস্তু ও শ্রম ঘন্টা এমনভাবে হতে হবে যাতে প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই পেশাগত চেষ্টা সাধনা (ও কর্মতৎপরতার) পরেও বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে আত্মগঠনের এবং দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনীর জন্য যথেষ্ট অবকাশ ও শক্তি থাকে।

৪. পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতাকে সম্মান দেখাতে হবে এবং কোন নির্দিষ্ট কাজ গ্রহণের জন্যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে না ও অন্য কোন কাজ থেকে ফায়দা লাভে বাধা দেয়া যাবে না।

৫. অন্যের ক্ষতি সাধন, একচেটিয়াবাদ, মওজুদদারী, সুদ এবং অন্যান্য বাতিল ও হারাম লেনদেন নিষিদ্ধ।

৬. ভোগ, বিনিয়োগ, উৎপাদন, বন্টন ও সেবা নির্বিশেষে অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ।

৭. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক গড়ে তুলতে হবে।

৮. দেশের অর্থনীতির ওপর বিজাতীয় অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্রতিরোধ করতে হবে।

৯. সাধারণ গণমানুষের প্রয়োজন পূরণ এবং দেশকে স্বনির্ভরতার পর্যায়ে উপনীতকরণ ও পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কৃষি, পশুপালন ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

ধারা-৪৪ : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরকারি, সমবায় ও ব্যক্তিগত এই তিন ভাগে বিভক্ত এবং সুশৃঙ্খলিত ও সঠিক পরিকল্পনার ওপর ভিত্তিশীল।

সমস্ত বৃহৎ শিল্প, মৌলিক শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৃহৎ খনিজ, ব্যাংকিং, বীমা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাঁধ ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কসমূহ, রেডিও-টেলিভিশন, ডাক, তার ও টেলিফোন, বিমান, নৌ-চলাচল, সড়ক ও রেলপথ এবং এ জাতীয় সবকিছু সার্বজনীন মালিকানাধীনে ও সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ইসলামী বিধিবিধান অনুযায়ী শহর ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিতব্য (ও প্রতিষ্ঠিত) উৎপাদন ও বণ্টনমূলক সমবায় কোম্পানী ও সংস্থাসমূহ সমবায় খাতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কৃষি, পশুপালন, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবার ঐ অংশ ব্যক্তিগত (বা বেসরকারী) খাতের অন্তর্ভুক্ত যা সরকারি ও সমবায় অর্থনৈতিক তৎপরতার পরিপূরক।

এ অধ্যায়ের অন্যান্য ধারা অনুযায়ী হলে, ইসলামী আইন কানুনের বহির্ভূত না হলে, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের সহায়ক হলে এবং সমাজের ক্ষতির কারণ না হলে এ তিন ভাগের মালিকানা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের আইনগত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে।

তিন ভাগেরই বিস্তারিত বিবরণ, আওতা ও শর্তাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত।

ধারা-৪৫ : আনফাল এবং অনাবাদী বা পরিত্যক্ত জমি, খনিজ, সমুদ্র,হ্রদ, নদনদী ও অন্যান্য সার্বজনীন পানি, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, বন-জঙ্গল, বাঁশ ও বেত্রসম্পদ

সমৃদ্ধ ভূমি, প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র বন, অসংরক্ষিত ও উন্মুক্ত চারণভূমি, উত্তরাধিকারবিহীন মীরাসী সম্পদ, মালিক খুঁজে পাওয়া যায়নি এমন সম্পদ, আত্মসাতকারীদের নিকট থেকে ফেরত নেয়া সর্বসাধারণের সম্পদসহ সকল প্রকার সার্বজনীন ধনসম্পদ ইসলামী হুকুমতের এখতিয়ারে থাকবে যাতে তা সর্বসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ ও তার ব্যবহার প্রক্রিয়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ধারা–৪৮ : প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও জাতীয় আয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক তৎপরতার বন্টনের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য করা যাবে না। প্রতিটি এলাকাকেই স্বীয় প্রয়োজন ও বিকাশ সম্ভাবনা অনুযায়ী পুঁজি এবং প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ আওতায় পেতে হবে।

ধারা–৪৯ : সুদ, আত্মসাৎ, ঘুষ, জবরদখল, চুরি, জুয়া, ওয়াক্ফ সম্পত্তির অপব্যবহার, সরকারী ঠিকাদারী ও লেনদেনের অপব্যবহার, পতিত ভূমি ও এ জাতীয় সম্পদ বিক্রি, অশ্লীলতার আড্ডা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ ফিরিয়ে নেয়া ও প্রকৃত মালিকদের প্রত্যার্পণ করা সরকারের দায়িত্ব; প্রকৃত মালিক কে তা জানা সম্ভব না হলে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে। তদন্ত, অনুসন্ধান এবং শরীয়াতভিত্তিক অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর সরকার কর্তৃক এ হুকুম কার্যকরী হবে।

ধারা–৫০ : ইসলামী প্রজাতন্ত্রে বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের ক্রমোন্নতিশীল সামাজিক জীবনের জন্যে পরিবেশের হিফাযত একটি সার্বজনীন দায়িত্ব। এ কারণে যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা ও অন্য যেসব তৎপরতার দ্বারা পরিবেশ দূষণ ঘটে বা পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ।

ধারা–৫১ : আইনসঙ্গতভাবে ব্যতীত কোনরূপ কর ধার্য করা যাবে না। কর মওকুফ ও হ্রাসের বিষয়টিও আইনানুসারে নির্ধারিত হবে।

সংবিধানের ৫২ নং ধারায় সরকার কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদনের ক্ষমতা মজলিসে শূরায়ে ইসলামীকে দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ৫৫ নং ধারায় সমস্ত মন্ত্রণালয় ও সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে যার রিপোর্ট মজলিসে শূরায়ে ইসলামীতে পেশ করা এবং সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা অপরিহার্য। সংবিধানের ৫৪ নং ধারা অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষণ কর্তৃপক্ষ সরাসরি মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর অধীন।

১৫.৬.৭ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো
Administrative Structure of the Islamic Republic of Iran

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তার সার্বভৌমত্বের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সংক্রান্ত ধারাসমূহ বর্ণনার পূর্বেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে ৫৬ নং ধারায় বলা হয়েছে :

"বিশ্ব ও মানুষের ওপর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আর তিনিই মানুষকে স্বীয় সামষ্টিক জীবনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তৃত্বশালী করে দিয়েছেন। মানুষের নিকট থেকে এ খোদায়ী অধিকার হরণ করে নেয়ার বা তাকে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই।"

এ মূলনীতি উল্লেখের পরেই রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ এবং তার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ দীনী নেতৃত্বের অধীনে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বাধীন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শুধু এ যুগের উপযোগী একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই উপস্থাপন করেনি, বরং এর কাঠামো ক্ষমতাদ্বন্দ্বে জর্জরিত রাষ্ট্রসমূহের সামনে ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্য বিধানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছে– যার অনুসরণে শুধু মুসলিম রাষ্ট্রসমূহই নয়, অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোও শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

১৫.৬.৮ সর্বোচ্চ নেতৃত্ব
Higher Leadership

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে নেতৃত্বের প্রসঙ্গ। ইরানের জনগণ হযরত ইমাম খোমেনীর (র) নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে আড়াই হাজার বছরের পুরনো রাজতান্ত্রিক তাগুতী শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে। তাই ইরানী জনগণ কর্তৃক হযরত ইমাম খোমেনীকে (র) নেতৃত্বে বরণের বিষয়টি ছিল অবিসম্বাদিত ও বিতর্কাতীত। একারণে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের অষ্টম অধ্যায়ভুক্ত ১০৭ নং ধারায় হযরত ইমাম খোমেনী (র) দেশের প্রথম সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য জনগণ গণভোটের মাধ্যমে এ ধারাটিসহ পুরো সংবিধান অনুমোদন করে কার্যত ইমাম খোমেনীর (র) নেতৃত্বের পক্ষে পুনর্বার রায় প্রদান করে।

সংবিধানের উক্ত ধারায় হযরত ইমামের (র) পরবর্তী সময়ের জন্যে নেতা নির্বাচনের ক্ষমতা একটি নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বর্তমান রাহ্‌বার (নেতা) হযতর আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী এ বিশেষজ্ঞ পরিষদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছেন।

সংবিধানের ১০৮ নং ধারা অনুযায়ী সংবিধানের অভিবাবক পরিষদের মুজতাহিদ সদস্যগণ বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যসংখ্যা, তাঁদের শর্তাবলী, নির্বাচন পদ্ধতি ও অধিবেশনের কার্যপ্রণালী বিধি নির্ধারণ করেন এবং হযরত ইমাম খোমেনীর (র) অনুমোদনক্রমে তা কার্যকরী হয়। পরবর্তী সময়ের জন্য বিশেষজ্ঞ পরিষদ সংক্রান্ত সকল বিধিবিধান প্রণয়ন ও পরিবর্তনের ক্ষমতা এ পরিষদের হাতেই অর্পণ করা হয়।

প্রথম বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠিত হওয়ার সময় থেকেই এর সদস্যসংখ্যা ৮০ জন। তাঁরা ৮ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কেবল ন্যায়বান মুজতাহিদগণই বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। তাঁরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যের জন্যে অন্য কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে বা অন্য কোন পদে নির্বাচিত হতে বাধা নেই।

বিশেষজ্ঞ পরিষদ আলোচনা, প্রস্তাব-সমর্থন ও ভোটাভুটির মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করেন। নেতার পদে কেউ প্রার্থী হতে পারেন না। প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনার পর প্রার্থীবিহীনভাবেই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞ পরিষদ সংবিধানে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন মুজতাহিদকে নেতা নির্বাচিত করেন। পরিষদের সদস্যগণ নেতার কাজকর্মের প্রতি নজর রাখেন। নেতাকে তাঁরা পরামর্শ দিতে পারেন। নেতা শরীয়াত বা সংবিধান লঙ্ঘন করলে বা অন্য কোনভাবে যোগ্যতা হারালে বিশেষজ্ঞ পরিষদ তাঁকে অপসারণ করতে পারেন।

তিনি ইসলামী হুকুমাতের সর্বোচ্চ ও সার্বিক কর্তৃত্বশীল যদিও কার্যত রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং অপরিহার্য না হলে কোথাও তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। মৃত্যু বা অযোগ্যতাজনিত অপসারণ না ঘটলে নেতা একবার নির্বাচিত হবার পর আজীবন এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের ১০৯ নং ধারায় নেতার গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে –

নেতার শর্তাবলী ও গুণাবলী :

১. ফিকাহর বিভিন্ন বিভাগে ফতোয়া দেয়ার জন্যে ইসলামী যোগ্যতা (অর্থাৎ মুজতাহিদ হতে হবে)।

২. ইসলামী উম্মাহর নেতৃত্বদানের জন্য প্রয়োজনীয় আদালত (عدالت) ও তাকওয়া।

৩. নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় সঠিক রাজনৈতিক ও সামাজিক দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, পরিচালনা ক্ষমতা ও শক্তি।

উপরোক্ত শর্তাবলী বিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে যে ব্যক্তি ফিকহী ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির বিচারে অধিকতর যোগ্য, নেতা নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে তাঁকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সংবিধানের ১০৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, বিশেষজ্ঞ পরিষদ দেশের সকল সুযোগ্য মুজতাহিদগণ সম্পর্কে আলোচনার পর নেতা নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ পরিষদ নিজেদের ভেতর বা বাইরে থেকে যে কোন যোগ্য মুজতাহিদকে নেতা নির্বাচন করার অধিকার রাখেন।

সংবিধানের ১০৭ নং ধারায় রাহবারের দায়িত্ব-কর্তব্য ও এখতিয়ার বর্ণিত হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে –

'রাহবারের দায়িত্ব-কর্তব্য ও এখতিয়ারসমূহ :

১ রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার সাধারণ নীতিসমূহ নির্ধারণ।

২. হুকুমতের সাধারণ নীতিসমূহের বাস্তবায়ন তদারক।

৩. গণভোটের আদেশদান।

৪. সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন।

৫. যুদ্ধ ও সন্ধি ঘোষণা এবং বাহিনীসমূহের সমাবেশ ঘটানোর নির্দেশদান।

৬. নিম্নোক্ত পদাধিকারীদের নিয়োগ, পদচ্যুতি ও পদত্যাগপত্র গ্রহণ :

ক. সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের মুজতাহিদ সদস্যগণ,

খ. বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান,

গ. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও-টেলিভিশন সংস্থার প্রধান,

ঘ. সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সম্মিলিত সংস্থার প্রধান,

ঙ. ইসলামী বিপ্লবের রক্ষীবাহিনীর সর্বাধিনায়ক,

চ. সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহের উচ্চপদস্থ অধিনায়কগণ।

৭. রাষ্ট্রের তিন বিভাগের মধ্যে মতপার্থক্য নিরসন ও সম্পর্কের বিন্যাস সাধন।

৮. রাষ্ট্রযন্ত্রের যেসব জটিলতা স্বাভাবিক পন্থায় নিরসন না হবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদের মাধ্যমে তার নিরসন ঘটানো।

৯. জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবার পর দেশের প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্ট পদের হুকুমনামায় স্বাক্ষর দান...।

১০. দায়িত্ব পালনে অনিয়মের কারণে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে বা যোগ্যতা হারানোর দায়ে মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর রায়ের ভিত্তিতে বা যোগ্যতা হারানোর দায়ে মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর রায়ের ভিত্তিতে দেশের কল্যাণের স্বার্থে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ।

১১. বিচার বিভাগের প্রধানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইসলামী মানদণ্ডের আওতায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি মওকুফ বা হ্রাসকরণ।

রাহবার তাঁর কতক দায়িত্ব-কর্তব্য ও এখতিয়ার অন্যকে অর্পণ করতে পারবেন।

সংবিধানের ১১১ নং ধারা অনুযায়ী নেতার মৃত্যু বা অপরসারণজনিত কারণে নেতৃপদে শূন্যতা সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন নেতা নির্বাচিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে নতুন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট, বিচার বিভাগের প্রধান ও সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের একজন মুজতাহিদ সদস্য সমবায়ে তিন সদস্যের অস্থায়ী নেতৃপরিষদ নেতার দায়িত্ব পালন করবেন। অসুস্থতা বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে নেতা সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রেও অনুরূপ নেতৃপরিষদ গঠিত হবে ও অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫.৬.৯ প্রেসিডেন্ট ও প্রশাসন
The President and Administration

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাহবার বা নেতার পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে প্রেসিডেন্টের পদ। দেশব্যাপী (পনর বছর ও তদূর্ধ বয়স্ক) সাধারণ ভোটারদের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে তিনি নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহী ব্যক্তিদের আবেদন বিবেচনা করে সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ প্রার্থী হবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রার্থী হতে অনুমতি দেন। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে অবশ্যই দীনদার, রাজনৈতিক যোগ্যতাসম্পন্ন, জন্মসূত্রে ইরানী, ইরানের নাগরিক, সুপরিচালক, প্রজ্ঞাবান, নিষ্কলুষ অতীতের অধিকারী, আমানতদার, তাকওয়াসম্পন্ন, খাঁটি ঈমানদার এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ভিত্তি ও রাষ্ট্রধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে। প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ চার বছর এবং এক ব্যক্তি পর পর দুই বার

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন। অভিভাবক পরিষদ নির্বাচন তদারক ও রায় ঘোষণা করেন। কোন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশি না পেলে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুই প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তি রাহবার কর্তৃক এ পদে নিযুক্ত হবার পর মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর অধিবেশনে বিচার বিভাগের প্রধান ও অভিভাবক পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট স্বীয় কাজের সহায়তায় তাঁর জন্য কয়েকজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনয়নের পর মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের অর্ধেকের বেশি ভোটে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেক মন্ত্রীর জন্য অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রী স্বীয় কাজে সহায়তার জন্য সহকারী মন্ত্রী ও উপদেষ্টা মনোনীত করতে পারেন; এজন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ প্রেসিডেন্টকে অনাস্থা দিলে রাহবারের অনুমোদনের সাথে সাথে তিনি পদচ্যুত হন। মজলিসের অর্ধেকের বেশি সংখ্যক সদস্য যে কোন বা সকল মন্ত্রীকে অনাস্থা দিতে পারেন এবং তা সাথে সাথে কার্যকর হবে। প্রেসিডেন্ট যে কোন সময় যে কোন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট রাহবারের নিকট পদত্যাগ করতে পারেন এবং মন্ত্রীগণ ও ভাইস-প্রেসিডেন্টগণ প্রেসিডেন্টের নিকট পদত্যাগ করতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টগণ ও মন্ত্রীগণ দায়িত্বে থাকাকালে শিক্ষাদান ও গবেষণা ছাড়া প্রজাতন্ত্রের অর্থ ব্যয়কারী কোন প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ বা পেশা অবলম্বন করতে পারেন না এবং দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ও দায়িত্ব সমাপ্তির পরে বিচার বিভাগের প্রধানের মাধ্যমে তাঁদের ও তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য পেশাগত বিষয়টি সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৫.৬.১০ মজলিসে শূরায়ে ইসলামী
Majlis-E-Shura-E Islami

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শূরায়ে ইসলামী (পার্লামেন্ট) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে চার বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এক ব্যক্তির বার বার মজলিস সদস্য নির্বাচিত হবার পথে কোন বাধা নেই। মজলিস ভেঙ্গে দেয়ার কোন সুযোগ

নেই। এক মজলিসের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই পরবর্তী মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশ কখনো মজলিস শূন্য থাকে না।

মজলিসের সদস্য সংখ্যা ২৭০ জন। অবশ্য বর্ধিত জনসংখ্যা বিবেচনায় ভবিষ্যতে প্রতি ১০ বছর অন্তর সর্বোচ্চ বিশজন সদস্য বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হয়েছে। (তবে এ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়নি।) জনগণের সরাসরি ভোটে মজলিস সদসদ্যগণ নির্বাচিত হন। স্বীকৃত সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিতে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যরথুস্ত্রীয়রা (পার্শী ধর্মাবলম্বীরা) একজন, কালীমী (ইহুদী) সম্প্রদায় একজন, এ্যাসিরীয় ও ক্যালিডোনীয় খ্রিস্টানরা মোট একজন এবং দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের আর্মেনীয় খ্রিস্টানরা একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন।

সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ মজলিসের নির্বাচন পরিচালনা ও রায় ঘোষণা, নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ শ্রবণ, রায় স্থগিত বা বাতিলকরণ, পুনঃনির্বাচন প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। অভিভাবক পরিষদ কর্তৃক যোগ্যতা বিচারের পরেই কোন প্রার্থী মজলিস নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

জনসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচনী এলাকা ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচতব্য সদস্যসংখ্যা নির্ধারিত হয়। কোন বড় শহরকেই একাধিক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয় না, বরং একটি নির্বাচনী এলাকা গণ্য করে জনসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচিতব্য সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। বর্তমানে তেহরান শহর থেকে ৩০ জন সদস্য নির্বাচিত হন। ভোটাররা ব্যালটপত্রে পছন্দনীয় ৩০ জন প্রার্থীর নাম লিখে ভোট প্রদান করে। অন্যান্য নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশি না পেলে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুই প্রার্থীর বা নির্বাচিতব্য সদস্য সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়। তেহরানে অবশ্য শতকরা ৩০ ভাগের বেশি সংখ্যক ভ্যালিড ভোট পেলেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। অবশিষ্ট সদস্যসংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক (সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত) প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে রাজনৈতিক দলের জন্য তৎপরতা চালানোর অনুমতি থাকলেও সংবিধানে রাজনৈতিক দলের জন্য কোন বিশেষ অধিকার বর্ণিত নেই। নির্বাচন সম্পূর্ণ নির্দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। মজলিস সদস্যগণ সরাসরি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হন। যে কোন মজলিস সদস্য যে কোন ব্যাপারে সরকারের সমর্থন বা বিরোধিতা প্রশ্নে পুরোপুরি স্বাধীন। একই সদস্য

কোন ব্যাপারে সরকারের সমর্থন ও কোন ব্যাপারে বিরোধিতা করার অধিকার রাখেন।

মজলিসে শূরায়ে ইসলামী সরকারের উত্থাপিত যে কোন বিল বা বাজেট গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে পারে। মজলিস স্বয়ং যে কোন বিল বা বাজেট প্রণয়ন, পেশ ও গ্রহণ করতে পারে।

যুদ্ধাবস্থায় প্রয়োজনে বিশেষ শর্তাধীনে মজলিস নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং নতুন মজলিস নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পুরনো মজলিসের কার্যকাল অব্যাহত থাকবে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে সাংবিধানিকভাবেই সামরিক শাসন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুদ্ধ ও জরুরি অবস্থায় মজলিসের অনুমোদন নিয়ে সরকার কর্তৃক জরুরি সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে; এতে প্রতি এক মাস পর পর মজলিসের পুনঃঅনুমতি নিতে হবে।

মজলিস সদস্যগণ মজলিসের অধিবেশনে দেশী-বিদেশী যে কোন বিষয়ে কথা বলার অধিকার রাখেন। মজলিসে প্রদত্ত বক্তব্যের জন্য তিনি কোন আদালতে বিচার্য হবেন না।

যে কোন আইন মজলিস বা মজলিস কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত মজলিসের আভ্যন্তরীণ কমিশন প্রণয়ন করবে

১৫.৬.১১ অভিভাবক পরিষদ
Superior Council

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে একটি সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ রয়েছে। বার সদস্য বিশিষ্ট এ পরিষদের ছয়জন মুজতাহিদ সদস্য ছয় বছরের জন্য রাহবার কর্তৃক মনোনীত হন। অন্যদিকে বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ছয়জন দীনদার সংবিধান বিশেষজ্ঞ মুসলিম আইনজীবী মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁদের মেয়াদও ছয় বছর।

মজলিসে শূরায়ে ইসলামী কর্তৃক গৃহীত যে কোন বিল অভিভাবক পরিষদের নিকট প্রেরণ করতে হয়। বিলটি ইসলামী শরীয়াত বা সংবিধানের পরিপন্থী নয় এ মর্মে অভিভাবক পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত হবার পর তা স্বাক্ষরের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত হয় এবং প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের পর তা আইনে পরিণত হয় ও কার্যকরযোগ্য হয়।

কোন বিলের ব্যাপারে আপত্তি থাকলে তা উল্লেখ করে অভিভাবক পরিষদ বিলটি সংশোধনের জন্য মজিলসে ফেরত পাঠান। মজলিস তা সংশোধন করে পুনরায়

অভিভাবক পরিষদে পাঠায় এবং সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অভিভাবক পরিষদ তাতে অনাপত্তি প্রদান করেন।

কোন বিলের ব্যাপারে অভিভাবক পরিষদের আপত্তি সত্ত্বেও মজলিস বাস্তব পরিস্থিতির কারণে বিলটিতে পরিবর্তন সাধনে অপরাগতা প্রকাশ করলে এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণের স্বার্থে ঐরূপেই বিলটি গ্রহণ অপরিহার্য গণ্য করলে বিলটি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদে প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাই হয় চূড়ান্ত।

অভিভাবক পরিষদ প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন পরিচালনা এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা করেন। নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠানের দায়িত্বও এ পরিষদের ওপর ন্যস্ত।

অভিভাবক পরিষদের সদস্যগণ বিলের ব্যাপারে দ্রুত মতামত প্রদানের লক্ষ্যে মজলিসের অধিবেশনে উপস্থিত থেকে আলোচনা শ্রবণ করতে পারেন। তবে মজলিসে যখন কোন জরুরি বিল নিয়ে আলোচনা হয় তখন তাতে হাজির থাকা ও মতামত প্রদান তাঁদের জন্য অপরিহার্য।

১৫.৬.১২ রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ
State Welfare Council

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাহবার মজলিসে শূরায়ে ইসলামী ও অভিভাবক পরিষদের মধ্যকার বিল সংক্রান্ত জটিলতা ও মতপার্থক্যের সমাধানের লক্ষ্যে একটি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ গঠন করেন। এতে কয়েকজন স্থায়ী ও কয়েকজন অস্থায়ী সদস্য থাকেন। সাধারণত প্রেসিডেন্ট, মজলিসের সভাপতি (স্পীকার) ও বিচার বিভাগের প্রধান স্থায়ী সদস্যগণের অন্যতম থাকেন। বিলটি যে মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তার মন্ত্রী শুধু ঐ বিলটি সংক্রান্ত আলোচনাকালে পরিষদের অন্যতম অস্থায়ী সদস্য হিসেবে পরিগণিত হন। পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের মতামতও শ্রবণ করেন।

১৫.৬.১৩ বিচার বিভাগ
The Judiciary

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিচার বিভাগ প্রশাসন ও মজলিসের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন বিভাগ। সরকারের একজন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী আছেন, তবে তিনি বিচার বিভাগের প্রধানের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন। অতঃপর তিনি বিচার বিভাগ এবং সরকার ও মজলিসের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। বিচার বিভাগে কর্মরত বিচারক ও

বিচারক বহির্ভূত নির্বিশেষে সমস্ত লোকের নিয়োগ, বরখাস্ত, পদোন্নতি ইত্যাদি সবকিছু বিচার বিভাগের প্রধানের নিয়ন্ত্রণ অধীন ও সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হয়। অবশ্য বিচার বিভাগের প্রধান চাইলে বিচারক সংক্রান্ত বিষয় বাদে অন্যান্য বিষয় বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত করতে পারেন।

সংবিধানের একাদশ অধ্যায়ভুক্ত ১৫৬ নং ধারায় বলা হয়েছে : বিচার বিভাগ হচ্ছে একটি স্বাধীন বিভাগ যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকারের পৃষ্ঠপোষক এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীল ও নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে :

১. জুলুম-নির্যাতন, সীমালঙ্ঘন ও অভিযোগের তদন্ত ও এতদসম্পর্কে রায় দান, বিরোধ-বিসম্বাদের নিরসন, মামলার নিষ্পত্তি এবং আইন নিধারিত ক্ষেত্রসমূহে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ।

২. সর্বসাধারণের অধিকারকে সঞ্জীবিতকরণ এবং ন্যায়বিচার ও বৈধ স্বাধীনতাসমূহের বিস্তার সাধন।

৩. আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

৪. অপরাধ উদঘাটন, এতদসংক্রান্ত তদন্ত, অপরাধীকে শাস্তিদান এবং ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন।

৫. অপরাধ প্রতিহতকরণ ও অপরাধীদের সংশোধনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিচার বিভাগের প্রধান রাহবার কর্তৃক মনোনীত হন। সংবিধানের ১৫৭ ধারা অনুযায়ী বিচার বিভাগের প্রধান পদে বিচার বিষয়ে সুবিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ সুপরিচালক ন্যায়বান মুজতাহিদ ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। এ নিয়োগ পাঁচ বছরের জন্য। বিচারকগণের নিয়োগ, বরখাস্ত, পদোন্নতি, পদাবনতি, বদলি ইত্যাদি তাঁর এখতিয়ারভুক্ত যা তিনি আইন অনুযায়ী আনজাম দেন। তিনি ন্যায়বান ও বিচার বিষয়ে সুবিজ্ঞ মুজতাহিদ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি ও প্রসিকিউটর জেনারেল নিযুক্ত করেন।

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের কোন বিভাগীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ ও অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের এখতিয়ার বিচার বিভাগের। এজন্য একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ও নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের সামরিক বা বিভাগীয় আদালত রয়েছে, তবে তা বিচার বিভাগের অধীন হিসেবে পরিগণিত এবং সেভাবেই বিচার বিভাগীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে এসব বিভাগের কোন লোক কোন সাধারণ অপরাধ করলে তার বিচার সাধারণ আদালতে হয়ে থাকে।

জেল, হাজত ও সংশোধন কেন্দ্রসমূহ বিচার বিভাগের এখতিয়ারাধীন। বিচার বিভাগের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী রয়েছে। আদালতের রায় কার্যকরকরণে সহায়তা করাই এ বাহিনীর দায়িত্ব।

১৫.৬.১৪ সশস্ত্র বাহিনীসমূহ
Armed Forces

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি ইসলামী বিপ্লবের রক্ষী বাহিনী নামে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী বাহিনী রয়েছে। এ ছাড়া 'বাসিজ' বা গণবাহিনী নামে একটি অনিয়মিত বাহিনী রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব দেশের প্রতিরক্ষা এবং বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর দায়িত্ব বিপ্লবের প্রতিরক্ষা। তবে প্রয়োজেন বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী দেশের সীমান্ত ও ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব রক্ষা কাজেও ভূমিকা পালন করে। বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান ইউনিট রয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সার্বিক আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আইন অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে চলে। রাহ্বার সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সশস্ত্র বাহিনীসমূহের ওপর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীসমূহ এবং সরকার ও মজলিসের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করেন।

শান্তিকালীন অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে শিক্ষা, ত্রাণ, উৎপাদন, পুনর্গঠন ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য সংবিধানে নির্দেশ রয়েছে, তবে তা এমনভাবে হতে হবে যে, তাতে যেন ইসলামী মানদণ্ড পুরোপুরি রক্ষিত হয় এবং তাদের সামরিক প্রস্তুতির ক্ষতি সাধিত না হয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মাটিতে কোন বিদেশী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা শাসনতন্ত্রে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তেমনি ইরানের কোন সশস্ত্র বাহিনীতে কোন বিদেশীকে গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

১৫.৬.১৫ সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ
National Security High Council

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব ও ইসলামী বিপ্লবের হিফাযতের লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ রয়েছে। রাহবারের নির্দেশিত সাধারণ নীতি অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন, সাধারণ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে জড়িত রাজনৈতিক, গোয়েন্দা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক

তৎপরতাসমূহের সমন্বয় সাধন এবং দেশী-বিদেশী হুমকির মোকাবিলার লক্ষ্যে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়-উপকরণাদির সুষ্ঠু ব্যবহারই এর লক্ষ্য।

সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট। এর সদস্যগণ হচ্ছেন : তিন বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়কত্ব সংস্থার প্রধান, পরিকল্পনা ও বাজেট বিভাগের প্রধান, রাহবারের মনোনীত দু'জন প্রতিনিধি, পরিকল্পনা ও বাজেট বিভাগের প্রধান, রাহবারের মনোনীত দু'জন প্রতিনিধি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তথ্য (গোয়েন্দা বিভাগীয়) মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ও বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর উচ্চতম পর্যায়ের অফিসারগণ।

সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দু'টি উপপরিষদ রয়েছে : প্রতিরক্ষা উপপরিষদ ও নিরাপত্তা উপপরিষদ।

১৫.৬.১৬ রেডিও-টেলিভিশন
Radio-Television

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও-টেলিভিশন একটি স্বাধীন সংস্থা যা সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং পরিপূর্ণভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী। অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও দেশের কল্যাণ রক্ষা করে এ স্বাধীনতা ভোগ করা তার দায়িত্ব।

রেডিও-টেলিভিশন সংস্থার প্রধান রাহবার কর্তৃক মনোনীত ও বরখাস্ত হন। প্রেসিডেন্ট, বিচার বিভাগের প্রধান ও মজলিসে শূরায়ে ইসলামী কর্তৃক দু'জন করে প্রেরিত মোট ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ সংস্থার তত্ত্বাবধান করে। রেডিও-টিভির প্রচারধারা এবং পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান আইন অনুসারে হয়ে থাকে।

সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান অত্যন্ত সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করেছে যেখানে প্রতিটি বিভাগ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে আদর্শিক বিচারে অপরিহার্য না হলেও এবং পরিবর্তনযোগ্য হলেও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রয়োগিক ক্ষেত্রগুলোর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছে যে, কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম নয়। প্রশাসন, পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনীসমূহ এবং রেডিও-টিভিকে এমনভাবে পরস্পরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে যে, তা ক্ষমতা বিভাজনের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত এবং ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অনেক দেশের জন্যই অনুকরণীয় হতে পারে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র বা সংবিধান

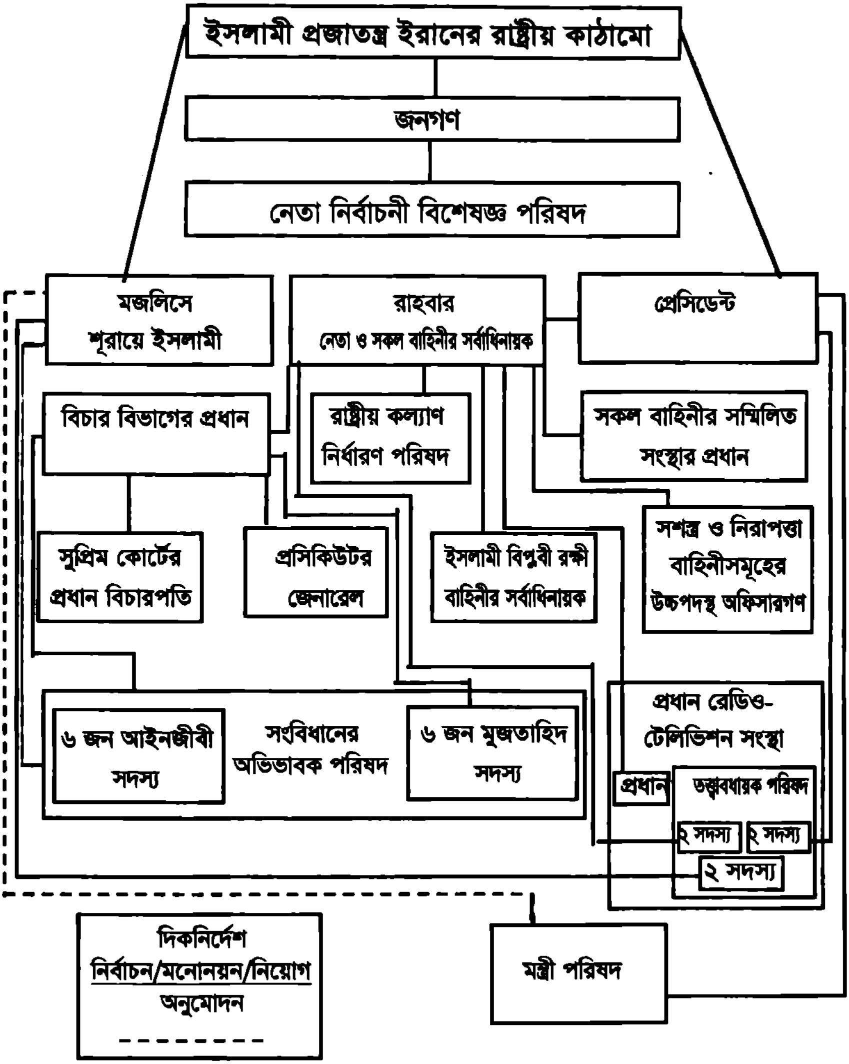

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পরিষদ

সভাপতি : প্রেসিডেন্ট

১। প্রেসিডেন্ট

২। মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর স্পিকার

সহায়তা লাভ এবং তার সমন্বিত বাস্তবায়ন তদারকের লক্ষ্যে প্রাদেশিক পরিষদসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'প্রদেশসমূহের সর্বোচ্চ পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদ বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারের মাধ্যমে মজলিসে প্রেরণ করতে পারে। এরূপ পরিকল্পনা নিয়ে মজলিসে আলোচনা অপরিহার্য। প্রদেশ থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে স্থানীয় পরিষদসমূহের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বা কার্যকর করতে বাধ্য থাকেন।

আইন ও শরীয়াতের লঙ্ঘনমূলক তৎপরতায় লিপ্ত না হলে কোন পর্যায়ের কোন পরিষদকে ভেঙ্গে দেয়া যায় না। ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনানুগ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। তাছাড়া ভেঙ্গে দেয়ার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগের সুযোগ আছে। সেক্ষেত্রে আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে তদন্ত ও রায় প্রদান করে থাকে।

প্রশ্নাবলী

১. শাসনতন্ত্র বা সংবিধান কাকে বলে?

২. শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।

৩. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলো বর্ণনা করো।

৪. বিশ্বের প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র হিসেবে 'মদীনা সনদের' মূল্যায়ন করো।

৫. 'মদীনা সনদের' ধারাগুলো পর্যালোচনা করো।

৬. মদীনা সনদের ধারাসমূহের বিশেষ উল্লেখপূর্বক রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসেবে মহানবী (সা)-এর কৃতিত্ব পরীক্ষা করো।

৭. ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে মদীনা সনদের গুরুত্ব নিরূপণ করো।

৮. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসনতন্ত্রের উদ্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
(Briefly trace the origin of the constitution of Islamic Republic of Iran)

৯. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।
(Discuss the main characteristics of the Iranian Constitution)

১০. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের আইন সভা মজলিসে শূরায়ী ইসলামীর গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা করো।

(Describe the composition and function of the parliament-Majlis-E Shura e Islami of Islamic Republic of Iran.)

১১. ইরানের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত মানবাধিকারের উপর একটি টীকা লিখ।

(Write a note on Human Rights as mentioned in Iranian Constitution.)

১২. ইরানের শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব রাহ্‌বারের ভূমিকা ও পদমর্যাদা আলোচনা করো।

(Discuss the role and position of the supreme leder Rahbar in the Iranian Constitution.)

১৩. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত অর্থনৈতিক নীতিমালাসমূহ লিখ।

১৪. ইরানের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করো।

(Describe the powers and functions of Iranian President.)

১৫. ইরানের প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক পদমর্যাদা উল্লেখ করো। ইরানী সরকার কি প্রেসিডেন্ট শাসিত?

(Indicate the constitutional position of the Iranian President. Has the Iranian Goverment become President ministerial.)

১৬. অভিভাবক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো।

১৭. ইরানের বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(Brifly describe the Iranian Judicial System.)

১৮. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বর্ণনা করো।

(১৬)

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি
(Foreign Policy of Islamic State)

১৬.১ ভূমিকা (Introduction)

পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্র বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে। জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State) জাতীয় স্বার্থ (National interest) সংরক্ষণের জন্য বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বময় তার প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে এক ধরনের ব্যাপক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা বা নেপালের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে। ব্যক্তি যেমন একাকী বাস করতে পারে না, রাষ্ট্রও তেমনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে কার্য পরিচালনা করতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। আদর্শিক স্বার্থসহ রাষ্ট্রের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র এক ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতির বিষয়টি বিশ্ব মানবতার ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ভাই ভাই, একই স্রষ্টার সৃষ্টি। এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন, জন্ম, মৃত্যু, হাসি, কান্না, যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে, সেখান থেকে জীবিকা পাচ্ছে, যে আলো বাতাস ভোগ করছে এসব কিছুর মধ্যে অনৈক্যের চেয়ে ঐক্যের উপাদানই বেশী পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞান, উপলব্ধি ও দৃষ্টির সংকীর্ণতার জন্য মানুষ ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্যের উপাদানগুলোকেই বেশী বিকশিত করে বিশ্ব মানবতার সম্পর্ক ও শান্তিকে বিনষ্ট করছে। ইসলামী রাষ্ট্র বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে ইসলামের শাশ্বত সুন্দর আদর্শের শিক্ষাকে সবসময় সামনে রাখে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে ইসলাম কার্যকর ও উজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারে।

১৬.২ বৈদেশিক নীতি কী (What is Foreign policy)

পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জালে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিটি রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সাধারণভাবে, যে নীতির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের আচরণকে নিজের অনুকূলে প্রভাবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তাই বৈদেশিক নীতি বা পররাষ্ট্রনীতি। প্যাডেলফোর্ড, লিঙ্কন এবং ওলভে (Padelford, Lincoln and Olvey)-এর মতে, 'পররাষ্ট্রনীতি হল ঐসব জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার লক্ষ্য অর্জন এবং স্বার্থ আদায়ে সক্ষম হয়।'[১] জেমস রোজনাও (James Rusenau)-এর মতে, পররাষ্ট্রনীতি হল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোন রাষ্ট্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি যার মাধ্যমে সে রাষ্ট্র কোন কোন স্বার্থ অর্জনে বদ্ধপরিকর হয়।

সহজ ভাষায়, পররাষ্ট্রনীতি বলতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমকে এবং জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বুঝায়। এসব লক্ষ্যের মধ্যে কিছু কিছু অত্যন্ত ব্যাপক এবং কিছু সাময়িক। সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌল লক্ষ্য। তেমনি অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ। এসব লক্ষ্য এবং স্বার্থের জন্যে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় রত থাকে।

১৬.৩ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলনীতি (Major Principles of Foreign Policy in an Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে :

১. জাতীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান।

২. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ।

৩. ভৌগোলিক অখণ্ডতার নিশ্চয়তা বিধান।

৪. রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ। ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকা হল মানব জাতির কল্যাণের জন্য এবং সভ্যতার উন্নয়নের জন্য অবদান রাখা।

৫. আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ।

---

১. Norman J. Padelford, George A. lincoln and Lee D. Olvey, The Dynamics of International politics, 1976.

৩। বিচার বিভাগ প্রধান

৪। সকল বাহিনীর সম্মিলিত সংস্থার প্রধান

৫। পরিকল্পনা ও বাজেট বিভাগের প্রধান

৬। রাহ্‌বার মনোনীত দু'জন প্রতিনিধি

৭। পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও তথ্য (গোয়েন্দা বিভাগীয়) মন্ত্রীগণ

৮। সংশ্লিষ্ট (প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ও ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর প্রধানগণ।

১৯৭৯ সালে সংঘটিত ইরানের ইসলামী বিপ্লব যা সাম্প্রতিক সামগ্রিক ইসলামী ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য সাধারণ ঘটনা।[৫] শাহের স্বৈরাচারী শাসনের সকল চিহ্ন মুছে দেবার জন্য গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও গতিশীলতা এবং পরবর্তীতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসা ও অভিবাদনের যোগ্য। বিশ্বের সকল পরাশক্তি ও তাদের ক্রীড়নকদের প্রবল বাধার মুখে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সফলতা ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির শক্তিমত্তার প্রমাণ এবং কুফরী খোদাদ্রোহী শক্তির জন্য একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা (A traumatic experience to the forces of kufr.)

১৫.৬.১৭ পররাষ্ট্রনীতি
Foreign Policy

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাষায় দেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলনীতিমালা বিধৃত রয়েছে। সংবিধানের দশম অধ্যায়ের চারটি ধারায় নিম্নোক্ত পররাষ্ট্রনীতি নির্দেশিত হয়েছে :

ধারা–১৫২ : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রনীতি যে কোন ধরনের আধিপত্যকামিতা ও আধিপত্য মেনে নেয়াকে প্রত্যাখ্যান; সকল দিক থেকে স্বাধীনতার হিফাযত; দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডত্বের হিফাযত, সকল মুসলমানের প্রতি সমর্থন, আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা জোটবদ্ধ না হওয়া এবং যেসব দেশ শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে না তাদের সাথে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের ওপর ভিত্তিশীল।

---

৫. ইরান সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য দেখা যেতে পারে, Nikkie Keddie, Roots of Revolution : An Interpretive History of Modern Iran, নিউ হ্যাভেন, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১।

ধারা-১৫৩ : দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, সাংস্কৃতিক, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর বিজাতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে এমন যে কোন ধরনের চুক্তি সম্পাদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ধারা-১৫৪ : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সমগ্র মানব সমাজের সৌভাগ্যকে স্বীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বলে মনে করে এবং মুক্তি, স্বাধীনতা, সত্য ও ন্যায়নীতির হুকুমতকে সমগ্র বিশ্ববাসীর অধিকার বলে মনে করে। এর ভিত্তিতে অন্যান্য জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি বিশ্বের যে কোন স্থানে মোস্তাকবেরদের[৬] মোকাবিলা মুস্তাযআফ[৭] জনগণের প্রতি সমর্থন জানায়।

ধারা-১৫৫ : ইরানের আইন অনুযায়ী দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক এবং নাশকতাবাদী হিসেবে প্রমাণিত না হলে কোন বিদেশী রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার তাকে আশ্রয় দিতে পারবে।

১৫.৬.১৮ স্থানীয় সরকার
Local Government

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।[৮] প্রাদেশিক, শহর ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, উন্নয়নমূলক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী সঠিকভাবে গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রাম, থানা, শহর, জেলা ও প্রাদেশিক পর্যায়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় পরিষদ রয়েছে। এ ছাড়া সাংবিধানিকভাবে অপরিহার্য না হলেও যে কোন মহল্লার সকল জনগণ একত্রিত হয়ে মহল্লা পরিষদ গঠন করতে পারে এবং ক্ষুদ্রায়তনে মহল্লা কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারে।

বৈষম্য প্রতিরোধ এবং প্রদেশসমূহের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রণয়নে

---

৬. মোস্তাকবের (مستكبر) আভিধানিক অর্থ 'বড়ত্ব কামনাকারী'; পারিভাষিক অর্থ 'শক্তিমদমত্ত উদ্ধৃত ও দাম্ভিক শক্তি।'

৭. মুস্তাযআফ (مستضعف) যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে, দাবিয়ে বা হীনবল বা পদদলিত করে রাখা হয়েছে।

৮. ইরান সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য দেখা যেতে পারে; Nikkie Keddic, Roots of Revolution Interpretive History of Modern Iran, নিউ হ্যাভেন, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১।

৬. ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অধিকতর স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ।

৭. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন। কুরআন ও হাদীসের কাঙ্ক্ষিত মানব সম্পর্ক সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এজন্যই ইসলাম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বৈদেশিক নীতির মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

৮. ন্যায়পরায়ণতার প্রতি অঙ্গীকার। ইসলামের অঙ্গীকার ন্যায়পরায়ণতার প্রতি।

১৬.৪ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Foreign Policy in an Islamic State)

১. আদর্শভিত্তিক : ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি আদর্শভিত্তিক। ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে সাম্যের নীতিতে একটি বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে বর্ণ, শ্রেণী বা দেশে দেশে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে হানাহানির বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির এই বৈশিষ্ট্যটি সত্যই অনন্য।

২. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি : ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ।

৩. সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ বিরোধী : ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি হবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধী। ইসলামী রাষ্ট্র নিজের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে যেমন মূল্যবান মনে করে, অন্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

৪. উন্নয়নমুখী (Development oriented) : ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক হবে উন্নয়নমুখী। বাণিজ্যের বহুমুখীকরণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রসারের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে জাতীয় অগ্রগতি অর্জন হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য।

৫. জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি : শুধু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য।

৬. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান : আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে বিশ্বময় এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে ইসলামী রাষ্ট্র বদ্ধপরিকর থাকবে। ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির আদর্শ। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য। সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হচ্ছে বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা। শান্তি প্রতিষ্ঠায় চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম গোটা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ কারণেই বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামে কোন বাধা নেই, যদি এতে ইসলাম ও মুসলিমের স্বার্থ হানি না ঘটে। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজ হবে বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, পরস্পরের মধ্যে হানাহানি ও যুদ্ধবিগ্রহ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। ইসলাম এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় যেখান হতে চিরতরে যুদ্ধের অবসান হবে। শান্তির অন্য ইসলামের অঙ্গীকার সর্বাত্মক, বিশ্বজনীন ও ব্যাপক। ইসলাম চায়, দুনিয়ার সকল মানুষ এবং সকল জাতি শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করুক।

৭. সহনশীলতা : ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি হবে সহনশীলতার প্রেরণায় আপ্লুত। মুসলমানদের অবশ্যই সহনশীলতার শিক্ষা নিতে হবে। সংহতি অর্জন করতে চাইলে তাদেরকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

১৬.৫ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা (Direction of Holy Quran about Foreign Policy of Islamic State)

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যে নির্দেশ ও হিদায়াত দান করা হয়েছে সংক্ষেপে তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালন

যাবতীয় চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন করে চলতে হবে। কোন বিশেষ কারণে চুক্তি বাতিল করা অপরিহার্য হলে দ্বিতীয় পক্ষকে (চুক্তিবদ্ধ দেশকে) তা যথাপূর্বেই জানিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন :

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً –

যাবতীয় প্রতিশ্রুতি পালন করো; এটা নিশ্চিত যে, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৭ : সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪)

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا.

আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করো যখন তোমরা কোন চুক্তি করো এবং নিজেদের শপথ পরিপক্ক করার পর তা ভঙ্গ করো না। (১৬ : সূরা আন নাহল : ৯১)

২. লেন-দেনে সততা রক্ষা

যাবতীয় কায়-কারবার ও লেন-দেন পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে হবে; প্রবঞ্চনা ও দুর্নীতিকে কখনো প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ۢ بَيْنَكُمْ -

আর তোমাদের শপথকে তোমাদের পরস্পরের প্রবঞ্চনার হাতিয়ার করবে না। (১৬ : সূরা আন নাহল : ৯৪)

৩. আন্তর্জাতিক বিষয়ে সুবিচার

সকল আন্তর্জাতিক বিষয়েই ইনসাফ ও সুবিচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে হবে। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا - هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ -

এবং কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এতদূর উত্তেজিত না করে যে, তোমরা তাদের সাথে ন্যায়বিচার করবে না। তোমরা সুবিচার করবে; এটা আল্লাহ্-ভীতির অধিক নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় করো। (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৮)

৪. যুদ্ধ সময়ে নিরপেক্ষ দেশের সীমালঙ্ঘন না করা

যুদ্ধের সময়ে নিরপেক্ষ দেশগুলোর সীমানা যাতে করে বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শান্তির সময়ে এ বিষয়ে যে অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্ বলেন :

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا

مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا - اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ ۢبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ -

আর যদি তারা (ঐ সকল মুনাফিক মুসলমান যারা শত্রুদের কাছে হাত মিলিয়েছে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে গ্রেফতার ও হত্যা কর– যেখানেই পাও না কেন।... তবে তারা ব্যতীত, যারা এমন কোন্ জাতির সাথে মিলিত হয়েছে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। (৪ : সূরা আন নিসা : ৮৯-৯০)

৫. সন্ধির শর্ত পালন

সন্ধি করলে তার যাবতীয় শর্ত পুরোপুরি মেনে চলতে হবে; দ্বিতীয় পক্ষ সন্ধি ভঙ্গ না করা পর্যন্ত সন্ধির কোন শর্তই ভঙ্গ করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন :

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

এবং তারা যদি সন্ধির জন্যে অগ্রসর হয় তা হলে তুমিও সেজন্যে অগ্রসর হতে পার এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। (৮ : সূরা আল আনফাল : ৬১)

৬. বিপর্যয় সৃষ্টি না করা

পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করা যাবে না এবং নিজের বাহাদুরী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাও চলবে না। আল্লাহ্ বলেন :

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

আখেরাতের সেই বাসস্থান ত আমি তাদের জন্যেই তৈরী করে রেখেছি যারা পৃথিবীর বুকে কোন প্রাধান্য বিস্তার করতে এবং কোন বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে পছন্দ করে না। আর সুখময় পরিণাম পরহিযগারদের জন্যেই রয়েছে। (২৮ : সূরা আল কাসাস : ৮৩)

৭. অশত্রু দেশ ও জাতির সাথে সুবিচার ও সদ্ব্যবহার

যে সকল দেশ বা জাতির সাথে মুসলমানদের কোন শত্রুতা নেই তাদের প্রতি ইনসাফ ও সদ্ব্যবহার করে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন :

لاَ يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

আল্লাহ্ কখনো তোমাদেরকে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করতে নিষেধ করেন না যারা দীনের (ইসলামের) ব্যাপারে তোমাদের সাথে কোন যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি। এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ সুবিচারকগণকে ভালোবাসেন। (৬০ : সূরা মুমতাহিনা : ৮)

৮. সদ্ব্যবহারের প্রতিদানে সদ্ব্যবহার

যারা সদ্ব্যবহার করবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ্ বলেন :

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ -

সদ্ব্যবহারের প্রতিদান সদ্ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে কি? (৫৫ : সূরা আর রাহমান : ৬০)

৯. অন্যায়ের প্রতিশোধে সীমালঙ্ঘন করা

যারা অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করবে তাদের প্রতিশোধ বড়জোর ততটুকুই নেয়া যেতে পারবে যতটুকু তারা অন্যায় করবে। আল্লাহ্ বলেন :

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ -

আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তবে সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করো যেই পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হয়েছ। (১৬ : সূরা আন নাহল : ১২৬)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসারে ইসলামের শিক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উপযোগী কারণ ইসলাম প্রকৃতভাবেই গ্লোবাল বা আন্তর্জাতিক। মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে ঐক্যের যে মূলনীতি ইসলাম পেশ করেছে– তা কাঙ্ক্ষিত বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

১. বৈদেশিক নীতি কি? ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলনীতিগুলো কি কি?
(What is Foreign Policy? Describe the Principles of Foreign Policy in an Islamic State)

২. ইসলাম রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো।
(Briefly discuss the characteristics of Foreign policy in an Islamic State)

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনাসমূহের একটি বিবরণী দাও।
(Discuss the direction of Holy Quran about Forign Policy of Islamic State)

১৭

টীকা

১৭. ১ তাগুত (Tagut)

১৭.১.১ তাগুতের অর্থ

Meaning of Tagut

তাগুতের অর্থ চরম অবাধ্য, সীমা লঙ্ঘনকারী, বিদ্রোহী (Rebel force), সৎ পথ পরিত্যাগ করে অসৎ পথে নেতৃত্বদানকারী, মন্দশক্তি (Transgressive force), অপশক্তি (Evil force), মিথ্যা দেবদেবী (False God), খারাপ কাজের মন্ত্রণাদানকারী, আল্লাহ্ পাকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী (Rebel force against Allah)।

'তুগইয়ান'- বিদ্রোহ, সীমালঙ্ঘন, বিরোধিতা, অবাধ্যতা, শরীয়াতের অবাধ্যতা। 'ত্বগা- বিদ্রোহ করেছে।

'তাগওয়া'- অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন।

اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

(ইযহাবা-ইলা ফিরআওনা ইন্নাহূ ত্বগা)

তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব ঔদ্ধত্য হয়ে গেছে। (২০ : সূরা তোয়াহা : ৪৩)

'তাগীয়া'–যুলুম ও অবাধ্যতায় শীর্ষস্থানীয়

তুগইয়ান - অত্যাচার নিপীড়নে আধিক্য।

কুরআনে তাগুত– ৮ বার, তুগইয়ান– ৯ বার, তাগওয়া– ১ বার, আওগা– ১ বার, তাগুন– ৬ বার, তাগইয়ান– ৬ বার এসেছে।

আল্লাহ্ মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। অমান্য করার দু'রকম অবস্থা।

---

১. মাওলানা আবদুল করিম পারীখ, বনী ইসরাঈলের ইহুদী ও আজকের মুসলমান, খায়রুন প্রকাশনী, জুন ২০০৬, পৃ. ১৮৮।

ফিসক : ফিসক হলো অমান্য করা। বান্দাহ নীতিগতভাবে আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

কুফর : কুফর হলো অস্বীকার করা। বান্দাহ আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বকে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফরী।

তাগুত : আরো জঘন্য। এ পর্যায়ে বান্দাহ মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাষ্ট্রে এবং সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এ শেষ পর্যায়ে যে বান্দাহ পৌছে যায় তাকে বলা হয় তাগুত।

১৭.১.২ তাগুতের সংজ্ঞা
Definition of Tagut

– তাগুত শব্দটি কুরআন মাজীদ সীমালঙ্ঘনকারী, অবাধ্য, বিদ্রোহী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যে বিষয়গুলো অভিশপ্ত শয়তানের জন্য নির্দিষ্ট। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা যে বিদ্রোহের সাথে লঙ্ঘন করে এবং তাঁর উপর অহংকার প্রকাশ করে সে রকম প্রতিটি ব্যক্তিই তাগুত।[১]

– যে নাফরমানীর সীমাও লঙ্ঘন করে তাকেই তাগুত বলে। খোদাদ্রোহী শক্তিই তাগুত। তাগুত নিজেই শুধু নাফরমান নয়; অন্যকেও নাফরমান বানায়, আল্লাহর বান্দাহ হতে বাধা দেয় এবং নিজের বান্দাহ বানাতে চেষ্টা করে। তাগুত হচ্ছে এমন এক শক্তি যে মানুষকে আল্লাহর বিধান পালন থেকে দূরে রাখে।

– কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ্ ও তাগুতের নিকট একই সাথে নতি স্বীকার মুনাফেকী।

– আল্লাহ্ ও তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য দাবি হচ্ছে তাগুতী আইন ও সরকারকে অস্বীকার করা।

– আল্লাহ্ ছাড়া আর যাকেই মানা হয় সেই তাগুত।

– শরীয়া ব্যতীত যত সব মতাদর্শ (জীবন বিধান) রয়েছে সেগুলোকে তাগুত বলে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় না বা রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মানব রচিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তাই হচ্ছে তাগুত। জালাল উদ্দিন মহল্লী বলেন, আল্লাহর আইন ব্যতীত মানব রচিত মনগড়া আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র

পরিচালনাকে তাগুত বলে। ফখরুল ইসলাম বাজদুভী বলেন, যে শক্তি মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালন করা থেকে বিরত রাখে তাই হচ্ছে তাগুত।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)-এর মতে : তাগুতের অর্থ সেসব ব্যক্তি, দল বা সংগঠন-প্রতিষ্ঠান যারা আল্লাহর মোকাবিলায় ঔদ্ধত্য-আধ্যতা অবলম্বন করেছে, বন্দেগীর শর্ত সীমালঙ্ঘন করে খোদায়ীর ধ্বজাধারী সেজে বসেছে।

কালেমা তাইয়্যেবা 'লা ইলাহা' দ্বারাই শুরু– তাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পরই 'ইল্লাল্লাহ' বলে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ঘোষণা করতে হয়।

১৭.১.৩ তাগুতের প্রকারভেদ

Types of Tagut

১. শয়তান (Evil power) : শয়তানও ইলাহ হবার দাবিদার। খারাপ কাজের মন্ত্রণাদানকারী।

২. নাফস বা হাওয়া (Nafs) : নাফস বা হাওয়া হচ্ছে অন্যতম তাগুত। এটিও ইলাহ হবার দাবিদার। কুরআন বলেছে :

اَرَئَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ – فَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا –

(আরাআইতা মানিত্তাখাযা ইলাহাতুন হাওয়া-হু আফাআন্তা তাকূনূ আলাইহি ওয়াকীলা)

" আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কী আপনি তার জিম্মাদার হবেন" (২৫ : সূরা আল ফুরকান : ৪৩)

নাফস হলো দেহের সব দাবি যা আল্লাহকে অমান্য করতে উস্কানি দেয়।

৩. প্রচলিত রীতিনীতি (Convertional Customs and Traditions) :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا. اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ.

(ওয়া ইযা-ক্বী-লা লাহুমুত্তাবিউ 'মা আনযালাল্লা-হু ক্বালূ বাল নাত্তাবিউ 'মা আলফাইনা- আ-লাইহি আ-বা-আনা আওয়ালাও কানা আবাউহুম লা-ইয়া-'ক্বিলু-না শাইয়াও ওয়ালা ইয়াহতাদূ-ন)

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য করো যা আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, জানত না সরল পথও। (২ : সূরা আল বাকারা : ১৭০)

সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার তাগুতী শক্তির বলেই টিকে আছে।

৪. অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তি (**Power for blind submission**) : রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া যাদেরকে অন্ধভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করা ও মেনে চলার দাবি করা হয়। আল্লাহ বলেন :

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ. وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ. سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

(ইত্তাখাযূ আহবা-রাহুম ও রুহবা-নাহুম আরবাবাম মিন দূ-নিল্লা-হি ওয়াল মাছীহাবনা মারইয়াম, ওয়ামা উমিরূ ইল্লা-লিয়া'বুদূ-ইলা হাও ওয়াহিদান, লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়া; ছুবহা-নাহূ' আম্মা ইয়ুশরিকূন)

তাদের (আহবার পণ্ডিত) ও রুহবান (সংসারবিরাগী)দেরকে তারা তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়ম পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। (৯ : সূরা আত তাওবা : ৩১)

৫. অর্থ বিত্তের অধিকারী শক্তি (**Economic Power**) : রিযক বন্ধ করার হুমকি দিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করতে বাধ্য করে।

৬. শাসন শক্তি (**Ruling Power**) : ক্ষমতার দাপট মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে দেয় না। আল্লাহ বলেন,

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى -

(ফাক্বা-লা আনা রাব্বুকুমূল আ'লা)

(ফেরাউন) বলল আমিই তোমাদের বড় / সেরা পালনকর্তা / খোদা। (৭৯ : সূরা আন নাযিয়াত : ২৪)

আল্লাহ বলেন, হে নবী! আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা এই মর্মে দাবি করে চলেছে যে, তারা ঈমান এনেছে সে কিতাবের প্রতি যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেসব কিতাবের প্রতি যেগুলো আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহের ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতের' দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছিল তাগুতকে অস্বীকার করার।' (৪ : সূরা আননিসা : ৬০)

এখানে তাগুত বলতে স্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কারো আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না।

৭. কায়েমী স্বার্থই (Vested Interest) তাগুত : সকল কায়েমী স্বার্থই তাগুত। এরা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী, তারা এ আন্দোলনকে বরদাশত করতে পারে না।

কায়েমী স্বার্থ

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় প্রশাসনিক অন্যান্য

১৭.১.৪ কুরআনে উল্লিখিত তাগুত
Tagut as mentioned in the Quran

১. রাজনৈতিক তাগুত : ফেরাউন, নমরূদ, আবু লাহাব, আবু জেহেল;

২. অর্থনৈতিক তাগুত : কারূন, আবু লাহাব; আবু লাহাবের স্ত্রী;

৩. ধর্মীয় তাগুত : আজর,

৪. সাংস্কৃতিক তাগুত : ছামেরী;

৫. প্রশাসনিক তাগুত : হামান।

১৭.১.৫ তাগুতের অনুসরণ
Identity and Allegianee with Tagut

তাগুতের অনুসরণ দু'ভাবে হতে পারে :

১. কোন অমুসলিম (কাফির মুশরিক)– সে তার নিজস্ব তাগুতী বিধানের অনুসরণ করতে পারে।

২. কোন মুসলিম– তাগুতী বিধানের অনুসারী হতে পারে।

বর্তমান যুগে কিছু মুসলিম নামধারী শরীয়াকে শুধু ব্যক্তি পর্যায়ের আদেশ নিষেধ পালনের মধ্যে সীমিত রেখে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিধানাবলীকে জেনে শুনে মৌখিক অস্বীকার ও অমান্য করে অবিশ্বাস করে এবং জীবনে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাগুতের বিধান পছন্দ করে ও পালন করে। স্বেচ্ছায় কোন মুসলিম তাগুতী বিধিবিধানকে পছন্দ ও গ্রহণ করলে সে মুরতাদ হয়ে যায়।

স্বেচ্ছায় তাগুতের অনুসরণ সর্বোতভাবে হারাম। যেমন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ.

(ওয়া লাক্বাদ বাআ'ছনা-ফী কুল্লি উম্মাতিন রাসূলান আনি' ওবুদুল্লহা ওয়াজতানিবত্বা-গূত ফামিনহুম মান হাদাল্লাহু ওয়া মিনহুম মান হাক্বক্বাত আ'লাইহিদ্ব দ্বালা-লাহ।)

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হিদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেলো।" (১৬ : সূরা আন-নাহল : ৩৬)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ - وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلاً بَعِيْدًا -

(আলাম তারা ইলাল্লাযী-না ইয়াযউ'মূ-না আন্নাহুম বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়া মা উনযিলা মিন ক্বাবলিকা ইয়ূরী-দূ-না আইয়্যাতাহাকামূ ইলাত্তা-গূ-তি ওয়া ক্বাদ উমিরূ আইয়্যাকফুরূ- বিহী; ওয়া ইয়ূরী-দুশশাইত্বা-নূ আইয়্যাদ্বিল্লাহুম দ্বলা-লাম বাঈ'দা।)

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে, শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।" (৪ : সূরা আন নিসা : ৬০)

কোন মুসলিম তাগুতের অনুসরণ দু'ভাবে করতে পারে।

১. বিশ্বাসগতভাবে– এরা মুরতাদ।

২. আমলগতভাবে।

আমলগত আবার ২ প্রকারের–

আমলগত

ইচ্ছাকৃতভাবে তাগুতের বিধানাবলীর অনুসারী (কাফের)

অনিচ্ছাকৃতভাবে তাগুতের বিধানাবলী পালনকারী

তাগুতকে শরীয়াহ বিরোধী মনে করে, তবে বিরোধিতা করে না

তাগুতের বিরোধিতা করে মুখ ও আমল দ্বারা

(মুমিন) তাগুত থেকে দূরে থাকে

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

(ওয়াল্লাযীনা জ্বা-হাদূ ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লা-হা লামা'আল মুহসিনীন।)

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" (২৯ : সূরা আনকাবূত : ৬৯)

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا -

(ওয়া মান আরা-দাল আ-খিরাতা ওয়া সাআলাহা সা'ইয়াহা ওয়াহুওয়া মু'মিনুন ফাউলা-ইকা কা-না সাইয়ুহুম মাশকূরা।)

"আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।" (১৭ : সূরা বনী ইসরাঈল : ১৯)

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

(ফামাইয়াকফুর বিত্তাগূতি ওয়াই উ'মিন বিল্লা-হি ফাক্বাদিসতামসাকা বিল 'উরওয়াতিল উছক্বা।)

না গোমরাহকারী তাগুতকে মানে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা ধারণা করে নেয় সুদৃঢ় হাতল যা ভাববার নয়। (২ : সূরা আল বাকারা : ২৫৬)

১৭.১.৬ ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের তাগুত অনুসরণ
Tagut followed by Jews and Christian's

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ.

(আলাম তারা ইলাল্লাযী-না উ-তূ নাছী-বাম মিনাল কিতা-বি ইয়ু'মিনূ-না বিল জ্বিবতি ওয়াত্ত্বা-গূ-তি)

"তুমি কি তাদের দেখেছ, যারা আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশেষ লাভ করেছিল? তাদের অবস্থা এ ছিল যে তারা জিবত ও তাগুতকে স্বীকার করে নিচ্ছে।" (৪ : সূরা আন নিসা : ৫১)

১৭.১.৭ তাগুতের পথে লড়াই
Struggle in the way of Tagut, Fight for Tagut

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

(আল্লাযী-না আমানূ ইয়ুক্বাতিলূনা ফী-সাবীল্লিাহি ওয়াল্লাযী-না কাফারূ ইয়ুক্বা-তিলূ-না ফী-সাবী-লিত্ত্বাগূ-তি।)

"যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে।" (৪ : সূরা আন নিসা : ৭৬)

১৭.১.৮ তাগুতের ইবাদত
Ibadah of Tagut

وَعَبَدَ الطَّاغُوْتِ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ -

(ওয়া ইবাদাত্ত্বাগূতি উলা-য়িকা মাকা-নাও ওয়া আদ্বাল্লু 'আন সাওয়াইস সাবীল।)

"এবং যারা তাগুতের ইবাদত করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।" (৫ : সূরা আল মায়েদা : ৬০)

১৭.১.৯ তাগুত অস্বীকারকারীদের জন্য সুসংবাদ
Rewards for denials of Tagut

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى - فَبَشِّرْ عِبَادِ -

(ওয়াল্লাযীনাজ্ব তানাবুত্ব ত্বগূতা আইয়াবু'দূহা ওয়া আনাবূ ইলাল্লা-হি ফাহুমুল বুশরা ফাবাশশির ই'বাদ।)

"যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।" (৩৯ : সূরা আয যুমার : ১৭)

১৭.১.১০ কুফর বিত তাগুত

Kufar Bith Tagut

ইসলামী আকীদার মূলভিত্তি দু'টি :

১। ঈমান বিল্লাহ –আল্লাহর প্রতি ঈমান।

২। কুফর বিত তাগুত – তাগুতকে অস্বীকার করা - তাওহীদের দাবি হচ্ছে সকল প্রকার তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে।

তাগুতকে অস্বীকার না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমান নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় হবে না।

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى - لاَ انْفِصَامَ لَهَا -

(ফামাইয়াকফুর বিত্ত্বাগূতি ওয়াইউ'মিম বিল্লাহি ফাক্বাদিসতামসাকা বিল 'উরওয়াতিল উছক্বা, লানফিছামা লাহা।)

"যে তাগুত (আল্লাহ বিরোধী সবকিছু) অস্বীকার ও অমান্য করে আর আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে যা ভাঙ্গবার নয়।" (২ : সূরা আল বাকারা : ২৫১)

ঈমানের অনিবার্য দাবি তাগুতকে অস্বীকার ও অমান্য করা, তাগুতকে অস্বীকার ও বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি হবে অর্থহীন। কোন ব্যক্তির তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কখনো সঠিক অর্থে আল্লাহর মুমিন বান্দা হতে পারে না। কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাগুতকে অস্বীকার করা, এ দুটি বিষয় পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত এবং এদের একটি অন্যটির অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

১৭.১.১০ তাগুতকে অস্বীকার করার দাবি

Obligation to deny Tagut

তাগুতকে অস্বীকার করার দাবি ৪টি :

১. আকীদা পোষণ করতে হবে, তাগুতের ইবাদত বাতিল ও অন্যায়।

২. তাগুতকে বর্জন করা।

৩. তাগুতের সাথে দুশমনি ও শত্রুতা পোষণ করতে হবে।

৪. তাগুতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

১৭.২ জাহিলিয়াত (Jahiliat)

জাহিলিয়াত একটি বিশেষ পরিভাষা। ইসলাম বিবর্জিত রীতিনীতি-ই জাহিলিয়াত। বিংশ শতাব্দীর এই যুগে জাহিলিয়াত মানুষের জীবনকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। বর্তমান দুনিয়ার মানুষের জীবনের কোন একটি দিকও নেই যা এই জাহিলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

মূলত জাহিলিয়াত হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট ভাবধারা-সার নির্যাস। তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে এবং তা হয়ে থাকে পরিবেশ-পরিস্থিতি, সময়-কাল ও স্থানের অবস্থার প্রেক্ষিতে। তা সত্ত্বেও সেসব রূপের অভিন্ন পরিচয়, তা জাহিলিয়াত। তার বাহ্য প্রকাশ (Phenomenon) যতই বিভিন্ন ও বিচিত্র হোক না কেন, আর বাহ্যিকভাবে সেসবের মধ্যে যত পার্থক্যেরই ধারণা করা হোক না কেন, মূল ব্যাপারের দিক দিয়ে তাতে বিন্দুমাত্রও তারতম্য ঘটে না। জাহিলিয়াত মানুষের বা ইতিহাসের বিবর্তনের কোন এক পর্যায় বা স্তরের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। তা পর্যায়-স্তরের উর্ধ্বে।

কুরআনের দৃষ্টিতে জাহিলিয়াত
Jahiliat according to Quran

জাহিলিয়াত শব্দটি কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার সংজ্ঞা ও পরিচিতিও উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে 'জাহিলিয়াত' হচ্ছে এমন একটি মানসিক অবস্থা, যা আল্লাহর দেয়া হিদায়াত মেনে নিতে পুরোপুরি অস্বীকার করে, তা এমন এক পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠন যা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং বিচার কার্য সম্পাদন করতে সম্পূর্ণ অরাজী হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন বলছে :

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُوْنَ.

"তবে ওরা কি জাহিলিয়াতের কর্তৃত্ব সন্ধান করে। অথচ দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন লোকদের জন্য আল্লাহর ছাড়া অধিক উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে?"

এ আয়াত অনুযায়ী জাহিলিয়াত হচ্ছে আল্লাহর পরিচিতি, আল্লাহর দেয়া হিদায়াত অনুযায়ী হিদায়াত গ্রহণ এবং আল্লাহর নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসন-প্রশাসন চালানোর পরিপন্থী রীতিনীতি ও আদর্শ।

জাহিলিয়াত মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যা আল্লাহর দেয়া হিদায়াত গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। জাহিলিয়াত এমন এক সাংগঠনিক-সামষ্টিক রূপ, যা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসন-প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণরূপে অবাধ্য ও অরাজী! আর এরূপ অবস্থারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে চরম মাত্রার বিকৃতি ও বিপর্যয়- deliquity, perversion-এই বিকৃতি ও বিপর্যয়ের রূপ বিভিন্ন হতে পারে এবং বিভিন্ন রূপের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের ফলাফলও হতে পারে বিভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব জীবনে বিকৃতি ও বিপর্যয় নিয়ে আসার ব্যাপারে জাহিলিয়াত অভিন্ন ভূমিকা পালন করে। জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়।

যে জনগোষ্ঠী আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা-মতবাদ অনুসরণ করে চলে, তারা অভিন্নভাবেই জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত।

মানুষের ইতিহাস

হিদায়াত (আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুসরণ)
ইসলাম
(একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা)

গোমরাহী-ভ্রষ্টতা
জাহিলিয়াত
(আল্লাহ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, হিদায়াত হতে দূরবর্তিতা, তার সাথে নিঃসম্পর্কতা। জাহিলিয়াত মানুষের বা ইতিহাসের বিবর্তনের কোন এক পর্যায় বা স্তরের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। তা পর্যায়-স্তরের উর্ধ্বে।

আধুনিক জাহিলিয়াত অত্যন্ত জটিল, অধিক বীভৎস, রূঢ় ও জঘন্য। কেননা এ জাহিলিয়াত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাহিলিয়াত। তত্ত্বালোচনা, তত্ত্বানুসন্ধান, গবেষণা, অধ্যয়ন ও মতাদর্শের জাহিলিয়াত। প্রকৃতির গভীরে নিহিত সুসংবদ্ধ জাহিলিয়াত। এ জাহিলিয়াত বস্তুগত অগ্রগতির, যা তার অর্জিত শক্তিমদে মত্ত। তার বিশ্ব বিজয়ী ও দিগন্ত বিস্তারকারী প্রভাবে দিশাহারা।

আধুনিক জাহিলিয়াত সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের, সুগঠিত, সুপরিকল্পিত; বিশ্বমানবতাকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার লক্ষ্যে একান্তভাবে নিয়োজিত। তার যাবতীয় কার্যকলাপই বিজ্ঞানভিত্তিক; বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল সমৃদ্ধ।

আধুনিককালের জাহিলিয়াত অনেক মানুষকে বিমোহিত, অবনত ও অধীন বানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানের জাহিলিয়াত তার অনুসারীদের মনের পটে বহুবিধ বর্ণের ছটা নিক্ষেপণ করেছে। তাদের ধারণা ও আচরণে বিভিন্ন প্রকারের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

জাহিলিয়াত হচ্ছে আল্লাহর দেয়া হিদায়াত অবলম্বন ও অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করতে অস্বীকার করা।

জাহিলিয়াত অন্তঃসার শূন্য। আর ইসলাম তো সারবত্তায় পরিপূর্ণ। মানুষ যদি ইসলামের কল্যাণময়তার সাথে পরিবচিত হতে পারে, কোন শক্তি নেই মানুষকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। সে জন্যই জাহিলিয়াতের ধারক-বাহকদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে যাতে ইসলামের মুবাল্লিগদের কাছে মানুষ ঘেঁষতে না পারে।

জাহিলিয়াত মাত্রই তা যে কালের ও যে ধরনেরই হোক– আল্লাহর দেয়া হিদায়াতকে অপছন্দ ও অগ্রাহ্য করে। হিদায়াতকে প্রত্যাখ্যান করে অন্ধত্বকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আর মনে মনে ধারণা করে, তারা যে জিনিস অবলম্বন করেছে, তা সম্পূর্ণ কল্যাণময়। আর তাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর যে হিদায়াতের দিকে তাদের আহ্বান করা হচ্ছে তাতে ক্ষতি বা লোকসান ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু তাদের অবলম্বিত জাহিলিয়াত ও অন্ধত্বে যে পথভ্রষ্টতা, বিকৃতি, বিপথগামিতা, ভাগ্যহীনতা ও অস্থিরতা নিহিত রয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রথমদিকে সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় হিদায়াত প্রাপ্তির পর। তার পূর্বে নয়। অন্ধকারের গহ্বর থেকে মুক্তি লাভের পর আলোকের মধ্যে আসতে পারলেই বুঝতে পারা যায় আলোর মর্যাদা ও গুরুত্ব। জাহিলিয়াতের ধ্বংসকারিতা মর্মে মর্মে অনুধাবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে মানব প্রকৃতিকে আল্লাহর হিদায়াতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

১৭. ৩ সিয়াসত (Siasat)

আরবি সিয়াসত শব্দের বাংলা রাজনীতি এবং ইংরেজি politics অত্যন্ত সুপরিচিত পরিভাষা। রাজনীতি বা সিয়াসত বা politics শব্দের অর্থ অনেক বিস্তৃত ও বিস্তারিত। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, Politics means

the Science and art of Government, the Science dealing with the form, organisation and administration of a state. অর্থাৎ রাজনীতি হচ্ছে সরকার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও আর্ট, একটি রাষ্ট্রের কাঠামো, রূপ, সংগঠন ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞান। উক্ত ডিকশনারীতে রাজনীতির সংজ্ঞায় আরো বলা হয়েছে, Politics is the branch of moral philosophy dealing within the state of social organisation as a whole. অর্থাৎ রাজনীতির সাথে নৈতিক দর্শনের বিষয়টিও জড়িত। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান লিখেছেন, রাজনীতি হচ্ছে সর্বাগ্রে নীতি সম্পর্কে – নীতি হচ্ছে কোন কিছু পরিবর্তন করার বাসনা না হয় পরিবর্তনের হাত থেকে কোন কিছুকে হিফাযত করার বাসনা।[২]

ইসলামী সিয়াসত বা ইসলামী রাজনীতি বলতে বুঝায়– ঐ রাজনীতি যার লক্ষ্য কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শের ভিত্তিতে দেশের শাসনব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনা। এ রাজনীতির ধারক বাহকগণ এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইসলামী রাজনীতির উদ্দেশ্য সংস্কার সাধন ও পুনর্গঠন। ভাঙ্গা নয়– নির্মাণ-উন্নতি অগ্রগতিই কাম্য। ইসলামের ভিত্তির মূলেই রয়েছে রাজনীতি। ইসলামের বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে সিয়াসত বা রাজনীতি অন্যতম শাখা। ইসলামী রাজনীতি ফরযে আইন। ইসলামী রাজনীতিতে অংশ না নিলে মুসলমান থাকা যায় না। ইসলামী রাজনীতি বা সিয়াসতের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন ১. নৈতিকতার প্রাধান্য, ২. সুশৃঙ্খল রাজনীতি, ৩. অনন্য নির্বাচন নীতি ও পদ্ধতি, ৪. সহনশীলতা-পারস্পরিক সহমর্মিতা, ৫. দুর্বৃত্তায়নের মূলোৎপাটন, ৬. জনগণের আনুগত্য ও সরকারের দায়িত্বশীলতা, ৭. ভণ্ডামী নীতি সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, ৮. সুশৃঙ্খল রাজনীতি ৯. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আদর্শ, কর্মসূচী, গণতন্ত্র চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির রাজনীতি, ১০. নিয়মতান্ত্রিকতা-নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ১১. ইতিবাচক রাজনীতি, ১২. নীতি, নৈতিকতা ও সমন্বয়ের রাজনীতি, ১৩. সৎ ও যোগ্য লোকেরাই এ রাজনীতিতে মর্যাদা পান, ১৫. ইসলামী রাজনীতি আদর্শ ও সংগঠন কেন্দ্রিক, ১৫. ক্ষমতা, ধন ও ঐশ্বর্যকে আমানত মনে করা হয়, ১৬. গণতান্ত্রিকতা-ইসলামী রাজনীতিতে গণতন্ত্রের অব্যাহত চর্চা করা হয়– গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, ১৭. ইসলামী রাজনীতি সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

---

২. ড. মোঃ দরবেশ আলী খান, রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৭৮।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবী (সা)-কে যে বিরাট দায়িত্বসহ পাঠিয়েছিলেন তা পালন করতে গিয়ে তাঁকে রাজনীতি করতে হয়েছিল। নবী হিসেবে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাই রাজনীতি বা সিয়াসতে অংশগ্রহণ করা ইসলামেরই তাকিদ। মহানবী (সা) তদানীন্তন সমাজে প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থ ও নেতৃত্ব পরিবর্তন করে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই চরম রাজনীতি, আর এ রাজনীতিই মহানবী (সা) সর্বশক্তি দিয়ে করেছিলেন। এ জন্য ইসলাম ও রাজনীতি বা সিয়াসত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাজনীতিকে দীনদারীর খেলাফ মনে করার কোন সুযোগ নেই। বিশ্বকবি ড. আল্লামা ইকবাল একথাই প্রকাশ করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত দুটি পংক্তিতে :

'জালালে বাদশাহী হো ইয়া জমহুরী তামান্না হো

জুদা হো দীন সিয়াসত সে তো রাহজাতি হ্যায় চেংগিজী।'

শাহানশাহের দাপট হোক বা গণতন্ত্রের প্রহসন হোক, রাজনীতি থেকে ধর্ম আলাদা করলে বাকী থাকে চেংগিজী বর্বরতা। মহানবী (সা) যে রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ৩টি। যেমন–

১. চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি

২. উপায় উপকরণের পবিত্রতা

৩. উদ্দেশ্যের পবিত্রতা

বস্তুত অসৎ নেতৃত্বের অপসারণ, সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা; সৎকাজের আদেশ, দুষ্কৃতির প্রতিরোধ; রাষ্ট্রযন্ত্রকে ইসলামের অনুকূলে ব্যবহার ইত্যাদির জন্য রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োজন। আর ইসলাম এজন্যই রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলামী আইন ও অনুশাসন কার্যকরী করার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা অপরিহার্য। আর এ জন্যই ইসলামী রাজনীতি। ইসলামী রাজনীতি বিজয়ী হওয়া মানে দুর্নীতি, মিথ্যা ও জুলমাতের তখত তাউস আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

১৭. ৪ খিলাফত (Khilafat)

১. ভূমিকা

Introduction

মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র মহানবী (সা)-এর এক অসাধারণ কীর্তি। তিনি

ইসলামী শরীয়া মোতাবেক একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীকালে তাঁর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত হয়। মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মুসলিম জাহানে খিলাফত আল মিন হাযিহিন নবুয়তের সূচনা হয়। এরপর হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) খলীফা হন। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল ছিল মোট ত্রিশ বছর। পরবর্তী খিলাফত ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও তা কার্যত ছিল মুলুকিয়াত। এভাবে উমাইয়া, আব্বাসিয়া, ফাতেমীয়, উসমানীয় খিলাফত মুসলিম জাহানকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯২৪ সালে তুরস্কের অটোমান খিলাফতের উচ্ছেদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে খিলাফত ব্যবস্থার অবসান ঘটে। বর্তমানে আবার খিলাফত আলা মিন হাযিহিন নবুয়ত প্রতিষ্ঠার জোর প্রয়াস চলছে। খিলাফত হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা।

২. খিলাফতের সংজ্ঞা
Definition of Khilafat

খিলাফত একটি আরবি শব্দ। খিলাফত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, উত্তরাধিকার, অন্য কারো মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর স্থানে উপবেশন করা, কারো অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা। কুরআন মাজীদে খলীফা বা খিলাফত শব্দটি উপরোক্ত প্রায় প্রত্যেকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ আল্লাহর খলীফা, খিলাফতের মর্যাদা দিয়েই তাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে খিলাফত হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাম যা মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দিয়ে এবং প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তাই পারিভাষিক অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে খিলাফত নামে আখ্যায়িত করা হয়। যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন বা স্থলাভিষিক্ত হন তাকে বলা হয় খলীফা। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক নেতৃত্বের পদবীও ছিল খলীফা। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী স্বীয় গ্রন্থ 'মুফরাদাতে' লিখেছেন, "খিলাফত হলো অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করা চাই তা সে ব্যক্তির অনুপস্থিতির কারণে হোক, তাঁর মৃত্যুর কারণে হোক, তার অপারগতার কারণে হোক অথবা যাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে তাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে হোক। লেন (Lane) তাঁর প্রসিদ্ধ ' Arabik English Lexicon' নামক অভিধান গ্রন্থে খলীফা অর্থ Successor (স্থলাভিষিক্ত) ছাড়াও Vicegerent (প্রতিনিধি) লিখেছেন। খিলাফত শব্দটি নিজেই একথা প্রমাণ করে যে, সে আসল নয়, আসলের প্রতীক

মাত্র, মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ারই নাম খিলাফত। বস্তুত আল্লাহর নবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ারই নাম খিলাফত। আল্লাহর নবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর গোটা উম্মাতের নেতৃত্ব গ্রহণ করাকেই বলা হয় খিলাফত। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নবুয়তের পর 'খিলাফত'ই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ।

৩. খিলাফতের উৎপত্তি

Origin of Khilafat

খিলাফত হচ্ছে একটি ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Religio-Socio-Political Institution)। মাজীদ খাদ্দুরীর মতে, খিলাফত হচ্ছে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান। ইবনে খালদুনের মতে, মহান ইসলামী আদর্শের সংরক্ষণ, তদনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন (State building) এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনা নাম খিলাফত। তাঁর মতে খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মহানবী (সা)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। মাওয়ার্দীর মতে, খিলাফত হচ্ছে একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান। ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব বলে অভিহিত। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা বা শাসন পরিচালক শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই রাষ্ট্র শাসনের অধিকার লাভ করে এবং তা জনগণের কল্যাণে প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক এ মহান উদ্দেশ্য সাধনে তাঁকে সাহায্য করে। কারণ প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহর রবুবিয়াতের খলীফা। ইসলামী শরীয়াত খিলাফতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর ইসলামী রাষ্ট্রের চারজন শাসক শুধুমাত্র 'খলীফা' উপাধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। খলীফা ছাড়াও হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি গ্রহণ করেন। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নবুয়তের পর 'খিলাফত'ই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ।

৪. উপসংহার

Conclusion

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম খিলাফত। 'খিলাফত তত্ত্বের' উপরই ইসলামী রাষ্ট্র ও তার কাঠামো ভিত্তিশীল। খিলাফতের ধারণা থেকেই ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ। ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভাবধারাই হচ্ছে খিলাফত তত্ত্ব।

১৭. ৫ আদালাহ্ (Adalah)

মূল শব্দ আদল। এর অর্থ নৈতিক সঠিকতা (moral probity), ন্যায়ানুগভাবে কাজ করা (to act justly), প্রত্যেককে তার ন্যায্য হিস্যা প্রদান করা (rendering everyone his due)। 'আদালাহ্' পরিভাষাটি সুবিচার (justice) শব্দটি হতে অনেক বেশি ব্যাপক এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। একজন মানুষের নিজের প্রতি বা অন্যান্য সকলের প্রতি যা কিছু করা কর্তব্য তা 'আদালাহ্' এর পরিধির মধ্যে পড়ে।

আদালাহ্ থেকে আসে আদালত পরিভাষা যা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ শুধু ন্যায়বিচার বা ন্যায়নীতি নয় বরং পরিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা, ভারসাম্য ও সত্যের সাক্ষ্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হওয়া। আদালতের অধিকারী ব্যক্তি নিজের বিপক্ষে হলেও সত্য প্রকাশ করবেন এবং সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আবেগমুক্ত হবেন; কারো প্রশংসা বা নিন্দার তোয়াক্কা করবেন না। তিনি সত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বন্ধু-দুশমন বিবেচনা করবেন না।

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম নীতিমালা হচ্ছে 'আদালাহ্'। এর মানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যদি তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও হয় (৪ : সূরা আন নিসা : ১৩৫) 'বিশ্বাসীদের ন্যায়পরায়ণ হতে আদেশ করা হয়েছে, কেননা 'ধর্মপরায়ণতার পরেই ন্যায়পরায়ণতার স্থান' (৩৮ : সূরা সোয়াদ : ২৪)। নবী-রাসূলগণ 'আসমানী কিতাব ও ভালমন্দ পরিমাপের দাঁড়িপাল্লাসহ আগমন করেছেন, যাতে মানুষ ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে পারে।' (৫৭ : সূরা আল হাদীদ : ২৫) 'সত্য' ও 'আল্লাহ্র পথ' অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নবী করীম (সা) নির্দেশিত হয়েছিলেন (২ : সূরা আল বাকারা : ২৪); অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ 'সত্য' ও 'আল্লাহ পাকের' শব্দদ্বয় বলতে 'ন্যায়পরায়ণতা' ও 'সুবিচার' বুঝিয়েছেন। আল কুরআনে ন্যায়বিচারের তাৎপর্য বুঝাতে বহুবিধ শব্দ যথা 'সুন্নাতুল্লাহ' (আল্লাহর পথ বা পন্থা), 'মিজান' (দাঁড়িপাল্লা), 'কিসত' ও 'আদল' উভয় শব্দই (সুবিচার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যক্তি মানুষ কর্তৃক সৎকাজের দায়িত্ব পালন, আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদাচরণ, বিদ্রোহ, অবিচার, লজ্জাকর ও গর্হিত কাজ পরিহার; অসৎ ইচ্ছা বা বিদ্বেষের বশে অন্যের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা প্রভৃতি বিষয়ের উপর আল কুরআন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল কুরআন শুধুমাত্র দুর্বল ও নিপীড়িতদের

প্রতি সুবিচারের কথাই বলেনি বরং সমাজে হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি কঠিন শাস্তির সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছে। আল কুরআন ব্যক্তি মানুষের এমন উচ্চতর নৈতিক আদর্শ দাবি করে যে প্রয়োজনে সে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। একটি ন্যায়পরায়ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো এমন সব ন্যায়বান ও দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয় যারা ন্যায় ও সততার সাথে জননীতি পরিচালনা এবং সকল সম্পদ ও সুযোগ ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমতার ভিত্তিতে বিলিবণ্টন ও বিন্যস্ত করবে।

আদালাহ্ হচ্ছে 'স্বাধীনতা ও সমতার' দুটি মৌলিক নীতি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচারের এমন একটি অপরিহার্য শর্ত ও পরিবেশ যে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের নৈতিক ও শুভ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক ইচ্ছা-পছন্দ ঘোষণা করতে পারে এবং ঐ বিশ্বাস ও পছন্দ মাফিক স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

আদালত শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ শুধু ন্যায়বিচার ন্যায়নীতি নয় বরং পরিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, ভারসাম্য ও সত্যের সাক্ষ্যের উপর জীবন্ত প্রতিমূর্তি হওয়া। আদালতের অধিকারী ব্যক্তি নিজের বিপক্ষে হলেও সত্য প্রকাশ করবেন এবং সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ভাবাবেগমুক্ত হবেন; কারো প্রশংসা ও নিন্দার তোয়াক্কা করবেন না। তিনি সত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বন্ধু দুশমন বিবেচনা করবেন না।

১৭. ৬ ইসলামী রাষ্ট্রে জবাবদিহিতা (Accountability in Islamic State)

জবাবদিহিতা (Accountability) ইসলামী রাষ্ট্র-প্রশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত সুপরিচিত শব্দ। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যজগৎ পরিচিত হয়েছে এ শব্দের সাথে। দায়িত্ব থেকে জবাবদিহিতা উদগত হয়। ইসলামে জবাবদিহিতার ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলাম সবাইকেই জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসে।

জবাবদিহিতা সম্পর্কে আল কুরআন

একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর নির্ধারিত সর্বপ্রথম বিষয় হচ্ছে পরকালের ভয়। এ ভয় সর্বদা তার মন-মগজ ও স্নায়ুমণ্ডলীতে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে রাখে। মহাজ্ঞানী সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সবকিছুর প্রত্যক্ষকারী, সর্বত্র বিরাজমান মহান সত্তা

আল্লাহ্ আদালতে আখেরাতে তার নিকট থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব গ্রহণ করবেন। মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ . وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।' (৯৯ : সূরা যিলযাল : ৭-৮)

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا - يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ -

'আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি, সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম চাক্ষুস দেখতে পাবে এবং কাফেররা বলবে হায়, আমি যদি মাটি হতাম।' (১৮ : সূরা আন নাবা : ৪০)

আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলকেই দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হতে হবে বান্দাহরূপে (১৯ : সূরা মারইয়াম : ৯৩)

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

'আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।' (২ : সূরা আল বাকারা : ১৫৬)

যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২ : সূরা আল বাকারা : ৩৮-৩৯)

জবাবদিহিতা সম্পর্কে মহানবী (সা)

'তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। আর তাকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসককে তার অধীনস্ত নাগরিকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ (স্বামী) তার পরিবার-পরিজনের কর্তা। তাকে তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘর সংসার এবং সন্তানের রক্ষক। তাকেও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, বুখারী-মুসলিম)

'কোন ব্যক্তি মুসলমানদের সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে তাতে প্রতারণা ও জালিয়াতি করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী, মুসলিম)

'কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের সর্ববিধ কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তাদের উন্নতি ও কল্যাণের ব্যবস্থা করে না এবং তাদের কাজকর্মের আনজাম দেয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করে না, যেভাবে সে আপন কর্মে নিয়োজিত থাকে- আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন (তাবারানী, কিতাবুল খারাজ)

ইসলামী রাষ্ট্রে জবাবদিহির পদ্ধতি

ইসলামে জবাবদিহিতার চারটি পর্যায় রয়েছে। মহানবী (সা) প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে, সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের কাজের জন্য চারভাবে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যেমন-

১. নিজের বিবেকের কাছে (To self) জবাবদিহিতা

২. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে (To Hierarchy) জবাবদিহিতা :

অধঃস্তন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কর্তৃক পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্ব কাঠামো অনুমোদিত। কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন : "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে মান্য কর, তাঁর রাসূলকে মান্য কর এবং আনুগত্য কর তাদের যাঁদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে" (৪ : সূরা আন নিসা : ৫৯)। অতএব, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তাগণ পদক্রম অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কাজের জন্য দায়ী থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ, কার্যবিবরণী পাঠানোর মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রশাসকগণ দায়ী থাকতেন আল-ওয়ালী বা প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে। অনুরূপভাবে, প্রাদেশিক গভর্ণরগণ দায়ী থাকতেন খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। অপরদিকে, খলীফা ও ওয়ালীগণ পরিদর্শনের মাধ্যমে অধঃস্তন কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। খলীফা একই সাথে সরকার ও রাষ্ট্রের প্রধান হলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতেন মজলিস-ই-শূরা বা পরামর্শদাতা পরিষদের।

৩. জনগণের কাছে জবাবদিহিতা (To the people)

সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাগণকে তাঁদের কাজের জন্য সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে

হত। খলীফা উমর ফারুক (রা) সাপ্তাহিক জুম'আর নামাযের সমাবেশে এবং বার্ষিক হজ্জের মহাসম্মেলনে জনগণকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় কর্মরত প্রশাসক, প্রশাসন ব্যবস্থা বা কার্যক্রমের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে তা উত্থাপনে উৎসাহিত করতেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ তথায় দাঁড়িয়ে সকল উত্থাপিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন। এতে জনগণের মধ্যে প্রশাসনের উপর তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হত এবং সরকারি আমলাগণও জনগণ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ্যে জবাবদিহি করার চেতনায় প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগে সতর্ক থাকতেন। এ জাতীয় একটি ঘটনায় একবার স্বয়ং খলীফা উমর ফারুক (রা)-কেই ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত কাপড় পরিধান করার জন্য জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

৪. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে জবাবদিহিতা (To Allah) :

শেষ বিচারের দিন মহান প্রভু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে ব্যক্তির মধ্যে আভ্যন্তরীণ চেতনাবোধ সমুজ্জ্বল রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনে সুফল পাওয়া যায়।

জবাবদিহিতার এ অনুভূতি মানবজীবনে দায়িত্ববোধের উপাদান প্রবিষ্ট করে তাকে লাগামহীন হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং সে নিজের প্রবৃত্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে নিজের প্রতিটি কাজে তার মালিকের সন্তোষ এবং তাঁর সামনে নিজের সৌভাগ্য ও কৃতকার্যতার খেয়াল জাগরুক থাকে।

১৭. ৭ জরুরিয়াত (Zaruriat)

ইসলামী রাষ্ট্রের বহুবিধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা। সকল নাগরিকের জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা, সকলের জন্য আয় উপার্জনের সম্মানজনক ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন বা জরুরীয়াত পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেন দরিদ্র ও অভাবীরা উৎপাদনাক্ষম হতে পারে এবং তাদের নিজেদের চেষ্টায় ন্যূনতম জীবন যাপনের মান অর্জনে সক্ষম হয়। আবদুল রশিদ মতেনের মতে, জরুরীয়াত হচ্ছে এমন সব দ্রব্যসামগ্রী যা ছাড়া জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়; রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের সাধারণ সুযোগ সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা বুঝায় (Zaruriat means necessary, essentials without which things can not run; applied to a political system which

guarantees the necessities of life to its citizens.) ইমাম শাতিবী[৩] ও ইমাম গাজ্জালী[৪] (রহ) মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে :

১. **জরুরীয়াত** Zaruriat (Basic Needs-Necessities) – আবশ্যকীয় -যা একান্তই অপরিহার্য, যা না হলে মানুষের চলেই না, বস্তুজগতের সামগ্রিক অগ্রগতিতে যা একান্তই অপরিহার্য, এমন সব দ্রব্যসামগ্রী যাছাড়া জীবনধারণ করা সম্ভব নয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের সকল প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বুঝায়।

২. **হাজিয়াত** Hajiat - Requirement (Comforts) প্রয়োজনীয় –যা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করে এবং কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। অন্য কথায় ঐসব দ্রব্যসামগ্রী যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে অত্যাবশ্যক নয়।

৩. **তাহসিনিয়াত** Tahsiniat (Beautification) –সৌন্দর্যবর্ধক –যা মানবজীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও কল্যাণময় করে। সৌকর্য বৃদ্ধিকরণ, সুন্দরকরণ, কোন কিছুকে নিখুঁত করে চরম উৎকর্ষে পৌছান।

তাঁদের মতে জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ৬টি যেমন–

১. **আকীদা / দীন** / Protection of faith, Deen, Ideology : ঈমান, দীন, আদর্শ

২. **নফস** Nafs-Life itself-Protection of life : ত্বয়ামুন-খাদ্য, লেবাসুন-বস্ত্র, মাকানুন-বাসস্থান, মুয়ালিয-চিকিৎসা, ইয়ানকালুন–পরিবহন, মুহিতুন–পরিবেশ, আল ইসতিরাহাতুন–বিশ্রাম, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, জনজীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদি যা মানুষের জীবন ধারণের সাথে সংযুক্ত।

৩. **নসল** Nasl-Family formation / Protection of Posterity : পরিবার গঠনের ক্ষমতা, বংশধারা সংরক্ষণ করা।

৪. **আকল** Aql-Intellect / Reason : শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা।

৫. **মাল** / Mal-Property, Wealth : ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা এবং তা সংরক্ষণ করা।

---

৩. ইমাম শাতিবী, Al muwafaqat fi Usul al shariah, vol-2. P. 177.

৪. আল গাজ্জালী, আল মুসতাসফা (১৯৩৭), প্রথম খণ্ড পৃ. ১৩৯-৪০।

৬. হুররীয়াত – Hurriat / Freedom: স্বাধীনতা, আজাদী।

১৭. ৮ বায়তুলমাল (Public Treasury)

বায়তুলমাল-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। মদীনা রাষ্ট্রে যে অর্থপ্রশাসন ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু হল বায়তুলমাল- রাষ্ট্রীয় কোষ। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারী অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থ ভাণ্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকেই বায়তুলমাল বলা হয়। অবশ্য কোন কোন সময় ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা অর্থব্যবস্থাকেও বায়তুলমাল বলা হয়ে থাকে। তবে পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ স্থানটিকে বায়তুলমাল বলা হয়। মদীনা রাষ্ট্রের বায়তুলমাল জনকল্যাণ এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য গঠিত হয়েছিল। বায়তুলমাল ছিল মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। এজনেই বলা হয়েছে–

"বায়তুলমাল সম্পদ মুসলমানদের (মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকদের) সম্মিলিত সম্পদ।"

বায়তুলমালে সঞ্চিত রাষ্ট্রের সম্পদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার স্বীকৃত। কি রাষ্ট্রপ্রধান, কি সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সাধারণ মানুষ বায়তুলমালের উপর কারোরই একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হতে পারে না। একথাই ঘোষিত হয়েছে মহানবী (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে–

"আমি তোমাদেরকে দানও করি না, নিষেধও করি না, আমিতো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে, আমি সেভাবেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টন করে থাকি।"

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল-ধনভাণ্ডার সহায় সম্পদ সবই জনগণের আমানত। শরীয়াত মুতাবিক ও জনগণের কল্যাণের নিমিত্তেই ন্যায়সঙ্গত পন্থায় রাষ্ট্রের আয় করতে হবে, ব্যয়ও করতে হবে। কোন প্রকার অপচয়, অন্যায় ব্যয়, বেইনসাফী করা চলবে না।

বস্তুত ইসলামে বায়তুলমালের ধারণা অতি ব্যাপক। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা এবং মানুষের খিলাফতের মৌলিক বিশ্বাসের উপরই বায়তুলমালের ধারণা ভিত্তিশীল। বায়তুলমাল ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকস্বরূপ। তদানীন্তন সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন বায়তুলমালই পূরণ করত। তবে অবশ্য আধুনিক

কালের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় ব্যাপক ও বিস্তর কাজ এর ছিল না। তাছাড়া আধুনিক অর্থে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অস্তিত্ব মদীনা রাষ্ট্রে ছিল না। ফলে জনগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

মদীনা মুনাওয়ারায় যেদিন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের শুভ সূচনা হয়েছিল মূলত সেদিন হতেই বায়তুলমালের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে বায়তুলমালে কোনরূপ ধনসম্পদ সঞ্চয় করে রাখা হত না, তার অবকাশও তখন ছিল না। বায়তুলমালে যে অর্থসম্পদ জমা হত, মহানবী (সা) তা তৎক্ষণাৎ স্বীয় সাহাবীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। কারণ তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় আয়ের অবস্থা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। মহানবী (সা)-এর যুগে বায়তুলমালের সম্পদ সঞ্চিত করে রাখার সুযোগই যেহেতু ছিল না, তাই এর জন্য পৃথক কোন ঘর নির্মাণ করা হয়নি বরং বায়তুলমালের সকল প্রকারের যাবতীয় ধন মসজিদে নববীতে জমা করে, পরবর্তীতে তা সঠিক প্রাপকের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত।

মহানবী (সা) স্বয়ং বায়তুলমালের কেন্দ্রীয় কর্মকাণ্ড ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের অঞ্চলওয়ারী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের নির্দেশ বা বিধান অনুযায়ী বায়তুলমালের অঞ্চল ও গোত্রভিত্তিক শাখা স্থানীয় অর্থকরী প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব বহন করত। বায়তুলমাল ছিল মদীনা রাষ্ট্রের সেসব আয়ের বাহক যা ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী অর্থভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। অন্যকথায় ইসলামী বিধানানুযায়ী মদীনা রাষ্ট্রের শাসনাধীন সমগ্র এলাকার যেসব আয় সরকারি অর্থভাণ্ডারে আসা উচিত সেসব সংগ্রহ ও জমা রাখার দায়িত্ব ছিল বায়তুলমালের। অনুরূপভাবে বায়তুলমাল ঐ সমস্ত ব্যয় নির্বাহেরও জামীনদার, যা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য অপরিহার্য। এজন্যই মহানবী (সা) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বায়তুলমালের আয়-ব্যয়ের নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোন সম্পদ বায়তুলমালে জমা হলেই মহানবী (সা) অস্থির হয়ে উঠতেন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সে সম্পদ অভাবগ্রস্তদের ও অন্যান্য পাওনাদারদের মধ্যে বিতরণ করে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। বায়তুলমাল থেকেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান করা হতো। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) বলেন : কাউকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কোন দায়িত্ব দেয়া হলে আমি অবশ্যই তাকে গ্রাসাচ্ছাদন দেব। অতিরিক্ত কিংবা এর বাইরে কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে খেয়ানত।

মহানবী (সা) বিভিন্ন উৎস থেকে বায়তুলমালের প্রাপ্ত আয় পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন, কারণ এর প্রতিটি উৎসের প্রকৃত ও বৈশিষ্ট্য ছিল আলাদা এবং তার ব্যয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

বায়তুলমালের আয় (Sources of Income of Baitulmal)

মহানবী (সা)-এর সময়ে বায়তুলমালের আয়ের উৎসসমূহ ছিল : ১. যাকাত, ২. ওশর, ৩. উশুর, ৪. সাদাকাতুল ফিতর, ৫. আওকাফ, ৬. আমওয়াল আল ফাদিলা, ৭. নাওয়াইব, ৮. দান, ৯. মালে গানীমাহ, ১০. খুমুস ১১. ফাই, ১২. মুক্তিপণ, (Ransom) ১৩. কর্জ, ১৪. উপহার সামগ্রী, ১৫. জিযিয়া, ১৬. খারাজ।

১৭.৯ আল আমানাহ (Al Amanah)

আল আমানাতু একটি আরবি পরিভাষা। এর অর্থ আমানত, আমানতদারী, আমানতদারিতা। এ পরিভাষাটি একাধারে আস্থা (Trust), আমানতদারী (trusteeship), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), বিশ্বস্ততা (Trust worthiness), অনুরাগ-আনুগত্য (Allegiance), বিশ্বাসযোগ্যতা (Faithfullness), সততা (Honesty), ইন্টিগ্রিটি (Integrity), সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা, জিম্মা, আস্থাভরে ন্যস্ত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মহানবী (সা)-এর উপাধি ছিল আল আমীন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি। আমানত ইসলামী মূলনীতিগুলোর মধ্যে অতি উচ্চমানের একটি নীতি। পরম শত্রুরাও মহানবী (সা)-এর নিকট তাদের অর্থকড়ি, মূল্যবান সম্পদ গচ্ছিত রাখত এবং তলবমাত্র যেমনটি রাখত, মহানবী (সা) তেমনটি ফেরত দিতেন। হিজরতের রাতে তিনি আমানত প্রত্যার্পণের জন্য আলী (রা)-কে দায়িত্ব অর্পণ করে তবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। রক্তলোলুপ শত্রু হলেও তাদের গচ্ছিত আমানত তসরূপ করা মহানবী (সা)-এর নিকট অকল্পনীয়। আমানতের এটি হল আদর্শরূপ।

আমানত শুধুমাত্র লোক সমষ্টির মধ্যে এ আচরণের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় না বরং আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারও বুঝায় যে তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি খিলাফতের দায়িত্ব একটি আমানত।

আমানত বিশ্বাসগতভাবে গচ্ছিত দ্রব্য। সাধারণ অর্থে গচ্ছিত মালের প্রত্যার্পণকে বলে আমানত। আমানত এর ক্ষেত্রে বিশ্বাস রাখার সাধারণ দায়িত্ব ব্যতীত কোন

বাধ্যতামূলক চুক্তি হয় না। এ জন্য ঘটনাচক্রে বা ইচ্ছা ব্যতিরেকে কারো উপর কোন দ্রব্য সংরক্ষণের দায়িত্ব বর্তালে তা আমানতের পর্যায়ে পড়ে। যেমন কারো বাড়িতে বাতাসে উড়ে আসা কোন জামা কাপড় অথবা কুঁড়িয়ে পাওয়া কোন দ্রব্য অথবা কোন বন্ধকী দ্রব্য। কুরআন মাজীদে সাধারণ অর্থে আমানত এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদেরকে আমানত হিসেবে গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যার্পণ করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন বলেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। (৪ : সূরা আন নিসা : ৮) এ নির্দেশ পালনকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে (তারা সফলকাম)। (২৩ : সূরা আল মুমিনূন : ৮) সূরা আল মায়ারিজের ৩নং আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে। হাদীসে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, আমানত রাখা মালামাল ফিরিয়ে দেয়া উচিত।' 'বিশ্বাস করে তোমার নিকট কোন জিনিস গচ্ছিত রাখা হলে তা জমাকারীকে ফেরত দাও। (ইবনে মাজাহ) আমানত উচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া।

১৭.১০ মজলিসে শূরা (Majlish-E-Shura)

মজলিস (مَجْلِس) মানে সভা, সমিতি, পরিষদ, সংস্থা। শূরা (شُوْرٰى) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ পরামর্শ। মজলিসে শূরা মানে পরামর্শ পরিষদ বা পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ।

প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হলে আরব শেখগণ গোত্রের গণ্যমান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে উদ্ভূত সমস্যাদি সমাধান করতেন। পবিত্র কুরআনেও পরামর্শ করে কার্যাদি সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা) প্রাক ইসলামী নীতি ও কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন। প্রাক ইসলামী যুগের আরব শেখদের পরামর্শ সভাকে 'বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ' বলা হতো এবং ইসলামী যুগে অনুরূপ পরামর্শ সভাকে 'মজলিসে শূরা' বলা হত। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মজলিসে শূরা বলা হয় এমন এক নির্বাচিত সংস্থাকে যারা শাসন বিভাগকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। পরামর্শ দেয়া জনগণের অধিকার আর পরামর্শ চাওয়া শাসন বিভাগের কর্তব্য। জনগণের পক্ষ হতে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে তাকওয়াবান, সৎ, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং আইন বিষয়ক যোগ্যতাও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত করতে হবে।

মজলিসে শূরা দু'প্রকারের। যেমন–

১. **মজলিসে আম :** সাধারণ সভা। এটি সাধারণ পরিষদ বা নিম্ন পরিষদ। এতে অধিকাংশ জনগণ অংশগ্রহণ করে থাকে।

২. **মজলিসে খাস :** বিশেষ সভা। এটি উচ্চ পরিষদ। এতে জননির্বাচিত, জ্ঞানী, আইনজ্ঞ ও বিজ্ঞজনরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রমে জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কুরআন ও সুন্নাহতে বিধৃত আইনসমূহকে ধারাবদ্ধকরণ (Codification) থেকে শুরু করে তার প্রয়োগ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সকল পর্যায়ে জনমত জানার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান মজলিসে শূরা বা আইন পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। সমকালীন ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইন পরিষদ (The Ligislature)-কে শূরা, ইজতিহাদ ও ইজমা (Shura, Ijtihad, and Ijma)-এর বহিঃপ্রকাশ ও সমার্থক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ড. হাসান তুরাবী পার্লামেন্টকে 'নির্বাচিত পরামর্শক সংস্থা' (Elected consultative institution) বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীকালে এ মহান প্রতিষ্ঠান বংশানুক্রমিক, স্বৈরাচারী ও বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীদের মর্জিমত গঠিত হতে দেখা যায়। নির্বাচিত শূরা বা আইন সভা অবশ্যই পুনর্জীবিত করতে হবে।[৫]

ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবালের মতে, আইন পরিষদ বা শূরার আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের (ইজতিহাদের) এখতিয়ার থাকতে হবে। যার ভিত্তিতে দেশবাসীর ঐক্যমত (ইজমা) স্থাপিত হবে। [It must have the right to interpret and apply the law (Ijtihad) which would the constitute the authoritative consensus of the community (Ijma)]। শুধু এভাবেই আইন ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির সঞ্চার করা সম্ভব হবে এবং কার্যকরভাবে এর বিবর্তিত অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।[৬]

অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে আইন সভার অধিকাংশ সদস্যকে নির্বাচিত সদস্য হতে হবে। তবে কিছু সংখ্যক সদস্য মনোনীত হতে পারেন যারা আধুনিক আইন শাস্ত্র ও শরীয়াহর অনুশাসন উভয়

---

৫. ড. হাসান তুরাবী, ইসলামী রাষ্ট্র সম্পাদনায় জন. এল. এসপোসিটো, ভয়েসেস অব রিসারজেন্ট ইসলাম, নিউইয়র্ক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩, পৃ. ২৪৩।

৬. ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, পৃ. ২৪৩।

বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত ও পারদর্শী হবেন। আইনসভা বা মজলিসে শূরা নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমের নীতিমালা রচনা করবে।[৭] আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দুটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে; একটি হচ্ছে শরীয়াহ অনুশাসনের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় চরিত্র এবং বাকী বিষয়াবলী প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তনশীল ও স্থিতিস্থাপক। অন্যকথায় মজলিসে শূরা বা আইন সভার কাজ হচ্ছে শরীয়ার সুস্পষ্ট বিধানসমূহকে আইনে রূপদান করা এবং যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সে ক্ষেত্রে শরীয়াহর সীমারেখার মধ্যে ন্যায়, স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও বিচার বুদ্ধির ভিত্তিতে আইন ও বিধান রচনা করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা বা আইন পরিষদের প্রসঙ্গটি কোন কোন মহলে এ ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে যে শূরা বা আইন সভার ভূমিকা শুধুমাত্র পরামর্শ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং প্রধান নির্বাহীর তা গ্রহণ বা বর্জন করার নিজস্ব এখতিয়ার রয়েছে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণাকে ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও সাধারণ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৭.১১ নাহদাহ (Nahdah)

আরবি মূল নাহাদা (Nahada) হতে নাহদাহ (Nahdah) শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ হচ্ছে দণ্ডায়মান হওয়া (to rise), আরো বিশদভাবে বললে এর অর্থ একটি শিশুর মাঝে যে সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে তাকে জাগ্রত করা (the actualisation of potentialities latent in the child)। নাহদাহ সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। তাই এই বক্তব্য যুক্তিসম্মত যে মুসলিম বিশ্ব 'নাহদাহ' এর মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হচ্ছে। অন্যকথায় মুসলিম সম্ভাবনার অঙ্কুর সবুজ বৃক্ষের রূপ নিচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে, এখানে ইসলাম, যা সকল কালের সকল সময়ের জন্যই অপরিবর্তিত থাকছে। ইসলামের মৌলিকত্ব, সামর্থ্য (Capabilities) ও সম্ভাবনা (Potentialities) ক্রমাগতভাবে ইসলামী উম্মাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যার ফলে বিদ্যমান যুগ সমস্যার সমাধানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেশে দেশে ইসলামী সংগঠনসমূহ সচেষ্ট হয়েছে।

বর্তমান সময়ে দেশে দেশে পরিচালিত ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন এর গঠন প্রকৃতি (form), বিষয়বস্তু (Content), লক্ষ্য (Goals) নির্বিশেষে পাশ্চাত্য জগতে উল্লেখযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পশ্চিমা দেশসমূহের অর্থনীতির জন্য তেল উৎপাদনকারী মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশসমূহের

৭. কুর্দী, দি ইসলামিক স্টেট, পৃ. ৭৭-৭৯।

গুরুত্ব, ১৯৭৯ সালে ইরানের সফল ইসলামী বিপ্লবের ফলে উত্থাপিত গুরুতর কৌশলগত প্রশ্ন, সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আফগান প্রতিরোধ আন্দোলনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গুরুত্ব এবং অনুরূপ অনেক ঘটনা পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্বে উদ্বেগ ও সতর্ক মনোভাব তৈরীর ক্ষেত্র তৈরী করে।

আধুনিক তাত্ত্বিকদের অনেকেই ইসলামী নাহদাহ আন্দোলন সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং এজন্যই তারা সমাজের দ্বৈত বা শঙ্কর চরিত্র লক্ষণের উপর বেশ জোর দেন। এই শেষোক্ত মতামত অনুসারে দুটি আকর্ষণ বিন্দু তত্ত্ব পেশ করা হয়; এর একটি হচ্ছে ইসলাম, তা গতিশীল (dynamic), স্থবির (stultified) বা সংস্কারধর্মী (reformed) যাই হোক না কেন; দ্বিতীয়টি হচ্ছে পশ্চিমের প্রভাব যা মুসলিমদের জন্য তৈরি ও চ্যালেঞ্জমুখী– যার মুখোমুখি মুসলিমদের হতে হবে, সমঝোতায় আসতে হবে এবং অতিক্রম করে যেতে হবে। অন্যকথায় পাশ্চাত্যে উদারনৈতিক (Liberal) বা মার্কসবাদী (Marxist) মহল মুসলমানদের সম্পর্কে যেরূপ ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, ঐসব ভাবনা চিন্তা মুসলমানদের বিভিন্ন সমীক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

চলমান নাহদাহ আন্দোলন তথা ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনসমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে মুসলমানরা এমন একটি বিশ্বে বাস করে যেখানে ইসলাম সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে।

ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার নাম (Islam is a total comprehensive civilization)– খ্রিস্টধর্মের মতো সীজারের অংশ সিজারকে, আল্লাহর অংশ আল্লাহকে দাও এ ধরনের দর্শনে ইসলাম বিশ্বাস করে না। ইসলাম এমন এক সর্বব্যাপী জীবন বিধান যা ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র সবকিছুকে সম্পৃক্ত করে নেয়। ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয় তাওহীদকে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সার্বভৌম একত্ব (the unity of creation), বিশ্বাসীদের ঐক্য (the unity of the community of faithful (Ummah) জীবনের সামগ্রিকতার ঐক্য (the unity of life as totality) এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের (the unity of the temporal and the spiritual) ঐক্যকে। মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যথাযথ অহীর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামের প্রথম যুগের তথা স্বর্ণযুগের মুসলমানরা যে সভ্যতা লাভ করেছিল তাতে তারা দুনিয়াবী সকল সাফল্যের সাথে পরকালীন মুক্তিরও আশ্বাস ও

নিশ্চয়তা লাভ করেছিল। ক্ষমতা ও মর্যাদা ছাড়াও তারা বস্তুগত সমৃদ্ধি ও উচ্চতম সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা প্রাপ্ত হয়েছিল। এ সমস্ত কিছুর উপলব্ধি সমকালীন মুসলমানদের তাদের জীবনের উচ্চতম মিশনের দায়িত্বশীলতা নির্ধারণ ও স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতের গৌরব গাঁথা মুসলামনদের তাদের ভাগ্য সম্পর্কে আশাবাদে অভিষিক্ত করে, যার ফলে তারা আল্লাহর রাহে জিহাদে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তারা যদি মহানবী (সা) প্রদর্শিত পথে ইসলাম প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে একই ফলাফল পুনঃপ্রাপ্তি ঘটবে।[৮]

জিহাদের ধারণা ও তার ফলে সৃষ্ট আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ মুসলমানদের মধ্যে চালিকাশক্তি হিসেবে নাহদাহ বা ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের চলমান প্রক্রিয়ার শামিল রেখেছে। ইসলামের মধ্যেই গতিশীল নাহদাহর বীজ সুপ্ত আছে যা এ হাদীস দ্বারা সত্যায়িত যে, 'প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন মুজাদ্দিদ আগমন করবেন, যিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য মানুষদের আহ্বান করবেন।'[৯]

এ দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামী নাহদাহ আন্দোলন আধুনিক কোন ঘটনাও নয়, নতুন কোন আন্দোলনও নয়। এ আন্দোলন শুধু পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া নয় বরং এ হচ্ছে সমস্যা সঙ্কুল ত্রুটিপূর্ণ এ বিশ্বে নবুয়তী কার্যধারার অনুসরণে মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠনের অন্বেষা ও প্রচেষ্টা।

এজন্যই মরহুম ড. ইসমাইল আল রাজী আল ফারুকী পাশ্চাত্য কর্তৃক ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত 'মৌলবাদ' পরিভাষার পরিবর্তে 'নাহদাহ' বা পুনর্জাগরণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতিশীল।[১০]

১৭.১২ ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice in Islam)

যেসব মহান বুনিয়াদী নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ইসলামের সমুদয় শিক্ষা রচিত হয়েছে তার অন্যতম অংশ হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার বা সামাজিক সুবিচার। অনেকে মনে করেন সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা একটি সমকালীন

---

৮. আবদুল রশীদ মতেন, 'Pure and practical Ideology : The thought of Mawlana Maududi' ইসলামিক কোয়ার্টালি, ১৮ (১৯৮৪) পৃ. ২১৮।

৯. পূর্বোক্ত।

১০. ড. ইসমাইলআল রাজী আল ফারুকী, Islamic Renaissance in Contemporary Society. আল ইজতিহাদ ১৫ : ৪ (অক্টোবর ১৯৭৮) পৃ. ১৫।

পাশ্চাত্য উপলব্ধি। এ ধারণা সঠিক নয়। পাশ্চাত্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা বিকশিত হওয়ার বহু আগেই ইসলাম কেবল সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাই দেয়নি বরং বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠাও করেছে। ইসলামের উদ্দেশ্যই হল 'আদল' বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। মানব রচিত যাবতীয় অন্যায় ও জুলুমমূলক মতবাদের বেড়াজাল হতে মানব জাতিকে মুক্ত করে আদল-ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আল্লাহর কিতাব নাযিল করেছেন এবং নবী রাসূল পাঠিয়েছেন।

ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার হচ্ছে একটি ব্যাপক ও সমন্বিত কর্মসূচী। ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নির্ধারিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। (৫ : সূরা আল মায়েদা : ৩) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে সুবিচারভিত্তিক একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। (৫৭ : সূরা আল হাদীদ : ২৫)। ইসলাম ন্যায়বিচার কায়েমের মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ক্ষমতার ভিত্তিতে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে।

ন্যায়বিচার বা সুবিচারের কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে আদল। ইংরেজিতে Justice, equilibrium. দুটি স্বতন্ত্র সত্যের সমন্বয়ে আদল গঠিত।

এক. মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা।

দুই. প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার অধিকার প্রদান করা।

কোন পক্ষপাতিত্ব না করে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেয়ার নাম আদল (সাধারণত আদল এর অর্থ করা হয় ইনসাফ করা। কিন্তু অনেক সময় ইনসাফ শব্দটি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে। ইনসাফ শব্দটি থেকে এ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, দু'ব্যক্তির মধ্যে তাদের অধিকার বর্ণিত হতে হবে অর্ধেক অর্ধেক বা সমান সমান ভিত্তিতে। এ ধারণা থেকেই আদল মানে ধরে নেয়া হয় সমবন্টন। অথচ সমবন্টন ব্যবস্থা স্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে আদলের দাবি হচ্ছে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য, সমান সমান নয়। কোন কোন দিক থেকে আদল সমাজের মানুষের মধ্যে অবশ্যই সমতা দাবি করে। যেমন– নাগরিক অধিকার। কিন্তু আবার কোন কোন দিক থেকে 'সমতা' আদলের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন– পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্ক এবং উন্নত ধরনের সেবা প্রদানকারী ও নিম্নমানের সেবা প্রদানকারীকে সমান সমান বেতন দেয়া। এজন্যই আল্লাহ পাকের নির্দেশ হচ্ছে অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা নয় বরং ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা, আদলের দাবি হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার

নৈতিক, সম্পর্কগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে যথাযথভাবে প্রদান করতে হবে।

সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাসমূহ পাওয়ার সমান অধিকারকে বুঝায়। অন্যকথায় সামাজিক ন্যায়বিচার হলো সমাজে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও জাতির প্রত্যেকেরই নিজ ন্যায়সঙ্গত চাহিদা পূরণের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকবে। তা করতে গিয়ে ব্যক্তি যেন অন্যের বা গোটা সমাজের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে সেজন্য ব্যক্তির উপর সমাজের বিভিন্ন সংস্থার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। যে কোন ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীর সদস্য হোক না কেন সমাজের প্রতিটি মানুষ জান- মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা লাভ, শিক্ষা ও কর্মলাভের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মতামত প্রকাশ ও ধর্ম পালনসহ যাবতীয় ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমান হবে। আইনের চোখে প্রতিটি মানুষ হবে সমান। সকলেরই সুবিচার লাভের সমান অধিকার থাকবে।

সামাজিক ন্যায়বিচারের এ সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক ধারণা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন–

১. সামাজিক ন্যায়বিচার লাভ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার।

২. সামাজিক সুবিচার লাভের জন্য সুবিচারভিত্তিক আইন অপরিহার্য।

৩. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক অসমতা ও অবিচারের উৎস ও উপাদানগুলো সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

৪. সামাজিক ন্যায়বিচার কেবল একটি ধারণা বা পরামর্শ বা উপদেশমূলক কর্মকাণ্ড নয় বরং প্রতিটি মানুষের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলাম 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক জীবনে সমতার ভিত্তিতে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' কর্মসূচীসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. জনগণের মৌলিক চাহিদার (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণ;

২. সমাজের স্বার্থে উৎপাদনের উপকরণসমূহের (ভূমি, শ্রম, পুঁজি, ইত্যাদি।)

সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি এবং নির্ধারিত আইন ও নীতি সমাজের উচু-নিচু, ধনী-গরীব, শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ;

৩. সম্পদের বন্টন ও পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সমাজের ধনী ও গরীবের ব্যবধান হ্রাস;

৪. দারিদ্র্য মোচন (কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে);

৫. রাষ্ট্রীয় সেবা ও সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ;

৬. সামাজিক আইন ও নীতি প্রণয়ন অর্থাৎ সমাজে কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা;

৭. নির্ধারিত আইন ও নীতি সমাজের উচু-নিচু, ধনী-গরীব, শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ;

৮. ন্যায়বিচারের কর্মসূচী অব্যাহত রাখার স্বার্থে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত না করা।

ইসলাম সমাজে 'ন্যায়বিচারের' কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে সৎ ও নিঃস্বার্থপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপর গুরত্ব আরোপ করেছে। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন : আত্তাবেয়ু মাল্লায়্যাসয়ালূকুম আজরাও ওয়াহুম মুহতাদু'ন, অর্থাৎ 'তোমরা অনুসরণ কর তাদেরকে যারা সৎ এবং যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না' (৩৬ : সূরা ইয়াসীন : ২১)। আর দেশব্যাপী 'ন্যায় বিচারের' কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য সরকারি আমলাব্যবস্থা বা সিভিল সার্ভিসে লোক নিয়োগের ভিত্তি হবে 'মেধা' (Merit) এবং মেধা যাচাইয়ের ভিত্তি হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও উন্নত নৈতিক চরিত্র, দায়িত্ববোধ এবং ন্যায়বিচারের কর্মসূচীর প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা (Commitment to Soial justice) (২৮ : সূরা আল কাসাস : ২৬)[১১]

---

১১. কুরআনুল কারীমে হযরত মূসা (আ)-কে চাকরিতে নিয়োগের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ। কর্মচারী হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত (২৮ : সূরা আল কাসাস : ২৬)। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে 'শক্তিশালী' শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্মদক্ষতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নত নৈতিক চরিত্র, দায়িত্ববোধ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা। দেখুন মুহাম্মদ সরফুদ্দীন 'Towards an Islamic Administrative theory' in the American Journal of Islamic social sciences, Vol-4, No 2, December 1987, পৃ. ২৩৪

সর্বশেষে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাজে ন্যায় বিচারের কর্মসূচী কার্যকর করার ব্যাপারে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য শাসক ও জনগণের জন্য পুরস্কারের অঙ্গীকার করা হয়েছে প্রভু আল্লাহর তরফ থেকে। (২ : সূরা আল বাকারা : ৮২; ১৮ : সূরা আল কাহ্ফ : ৩১-৩২)। আর যারা শাসক ও প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার করবেন, শেষ বিচারের দিনের কর্মমূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের জন্য জাহান্নামের অবমাননাকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে (৪ : সূরা আন নিসা : ১২৩; ৩৫ : সূরা আল ফাতির : ৩৬-৩৭)

১৭.১৩ আল হিসবাহ ও মুহ্তাসিব (Al Hisbah and Muhtasib)

হিসবাহ হচ্ছে সত্যকে উৎসাহিতকরণ ও মিথ্যাকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের উপর অর্পিত দায়িত্ব; বাজার ও অন্যান্য স্থানের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারি কার্যালয়। আবদুর রশিদ মতেন এর মতে হিসবাহ হচ্ছে, 'The duty of every Muslim to enjoin the good and forbid evil, office for the supervision of moral behaviour and of the markets.'

আর মুহতাসিব হচ্ছে 'হিসবাহ' এর দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা (The official in charge of the hisbah)

আল হিসবাহ ইসলামী রাষ্ট্রের এক অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অসাধুতা রোধ এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতা প্রতিরোধক এবং ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান তদারকি প্রতিষ্ঠানই আল হিসবাহ।

ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তি ও দেশের অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে। এর প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যেই ইসলামী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আল-হিসবাহর প্রতিষ্ঠা। আরবি শব্দ হিসবাহ-র ধাতুগত অর্থ গণনা। এ থেকে উৎপন্ন শব্দ ইহতাসাবার অর্থ কোন বিষয় বিবেচনায় আনা। ব্যবহারগত দিক থেকে হিসবাহর অর্থ এমন এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যার দায়িত্ব সৎ কাজে মানুষকে সহায়তা করা বা নির্দেশ দেওয়া (আমর বিল মারূফ) এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়া বা নিরস্ত করা (নেহী আনিল মুনকার)। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রের দায়িত্বই হচ্ছে এমন

ব্যবস্থার আয়োজন করা যার দ্বারা অপরিহার্যভাবেই সুনীতির (মারূফ) প্রতিষ্ঠা হবে এবং দুর্নীতির (মুনকার) উচ্ছেদ হবে।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর রাসূলে করীম (সা) প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় এই দায়িত্ব পালনের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নেন। বহু প্রসিদ্ধ হাদিস হতে দেখা যায়, তিনি নিজেই বাজার পরিদর্শন করেছেন, ব্যবসায়ীদের ওজনে কারচুপি ও দ্রব্যসামগ্রীতে ভেজাল দিতে নিষেধ করেছেন, মজুতদারীর (ইহতিকার) বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যখনই কাউকে জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত দেখেছেন তাকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করেছেন। পানির নহরের ব্যবস্থাপনা, খেজুর বাগানের তত্ত্বাবধান করেছেন। এজন্যেই ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে প্রথম মুহতাসিব (আল-হিসবার দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত ব্যক্তি) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেলে তিনি মদীনায় হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং মক্কায় হযরত সাঈদ বিন আল আস বিন আল আসকে (রা)-কে মুহতাসিব নিয়োগ করেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুহতাসিবের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয়। উমাইয়া-আব্বাসীয় আমলেও হিসবাহ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামী খিলাফতের বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মুসলিম এলাকায় নানা নামে মুহতাসিবের পদটি চালু ছিল। বাগদাদের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহের দায়িত্বশীলের পদবী ছিল মুহতাসিব, উত্তর আফ্রিকায় এটি ছিল সাহিব আল সুউক, তুরস্কে ছিল মুহতাসিব আগাজী এবং ভারতবর্ষে কোতোয়াল।

আল হিসবাহর আওতায় মুহতাসিবের দায়িত্ব কি কি সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া। তাঁর মতে, মুহতাসিবের কাজের মূলনীতি হবে আমর বিন মারূফ এবং নেহী আনিল মুনকারের যথাযথ প্রয়োগ। তার কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে :

১. দীনি আহকাম বাস্তবায়ন

২. জুয়া ও সুদের কারবার উচ্ছেদ

৩. দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

৪. মূল্য নিয়ন্ত্রণ

৫. ঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণ

৬. সম্পদের মালিকানার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

৭. জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার

৮. সরকারি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান

৯. পৌর সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান

১০. আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত এবং ব্যবসায়ীদের অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ প্রসঙ্গে মুহতাসিবের দশটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে 'আল হিসবাহ ফী আল ইসলাম' গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো। এ থেকেই বুঝা যাবে বাজার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল কত বিস্তৃত ও গভীর ছিল। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয়গুলো বর্তমানেও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচ্য। এ সবের মধ্যে রয়েছে :

১. ইসলামী শরীয়াহতে যা সুস্পষ্টভাবে হারাম তেমন কোন কিছুর উৎপাদন ভোগ ও বণ্টনের জন্যে রাষ্ট্র বা ব্যক্তির সহায়-সম্পদ কোনক্রমেই যেন ব্যবহৃত হতে না পারে তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা;

২. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

৩. সকল প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পন্ন হবে প্রকাশ্যে। কারণ গোপন লেনদেন শুধু সরবরাহের পরিমাণ ও সময়ই বিঘ্নিত করে না, স্বাভাবিক মূল্য স্তর প্রতিষ্ঠায়ও বাধা দেয়;

৪. ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে যেন আপোষে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস না করতে পারে; কারণ এতে ক্রেতা সাধারণ বা নতুন বিক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

৫. নতুন ব্যবসায়ীকে বাজারে প্রবেশ করতে তথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংঘ বা গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়া;

৬. শহুরে ব্যবসায়ীরা পথিমধ্যেই পল্লীর সরবরাহকারীর সাথে যেন মিলিত হতে না পারে, কারণ এর ফলে তারা ঐসব সরবরাহকারীকে শহরে বিদ্যমান মূল্য স্তর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে নেবে এবং শহরবাসীর কাছে তা চড়া মূল্যে বিক্রি করে প্রভূত মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবে;

৭. পল্লী অঞ্চলের সরবরাহকারীদের বাজারের সন্নিকটেই পণ্যসামগ্রী মজুত, বিশ্রাম ও অবস্থানের সুযোগ করে দেয়া যেন তারা নিজেরাই বাজারের

হাল-হাকীকত বুঝতে পারে এবং সুবিধামত সময়ে ও দরে তাদের পণ্য বিক্রয় করতে পারে;

৮. বেচাকেনার সকল পর্যায় হতে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল, বেপারী ও ফড়িয়া শ্রেণীর উৎখাত করা; কারণ এরাই পণ্যসামগ্রীর কোনো গুণবাচক পরিবর্তন না ঘটিয়েই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই মুনাফা লুটে নেয়, এরাই বাজরে সরবরাহ বিঘ্নিত করে। বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে এই শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ করতে হবে কঠোর হাতে;

৯. বাজার দখল বা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীকে ঘায়েলের উদ্দেশ্যে দ্রব্যসামগ্রীর ডামপিং প্রতিহত করা; এবং

১০. ব্যবসায়ী ও কারিগরদের পণ্যসামগ্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি বা খুঁত প্রকাশে বাধ্য করবেন। ক্রেতাদের সামনে যেন মিথ্যা শপথ নিতে না পারে সেই নিশ্চয়তা বিধানও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

১৭.১৪ দিওয়ান-ই-মাযালিম (Dewan-E-Majaleem)

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নির্বাহীদের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জনগণকে রক্ষা করা, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম-শোষণ দূরীকরণের জন্য জনগণের প্রতিরক্ষামূলক একটি প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল যার নাম দিওয়ান-ই-মাযালিম। মাযালিম ছিল জনগণের জন্য সর্বোচ্চ আপীল আদালত যা সাধারণত খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরিচালিত হত। অন্যায় ও পক্ষপাতিত্বমূলক রায়ের বিরুদ্ধে আপীল এ প্রতিষ্ঠানে করা যেত। আসলে দিওয়ান-ই-মাযালিম ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ফৌজদারী আপীল আদালত।

মহানবী (সা) সিপাহসালার খালিদ বিন ওয়ালিদের বিরুদ্ধে জুতমা গোত্রের উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১২] জনৈক বেদুইনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) গাসসান প্রদেশের গভর্ণর জাবাল ইবনে আল আইহাম ও জনৈক মিশরীয় নাগরিকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মিশরের গভর্ণর আমর ইবনে আল আসের পুত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।[১৩] হযরত আলী (রা) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ

---

১২. নাঈম নুসাইর, in the Islamic External critics of Public Administration : A comparative perspective, The American Journal of Islamic Social Sciences (July 1985).

১৩. পূর্বোক্ত

প্রশাসনিক চিঠিতে মিশরের গভর্ণর মালিক ইবনে হারিসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'অন্যান্য কাজের ফাঁকে কিছুটা সময় তুমি দরিদ্র ও মজলুমদের জন্য বরাদ্দ করে রাখ এবং তোমার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ শোনার ব্যবস্থা করো। এ শ্রুতির সময় আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি তাদের সাথে দয়া, সৌজন্য ও সম্মানের সাথে ব্যবহার কর। তোমার সরকার ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তারা যেন খোলাখুলিভাবে এবং নিঃসংকোচে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারে, তার স্বার্থে তোমার কর্মচারী, সৈনিক বা প্রহরীকে ঐসময়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে দিওনা। এটা (ন্যায়ানুগ ও ইনসাফভিত্তিক) প্রশাসনের জন্য অত্যাবশ্যক। আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, "ঐসব সরকার ও ব্যক্তির মুক্তি লাভ করবে না, যাদের কারণে দরিদ্র ও দুঃস্থদের অধিকার শক্তিমানদের হাত থেকে রক্ষিত হয় না। .....যখনই তুমি অনুভব করবে যে, তোমার রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি অতটা সচেতন বা আগ্রহী নয়, তখনই তুমি নিজেই এতে আপন মনোযোগ নিবদ্ধ করবে... তুমি কোনক্রমেই নিজেকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না।"[১৪]

উমাইয়া বংশের চতুর্থ শাসক আবদুল মালিকের শাসনামলে তিনি একটি দিবস নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন জনগণের অভিযোগ শ্রবনেণর জন্য সেটা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ) ও তাঁর পরবর্তী যুগে দীর্ঘকাল যাবত অনুসৃত হয়।

পরকর্তীকালে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী (২৬ : সূরা ইয়াসীন : ২১; ২৮ : সূরা আল কাসাস : ২৬) ন্যায়বান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে মাযালিম পদে অধিষ্ঠিত করা হত।[১৫] মাযালিমকে সহযোগিতা করার জন্য ছিল জনগণের অভিযোগ লিপিবদ্ধকারী করণিক ফকীহ (আইনের ব্যাখ্যাদানকারী) ও আইন প্রয়োগকারী যা অনেকাংশে আধুনিক মোবাইল কোর্টের (ম্যাজিস্ট্রেট) এর সাথে তুলনীয়। বিয়োবেন নেভীর মতে, মাযালিম যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফায়সালা করতেন সেসবের মধ্যে ছিল :

১. ইসলামী রাষ্ট্রের জনসাধারণের উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের নির্যাতনমূলক আচরণ;

---

১৪. হযরত আলী (রা) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি, মনজুর আহসান অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ২৩-২৪।

১৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য Muhammad Al-Buracy, Administrative Development : An Islamic Perspective (London : KPI (1985) পৃ. ২৫১-২৫৭।

২. জনসাধারণের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা অবিচার;

৩. সরকারি ভাতা প্রদানে অনিয়ম;

৪. অন্যায়ভাবে দখলীকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করার দাবি;

৫. সুষ্ঠুভাবে আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ এবং অন্যায়কার্য প্রতিরোধ;

৬. সংঘাতে লিপ্ত উভয় পক্ষের অভিযোগ শ্রবণ ও বিবাদের মীমাংসা এবং

৭. সুষ্ঠুভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালন ইত্যাদি।[১৬]

দিওয়ান-ই-মাযালিমের দায়িত্ব শুধু অভিযোগ শ্রবণ ও তদন্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিকারের রায় কার্যকর করার ক্ষমতাও এর ছিল। এটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, উপরোল্লিখিত বিষয়াদি ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ দায়েরের অপেক্ষা না করেই স্বীয় উদ্যোগে (Suo moto) তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। গ্রুনিবাউম (Grunebaum) তাই দিওয়ান-ই-মাযালিমকে 'মাযালিম কোর্ট' বলে অভিহিত করেছেন।[১৭] এ ছাড়াও মাযালিম খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তার কার্যকলাপ সম্পর্কিত নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করতেন।[১৮] ইসলামের ইতিহাসে এমন নজীরও রয়েছে, আব্বাসীয় শাসক হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক নিয়োগকৃত জাকের নামক একজন মাযালিম একদিনে প্রায় এক হাজার অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছিলেন।[১৯]

একবার আব্বাসীয় শাসক আল মামুনের উপস্থিতিতে, জনৈক বিধবা কর্তৃক আল মামুনের পুত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিচার অনুষ্ঠিত হয় এং এতে অভিযুক্তের উপর শাস্তিও কার্যকর করা হয়।[২০] কিন্তু কালক্রমে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসনের বদলে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা লাভের কারণে, জনস্বার্থ রক্ষাকারী মাযালিমের প্রতিষ্ঠানটি অবহেলিত হয়ে পড়ে।

---

১৬. Reuben Levy, The Social Structure of Islam (London; Cambridge University Press, 1979) পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।

১৭. Reuben Leveg, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।

১৮. E. Von-Grunebaum, Islam : Essays in the Nature and Growth of the Cultural Tradition, Second Edition (London, Routledge. 1969) পৃ. ১৩৩।

১৯. এস. এম. ইমাম উদ্দিন, আরব মুসলিম এডমিনিস্ট্রেশন (করাচী : এস. এম. খুরশীদ ঈমান, ১৯৭০) পৃ. ১৯১।

২০. এস. এ. কিউ. হুসেইনী, আরব এডমিনিস্ট্রেশন, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (লাহোর, শেখ মুহাম্মদ আশরাফ, ১৯৭০) পৃ. ১৯১।

১৭.১৫ অমবুডসম্যান / ন্যায়পাল (Ombudsman)

ইংরেজিতে Ombudsmanকে বাংলায় 'ন্যায়পাল' বা জনস্বার্থে সংবেদনশীল মহাপর্যবেক্ষক বলা হয়। অভিধানে 'ন্যায়' এবং 'পাল' শব্দ দুটির অর্থ পাওয়া যায়। 'ন্যায়' মানে যুক্তি, নীতি, সুবিচার, সত্য, সততা, তুল্য, সদৃশ ও মতো। 'ন্যায়' শব্দটির সঙ্গে সংযুক্ত শব্দের মধ্যে রয়েছে ন্যায়বাগীশ, ন্যায়বাদী, ন্যায়াধীশ ইত্যাদি। 'পাল' মানে রক্ষক, পালক, চাঁদোয়া, বায়ুভরে নৌকা চালাবার জন্য মাস্তুলে জড়িত বস্ত্রখণ্ড ইত্যাদি। কাজেই ন্যায়পাল শব্দটির মর্মার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বটে। সুইডিশ Ombud হতে Ombudsman শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের হয়ে কথা বলেন বা অন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। আধুনিক অর্থে, ন্যায়পাল হচ্ছে সরকার (আইন বিভাগ অথবা শাসন বিভাগ) কর্তৃক নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা যিনি প্রশাসনিক কর্মের বিরুদ্ধে জনগণের কাছ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালানা করেন এবং অভিযোগ সমর্থিত হলে এর সমাধান নির্দেশ করেন।[২১] এজন্য ন্যায়পালকে অনেক সময় প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা হতে নাগরিকদের প্রতিরক্ষাকারী (Citizens defender) হিসেবেও অভিহিত করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে আইন সভা বা শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত হলেও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ন্যায়পাল আইন সভা বা সরকার থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন।

ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার পটভূমি

প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা হতে নাগরিকদের জন্য প্রতিরক্ষামূলক অমবুডসম্যান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত হয় মহানবী (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের অভিযোগ তদন্ত করে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে রিপোর্ট প্রদানের জন্য দিওয়ান-ই-মাযালিম নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল। দিওয়ান-ই-মাযালিম ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রে জনস্বার্থে প্রতিরক্ষামূলক আর একটি প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল যাকে বলা হত আল হিসবা। হিসবার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বলা হত মুহতাসিব। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও সমাজ জীবনে বিদ্যমান দুর্নীতি প্রতিরোধই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। মুহতাসিব ও মাযালিম নিষ্ঠার

---

২১. Donald C. Rowat, 'The suitability of the Ombudsman plan for developing countries', in International Review of Administrative Sciences (1984) পৃ. ২০৭।

সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাগত নৈতিকতা ছাড়াও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্পর্কিত ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হতেন।[২২] মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয় ও উসমানীয় শাসনামলে এ দুটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রে সক্রিয় ছিল।

আধুনিক ন্যায়পালের সূত্রপাত

১৮০৯ সালে ইউরোপের সুইডেনে আধুনিক ন্যায়পালের সূত্রপাত ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে (১৭১৩ খৃ) সুইডেন রাশিয়ার সাথে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস উসমানীয় সালতানাতের রাজধানী ইস্তাম্বুলে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে সুইডেনে সরকারি কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করেন চ্যান্সেলর অব জাস্টিস (Chancellor of Justice (JK) নামক রাজার মনোনীত একজন প্রতিনিধি। দীর্ঘ বার বছরকাল তুরস্কে অবস্থানকালে উসমানীয় সালতানাতের বিভিন্ন স্থানে সে সময়ে সক্রিয় দিওয়ান-ই-মাযালিম (অভিযোগ তদন্তকারী) এবং আল হিসবা (বাজার পরিদর্শক) প্রতিষ্ঠান দু'টি রাজা চার্লসের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।[২৩] রাশিয়ার সাথে যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে রাজা দ্বাদশ চার্লস রাজ কর্মচারীদের আইন বিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রক্ষাকবচ হিসেবে, ইসলামী আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষা ব্যবস্থার আদলে Justice Ombudsman (JO) এবং ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য Consumer Ombudsman (KO) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন।[২৪] পরবর্তীকালে রাজা গাসটাভা (King Gustava) ১৮০৯ সালে সরকারি প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক সংসদীয় প্রতিষ্ঠানটির সুইডিশ নামকরণ করেন Ombudsman, যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ন্যায়পাল।

---

২২. কুরআনুল কারীমে মুমিনদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকবে যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের / সুকৃর্তির নির্দেশ দিবে এবং অসৎকর্মে (দুর্নীতি) নিষেধ করবে; এরাই হবে সফলকাম (৩ : সূরা আলে ইমরান : ১০৪, ১১০)।

২৩. D. R. Saxena, Ombudsman (Lokpal); Redress of Citizen's Grievances in India (New Delhi : Deep and Deep Publications 1987) পৃ. ৩৬।

২৪. D. R. Saxena পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২, ৪৯।

এভাবে ভিন্ন নামে হলেও ইসলামী লিগ্যাল সিস্টেম হতে সংগৃহীত জনস্বার্থ সংরক্ষণমূলক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাকে স্বদেশ এবং বিশ্বসমাজের কাছে তুলে ধরার জন্য সুইডেন অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। প্রায় একশত বছরব্যাপী সুইডেনে ন্যায়পালের সফল কর্ম অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, পরবর্তীকালে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অপরাপর দেশসমূহ যেমন– ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে যথাক্রমে ১৯১৯, ১৯৫৫ এবং ১৯৬২ সালে এই জনস্বার্থ সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করে। এতে উৎসাহী হয়ে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডই সর্বপ্রথম ১৯৬২ সালে 'সংসদীয় কমিশনার' (Parliamentary Commissioner) নামে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে যুক্তরাজ্যেও সরকারি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য সেবা-প্রশাসনের এই তিন ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে তিনজন Parliamentary Commissioners-Parliamentary Commissioner for Administration, Parliamentary Commissioner for Local Administration and Parliamentary Commissioner for Health Services নিয়োগ করা হয়। ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের অপরাপর উন্নত দেশসমূহ এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করে।

সরকারি প্রশাসনকে তার কার্যকলাপের জন্য আইন সভার নিকট জবাবদিহি করা এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিচার হতে নাগরিকদের প্রতিরক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে সাম্প্রতিককালে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এশিয়া তথা উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে ইসরাইলই সর্বপ্রথম সফলভাবে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান কার্যকর করে। অস্ট্রেলিয়াতে ১৯৭৩ সালে এই পদের সৃষ্টি করা হয়। প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে তাঞ্জানিয়া ১৯৬৬ সালে Permanent Commission of Enquiry প্রতিষ্ঠা করে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ন্যায়পালের অনুরূপ প্রকিউরেটর (Procurator) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয় যা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান (International Ombudsman Institute)-এর হিসাব মতে, ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিশ্বের ১৯টি উন্নত এবং ১১টি উন্নয়শীল দেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সর্বমোট ৮৮টি

২৫. দেখুন Ombudsman and other complain- Handling Systems Survey, Vol. XI, July 1, 1982, June 30, 1983, (Edmonton : International Ombudsman Institute), পৃ. ১১৩।

সাধারণ আইন বিভাগীয় ন্যায়পাল (Legislative Ombudsman) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৫] এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানের প্রসার এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য ১৯৭৮ সালে কানাডার অটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে International Ombudsman Institute (IOI) যার কার্যক্রম এশিয়া, আফ্রিকা, অ অস্ট্রেলিয়া ও প্যাসিফিক, ইউরোপ এবং ক্যারিয়ান দ্বীপপুঞ্জসহ উত্তর ও ল্যাটিন আমেরিকা-এই পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত। পাকিস্তানের অন্তবর্তীকালীন সংবিধান (১৯৭২) এবং ১৯৭৩ সালে প্রণীত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী, ১৯৮৩ সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশবলে Wafaqi Mohtasib নামে সে দেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিচারপতি সরদার মোহাম্মদ পাকিস্তানের প্রথম মুহতাসিব হিসেবে চার বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্তি লাভ করেন, যিনি তাঁর সময়কালে দেড় লক্ষাধিক অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টে পাঁচবার (১৯৬৮, ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৫ ও ১৯৮৯) ন্যায়পাল (লোকপাল) প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিল উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি কর্তৃক বিল নিরীক্ষাধীন থাকা অবস্থায় পার্লামেন্টের বিলুপ্তি ঘটায় আজ অবধি সে দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে সফল না হলেও ভারতের ১০টি রাজ্যে (অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, বিহার, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশ) লোকাযুক্ত নামে লোক প্রশাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে গণ অভিযোগ তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান কার্যরত রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও (৭৭ নং অনুচ্ছেদ) জাতীয় সংসদ কর্তৃক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আজ অবধি নাগরিক প্রতিরক্ষামূলক সংবিধানের উল্লিখিত ধারাটি কার্যকর হয়নি!

ন্যায়পালের প্রকারভেদ

ন্যায়পাল দু'ধরনের হতে পারে : 'আইন বিভাগীয় ন্যায়পাল' (Legislative Ombudsman) এবং 'শাসন বিভাগীয় ন্যায়পাল' (Executive Ombudsman)। আইনসভা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হলে সেই ন্যায়পালকে 'আইন বিভাগীয় ন্যায়পাল' বলা হয়। এ ধরনের ন্যায়পাল তাঁর কার্যকলাপের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, নিউজিল্যাণ্ডের ন্যায়পাল। অপরদিকে, যে সকল ন্যায়পাল শাসন বিভাগ (অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক) কর্তৃক নিয়োজিত হন এবং কার্যাবলীর জন্য শাসন বিভাগের নিকট দায়ী

থাকেন, তাঁদেরকে 'শাসন বিভাগীয় ন্যায়পাল' বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, নাইজেরিয়ার ন্যায়পাল।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে ন্যায়পালের প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক অবিচার থেকে নাগরিকদের রক্ষাব্যবস্থা (Citizen's defender) হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য নতুন কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আর এজন্যই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে প্রচলিত ন্যায়পালের প্রতি ক্রমেই উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর আগ্রহ বেড়ে চলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ন্যায়পালকে সফলভাবে গ্রহণ করেছে ইসরাইল, ঘানা, মৌরিতানিয়া, ফিজি। এক হিসেব মতে, ইসরাইলিদের মধ্যে প্রতি বিশ জনের মধ্যে গড়ে একজন প্রতি বছর ন্যায়পালের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে।[২৬] এ সকল অভিযোগ গ্রহণের একদিনের মধ্যেই প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। অধিকাংশ অভিযোগ দশ দিনে থেকে এক মাসের মধ্যে তদন্ত ও প্রতিকার করা হয়।[২৭]

১৭.১৬ মৌলবাদ (Fundamentalism)

মৌলবাদ এক কালকুট প্রবঞ্চ- বিষ। এই বিষ খ্রিস্ট জগতের হাজারো ডিনোমিনেশন বা ফেরকার মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত। আসমানী ইনজিল গ্রন্থের অসংখ্য পথে বিকৃতির প্রেক্ষাপটে ত্রিত্ববাদী নাসারা বা খ্রিস্টানদের বিকৃত ধর্ম টেকানোর উপায়স্বরূপ মৌলবাদের উদ্ভব ঘটেছে।[২৮] মৌলবাদের উৎপত্তি ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন প্রটেস্টান্টবাদ সম্পর্কে অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছিল যাদের লক্ষ্য ছিল আধুনিকতাবাদী ও উদারনৈতিকতাবাদী মতবাদসমূহকে প্রতিরোধ করা।

মৌলবাদ বা Fundamentalism কথাটি ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। মৌলবাদী বলে বুঝানো হতে থাকে

২৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Gerald Caiden, 'Ombudsman in Developing Democracies : Comment', in International Review of Administrative Sciences (1984), পৃ. ২২৩।

২৭. পূর্বোক্ত পৃ. ২২৪।

২৮. প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, মৌলবাদ নয় ইসলাম, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ ঢাকা, মে ২০০৫, পৃ. ৪।

একদল মার্কিন প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানকে– যারা বলেন, বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। মার্কিন কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীব-বিবর্তনবাদ সত্য বলে পড়ানো চলবে না।[২৯] খ্রিস্টিয় মৌলবাদ আন্দোলনের দু'জন নেতা ছিলেন। এরা হলেন উইলিয়াম জেনিংস ব্রেয়ন (William Gennings Brayan) এবং জন গ্রেসহ্যাম ম্যাকেন (John Gresham Machen)। ব্রেয়ন ছিলেন জীব বিবর্তনবাদের বিরোধী। আর ম্যাকেন মনে করতেন বাইবেলের কোন ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না। তাকে মেনে চলতে হবে আক্ষরিকভাবে।

সুবিখ্যাত ওয়েবস্টারস নিউ ওয়ার্ল্ড ডিকশনারীর ভাষ্য মতে ফাণ্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদের সংজ্ঞা বলা হয়েছে 1. Religious beliefs based on a literal interpretation of everything in the Bible and regarded as fundamental to christian faith and morals. 2. The twentieth century movement among some American protestants based on this belief. অর্থাৎ, ১. মৌলবাদ বলতে খ্রিস্টানদের বাইবেলে প্রদত্ত যাবতীয় বিষয়াদির আক্ষরিকভাবে গ্রহণকেই বুঝায়। ২. মৌলবাদ বিশ শতকের একটি আন্দোলন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের একাংশের গোঁড়া বিশ্বাসমালার আন্দোলন।

দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতে, 'মৌলবাদ প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের একটি গোড়া ধর্মীয় বিশ্বাস।'

দি ম্যাকমিলান ফ্যামিলি এনসাইক্লোপেডিয়ার ১৯৮৩ সালের সংস্করণের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় পল মেরিয়েট ব্যাসেট মৌলবাদের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'ফাণ্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ হচ্ছে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এমন একটি ধারণা যার অর্থ হচ্ছে খ্রিস্টিয় মতবাদে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া। এটা বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যা নির্ভর। আন্তঃউপদলীয় বা ফেরকা বিভক্ত খ্রিস্টিয় প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন যা উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়, তা থেকে এটা উদ্ভূত। এই মৌলবাদ খ্রিস্টিয় ধর্ম মতবাদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও দর্শনের সমঝোতার বিরোধী। খ্রিস্টিয় মৌবাদীদের নিজেদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তারা বাইবেলের অভ্রান্ত হওয়া, যীশুর কুমারী মাতার গর্ভে জন্মলাভ এবং তাঁর গড বা উপাস্য হওয়া, পাপ মোচনে তার মৃত্যু,

---

২৯. ড. এবনে গোলাম সামাদ, ইসলামী মৌলবাদের নামে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির পশ্চিমা কৌশল এবং আজকের বাস্তবতা (প্রবন্ধ) পৃ. ১।

তাঁর কবর থেকে উঠে আসা– এসবে বিশ্বাসী। ১৮৭৮ সালে নায়েগ্রা বাইবেল কনফারেন্সে ঘোষিত ১৪ দফা মৌল নীতিমালায় এসব কথা বলা হয়েছিল এবং ১৯১০ সালে প্রেসবাইটারিয়ান জেনারেল এসেমব্লীর ৫ দফা ঘোষণায় খ্রিস্টিয় মৌলবাদী ধারণা ব্যক্ত হয়। ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ ও আমেরিকান খ্রিস্টিয় মৌলবাদী পণ্ডিত ও পাদ্রী প্রচারকরা ১২ অক্ষর বিশিষ্ট ফাণ্ডামেন্টালস (এফ. ইউ. এন. ডি এ. এম. ই, এন. টি. এ. এল, এস) এর সাথে সংগতি রেখে ১২ খণ্ডের একটি মৌলবাদী রচনা সমগ্র প্রকাশ করে। এই খণ্ডগুলোর তিন মিলিয়ন বা ত্রিশ লাখ কপি প্রকাশ করা হয়। ১৯১৯ সালে ওয়ার্ল্ড ক্রিশ্চিয়ান ফাণ্ডামেন্টালস এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯২০ এর দশকে খ্রিস্টিয় মৌলবাদ সুস্পষ্ট পরিচিতি লাভ করে। এই বছরগুলোতে এ. টি. পিয়ারসন, এ. জে. গার্ডেন, সে. আই. স্কোফিল্ড, এ. সি. ডিক্সন, রিউবেন টোরে, উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, জে. গ্রেশাম ম্যাকেন প্রমুখ খ্রিস্টিয় মৌলবাদের নেতৃত্ব দেন।

দি এনসাইক্লোপেডিয়া এ্যামরিয়কানের মতে, মৌলবাদ হচ্ছে একটি জঙ্গী রক্ষণশীল প্রটেস্টান্ট আন্দোলন যেটা ১৯২০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত হয়ে উঠে।

দি নিউ ইলাসট্রেটেড কলাম্বিয়া এনসাইক্লোপেডিয়ার ২৫৭২ নম্বর পৃষ্ঠায় ফাণ্ডামেন্টালিজমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মৌলবাদ হচ্ছে একটি ধর্মীয় আন্দোলন যেটা বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রটেস্ট্যান্টদের বিভিন্ন ডিনোমিনেশনের রক্ষণশীল সদস্যের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। বাইবেলের গতানুগতিক ব্যাখ্যা ও খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের মৌল তত্ত্বসমূহের উপর শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাই মৌলবাদের প্রণোদনা।

ব্রুস লরেন্স মৌলবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, মৌলবাদ হচ্ছে এমন এক ধরনের আদর্শবাদী ফরমেশন যা আধুনিকতার পরিপন্থী এবং তার সমস্ত শক্তি আধুনিকতার সকল লক্ষ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। এটি বুদ্ধিবৃত্তি বিরোধী, আধুনিকতার পরিপন্থী এবং শ্রেণী বা প্রজন্মের যুদ্ধ। (Fundamentalism is a kind of ideological formation, affirming the modern world not only by opposing it but also by using its means against its purposes. It is a anti-Intellectual, anti modernist and a class or generational struggle.)

প্রটেসস্টান্ট মৌলবাদের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হচ্ছে–

১. ঐশী বাণীর অভ্রান্ততা Inerrancy of scripture

২. কুমারী মাতার গর্ভে যীশুর জন্ম The virgin birth of christ

৩. পরিবর্তক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা Substitutionary atonement

৪. যীশুর শারীরিক পুনরুত্থান The bodily resurrection of christ

৫. অলৌকিক ঘটনার সত্যতা The authenticity of miracles.[30]

১৯২০ সালের প্রোটেসস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা এক ধরনের অপশক্তিতে পরিণত হয়, যখন তারা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারণা শুরু করে। তীব্র প্রচারণা যুদ্ধে তারা বিজয়ী হতে না পেরে একটি সাংস্কৃতিক উপসম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং পরবর্তিতে 'মরাল মেজরিটি' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

উৎসের দিক থেকে প্রোটেসস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও মৌলবাদ পরিভাষাটি ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন এবং অমুসলিমদের অনুরূপ আন্দোলন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মতলববাজ বুদ্ধিজীবীরা ব্যবহার করে থাকে। ব্রুস লরেন্স প্রদত্ত নতুন সংজ্ঞা অনুসারে মৌলবাদ হচ্ছে এমন এক ধরনের আদর্শবাদী সংগঠন বা আন্দোলন যা আধুনিকতার পরিপন্থী এবং তার সমস্ত শক্তি আধুনিকতার সকল লক্ষ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।' এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধুনিকত্ব পরিপন্থী ও বিরুদ্ধবাদী। সে হিসেবে সমস্ত আধুনিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী। (Fundamentalism is a kind of ideological formation, affirming the modern world not only by opposing it but also by using its means against its purposes.' It is anti-intellectual, anti-modernist and a class or generational struggle.)[৩১] লক্ষ্য করা উচিত যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে আহরহ মৌলবাদী হিসেবে অভিহিত করা হয় তারা সহিংস পদ্ধতি বা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না বরং নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সংবিধানিক উপয়ে– তা করতে চায়। পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়ামী ও মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে অহরহই মৌলবাদ হিসেবে

---

৩০. জর্জ মার্সডেন, ফাণ্ডামেন্টালিজম এণ্ড আমেরিকান কালচার, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৮২, পৃ. ১১।

৩১. ব্রুস বি লরেন্স, , বারবারা ফ্রেয়ার সম্পাদিত, দি ইসলামিক ইমপালস, ক্রুস হেম, লন্ডন ১৯৮৭, পৃ. ৩১, ৩২।

চালিয়ে দেয়া হয়– এ অপ-মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রচারণাকারীদের আসল চরিত্রই ধরা পড়ে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ফাণ্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ খ্রিস্টানদের মধ্যে উদ্ভূত, তাদের সৃষ্ট, তাদের ধর্মীয় আন্দোলনের ব্যাপার এবং তাদেরই দাবী ও সমস্যার বিষয়। এর সঙ্গে ইসলামের ও মুসলিমদের সামান্যতম যোগ নেই, থাকতেও পারে না। কিন্তু বর্তমানে মৌলবাদ শব্দটাকে ইসলামের সঙ্গেও যুক্ত করার অপচেষ্টা চলছে। এটি অত্যন্ত নোংরা ষড়যন্ত্র। মৌলবাদ বাস্তবেই ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টিয় বিষয়, বিভীষণ, বিষ। অথচ মৌলবাদ কথাটি এখন পাশ্চাত্য ও তাদের অনুসারীরা প্রয়োগ করছে অনেক প্রসারিত করে। সামগ্রিকভাবে ইসলামকে যেন এখন চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরোধী এক মৌলবাদ হিসেবে। মৌলবাদ শব্দের এ অপপ্রয়োগকে মুসলমানরা মেনে নিতে পারে না। কারণ এর মধ্যে থাকছে সামগ্রীকভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে হেয় করার চেষ্টা। আর এতে করা হচ্ছে ইতিহাসের বিকৃতি।

অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতদের বিবেচনায় মৌলবাদ পরিভাষাটি খ্রিস্টান প্রেক্ষিতে আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ইসলামের প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী লেখকগণ ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনসমূহকে ভুলক্রমে মৌলবাদ বলে অভিহিত করছেন এবং ইসলামী আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বুঝতে পেরে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছেন।

১৭.১৭ ফতোয়া (Fatwa)

ফতোয়া কুরআন মাজীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। কুরআন শরীফের সূরা আন নিসা, সূরা ইউসুফসহ একাধিক সূরায় ফতোয়া শব্দ রয়েছে। ফতোয়া অর্থ মতামত পেশ করা, সিদ্ধান্ত দেয়া। ফতোয়া শব্দটি 'ফাতা' থেকে উদ্ভূত। 'ফাতা' অর্থ যৌবন, নতুনত্ব, সরলীকরণ বা ব্যাখ্যা। এ সকল অর্থ ফতোয়ার বিভিন্ন সংজ্ঞায় দেখা যায়।

ফতোয়ার সহজ সরল অর্থ হলো কুরআন-হাদীসের পথ নির্দেশ অনুসারে ব্যবহারিক জীবনে উদ্ভূত সমস্যাদির ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত। ফতোয়া মুসলমানদের জীবনের সকল দিক বিভাগে নির্দেশনা প্রদানকারী বিষয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নেয়াই ফতোয়া। কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণ যখন কোন সমস্যার সমাধান পেশ করেন তার নাম ফতোয়া। অন্যকথায় কুরআন ও হাদীসের মতামত ব্যক্ত করার নামই

ফতোয়া। ড. আবদুর রশিদ মতেনের মতে কোন আইনগত বিষয়ের উপর কোন আইন বিশারদ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতই ফতোয়া। (Fatwa is a legal opinion of a Jurist in a point of law or legal problem.) ফতোয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ফতোয়া হচ্ছে আলেমদের আইনানুগ মতামত যা বাধ্যতামূলক নয়। আসলে এটিই সত্যি এবং এটাকেই একটা সাধারণ সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য এটা আদালতের রায় বা সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক। রায় হচ্ছে আদালতের সিদ্ধান্ত যা বাধ্যতামূলক, তবে তা উচ্চতর আদালতে আপীলযোগ্য। অথচ ফতোয়া শুধু আইনানুগ মতামত। অবাধ্যতামূলক 'ফতোয়া' কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত ব্যাপারে মেনে চলতে পারে, এমনকি তা সামাজিক ব্যাপারেও মানা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা জোর করে চাপানো হয় অথবা তা রাষ্ট্রীয় আইনের (Public Law) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ফতোয়ার দ্বারা কোন শাস্তি দেয়া যায় না। শাস্তি কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত দিতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে এই নজির নেই যে, কোন আলেম কাউকে শাস্তি দিয়েছেন বরং শরীয়া আদালতই এরূপ শাস্তি বিধান করেছে।

ফতোয়া গোটা মানবজাতির মুক্তির সনদ। ইসলামের করণীয় বর্জনীয় সব ফতোয়ার মাধ্যমে এসেছে। ফতোয়া কারো মস্তিষ্ক প্রসূত বা কল্পিত কোন মনগড়া বস্তু নয়; এটি আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত বা Divine guidence যা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। ফতোয়া মানুষকে নির্যাতনের জন্য নয়, ফতোয়া হচ্ছে মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের নাম। যে ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করেন তিনি মুফতি নামে অভিহিত। (The person who gives a fatwa is a Mufti)

ফতোয়ার ধারণা
Concept of Fatwa

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ফতোয়া দিয়েছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। এরপর মহানবী (সা) ও তারপর সাহাবায়ে কেরামগণ ফতোয়া দেন। কুরআনে ফতোয়ার উল্লেখ দেখা যায় দু'ভাবে।

প্রথমত কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উত্তর চাওয়া।

দ্বিতীয়ত সুনির্দিষ্ট জবাব দান। (৪ : সূরা আন নিসা : ১২৭ ও ১৭৬)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কাঠামোতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ফতোয়ার ধারণার উন্মেষ ঘটে। তখন এর বিষয় ছিল জ্ঞান।

পরবর্তীতে 'জ্ঞান' যখন হাদীসের সাথে যুক্ত হয় তখন ফতোয়া রায় ও ফিকাহ্ বা আইন শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হয়। ফলে ফতোয়া শব্দটির কৌশলগত ব্যবহার আরও অধিকতর পরিশীলিত হয়।

বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্বের কার্যকারিতার প্রেক্ষাপটে ফতোয়া এবং আদালতের রায় এক নয়। ফতোয়ার আওতা আদালতের রায়ের চেয়ে প্রশস্ততর। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আওতাভুক্ত 'ইবাদত' বা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদালতের আওতা বহির্ভূত যদিও এগুলো ইসলামী আইনের অপরিহার্য অংশ এবং আইনশাস্ত্রে ও ফতোয়ায় এটা উল্লেখযোগ্যভাবে উদ্ধৃত হয়। আরও উল্লেখযোগ্য ফতোয়া কারও উপর বাধ্যতামূলক নয়, যদিও আদালতের রায় বাধ্যতামূলক এবং আইনানুগ কার্যকরী।

পূর্বে ফতোয়া বিচার পদ্ধতির বহির্ভূতভাবেও কাজ করতো যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কোর্টের সাথে মুফতীদের সংযুক্ত করা হতো। মুসলিম স্পেনে আদালতের উপদেষ্টা হিসেবে মুফতীগণ কাজ করতেন।

আধুনিক পণ্ডিতবর্গও ফতোয়াকে সচরাচর ইসলামী পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক আইনানুগ মতামত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য তাদের ভূমিকা উপদেশমূলক এবং তা স্ব স্ব দেশের ধর্মীয় মন্ত্রণালয়ের অংশ, বিচার মন্ত্রণালয়ের নয়।

ফতোয়া প্রদানের পদ্ধতি ও ফতোয়ার কাজ (Process and Functions of Fatwa) ফতোয়া সাধারণত একজন মুফতী প্রশ্নকারী কোন ব্যক্তিকে উত্তর আকারে দিয়ে থাকেন। ফতোয়া এমন একটি ইসলামী পদ্ধতি যা সকল কালে এবং সকল স্থানে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফতোয়াকে রোমান আমলের আইন পরামর্শদাতাদের (Juris consuls) মতামতের (Legal opinion) সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোর্টের রায় এবং ফতোয়া ভিন্ন ধরনের (Different category)। কোর্টের রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু ফতোয়া পরামর্শদানের পর্যায়ের (Advisory), মুফতীরা ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেন কিন্তু কোর্ট সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে রায় প্রণয়ন করে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারক এবং মুফতী নিজস্ব পদ্ধতিতে শরীয়ার বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। যেখানে কোর্ট প্রধানত সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে বিচার করে সেখানে মুফতী কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য প্রমাণ দেখে ফতোয়া প্রদান করেন। ফতোয়া মৌখিকভবে দেয়া যায়। অসংখ্য ফতোয়া রয়েছে বিভিন্ন ফতোয়ার গ্রন্থে। যেমন– ফতোয়া-

ই-আলমগিরি[৩১], ফতোয়া-ই-রশিদিয়া[৩২], ইমাদুল ফতোয়া[৩৩] প্রভৃতি। এ ছাড়া বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্কাইভে (Archive) ফতোয়া সংরক্ষিত আছে। ফতোয়া হ্যাঁ বা না আকার প্রশ্নের উত্তরে, এক শব্দে হতে পারে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা পুস্তিকার আকার ধারণ করতে পারে।

ফতোয়ার সামগ্রিক তাৎপর্য দু'ধরনের। যেমন-

প্রথমত ফতোয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত বিষয়ে খ্যাতনামা ফিকাহবিদগণ (Jurist) তাদের আনুষ্ঠানিক (Formal) মতামত দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত অন্যদিকে অসংখ্য অন্যান্য ফতোয়ার মাধ্যমে মুসলিম জনগণ তাদের জীবনকে শরীয়াতের আলোকে সাজিয়ে নিয়েছেন।[৩৪]

ফতোয়ার আধুনিক রীতি

Modern Usage of Fatwa

আধুনিক মুসলিম বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে থাকে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (O I C) এর ফিকহ একাডেমী, সৌদি আরবের স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান দারুল ইফতা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। উত্তর আমেরিকার মুসলিমদের রয়েছে নর্থ আমেরিকান ফিকাহ কাউন্সিল।

ফতোয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট। যেহেতু প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ইসলামী বিধি-বিধান জানা ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য। তাই এ বিষয়ে জানার জন্য কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে প্রশ্ন করা বা মতামত চাওয়াও ফরযের অঙ্গ। আর আলেমদের জন্য কেউ দীন ও শরীয়াহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তা জানানো ফরয। দীন ও শরীয়াহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা) দিয়েছেন। কোন আলেমের কাছে শরীয়াহ্ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে সে বিষয়ে তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নকারীকে অবহিত না করলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে বলে মহানবী (সা) বলেছেন। তাই শরীয়াহ বিষয়ে আলেমদের প্রশ্ন করা আলেমদের

৩১. ফতোয়া-ই-আলমগিরি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ৩০০ আলেম সংকলন করেন।
৩২. দেওবন্দের একজন বিখ্যাত আলেমের লেখা।
৩৩. ইমদাদুল ফতোয়া- মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) লিখেছেন।
৩৪. শাহ আবদুল হান্নান, দেশ সমাজ রাজনীতি, কামিয়াব প্রকাশন, মার্চ ২০০৩ পৃ. ৭৭-৮০।

পক্ষ থেকে সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা বা ফতোয়া প্রদান করা ইসলামী শরীয়াতের অপরিহার্য অঙ্গ। আর এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের আমল এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বকালের আলেমদের ভূমিকা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

১৭.১৮ উম্মাহ (Ummah)

উম্মাহ কুরআন মাজীদের একটি অন্যন্য সাধারণ পরিভাষা। কুরআনে উম্মাহ শব্দটি মোট ৬৫ বার এসেছে। একবচনে ৫২ বার এবং বহুবচনে ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিমা ভাষায় এর কোন প্রতিশব্দ নেই। অভিধানে উম্মাহ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়- জননী, গোষ্ঠী, লোকসমষ্টি, দল, একই ঐতিহ্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী, একই অঞ্চলের অধিবাসী, সম্প্রদায় ইত্যাদি।[৩৫] গোষ্ঠী ও জাতি অর্থে কুরআনে উম্মাহ শব্দটি ব্যাপক ব্যাপ্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই কিংবা ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোন পাখি নেই যারা তোমাদের মতো উম্মত নয়।[৩৬] ভাষা, বর্ণ, জাতিসত্তা, গোত্র নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন আদর্শ, ধর্ম, আইন, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সুসমন্বিত, সংঘবদ্ধ জাতি।

আল কুরআনে উম্মাহ শব্দটি সাতভাবে বিশেষিত হয়েছে। যেমন-

১. উম্মতে মুসলিমা Ummah Muslimah

জাতিসত্তা, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে ঈমানদারদের দল বা গোষ্ঠী (Community of faithfuls, the Muslim Community irrespective of race, ethnicity and so on)। কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে পরওয়ারদিগার। আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মাহ সৃষ্টি কর। (২ : সূরা আল বাকারা : ১২৮)

২. উম্মাহ ওয়াহিদা Ummah Wahidah

একক সম্প্রদায়, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে একটি মাত্র সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (A single community. The Quran in many verse refers to the entire human race as a single community)। কুরআন বলছে, সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাহ-জাতি। আল্লাহ নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন।

---

৩৫. আল ওয়াসীত ১/২৭।

৩৬. ৬ : সূরা আল আনয়াম : ৩৮।

মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তা মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন। (২ : সূরা আল বাকারা : ২১৩)

আর সমস্ত মানুষ একই উম্মাহভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। (১০ : সূরা ইউনুস : ১৯) (৫ : ৪৮; ১১ : ১১৮; ১৬ : ৯৩; ২১ : ৯২; ২৩ : ৫২; ৪২ : ৮; ৪৩ : ৩৩ আয়াতেও উম্মাহ ওয়াহিদা প্রসঙ্গ এসেছে।)

৩. উম্মাহ্ ওয়াসাত Ummah Wasat

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী উম্মাহ বা জাতি। আল্লাহ্ বলেন, 'এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মাহ্-জাতিরূপে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল (সা) তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (২ : সূরা আল বাকারা : ১৪৩)

৪. খায়র উম্মাহ Khair Ummah

কুরআন বলছে, তোমরাই হলে সেই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, মানুষের জন্য তোমাদের আবির্ভাব তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিতে থাক, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর ঈমান রাখ। (৩ : সূরা আলে ইমরান : ১১০)

৫. উম্মাহ্ মুকতাসিদা Ummah Muktasida

'তারা যদি তাওরাত, ইনজীল ও তাদের প্রতিপালকদের নিকট হতে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করত, তাহলে তারা রিযিক পেত মাথার উপর (আসমান) হতে ও তাদের পায়ের নিচ (জমীন) হতে, তাদের মধ্যে অবশ্য একদল (ন্যায়) ও মধ্যপন্থী লোক রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট'। (৫ : সূরা আল মায়িদা : ৬৬)

৬. উম্মাহ্ কায়িমা Ummah Qaima

'তারা সকলে এক রকম নহে। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে; তারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদাহ করে।' (৩ : সূরা আলে ইমরান : ১১৩)

৭. উম্মাহ্ কানিতা Ummah Qunita

'ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত, (এক জাতির প্রতীক ছিলেন) আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং তিনি ছিলেন না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।' (১৬ : সূরা আন নাহল : ১২০)

হাদীসেও উম্মাহ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মহানবী (সা) তাঁর অনুসারীদের উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই নব উত্থিত সমাজের ঐক্য

ও সংহতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ড. হামিদুল্লাহর মতে, উম্মাহ্ ধারণাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে মদীনার লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদে' শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমে।[৩৭] উম্মাহ্ সে দলকে বলা হয়, যারা একটি সর্বসম্মত বিষয়ে বা উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। যেসব লোকের মধ্যে কোন অভিন্ন মৌলিক বিষয় থাকে, তাদেরকে উক্ত মৌলিক বিষয়ের বিচারেই 'উম্মাহ' বলা হয। মুসলমানদেরকে যে অভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে উম্মাহ্ বলা হয়েছে তা বংশ, ভৌগোলিক বাসভূমি বা অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে নয় বরং তা হচ্ছে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও তাদের দলের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে।

ড. আবদুল রশিদ মতেনের মতে, উম্মাহ্ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যত মুসলমান বাস করে তাদের সমন্বয়ে এবং ইসলামী দর্শন ও চেতনার ঐক্যবন্ধনে গঠিত একটি সামগ্রিক ধারণা। স্থানকালের পরিসীমা অতিক্রম করে ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের সামগ্রিক মানবগোষ্ঠী হচ্ছে উম্মাহ্, যার লক্ষ্য ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। (Ummah is a universal order enclosing the entire collectivity of Muslims inhabiting the globe, united by the bond of one strong and comprehensive ideology of Islam. It is indispensible for the actualisation of the divine will in space time and for the achievement of happiness in this world and salvation in the hereafter)

উম্মাহর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন ১. উম্মাহর ধারণা উম্মাহর প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে ২. শরীয়াহ্কে বৈধতার চূড়ান্ত উৎস বলে মনে করে, ৩. আল্লাহ্ পাকের একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ধারণা তাওহীদের ভিত্তিতে গঠিত, ৪. সকল কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত বিলুপ্ত করে, ৫. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে, ৬. সমস্ত বিশ্ব মুসলিমকে একই উম্মাহে পরিণত করে।

তাওহীদের ভিত্তিতে সংস্থাপিত মুসলিম উম্মাহ্ সার্বজনীন, সর্বব্যাপ্ত ও সুসংগঠিতভাবে সমন্বিত।

১৭.১৯ মিল্লাত (Millat)

মিল্লাত (مِلَّة) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ দীন, শরীয়াহ্, জীবন ব্যবস্থা, জাতি ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে মিল্লাত শব্দটি دِيْن বা জীবন ব্যবস্থা ও জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে :

---

৩৭. ড. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ, The First Written Constitution in the World (লাহোর, আশরাফ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৫), ঐ

ইউসুফ বললেন–...আমি স্বীয় পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাত (ধর্ম) অনুসরণ করেছি। (১২ : সূরা ইউসুফ : ৩৮)

তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও। (২২ : সূরা আল হাজ্জ : ৭৮) যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে, সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করে– যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? (৪ : সূরা আন নিসা : ১২৬)

হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন মুসলিম এবং তার দীন ছিল ইসলাম। এই দীনের উপর নিষ্ঠার সাথে টিকে থাকার কারণে তাঁকে 'হানিফ' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। কুরআনে মাজীদ মিল্লাতে ইবরাহীমকে সর্বোৎকৃষ্ট দীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই ইসলামই ছিল সকল নবীর দীন এবং সকল নবী রাসূল এই দীনের অনুসরণেই তাকিদ দিয়েছেন। মহানবী (সা) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর এবং ইবরাহীমী মিল্লাতের অনুসারী তথা চিরন্তন শাসত তাওহীদবাদী ইসলামের শেষ নবী। বস্তুত কুরআনে ইসলামকে মিল্লাতে ইবরাহীম বলা হয়েছে।

মিল্লাত শব্দটি কখনও রাষ্ট্র অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে– 'ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পর যমজ ভাই'। মিল্লাত বলতে কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী ও জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়।

তবে মিল্লাত শব্দটি জাতি অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়। ইসলামী মিল্লাত ও প্রচলিত জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত জাতীয়তাবাদ বংশ, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। ইসলামী জাতীয়তা গড়ে উঠে ইসলামের ভিত্তিতে। তাওহীদী বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামী জাতীয়তার মর্মকথা। এই ইসলামী জাতিকেই কুরআন মাজীদে 'মুসলিম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেসব লোকই মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত, যারা বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের লোক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর দীনকে জীবনে ও জমীনে প্রতিষ্ঠা করাকে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছে, তারা যে বর্ণের, যে অঞ্চলের ও যে ভাষাভাষী লোকই হোক না কেন। কেননা ইসলাম বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য করে না, জাতি গঠন করে না। এগুলোতো স্বাভাবিক ব্যাপার। এর সাথে মানুষের নিজের ইচ্ছা ও মতের কোন সম্পর্ক নেই। কারুর ইচ্ছাধীন নয় এসব ব্যাপার। ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র তো আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে :

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র ও বিভিন্নতা আল্লাহর নিদর্শন। এর মধ্যে বিশ্ববাসীর জন্যে চিন্তার বিষয় রয়েছে। (৩০ : সূরা আর রূম : ২২) কাজেই এ ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা ও এই পার্থক্যের ভিত্তিতে জাতি গঠন করার মতো বড় জুলুম আর কিছু হতে পারে না। ইসলাম বংশ-গোত্র-বর্ণ-ভাষা ও ভৌগোলিক সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসা লোকদের নিয়ে এক নবতর আদর্শভিত্তিক জাতি বা মিল্লাত গঠন করেছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, সবাই একই উৎস থেকে উৎসারিত। এখানে কেউ কারো চেয়ে বড় নয়। ইসলামী মিল্লাতের ভিত্তি হল মহান আল্লাহ মনোনীত দীন ইসলাম। ইসলাম পৃথিবীর সকল মানুষের গ্রহণীয় আদর্শ। বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ। গোত্র-বর্ণ-ভাষা-পেশা-অঞ্চল নির্বিশেষে পৃথিবীর যে মানুষ তা গ্রহণ করে 'ইসলামী মিল্লাতের' অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১৭.২০ কাওমিয়াত – জাতীয়তাবাদ (Qaomiat - Nationalism)

কাওমিয়াত মানে জাতীয়তাবাদ।

বর্তমান সময়ে জাতীয়তাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদকে আধুনিক বিশ্বের রাজনীতির একটি প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। লয়েড (C. Lioyd) মন্তব্য করেছেন, 'Nationalism is the religion of the modern world.' জাতীয়তাবাদ একটি ভাবগত বা মানসিক ধারণা বিশেষ। জাতীয়তাবাদ হল জনসমাজের মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ বা স্বাতন্ত্রবোধ। কোন জনসমাজ যখন ভাবগত ঐক্যবোধের ভিত্তিতে একাত্ম হয় এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। সুতরাং জাতীয়তাবোধের দুটি মূল বৈশিষ্ট্য বর্তমান : ১. নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ এবং ২. বিশ্বের অন্যান্য জনসমাজ থেকে স্বাতন্ত্রবোধ।

ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যানস কোঁন (Hans Kohn) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ The ideas of Nationalism নামক গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক প্রকার মানসিক অবস্থা যা অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত এবং যা সমগ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে, এটা জাতীয় রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ রাজনৈতিক সংগঠন এবং জাতীয়তাকে সকল সৃজনশীল গোষ্ঠীগত এবং অর্থনৈতিক কল্যাণের উৎস মনে করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জে. এইচ.

হ্যাইস (J. H. Hayes) বলেন, জাতীয়তাবাদ জাতীয়তা এবং দেশ প্রেম এ দুটি আধুনিক অনাসক্ত বিষয়ের এক আবেগপূর্ণ সমন্বয় ও অতিরঞ্জিতকরণ। (Nationalism consists of modern emotional fusion and exaggeration of two very cold phenomena nationality and patriotism)

প্রফেসর হ্যারল্ড জে. লাস্কি (Harold J. Lasky) বলেন, জাতীয়তাবাদ সাধারণত এক প্রকার মানসিক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ এবং এ ঐক্যবোধ উক্ত জনসমাজকে বাকি জনসমাজ হতে পৃথক করে।

জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক প্রবৃত্তি এবং ভাবপ্রবণতা (Sentiment)। জাতীয়তাবাদ মূলত জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠে।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিপরীতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জাতীয়তাবাদের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বে জাতীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতীয়তাবাদের সমর্থনসূচক নানা রকম যুক্তি আছে। তবুও বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাবিদ জাতীয়তাবাদের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। অনেকের মতে জাতীয়তাবাদ মানব সভ্যতা ও বিশ্বশান্তির শত্রুস্বরূপ। জাতীয়তাবাদকে অগণতান্ত্রিক, বিশ্বশান্তির বিরোধী, অন্যায়ের উৎস, সভ্যতার সংকট তৈরীকারী, সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী, সাম্রাজ্যবাদের আশঙ্কা প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। সংকীর্ণ বা উগ্র জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়ে মানব সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করে।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আদর্শ বলে জাতীয়তাবাদ ইসলামী আদর্শের সাথে সামস্যপূর্ণ নয়। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রভিত্তিক ধারণা-চিন্তাভাবনা সাধারণত ভৌগোলিক এলাকাকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম উম্মাহর পরিধি বিশ্বব্যাপী হতে পারে। ইসলাম সংহতির অংশ হিসেবে জন্ম ও রক্তের কৌলিণ্যের সংকীর্ণ ভিত্তিকে বাতিল করে দিয়েছে, বংশ বা জন্মভূমির প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। তবে মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে একটি দল বা গোষ্ঠীর প্রতি অন্যান্য দল বা গোষ্ঠীর ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকা আবশ্যক। জাতীয়তা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ব্যক্তির পছন্দের উপর। কেননা যারা অভিন্ন আদর্শে বিশ্বাস করে ইসলাম তাদের সকলকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ করে। এখানে ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা

জন্মস্থানের মধ্যে কোন তারতম্য করে না। এখানে কাউকে নির্মূল করার বা অধীনতার পাশে আবদ্ধ করার অবকাশ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তা সৃষ্টিতে একটি মাত্র বৈধ পথ উন্মুক্ত রয়েছে এবং তা হলো কাউকে সাদরে গ্রহণ বা আত্মীকরণ।

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) এর মতে জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম উভয়ে মতাদর্শ হিসেবে পরস্পরের বিপরীত। তাঁর মতে, মুসলমানদের হৃদয় ও মনের এক প্রান্ত দিয়ে যখন জাতীয়তাবাদের চেতনা অনুপ্রবেশ করে তখন অন্য প্রান্ত দিয়ে ইসলাম নিস্ক্রান্ত হয়। যে মুসলিম নিজেকে জাতীয়তাবাদের ধারক বলে জাহির করেন, তিনি ইসলামের আলোকবর্তিকা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের বিপরীতে জাতীয়তাবাদ মানুষে মানুষে বিভক্তি আনে। জাতিতে জাতিতে হিংসা, বিদ্বেষ, লড়াই ও সংঘাত জাতীয়তাবাদেরই পরিণাম। আবদুল হামিদ সিদ্দিকীর মতে, জাতীয়তাবাদের অর্থ যদি হয় প্রতিটি জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার তাহলে শঙ্কিত হবার কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, তা এ পর্যন্ত সীমিত থাকছে না।...আধুনিক জাতীয়তাবাদ শুধু একটি জাতির উন্নতি সাধনেই তৎপর নয়, এটা অন্যান্য জাতির অস্তিত্ব মুছে ফেলতেও সচেষ্ট। তাই আজকে জাতীয় মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ দাঁড়িয়েছে প্রয়োজনবোধে অপরের উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য।[৩৮]

১৭.২১ হুররীয়াত – স্বাধীনতা (Hurriat - Freedom)

হুররীয়াত অর্থ স্বাধীনতা। আরবিতে স্বাধীনতাকে ইসতিকলালও বলা হয়। হুররীয়াত শব্দটি সকলের নিকট খুবই পছন্দনীয় শব্দ। মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীনতা প্রিয়। স্বাধীনতা এখন রাজনৈতিক পরিভাষা। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য কাজ করার ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ ভোগ ব্যবহারের অধিকার।

স্বাধীনতার ইংরেজি Independence এর আসল অর্থ সাবলম্বী হওয়া। ইংরেজি Liberty শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয় যা ল্যাটিন 'Liber' শব্দ হতে উদগত হয়েছে। 'Liber' শব্দের অর্থ হল স্বাধীনতা। ইংরেজি ভাষাভাষীরা Freedom শব্দও ব্যবহার করেন। সুতরাং শব্দগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে বুঝায় স্ব-অধীনতা অর্থাৎ ব্যক্তি ইচ্ছেমত যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে

৩৮. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, দ্যা মেইন স্প্রিংস অব ওয়েস্টার্ণ সিভিলাইজেশন, পৃ. ১৫৫।

অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। স্বেচ্ছাচারিতা স্বাধীনতাকে অবাস্তব করে তুলে। প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা হলো নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। সমাজে একত্রে বসবাস করতে হলে সকল মানুষকেই রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন স্বাধীনতার অন্তরায় নয় বরং তা স্বাধীনতার সহায়ক। আইন বিবর্জিত অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা কখনও সুশীল সমাজের কাম্য হতে পারে না।

বাংলায় স্বাধীনতা Own subservient – ইসলামে আল্লাহর আনুগত্য অনিবার্য সত্য। সেজন্য স্ব-অধীন হয়ে স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ ইসলামে নেই। একটি বাধাধরা গণ্ডির ভেতর থেকেই ইসলামে স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ রয়েছে। বল্লাহীন স্বাধীনতা বলতে ইসলামে কিছু নেই।

স্বাধীনতার ইসলামী স্বরূপ হচ্ছে– মানুষ মানুষের গোলামী করবে না। এখানে রবের গোলামী বন্দেগী করতে কোন বাধা থাকবে না। শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না, থাকবে না কোন অন্তরায়। জান, মাল, ইজ্জত-আবরু ভুগবেনা কোন নিরাপত্তাহীনতায়। মৌলিক অধিকারের পাওয়া যাবে নিশ্চয়তা। দেশের সার্বভৌমত্ব অন্য কোন দেশ বা জাতি দ্বারা হুমকীপূর্ণ হবে না।

স্বাধীনতা মানে পতাকা পরিবর্তন নয়। মানুষ যদি স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ ভোগ করতে না পারে, তাহলে এ স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। এজন্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে হবে। স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার জন্য সমাজদেহ হতে সর্বপ্রকার ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ কাতে হবে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ নাগরিকদের জীবন মান উন্নতকরণের জন্য ব্যবহার করতে হবে, রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি সকল নাগরিকের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, 'মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে যে অবস্থার প্রয়োজন তাকেই স্বাধীনতা বলে। মূলত স্বাধীনতা হচ্ছে সবকিছুর উপরিভাগে নিহিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতার উদ্ভাসন। মানুষ এ উদ্ভাসন কামনা করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনায়, চলনে-বলনে, পোশাকে-আশাকে, অর্থনীতিতে-রাজনীতিতে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, উঠা-বসায়, অর্জনে-বর্জনে, খাওয়ায়-দাওয়ায় এককথায় ব্যক্তিক-পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, 'আন্তর্জাতিক সর্বরকমের অভিজ্ঞা নেই। আসলে আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই স্বাধীনতার ইতিহাসের দিগদিগন্ত।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হামমুদাহ আবদালতি বলেন, ইসলামই মানুষকে যথার্থ স্বাধীনতার শিক্ষা দেয়, একে সযত্নে লালন করে এবং মুসলমানদের ন্যায় অমুসলিমদের জন্যও এর নিশ্চয়তা বিধান করে।

স্বাধীনতার ইসলামী সংজ্ঞা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল স্বেচ্ছামূলক কাজের বেলায়ই প্রযোজ্য। সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মন ও মননের মুক্তির উপর। একবার যদি মনমানসিকতা কোন পরাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কোন অধীনতা থেকেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ ঘরে ঘরে পৌছে দিতে হবে। সেই প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ তো পৌছে দিতে পারে একমাত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থা। তাই ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই হলো প্রকৃত স্বাধীনতার আনন্দ ও উপঢৌকনকে স্বাগত জানানো।

১৭.২২ মুলুকিয়াত – রাজতন্ত্র (Mulukiat - Monarchy)

মুলুকিয়াত বা রাজতন্ত্র বলতে এমন এক সরকার ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে রাজা বা রাণী প্রত্যক্ষভাবে তার অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং রাজবংশের অভিজাতদের সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। তিনি নির্বাচিত বা মনোনীত না হয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে শাসনক্ষমতা লাভ করে থাকেন। রাজতন্ত্রে রাজা বা রাণীই শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন। এ ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। অন্যকথায় রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন রাজবংশ, কোন বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। একজন রাজার মৃত্যু বা বিদায়ের পর পরবর্তী রাজা উক্ত বংশ, পরিবার বা গোষ্ঠী থেকেই মনোনীত হন। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রশ্নটি গৌণ বিষয়। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার চেয়ে যোগ্যও হয় তবুও তাকে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে নিয়োগ না করে রাজ পরিবারের বা রাজবংশের একজনকেই রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক করা হয়। আর সে রাজা বা রাজবংশের মর্জি মোতাবেকই রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয। রাজা বা রাণী ক্ষমতা প্রয়োগ ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

বর্তমান বিশ্বের বহু দেশে রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। অতীতে অবশ্য সর্বত্রই ছিল রাজতন্ত্র। রাজা বা রাণীর নির্দেশই ছিল আইন। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়নের সাথে সাথে রাজতন্ত্র ঝরে পড়েছে।

রাজতন্ত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy)

২. স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র (Tyranical Monarchy) : যেমন ইরানের শাহের রাজতন্ত্র।

৩. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) : রাজা বা রাণী রাষ্ট্রপ্রধান হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে। বৃটেন ও জাপানের শাসনব্যবস্থা হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বৃটেন ও জাপানে রাজা বা রাণী আছেন বটে কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনা করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ। রাজা বা রাণী ঐসব দেশে শুধুমাত্র আলঙ্কারিক প্রধান।

৪. জনমঙ্গলকর রাজতন্ত্র (Benevolent Monarchy) : সৌদি আরব, কুয়েত, জর্ডানের রাজতন্ত্র এ ধরনের রাজতন্ত্রের উদাহরণ।

ইসলামের রাজতন্ত্রের কোন স্থান নেই– তার পক্ষে যে ব্যাখ্যাই দেয়া হোক না কেন। রাজতন্ত্রের আরবি পরিভাষা হচ্ছে মুলুকিয়াত। ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র এক পর্যায়ে এসে মুলুকিয়াত বা রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। আর এর উদগাতা ছিলেন উমাইয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)। মহানবী (সা) রাষ্ট্রশাসন ও রাষ্ট্রনীতির যে দর্শন বাস্তবায়িত কার উত্তরসূরী খলীফাদের জন্য চলার পথ কণ্টকমুক্ত করে যান তারই নাম খিলাফত। এটি নির্মম সত্য যে, মহানবী (সা)-এর তিরোধানের পর তিন দশকেরও কম সময়ের মধ্যে খিলাফতভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ধূলিসাৎ হয়ে যায় আর তার স্থান গ্রহণ করে মুলুকিয়াত বা রাজতন্ত্র।

ইসলাম রাজতন্ত্র সমর্থন করে না। যোগ্যতা, সততা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে যিনি উপযুক্ত, তাকেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। আর সকলকেই তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তাকে রাজবংশের লোক হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে যোগ্যতার ভিত্তিতেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এখানে বংশ মর্যাদা কোন বিষয় নয়। মহানবী (সা) বলেন, 'যদি নাক কাটা হাবশী গোলাম তার যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তবুও তোমরা কোন বংশ মর্যাদার প্রশ্ন না করে তার আনুগত্য করবে।' ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের ছেয়ে অনেক উন্নত এবং কল্যাণকর। রাজতন্ত্র কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় কেননা

ইসলামে বাদশাহীতন্ত্র বা আমীর শাহীর কোন স্থান নেই, বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকার নির্বাচনেরও কোন অবকাশ নেই।[৩৯]

১৭.২৩ জিহাদ (Jihad)

জিহাদ একটি ইসলামী পরিভাষা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জিহাদ ইবাদতের একটি স্তর এবং মানুষের মুক্তি ও বিকাশের জন্য জিহাদ অপরিহার্য। জিহাদ দীন ইসলামের প্রাণশক্তি। ইসলামের মৌল ভাবধারা, ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের একমাত্র উপায়। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পূর্ণত্ব বিধানে, মুসলিম জাতিও জনগণের স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণের এবং বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, দাসত্ব নিগড়ে বন্দী মানবতার মুক্তি সাধনে শত্রু ও আগ্রাসী শক্তির আঘাত থেকে ইসলামী উম্মাহকে রক্ষা করার প্রেক্ষাপটে জিহাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে।

জিহাদের আভিধানিক অর্থ : আরবি জিহাদ শব্দটি জাহদুন বা জহুদুন শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধনা করা।

অন্যকথায়, জিহাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে, চেষ্টা, প্রচেষ্টা ও সর্বশক্তি নিয়োগ, চূড়ান্তভাবে কার্য সম্পাদন, শত্রু প্রতিরোধ ও দমনে শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষে প্রয়োগ।

সাধারণ অর্থ : সাধারণ অর্থে কোন কাজে অবিরত সাধনা করা তথা সর্বশক্তি প্রয়োগ করার নাম জিহাদ। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো অর্থে জিহাদ শব্দের ব্যবহার।

পারিভাষিক অর্থ : ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জান-মাল, শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে সংগ্রাম করার নাম জিহাদ। বস্তুত জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর পথে চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর সংগ্রাম চালানো। লেখা, কথা-বার্তা ও বিভিন্ন রকম কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সকল কর্ম প্রচেষ্টা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। আল কুরআনে দীন কায়েমের সামগ্রিক প্রচেষ্টার বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড এবং দীন বিজয়ী হওয়ার পর একে সুসংহতকরণ ও সকল জাতি গঠন এবং রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি সবকিছুকেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জিহাদ ঈমানের ঐকান্তিক তাকিদ।

---

৩৯. গডফ্রে এইচ জ্যানসেন, মিলিট্যান্ট ইসলাম, নিউইয়র্ক, হারপার এণ্ড রো, ১৯৭৯, পৃ. ১৭৩।

জিহাদ হচ্ছে ঈমানী জীবনের বিশেষত ইসলামী জীবনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য, সর্বোচ্চ ধাপ।

দীন ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়। তা একটা বিপ্লবী বিশ্বাস, একটা বিপ্লবী আদর্শ, একটা বিপ্লবাত্মক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের প্রতি প্রথম যখন ঈমান গড়ে উঠে, তখনই ঈমানদারদেরকে চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হতে হয় বিপ্লবী। যা কিছু অনৈসলামিক বিষয়াদি মনে মগজে বাসা বেঁধে আছে আবহমান কাল থেকে, তা নির্মমভাবে উৎপাটিত করার জন্য তাকে সক্রিয় ও সচেষ্ট হতে হবে। এরপর ব্যক্তির বাস্তবজীবন পরিচালিত করতে হয় ইসলামী আইন বিধান ও নিয়মনীতি অনুযায়ী সর্বপ্রকারের প্রতিকূলতা ও বাধা বিপত্তিকে প্রবলভাবে প্রতিহত করে। অতঃপর ব্যক্তিকে এগিয়ে যেতে হয় সামষ্টিকতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন থেকে। বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মহাসমুদ্রের দিকে। প্রতিপদে তাকে মুকাবিলা করতে হয় অনৈসলামী নিয়মনীতি, আইন-কানুন ও সেসবের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরাক্রমশালী তাগুতী শক্তির সহিত। এ মোকাবিলাই জিহাদ। এ মোকাবিলার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, অনৈসলামী তাগুতী শক্তিকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নির্মূল করে দিয়ে তদস্থলে মহান আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে তাঁরই দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে জিহাদ। এই হচ্ছে জিহাদের অব্যাহত ও সার্বক্ষণিক কার্যক্রম।

জিহাদের অর্থ যুদ্ধমাত্র নয়। কিছু লোক ইসলামের জিহাদকে 'প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের' মধ্যে সীমিত করে ফেলে। অথচ ইসলামের জিহাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ যুগের মানুষদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, যেসব কারণ এসব যুদ্ধ বিগ্রহকে উসকে দেয় এবং যেসব স্বার্থ এগুলোর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, তার সাথে ইসলামের জিহাদের কোনই সম্পর্ক নেই। ইসলামী জিহাদের কারণ খোদ ইসলামের অভ্যন্তরেই খুঁজে দেখতে হবে, খুঁজে দেখতে হবে ইসলাম পৃথিবীতে কি ভূমিকা পালন করতে এসেছে, কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় ইসলামকে, রাসূলদেরকে ও বিশেষভাবে সর্বশেষ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে।

ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্যেও নয় এবং শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিশেষ কর্তৃক রচিতও নয়। আর

ইসলামের জিহাদ মূলত পৃথিবীতে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর বান্দাদের গোলামী মূলোৎপাটনের সাথে জড়িত।

ইসলামের জিহাদ অপরাধমূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। আকৃতি, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য কোন দিক থেকেই সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের জিহাদের কোন মিল নেই।

১৭.২৪ সন্ত্রাস – সন্ত্রাসবাদ (Santrash - Terrorism)

সন্ত্রাস অধুনা বিশ্বের ভয়ানক এক মরণব্যাধি, যা বিশ্ব শান্তিকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার সাথে পাল্লা দিয়ে আরো যে একটি জিনিসের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস আজ বিশ্বব্যাপী।

সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসবাদ নতুন কোন সমস্যা নয়। হাজার হাজার বছর ধরেই জগতে এ দু'য়ের দাপট চলছে। এ সমস্যা মানব সভ্যতার প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরের।[৪০] সন্ত্রাস অতীতেও ছিল। বিভিন্ন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাস বিভিন্নরূপ ধারণ করে থাকে। সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসবাদের হাজার হাজার বছরের সর্ববিধ্বংসী সমস্যার মুখে মানব সভ্যতা এখানো টিকে আছে। তবে বর্তমান সময়ে নানাভাবেই সন্ত্রাস শব্দটি পৃথিবীতে উচ্চারিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসের নানা ঘটনা ঘটছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সন্ত্রাস আজ বিশ্বমানবতার শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে প্রতিনিয়ত। সন্ত্রাস এমন একটি শব্দ যার প্রতি ঘৃণা, ধিক্কার ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া চলছে বিশ্বব্যাপী।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে সর্বসম্মত ব্যাখ্যা আজও নির্ণীত হয়নি। যে কারণে দেখা যায় যে, যা একটা জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, তা অন্যের ভাষায় চরম ধিকৃত বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস। কারো বক্তব্যে যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, অন্যের ভাষায় ঠিক তাই হলো আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

সন্ত্রাস বা ভয়ানক আতংক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Terror. সন্ত্রাস শব্দ ত্রাস থেকে উদ্ভূত। ত্রাস হলো : ভয়, শঙ্কা, ভীতিকর। আর সন্ত্রাস হলো আতঙ্কগ্রস্ত

---

৪০. প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান, সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা)-এর আদর্শ (প্রবন্ধ) সংকলিত সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ৫৬।

করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সন্ত্রাসিত-সন্ত্রাসযুক্ত, সন্ত্রস্ত।[৪১] সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Terror extreme fear যৎপারানাস্তি আতঙ্ক। Terrorism বা সন্ত্রাসবাদ পদবাচ্যের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি। Terrorist হচ্ছে সন্ত্রাসী। Terrorise মানে সন্ত্রাসিত করা, ভয় দেখিয়ে শাসন করা।[৪২] সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'ইহরাব' অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা।[৪৩]

পারিভাষিক অর্থে সন্ত্রাস হলো : যে কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা। সন্ত্রাসবাদী– যে সন্ত্রাসবাদে আস্থাশীল বা তদনুযায়ী কাজ করে।[৪৪] The illegal use of (treats of) violence to obtain political demands[৪৫] আরবি ভাষায় ইরহাবিয়্যুন এমন একটি গুণবাচক নাম তাদের জন্য যারা রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ পূরণে শক্তিপ্রয়োগ ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করে।[৪৬]

১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে সন্ত্রাস দমনে সম্মিলিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এতে সন্ত্রাসবাদের একটি সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। সংজ্ঞাটি হচ্ছে : সন্ত্রাস হলো ব্যক্তি ও সামষ্টিক অপরাধ মনোবৃত্তি হতে সংঘটিত নিষ্ঠুর কাজ বা কাজের হুমকি, যে প্ররোচনা বা লক্ষ্যেই হোক না কেন, যা দ্বারা মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা হয় বা তাদেরকে কষ্টে ফেলার জন্য হুমকি দেয়া হয় বা তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা হয় বা পরিবেশকে ক্ষতির মুখোমুখি করা হয় অথবা প্রাইভেট বা সরকারি সম্পত্তি ছিনতাই করা, দখল করা, নষ্ট করা হয় অথবা কোন রাষ্ট্রীয় উৎস ধ্বংসের মুখে ফেলা হয়।[৪৭]

---

৪১. সংসদ বাংলা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ), ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ৩১৭।

৪২. Sansad English-Bangali Dictionary (Calcutta Sahita Sansad), Fifth Edition 1980, P. 1186.

৪৩. মুজাসুল ওয়াম্বিত নাজমাতুল লুগাতিল আরাবিয়াহ, আল ইদারাতুল আম্মা লিল মুজামাত ও ইহয়াযুত তুরাস (দিল্লী : দারুল ইলম) পৃ. ৩৭৬।

৪৪. সংসদ বাঙালা অভিধান, পৃ. ৬৬১।

৪৫. মাহমুদুল হাসান, সন্ত্রাস নয় শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অন্বেষা (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ৮ আগস্ট ২০০২, পৃ. ১০।

৪৬. মুযামুল ওয়াসীত, পৃ. ৩৭৬।

৪৭. দৈনিক আল আহরাম, মিশর, উদ্ধৃত সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

সন্ত্রাসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস – Nationalist Terrorism : আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম, যদি তার সাথে কোন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডযুক্ত হয়।

২. ধর্মীয় সন্ত্রাস – Religious Terrorism

৩. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস – State sponsored Terrorism : রাষ্ট্র কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসকে সমর্থন দেয়া। হিটলার, মুসোলিনি ও স্টালিনদের শাসনামলে রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস দেখা গেছে।

৪. রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ – Political Terrorism : ভয় বা আতঙ্কিত করে দেশ শাসন করার বা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস বা পদ্ধতি।

৫. ব্যক্তিগত সন্ত্রাস – জীবন বা অঙ্গহানির ভয় দেখিয়ে অর্থসম্পদ আহরণ কিংবা জিঘাংসা চরিতার্থকরণকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাস বলা হয়।

৬. বামপন্থী সন্ত্রাস – Leftwing Terrorism : শ্রেণী শত্রু খতম করার প্রত্যয় থেকে এ সন্ত্রাসের জন্ম। বামপন্থী গ্রুপের বা বাম ক্রিমিনাল গ্রুপের সন্ত্রাস।

৭. ডানপন্থী সন্ত্রাস – Right wing Terrorism : অন্যের অধিকার হরণ ও আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে হত্যা নির্যাতন এই সন্ত্রাসের দৃষ্টান্ত।

৮. নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাস – Anarchist Terrorism : আত্মহনন এবং লক্ষ্যহীন সন্ত্রাসী কার্যকলাপই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

৯. মাদক সন্ত্রাস – Narcoterrorism : মাদক সন্ত্রাস বলতে যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে বুঝায় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবৈধ মাদক চাষ, উৎপাদন, বিপণন এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যান্য সন্ত্রাসী গ্রুপকেও মাদক সন্ত্রাসী কর্তৃক সঠিক সহযোগিতা করতে দেখা যায়।

১০. তথ্য সন্ত্রাস (Media Terrorism) : তথ্যের মাধ্যমে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয় তাই তথ্য সন্ত্রাস। মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দ্বারা প্রবল ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টি করে দুশমনকে কাবু করার যে প্রক্রিয়া তাঁরই নাম তথ্য সন্ত্রাস। যার অপর নাম মিডিয়া সন্ত্রাস। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তথ্য সন্ত্রাসী হচ্ছে ইহুদী গোষ্ঠী। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইসরাইলে তাদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তথ্য সন্ত্রাসের উপর ভিত্তি করে। তথ্য সন্ত্রাস হচ্ছে সেই সন্ত্রাস, যার বাহন হলো তথ্য। সে তথ্যের মাধ্যমে বা তথ্যের দ্বারা বিভীষিকা আর ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বিবেককে বিভ্রান্ত করা হয়।

১১. কম্পিউটার তথ্য সন্ত্রাস– **Cyber Terrorism** : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং কম্পিউটার তথ্য প্রবাহে ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সাইবার টেরোরিজম।

১২. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস

সারণী-১ : ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণসমূহ

সামাজিক	রাজনৈতিক	অর্থনৈতিক	প্রশাসনিক
১. সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের অভাব	১. রাজনৈতিক অস্থিরতা	১. আর্থিক অস্বচ্ছলতা	১. অস্ত্রের সহজলভ্যতা
২. মানসিক হতাশা	২. রাজনৈতিক উত্তেজনাপূর্ণ উক্তি		২. শিক্ষকদের গ্রুপিং
৩. অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ	৩. ছাত্র রাজনীতিতে প্রভাবশালী নেতার আনুকূল্য		৩. সঠিক সময়ে পরিচয়পত্র প্রদান না করা
৪. বেকারত্ব	৪. যোগ্য নেতৃত্বের অভাব		৪. পরীক্ষা পিছানো
৫. সঙ্গদোষ	৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল		৫. ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা
৬. নৈতিকতার অভাব	৬. দলীয় কোন্দল		৬. বিচারকার্যে অপারগতা
৭. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়	৭. হলে রাজনৈতিক সিট দখল		৭. পুলিশ বাহিনীর আনুকূল্য কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা
৮. বৈষম্যের সমাজ ব্যবস্থা	৮. রাজনৈতিক আশ্রয়		৮. নবাগত ছাত্রদের যথাসময়ে সিট প্রদান না করা
	৯. নেতৃত্ব প্রদানের ইচ্ছা (হিরোবাদ)		৯. বহিরাগতদের আশ্রয়
			১০. প্রশ্নপত্র ফাস
			১১. সেশন জ্যাম
			১২. অস্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা পাসের প্রবণতা

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

ইসলামে সন্ত্রাসের কোন অবকাশ নেই। অন্যকথায় ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। ইসলাম অশান্তি, জঙ্গীবাদ, বাড়াবাড়ি, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসকে হত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ বলে অভিহিত করেছে। এমনকি অন্যায়ভাবে একজন মানুষের হত্যাকেও মানবজাতির হত্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ্ বলেন, 'যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করলো সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্য করলো।' (৫ : সূরা আল মায়েদা : ৩২) আত্মঘাতি বোমা হামলারও কোন অনুমতি নেই ইসলামে। আত্মহত্যাকারীদের জন্য জাহান্নামের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বোমার মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনভাবে হোক না কেন, আত্মহত্যাকারী পার্থিব জীবনে আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে চায়, তাকদীরে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুল করে না। (সহীহ আল বুখারী, হাদীস–৩৮৮২)। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদ ইতিবাচক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোন বুনিয়াদ নয় বিধায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামের কোন ভিত্তি নয়। ফিতনা বা বিপর্যয় হত্যার চেয়েও জঘন্য (২ : সূরা আল বাকারা : ১৯১) অতএব ইসলামের নামে বোমাবাজি করা, মানুষ হত্যা করা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কুরআন সুন্নাহসম্মত কাজ নয়। এ কারণেই ইসলাম অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানে অত্যন্ত কঠোর। ইসলামের মানবিক রূপ পশ্চিমী দেশসমূহে যুদ্ধবাদী, সহঅবস্থান বিরোধী, অশান্তি সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত হয়েছে। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চলছে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই। পাশ্চাত্যের এ চিন্তা বুঝার ভুল বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত। নিরপেক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ হয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে মানবতা ও মানব সমাজ বিরোধী অপরাধের প্রতিরোধ, প্রতিবিধান ও বিচারের প্রশ্নে ইসলামের অনঢ়তা, আপোষহীনতা মানব সমাজের শান্তি ও কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন। ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। সকল নবীই জনগণের মন জয় করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। সন্ত্রাস বা শক্তি প্রয়োগ করে তা করেননি। কারণ শক্তি প্রয়োগ করে মন জয় করা যায় না।

মোটকথা জঙ্গীবাদ , সন্ত্রাসবাদ মানবাধিকার বিরোধী কাজ। ইসলামী ব্যবস্থায় দমন, অসহিষ্ণুতা ও চরমপন্থা বাস্তবায়নের অনুমতি দেয়া হয়নি।

১৭.২৫ মহাসনদ বা ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta)

১০৬৬ সালে নর্মান্ডির উইলিয়াম (William) ইংল্যাণ্ড জয় করেন। তিনি

নিজেকে ইংল্যাণ্ডের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে নর্মান যুগ শুরু হয়। এই সময় পুরোপুরি সামন্ত ব্যবস্থা (Feudal System)-এর সূত্রপাত ঘটে এবং রাজার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উইলিয়াম সমস্ত জমি সৈন্যদের প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে সামন্ত প্রথা অনুসারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করেন। আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার উপরও নর্মান নৃপতিগণ তাঁহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। উইলিয়াম নিজেকে গীর্জা বা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান হিসেবেও ঘোষণা করেন। এভাবে নর্মান যুগে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের এবং কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে অ্যাংলো-স্যাকসন যুগের উইটান এর মতো 'মহাপরিষদ' (Magnum Concilium) নামক একটি সংস্থার পরামর্শক্রমে উইলিয়াম ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা রাজকার্য পরিচালনা করতেন। নর্মান যুগের 'মহাপরিষদ' উইটান' এর মতোই একটি সংস্থা, মহাপরিষদও প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচিত সংস্থা ছিল না। রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি, উচ্চ শ্রেণীর যাজক, নাইট ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে রাজা এই 'মহাপরিষদ' গঠন করতেন। রাজার প্রতি মহাপরিষদের অখণ্ড আনুগত্য বর্তমান ছিল। অনেক দিন অন্তর এই সভার অধিবেশন বসত। এই সভার অধিবেশনগুলোর অন্তবর্তী সময়ে সর্বদা রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য আর একটি ক্ষুদ্রতর সংস্থা ছিল। এই সংস্থাটিকে বলা হত 'ক্ষুদ্র পরিষদ'। কয়েকজন প্রধান রাজকর্মচারী এবং ব্যারনদের নিয়ে এই সংস্থা গঠিত হত। নর্মান নৃপতিগণ 'মহাপরিষদ' এবং 'ক্ষুদ্র পরিষদ' এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন বটে, কিন্তু পরামর্শ মতো কাজ করার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। অন্যকথায় সেকালে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রায়ই যা খুশি তাই করতে পারতেন।

মহাসনদ ও চরম রাজতন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ : নর্মান রাজাদের সর্বময় কর্তৃত্বের ব্যাপক বিস্তারের ফলে সামন্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধন ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের সামন্ত শ্রেণীর ক্ষোভ তীব্রতর হয়। এই সময় দ্বিতীয় হেনরীর দুই পুত্র রিচার্ড ও জন স্বেচ্ছাচারী হইয়া ওঠেন। বিশেষত জনের খামখেয়ালীপনায় সামন্ত শ্রেণী অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তারা যাজক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চরম রাজক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য উদ্যোগী হয়। অবশেষে ১২১৫ সালে ১৫ই জুন তারিখে ভূস্বামীরা (Barons) রুনিমিড নামক একটি জায়গায় সমবেত হয় এবং রাজা জনকে তাদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি দলিল স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে। ১২১৫ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা জন সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত একটি

ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। রাজা জন ও ভূস্বামীদের মধ্যে সম্পাদিত এই ঐতিহাসিক দলীল 'মহাসনদ' বা 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta) নামে পরিচিত। এই সম্পাদিত দলীলের মাধ্যমে রাজার ব্যক্তিগত স্বৈরাচারের হাত থেকে মূলত ভূস্বামী ও যাজকদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। রাজা জন সামন্ত প্রভুদের বহু দাবিদাওয়া মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে মহাসনদ অধিকারের সনদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই মহাসনদের মাধ্যমে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত যে, রাজার ক্ষমতা প্রচলিত আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ- অনিয়ন্ত্রিত নয়। এ চুক্তি রাজার স্বেচ্ছাচারের অধিকার কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ রাজাকেও হতে হয়েছিল নিয়মের অধীন।

ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইতিহাসে ম্যাগনা কার্টা প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, রাজা প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদের অনুমোদন ছাড়া কারো স্বাধীনতায় বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এ চুক্তির সুপ্রভাব শুধু ইংল্যান্ডেই নয়, অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতালিপ্সু রাজা সহজে এ চুক্তিতে সাক্ষর করতে চাননি। কিন্তু সব সামন্ত মিলে রাজা জনকে লন্ডনের কাছে এক দ্বীপে বন্দী করে এ চুক্তিতে সাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এ চুক্তি বিচার বিভাগকেও অনেকটা নিরপেক্ষ করেছিল।

১৭.২৬ ফিতনা (Fitnah)

ফিতনা (Fitnah) মুনকারের অন্যতম প্রকরণ। মুনকারের এই প্রকারণটির বিরুদ্ধে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করতে বলেছে। তাকে সকল প্রকার মুনকার থেকে অধিকতর স্পষ্ট ও আলাদা করে দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেসব আয়াতে মুনকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেওয়া হয়েছে অথবা তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হযেছে কিংবা অস্ত্রবলে তাকে নির্মূল করতে বলা হয়েছে, সেখানে 'মুনকার' শব্দের পরিবর্তে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, যথা ঃ

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ ـ

"ফেৎনা বিশৃঙ্খলা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করা।" (২ : সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৯৩)

لَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ ـ

"আল্লাহ যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে জব্দ না করতেন। তাহলে দুনিয়া ফাসাদ (অরাজকতায়) ভরে যেত।" (২ : সূরা আল বাক্বারা ঃ ২৫১)

اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ.

"তোমরা যদি এরূপ (যেবাবে সশস্ত্র সংগ্রামের নির্দেশ দেয়া হয়েছে) না কর তাহলে খুব বড় রকমের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিবে।" (এখানে ফেৎনা ও ফাসাদ উভয় শব্দই একত্রে ব্যবহৃত)। (৮ : সূরা আল আনফাল ঃ ৭৩)

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -

"বস্তুতঃ 'ফেৎনা' হত্যার চেয়েও মারাত্মক।" (২ : সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৯১)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا -

"কাউকে হত্যাও করেনি, ফাসাদও ছড়ায়নি– এমন ব্যক্তিকে যে হত্যা করলো সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করলো।" (৫ : সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২)

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ -

"তারা ফেৎনা ছড়াবার চেষ্টা করেছিল।" (৯ : সূরা আত তাওবা ঃ ৪৮)

كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا -

"তারা যখনই ফেৎনার দিকে ফিরে যায় তাতে নিজেরাও শামিল হয়ে যায়।" (৪ : সূরা আন নিসা ঃ ৯১)

উপরের এই আয়াতগুলোতে মুনকারকেই ফেৎনা ও ফাসাদ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ সমস্ত মুনকারের মধ্যে এই ফেৎনা ও ফাসাদই একমাত্র বস্তু যাকে তরবারী ছাড়া নির্মূল করা যায় না।

ফিতনার তাৎপর্য

সাধারণভাবে লোকে মনে করে দুটো দলের মধ্যে প্রথমে কোন ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হবে। তারপর পরস্পরকে গালিগালাজ করবে, তারপর দু'দলের তাগড়া জওয়ানেরা লাঠি-সোটা, ইট-পাথর, তীর-বল্লম, ছোরা-বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে মাঠে লাফিয়ে পড়বে, একে অপরের মাথা ফাটাবে, হত্যা ও লুটপাট চালাবে, সবরকম উপায়ে গায়ের ঝাল মেটাবে– তবেই তাকে বলা হবে ফেৎনা ও ফাসাদ।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের অবস্থাও ফেৎনা ফাসাদেরই পর্যায়ভুক্ত বটে। তবে কুরআনিক পরিভাষায় এ শব্দ দুটোর অর্থ আরো ব্যাপক। ও প্রশস্ত। আরো অনেক অপরাধ রয়েছে এই তালিকাভুক্ত। সেই সব রকমের ফিরিস্তি আমাদের অন্য বই কিতাবে খুঁজতে হবে না। কুরআনেই তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কুরআন নিজেই ফেৎনা ও ফাসাদের মর্ম বিশ্লেষণ করেছে।

আরবী অভিধানে فَتَن শব্দের অর্থ স্বর্ণ পুড়িয়ে তা খাঁটি না ভেজাল তা দেখা। এই আভিধানিক অর্থের হিসাবে এই শব্দটি মানুষকে আগুনে ফেলা বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ -

"যেদিন তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।" (৫১ : সূরা আল মারিয়াত ঃ ১৩)

এরপর রূপক অর্থে এ শব্দটি মানুষকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে এমন যে কোন জিনিস বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততীকে ফেৎনা বলা হয়েছে। যথা ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ -

"জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেৎনা স্বরূপ।" (৮ : সূরা আর আনফাল ঃ ২৮)

এটা বলার কারণ এই যে, এগুলো মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়। মানুষ সত্যকে বেশি ভালোবাসে, না এ গুলিকে, তা এ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়। সুখ-শান্তি এবং বিপদ মুসিবতকেও ফেৎনা বলা হয়েছে। যথা ঃ

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً -

"আমি তোমাদেরকে বিপদ দিয়েও পরীক্ষা করি শান্তি দিয়েও পরীক্ষা করি।" (২১ : সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩৫)

এ কথা বলার কারণ এই যে, বস্তুতঃ উভয় অবস্থাতে মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে। যুগের আবর্তন এবং ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকেও ফেৎনা বলা হয়েছে। কেননা এগুলোর মধ্য দিয়েও জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের পরীক্ষা হয়ে থাকে। যথা ঃ

اَوَلاَ يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوْبُوْنَ وَلاَهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ -

"তারা কি দেখেনা যে, প্রতিবছর তাদেরকে একবার বা দুবার করে পরীক্ষা করা হয়। এতদসত্ত্বেও তারা সুপথে ফিরে আসে না এবং সাবধান হয় না।" (৯ : সূরা আত তাওবা ঃ ১২৬)

কাউকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি দায়িত্ব দেয়াকেও ফেৎনা বলা হয়েছে। কেননা এটা তার ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষা। যথা ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِىْ وَلاَتَفْتِنِّىْ -

"কেউ কেউ বলে, আমাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিন। আমাকে বিপদে ফেলবেন না।" (৯ : সূরা আত তাওবা ঃ ৪৯)

এসব উদাহরণ থেকে বুঝা গেল, ফেৎনার আসল অর্থ হলো পরীক্ষা– চাই তা ভোগের লালসা লাভের হাতছানি, স্বাদ সম্ভোগের মোহ ও প্রিয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমেই হোক অথবা ক্ষয় ক্ষতির ভয়, বিপদ আপদের আশংকা, দুঃখ লাঞ্ছনার আঘাত দিয়েই হোক। এই পরীক্ষা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তা হলে তা-ন্যায় সঙ্গত। কেননা আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা মানুষের পরীক্ষা নেয়ার অধিকার তার রয়েছে। বিশেষতঃ তার পরীক্ষা গ্রণের উদ্দেশ্য মানুষকে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় উন্নীত করা। কিন্তু একই পরীক্ষা যদি মানুষের পক্ষ থেকে হয় তাহালে সেটা জুলুম। সেটা তার অনদিকার চর্চা। মানুষ যখন কাউকে অনুরূপ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে তখন তার উদ্দেশ্য হয় তার বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করা, তার আনুগত্য গ্রহণে অন্যকে বাধ্য করা এবং নৈতিক ও আত্মীক দিক দিয়ে তাকে হীনতর ও নিম্নতর পর্যায়ে নিক্ষেপ করা। এই শেষোক্ত মর্মের দিক দিয়ে ফেৎনা শব্দটি ইংরেজি Persecution শব্দের প্রায় সমার্থক। তবে ফেৎনা শব্দের তাৎপর্য ইংরেজি শব্দের চেয়েও অনেক বেশি ব্যাপক। পবিত্র কুরআনে এর যে কয়টি অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েচে তা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

(১) দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর বাড়ি জবর দখল করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়া। যথা ঃ

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا-

"যারা নিদারুণ দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগের পর ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এবং যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছে ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে, তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (১৬ সূরা আন নাহল ঃ ১৪)

وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ - وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ -

"(পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধকরা অবশ্যই হেরেম শরীফের অবমাননার শামিল) কিন্তু হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে তাড়ানো ও বের করা আল্লাহর কাছে আরো সাংঘাতিক জিনিস। বস্তুতঃ হত্যার চেয়েও অরাজকতা মারাত্মক।" (২ সূরা আল বাকারা ঃ ২৭)

(২) জোর জবরদস্তির সাথে সত্যকে দাবানো ও সত্য গ্রহণ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া ঃ

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ -

"মুছা (আ) এর উপর তাঁর জাতির একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী ছাড়া আর কেউ ঈমান আনেনি। কেননা তাদের আশঙ্কা ছিল, ফেরআউন ও তার পাণ্ডারা হয়তো তাদের ওপর জোর জুলুম চালাবে।" (১০ : সূরা ইউনুস ঃ ৯)

(৩) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা– পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি এর ব্যাখ্যা করে এসেছি, সূরা আনফালের এক স্থানে অবিশ্বাসীদের একটি অপরাধ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। অতঃপর তারা পরাজিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সব শেষে তাদের এই অপরাধকে 'ফেৎনা' রূপে অভিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াত কয়টি লক্ষণীয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"কাফেররা আল্লাহর পথ অবরুদ্ধ করার জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে।" (৮ : সূরা আনফাল ঃ ৩৬)

فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ -

"তারা ব্যয় করতে করতে এক সময়ে ভীষণ অনুশোচনায় পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হবে।" (৮ : সূরা আনফাল ঃ ৩৬)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ -

"ফেৎনা ও অরাজকতা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।" (২ : সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

(৪) লোকদের বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধোকা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের চেষ্টা করা ঃ

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلاً ـ

"তারা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল যে, তোমাকে প্রলোভন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আমার নাজিলকৃত ওহি থেকে ফিরিয়ে নেবে– যাতে তুমি সেটা ছেড়ে দিয়ে আমার সম্বন্ধে অপপ্রচারণায় লিপ্ত হও। তুমি এতে সম্মত হলে তারা তোমাকে বন্ধু করে নিত।" (১৭ : সূরা বনি ঈসরাইল ঃ ৮)

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ـ

"সাবধান, যেন তারা আমার নাযিল করা ওহির কিছু অংশ থেকেও তোমাকে ফেরাতে না পারে। .....তবে কি তারা জাহেলিয়াতের শাসন ব্যবস্থা চায়? (৫ : সূরা আর মায়েদা ঃ ৭)

(৫) অসত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা এবং অসৎ ও অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হত্যা, রক্তপাত করা ও জোটবদ্ধ হওয়া।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا اِلاَّ يَسِيْرًا ـ

"(খন্দক যুদ্ধের সময়) মদিনার চতুর্দিক থেকে যদি শত্রুরা ঢুকে পড়তো এবং এই মোনাফেকদেরকে যদি তখন ফেৎনায় অংশ নিতে বলা হতো তা হলে তারা অবশ্যই তাতে অংম নিত এবং তাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হত না।" (৩৩ : সূরা আল আহযাব ঃ ২)

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ـ كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ـ

"তুমি এই মোনাফেকদের দলে এমন কিছু লোকও পাবে যারা তোমাদের সাথেও শান্তিতে থাকতে চায়। নিজের সম্প্রদায়ের সাথেও থাকতে চায়। কিন্তু

যখন ফেৎনার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন তাতে নির্দ্বিধায় শামিল হয়ে যায়।" (৪ : সূরা আন নিসা ঃ ১২)

(৬) ইসলামের অনুসারীদের ওপর বাতিলপন্থীদের প্রতাপ ও জোর জুলুম ঃ

اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ـ

"তোমরা যদি (ইসলামের অনুসারীদের সাহায্য) না কর, তাহলে পৃথিবীতে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিপর্যয় দেখা দেবে। (অর্থাৎ বাতিল পরাক্রান্ত হয়ে যাবে এবং ইসলামপন্থীদের ওপর জোর জুলুম চালাবে।) (৮ : সূরা আল আনফাল ঃ ১০)

১৭.২৭ ফাসাদ (Fasad)

অভিধানে 'ফাসাদ' বলা হয় কোন কিছুর মধ্যম পন্থার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকে। তাই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ন্যায় নীতি ও মধ্যমপন্থার পরিপন্থী এবং গঠনমূলক নয়–এমন যে কোন 'ফাসাদ' এর শামিল। তবে পবিত্র কুরআনে সাধারণভাবে ফাসাদ বলে বুঝানো হয়েছে সামাজিক চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকৃতিকে। উদাহরণ স্বরূপ কুরআন ফেরআউন, আ'দ ও সামুদকে ফাসাদের জন্য নিম্নরূপ দোষারোপ করেছে ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ـ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ـ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلاَدِ ـ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ـ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ـ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلاَدِ ـ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ـ

"এরকমের সেই নজিরহীন আদজাতি, উপত্যকায় পাথর দিয়ে গৃহ নির্মাণকারী সামুদ জাতি বং সমর সজ্জিত ফেরাউনের সাথে তোমার প্রভু কিরূপ ব্যবহার করেছেন তা দেখনি, তারা দেশে দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং ব্যাপক ফাসাদ বিস্তার করেছে। ফরে তোমার প্রভু তাদের ওপর আজাবের কোড়া বর্ষণ করেন।" (৮৯ : সূরা আল ফজর ঃ ১)

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের সেই ফাসাদ নামক অপরাধের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে ঃ

(১) ফেরআউন ছিল ক্ষমতাদর্পী। প্রজাদের মধ্যে সে শ্রেণী ও বর্ণগত বিভেদ সৃষ্টি করতো এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাতো। দুর্বলদের অন্যায় ভাবে হত্যা করতো ও তাদের সম্পদ লুট করতো ঃ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ - اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ -

"ফেরআউন ক্ষমতায় মত্ত হয়ে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। এক শ্রেণীকে দুর্বল করে দিয়ে তাদের সন্তান সন্ততীকে জবাই করতো এবং তাদের স্ত্রীদেরকে জীবিত রেখে দিত। সে সত্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (২৮ : সূরা আল কাসাস ঃ ১)

সে সত্য ইসলাম গ্রহণ করা থেকে লোকদের জোর-জবরদস্তি ফিরিয়ে রাখতো। হযরত মূসার (আ) অলৌকিক কীর্তি দেখে যখন যাদুকররা মুসলমান হলো তখন সে বললো ঃ

اٰمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ - اِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى -

"আশ্চার্য, আমি অনুমতি না দিতেই তোমরা ওর ওপর ঈমান আনলে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের গুরু। সে-ই তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। এখন আমি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত পা কাটাবো এবং তোমাদেরকে খেজুরের গাছের ওপর শূলে চড়াবো। দেখে নিও, কার আজাব কঠিনতর ও বেশি দীর্ঘস্থায়ী।" (২০ : সূরা ত্বহা ঃ ৭১)

সে একটি সম্প্রদায়কে দুর্বল পেয়ে তাদেরকে দাস শ্রেণীভুক্ত করে। সে যখন হযরত মূসাকে নিজের উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তখন তিনি জবাব দেন ঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ -

"তুমি যে অনুগ্রহের খোটা দিচ্ছ, তাহলো এই যে, বনি ঈসরাইলকে দাস বানিয়ে নিয়েছ।" (২৬ : সূরা আল শোয়ারা ঃ ২২)

সে ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে তারই মত মানুষের খোদা হয়ে বসেছিল এবং শুধুমাত্র বস্তুগত শক্তির জোরে রাজত্ব করতো। অথচ শক্তি হলো, ন্যায় বিচার ইনসাফ ও খোদাভীতির শক্তি।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ..... وَاسْتَكْبَرَهُمْ وَجُنُوْدُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْاْ اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لاَيُرْجَعُوْنَ -

"ফেরআউন বললো, হে দেশবাসী, আমি নিজে ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদা আছে বলে তা জানিনা। .....সে ও তার সেনাদল পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়াতো। তারা ভাবতো যেন আমার কাছে তাদের আর ফিরে আসতে হবে না।" (২৮ : সূরা আল কাসাস ঃ ৩৮-৩৯)

সে তার প্রজাদের মানসিকতা ও নৈতিকতার বিকৃতি ঘটিয়ে এত হীন ও নীচ করে দিয়েছিল যে, তারা তার দাসসুলভ আনুগত্য পোষণে সম্মত হয়েও গিয়েছিল।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ - اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ -

"সে তার জাতিকে নীচাশয় বানিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা তার আনুগত্য করেছিল। সত্যই তারা ছিল একটা পাপিষ্ঠ জাতি। (৪৩ : সূরা যুখরুফ ঃ ৫৪)

তার সরকারের ভিত্তিই ছিল অবৈধ ও ভ্রান্ত কালাকানুনসমূহ ঃ

فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ - وَمَا اَمْرُهُمْ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ -

"তারা ফেরআউনের আদেশ মেনে চলতো। অথচ ফেরআউনের আদেশ ন্যায় সঙ্গত ছিল না।" (১১ : সূরা হূদ ঃ ৯৭)

(২) অনুরূপভাবে ফা'সাদ ব্যাপৃতকারী নামে অভিহিত আদ জাতির একটা অপরাধ এই যে, তারা স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারি শাসকদের আদেশ মেনে চলতো ঃ

وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ -

"তারা স্বৈরাচারী ও হটকারী মাত্রেরই অনুকরণ করতো।" (১১ : সূরা হূদ ঃ ৫৯)

তারা জালেম ও হটকারী ছিল। ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সাথে তাদের কোন সংস্রব ছিল ন্যারত হূদ আলাইহিস সালাম তাদের এই দোষটির নিম্নরূপ সমালোচনা করেন।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ -

"তোমরা যার উপরেই হস্তপেক্ষপ কর, হটকারিতার সঙ্গেই কর।" (২৬ : সূরা আল শোয়ারা ঃ ১৩০)

তারা ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে দুর্বল জাতিসমূহের ওপর অত্যাচার চালাতো ঃ

فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً -

"তারা পৃথিবীতে অবৈধ পন্থায় পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে যে, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে?' (৪১ : সূরা হামীম সিজদাহ ঃ ১৫)

৩০ সামূদ জাতির 'ফাসাদ'মূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা কুরআনে এই দেয়া হয়েছে যে, তাদের গোত্রপতি ও শাসকরা জালেম ও পাপিষ্ঠ ছিল এবং তারা সেই জালিমদেরই অনুসরণ করতো। হযরত সালেহ্ (আ) তাদের উপদেশ দিতেন ঃ

وَلَاتُطِيعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ - الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَمْرِ وَلَايُصْلِحُوْنَ -

"তোমরা এসব সীমা লঙ্ঘনকারীদের কথামত চলো না যারা পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়ায় এবং গঠনমূলক কাজ করেনা।" (২৬ : সূরা আল শোয়ারা ঃ ১৫১-১৫২)

তারা এমন হটকারী চরিত্রের লোক ছিল যে, একজন মানুষ শুধুমাত্র তাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে এবং সৎকাজ করার উপদেশ দেয় এই কারণে তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারপর সেই জঘন্য অনাচারের জন্য মিথ্যা ও দুরভিসন্ধির নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বনেও কুণ্ঠাবোধ করেনা ঃ

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَايُصْلِحُوْنَ - قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ -

"সেই শহরে নয়জন দলপতি ছিল। তারা পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করতো এবং গঠনমূরক কাজ করতো না। তারা পরস্পরে বলাবলি করতো ঃ এসো, আমরা শপথ করি যে, রাতে আকস্মিকভাবে ছালেহ (আ) এর বাড়ির ওপর আক্রমন চালাবো এবং (তাকে হত্যা করে ফেলবো।) পরে তার খুনের দাবীদারদের বলবো যে, আমরা ছালেহ ও তার পরিবার পরিজনের হত্যা সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা সত্যই বলছি।" (২৭ : সূরা আন নমল ঃ ৪৮)

(৪) পবিত্র কুরআনে হযরত লূত (আ)-এর জাতিকে 'ফাসাদ' ব্যাপৃতকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের 'ফাসাদ' মূলক কাজের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করা হয়েছে ঃ

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ - اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرِ -

"তোমরা এমন অশ্লীলতা করছ যা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। কি আশ্চর্য;

তোমরা পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর, রাহাজানি কর এবং প্রকাশ্য সভা-সমিতির মধ্যে অশ্লীল কাজ কর।" (২৯ : সূরা আনকাবুত ঃ ২৯)

বস্তুতঃ লূত (আ) এর জাতির কৃত্রিম যৌনতা, বাণিজ্যিক সড়কের ওপর ডাকাতি এবং সামাজিক চরিত্রের এমন বিকৃতি ঘটা যে প্রকাশ্যে অনাচারে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাতে বাধা দেয় না। এ কয়টি জিনিসকেই একত্রে 'ফাসাদ' বলা হয়েছে।

(৫) মাদায়েনের লোকদেরকেও ফাসাদ ব্যাপৃত করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। হযরত শোয়াইব (আ) তাদেরকে নিম্নরূপ উপদেশ দেন ঃ

فَاَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَاتَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَايُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا - ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - وَلَاتَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِه وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا -

"মাপ ও ওজন ঠিকমত দাও। লোকদের কেনা জিনিস কম দিওনা। পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর আর তাতে ফাসাদ ব্যাপৃত করোনা। তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে এটাই উত্তম কর্মপন্থা। আর চলাচলের পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করো না এবং যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ঠেকানো ও তাদেরকে বক্রতার দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করো না।" (৭ : সূরা আল আরাফ ঃ ১১)

হযরত শোয়াইব (আ) যখন তাদেরকে সৎপথে চলার উপদেশ দিলেন তখন তারা বললো ঃ

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ -

"যদি তোমার দলবল না থাকতো তাহলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে, মেরে ফেলতাম। তুমি আমাদের ওপর ক্ষমতাশালী নও।" (১১ : সূরা হূদ ঃ ৮)

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মাদায়েনবাসীর ক্ষেত্রে ফাসাদ ছিল তাদের সর্বব্যাপী অবিশ্বস্ততা, বাণিজ্যিক কায়কারবারে বেইমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা। তারা বাণিজ্যিক চলাচলের পথে ডাকাতি রাহাজানি ও ছিনতাই করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতো। ঈমানদারকে ন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিহিংসা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, একজন পুণ্যবান মানুষ যখন তাদের

অন্যায় ক্রিয়া-কলাপের সমালোচনা করলো এবং পুণ্যের দিকে দাওয়াত দিল, তখন তারা তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বরদাশ্‌ত করতে রাজী হলো না এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

(৬) চুরিকেও 'ফাসাদ' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাইদের ওপর যখন পানপাত্র চুরির অভিযোগ আরোপ করা হয় তখন তারা বলে ঃ

تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ.

"আল্লাহর কসম, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমরা ফাসাদ ব্যাপৃত করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।" (১২ : সূরা ইউসুফ ঃ ৯)

(৭) রাজ রাজাদের পররাজ্য গ্রাসের দরুন যে বিপর্যয় আসে এবং তার প্রভাবে বিজিত জাতিগুলোর চরিতে যে হীনতা ও নীচাশয়তার জন্ম হয় তাকেও ফাসাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের চিঠি পেয়ে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকিস তার উপদেষ্টাদের বলেন!

اَلْمُلُوْكُ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُوْنَ -

"রাজারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে ফাসাদে ভরে তোলে। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব।" (১৬ : সূরা আন নহল ঃ ৩)

(৮) পবিত্র কুরআনে ফাসাদের একটা ব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যে সব সামাজিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা মানব সভ্যতার ভিত্তি, সেগুলো নষ্ট করা ফাসাদের শামিল। সূরা রা'দ-এ বলা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارُ -

"আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর যারা তা ভেঙ্গে দেয় এবং আল্লাহ যেসব সম্পর্ক– সম্বন্ধ দৃঢ় করার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করে, তাদের ওপরই আল্লাহর অভিশাপ এবং তাদের জন্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা রয়েছে।" (১৩ : সূরা আর রা'দ ঃ ৩)

সাধারণ তফসিরকারগণ এখানে 'সম্পর্ক ছিন্ন করা'কে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা একে শুধু আত্মীয়তা ছিন্ন করার অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে মানব সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পক্ষে যে সমস্ত সম্পর্ক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে সেই সমস্ত গুলিকেই বুঝানো হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সম্পর্ক, বাণিজ্যিক লেন দেন ও কায়কারবারের সম্পর্ক, চুক্তি অঙ্গীকার ও পারস্পরিক বিশ্বস্ততার সম্পর্ক, বিভিন্ন দেশ ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ সব সম্পর্কই মানব-সভ্যতার ভিত্তি।

পৃথিবীর সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা এ সব সম্পর্ক– সম্পদের সুষম ও সুচারুরূপে চালু থাকা ও টিকে থাকার ওপরই নির্ভরশীল। এগুলোকে বিনষ্ট করে দেওয়ার ফলেই পৃথিবীতে যুদ্ধ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। এজন্য আল্লাহ এগুলোর নষ্ট করাকেই ফাসাদ নামে অভিহিত করেছেন এবং এর জন্য অভিশাপের হুসিয়ারী দিয়েছেন।

(৯) যে শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিবর্তে জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজ চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকেও ফাসাদ, নামে অভিহিত করা হয়েছে।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ - وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ -

"সে যখন শাসকের আসনে বসে তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করতে সচেষ্ট হয় এবং ফসল ও প্রাণী কুলকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয় অথচ আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না।" (২ : সূরা আল বাকারা ঃ ২৫)

(১০) صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তথা, আল্লাহর পথ অবরোধ করাকেও ফাসাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে 'ফেৎনা' প্রসঙ্গে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহলে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ -

"যারা কুফরীরর পথ অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর পথ অবরোধ করে চলেছে,

তাদের উপর আমি আজাবের ওপর আজাব নাজিল করবো। কেননা তারা ফাসাদ ব্যাপৃত করতো।" (১৬ : সূরা আন নাহল ঃ ১২)

(১১) সূরা মায়েদায় যেসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করে وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا এবং যাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এসব ফাসাদ ব্যাপৃতকারীকে ভালোবাসে না। وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ। তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ـ

"তুমি তাদের বেশির ভাগ লোককেই দেখতে পাবে। পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও অবৈধ সম্পদ খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে।" (৫ : সূরা আল মায়েদা ঃ ৬২)

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ـ

"আমি কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তাদের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার বীজ বপন করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, আমি তা নিভিয়েছি।" (৫ : সূরা আল মায়েদা ঃ ৯)

এ থেকে বুঝা গেল যে, اثم (পাপাচার) যা মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রকে ধ্বংস করে, عدوان (সীমালঙ্ঘন) যার খারাপ প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে এবং اكل سحت (অবৈধ সম্পদ গ্রহণ) অর্থাৎ ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি অবৈধ কারবার দ্বারা মানুষের সম্পদ নেয়া এবং হীন স্বার্থের খাতিরে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার বীজ লালন করা ও যুদ্ধের আগুন জ্বালানো– এসবই ফাসাদের শামিল।

ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারণা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাংলার ইতিহাস, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি, রমযানের চল্লিশ শিক্ষা, ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা, মাইক্রো ফাইনান্স ও ইসলাম, মহানবীর সচিবালয়, মহানবীর অর্থ প্রশাসন, ইসলামে সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও বন্টন, ইলমুল হাদীস, ইসলামী আন্দোলনসহ অন্যান্য গ্রন্থাবলি শিক্ষার্থী ও সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক দু'টি বই প্রকাশের অপেক্ষায়। ছোটদের জন্যও তিনি নিয়মিত লিখছেন। ছোটদের ইসলামী অর্থনীতি, ছোটদের ইসলামী আন্দোলন, ছোটদের ইসলামী রাজনীতি প্রকাশনার কাজ চলছে। মাদরাসা ছাত্রদের জন্য তিনি বহু বই লিখেছেন, যা ছাত্র-শিক্ষক মহলে তাঁকে জনপ্রিয়তা দিয়েছে। একজন স্বতন্ত্র ধারার গবেষক ও প্রবন্ধকার হিসেবে ইতোমধ্যেই পাঠক মহলে তিনি তাঁর স্থান দৃঢ় করে নিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট।

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com
ISBN 984-70012-0004-3